হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

অষ্টাদশ ভাগ।

১৩১৭ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৭ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt.

at the Janma Bhumi Press.

39 Manick Bose's Ghat Street.

CALCUTTA.

1911

[illegible] দড় টাকা।] [ডাঃ [illegible] ন।]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

জন্মভূমির অষ্টাদশ বর্ষের সূচীপত্র সমাপ্ত।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

অষ্টাদশ ভাগ।

১৩১৭ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৭ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt.

at the Janma Bhumi Press.

39 Manick Bose's Ghat Street.

CALCUTTA.

1911

দড় টাকা।] [ডাঃ ... ান।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

জন্মভূমির অষ্টাদশ বর্ষের সূচীপত্র সমাপ্ত।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। } ১৩১৭ সাল, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

জয় জগদীশ্বর!

সর্ব্বমঙ্গলময় পরমপিতা পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসাদে আমাদের জন্মভূমি-পত্রিকা সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া, এই নববর্ষের প্রথম মাসে অষ্টাদশ বর্ষে প্রবেশ করিল। বর্ষপ্রবেশের মঙ্গলাচরণে সেই মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। গ্রহবৈগুণ্যবশে গতবর্ষে বিবিধ বিঘ্ন সংঘটনে আমরা একপ্রকার অবসন্ন হইয়াছিলাম; পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘ্ন বিনাশন বিশ্বপিতার করুণায় সেই নিদারুণ পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। সামাজিক ব্যবহারানুসারে আমরা ঢাক

বাজাইয়া বর্ষ বিদায় করি, ঢাকের বাদ্য কর্কশ হইলেও এ সময় সেই বাদ্যকে আমরা মঙ্গলবাদ্য জ্ঞান করিয়া থাকি, বর্ষ শেষে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে আমাদের উৎসব হয়, সেই উৎসবের মুলাধার উৎসব-সাগর বিশ্ব-মুলাধার, সেই কারণেই আমরা সমস্ত উৎসবে মানস-দর্পণে সেই বিশ্ব-রূপের রূপচ্ছবি অবলোকন করি। মঙ্গলাচরণে পুনরায় আমরা সেই বিশ্বময়ের শ্রীপদ-কমলে শরণাপন্ন হইলাম। প্রার্থনা এই যে, এই নববর্ষের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা সর্ব্বপ্রকার শুভানুষ্ঠানের সংকল্পিত ব্রতে মঙ্গল ফল লাভ করিয়া সুখী হইতে পারি।

প্রাণপণযত্নে দৃঢ়সংকল্পে জন্মভূমি-পত্রিকার পুষ্টি সাধনার্থ আমরা আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের যথানুক্রমে সাধ্যমতে আলোচনা করিয়াছি, ঐ উভয় বিষয়ের আলোচনায় যাহাতে জন সাধারণের চিত্ত-রঞ্জন হয়, সাধ্যমতে তৎবিষয়েও প্রয়াস পাইয়াছি, কৃতকার্য্যতা লাভ কতদূর হইয়াছে, তাহার বিচারকর্ত্তা গুণগ্রাহী পাঠক মহোদয়েরা।

আমাদিগের অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা গতবর্ষে আমাদিগকে যে প্রকার উৎসাহ দান করিয়াছেন, বর্ত্তমান বর্ষেও আমরা সেই প্রকার উৎসাহরূপ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত থাকিব না, সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ আশা রাখি। সংকল্পিত ব্রতে যাহাতে আমরা কিছুমাত্র বিচলিত না হই, সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করুন। জয় জগদীশ্বর!

ভূতবিজ্ঞান

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি.এ.এল.এম.এ.

ভূতবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের একটি প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুত সংহিতায় অমানুষ প্রতিষেধ নামক একটি অধ্যায় আছে, তাহাতে ভূতের যে সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, এখনকার Germ-disease. আর প্রাচীন কালের Demon-disease একই তত্ত্ব! Birdoe তাঁহার সুবিখ্যাত The original and Growth of the Healing Art নামকগ্রন্থের একস্থানে(P. 474) লিখিয়াছেন, The disease demon has now re-appeared in the form of a germ. অর্থাৎ প্রাচীন কালে লোক যাহাকে গ্রহজুষ্ট অমানুষ রোগ বলিত,

এখন স্থিরীকৃত হইতেছে তাহা Germ বা সূক্ষ্মসূক্ষ্ম ভূতযোনি হইতে সমুৎপন্ন।

তালগাছের মত লম্বা, কোটর গত চক্ষু, অনুনাসিক কণ্ঠস্বর সম্পন্ন ভূতযোনি মানুষের ঘাড় মটকাইয়া রক্ত পান করে, এরূপ কথা আয়ুর্ব্বেদের কোন স্থানেই পরিদৃষ্ট হয় না। সুশ্রুত ভূতের সংজ্ঞায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অন্যরূপ।

তিনি লিখিয়াছেন—

"হিংসাবিহারী যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুপাশ্রিতাঃ।
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবক্তৃভিঃ॥"

অর্থাৎ গ্রহ সকলের মধ্যে যাহারা হিংসাপ্রিয় দিব্যভাব প্রাপ্ত, সংজ্ঞাকারেরা তাহাদিগকে "ভূত" এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, গ্রহগণ শুচি ও অশুচি এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত; যাহারা শুচি তাহারা মানুষের কোনরূপ অনিষ্ঠ করে না; বরং তাহারা দেবভাব প্রাপ্ত হওয়ায় মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও উপকারপরায়ণ হয়।

নিশাচরণং তেষাংহি
যে দেবগণ সংস্থৃতাঃ।
তেতু ভৎসত্ত্ব-সংসর্গা
দ্বিজ্ঞেয়াস্ত তদঞ্জনাঃ॥
দেবগ্রহা ইতি পুনঃ
প্রোচ্যন্তে শুচয়শ্চ যে
দেববচ্চ নমস্তন্তে—
প্রত্যর্থ্যন্তে য দেববৎ॥
স্বামিশীলঃক্রিয়াচারাঃ
ক্রম এব সুরাদিষু॥

যে পুনরনুচরাঃ শুচয়ঃ তে দেবগ্রহা ইতি প্রোচ্যন্তে।
এভ্যঃ ন অস্মকমপকার স্তথাবিধো
ভবতি যে এবং বিধা ভবন্তীত্যর্থঃ অশুচয় স্তবেতে।
অশুদ্ধা অতএব গ্রহন্তি দেববচ্চ নমস্কারপূজাম্।

অশুচি স্বভাব যাহারা, তাহারা অসৃক্, বসা, মাংস লোলুপ হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে; ক্ষত শরীর পাইলে খুবই ভাল, অক্ষত শরীরেও তাহারা আবেশ করে, যদি তাহা মলিন ও অশুচি হয়। অশুচিগণ নিঋতির বংশ।

নিশ্বর্তের্ষা দুহিতর *

স্তাসং স প্রসবঃস্মৃতঃ।

নৈঋতোরক্ষঃ পিতামহঃ তস্য যা

দুহিতরঃ পুত্র্যঃ তাসাং স প্রসবঃ অত

প্রভৃতি ভাবং ন ত্যজতি।—ডল্লনঃ

নৈঋতিঃ পাপদেবতা-সায়ন

ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া অধর্ম্ম পথে ইহারা প্রস্থিত সুতরাং হিংসাই ইহাদের বৃত্তি।

সত্যত্বাদপ বৃত্তেষু—

বৃত্তিস্তেষাং গণৈঃকৃতা॥

অশুচিং ভিন্ন মর্য্যাদং

ক্ষতং বা যদি বা ক্ষতম্

হিংস্যু হিংসা বিহারার্থং

সৎকারার্থমথাপি চ।

হিংসা বিহারাণি হি মহাবীর্য্যানি

রক্ষাংসি পশুপতি কুবের কুমারণুচরাণি

মাংস শোণিত প্রিয়ত্বাৎ ভোজন নিমিত্তং

ত্রৰ্ম্মিমুপসর্পন্তি সৎকারার্থং

জিঘাংসূনি বা কদাচিৎ।

নিশাচরেভ্যো রক্ষ্যন্তু

নিত্যমেব ক্ষতাতুরঃ॥

রক্ষংসি পশুপতি কুবের কুমারানুচরাণি

মহেশ্বর ধনদ কাৰ্ত্তিকেয়ানুগতানি তদা

দেব কারীনীত্যর্থঃ।—ডল্লনঃ

সুশ্রুত বলিয়াছেন, অসৃক বসা মাংস লোলুপ পাপদেবতা নিঋতির অপত্য সকলই হিংসার্থী হইয়া মানুষে আবিষ্ট হয়, বলিয়া ইহারা ঠিক দেবতা নহে, দেবতাদিগের অনুচর বা পরিচারক। দেবতারা মানুষে আবিষ্ট হন না।

সুশ্রুত বলিয়াছন যে বৈদ্য মোহ বশতঃ বলে দেবতারা আবিষ্ট হন, তাহাদিগকে ভূতবিদ্যার অধিকার হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। তাহারা জানেনা যে দেবতা তপোধর্ম্ম ও অষ্টগুণ সম্পন্ন।

তপাংসি তীব্রাণি তথৈবচ।
ব্রতানি ধর্ম্ম নিয়মশ্চ
গুণাস্তথাষ্টাবপিতেচ
ব্যস্তা সমস্তাশ্চ তথা॥
ন তে মনুষ্যাং সহ সংবিশন্তি
ন বা মনুষ্যান্ কচিদাবিশন্তি।
যে বা বিশন্তীতি বদন্তি মোহাৎ
তে ভূতবিদ্যা বিষয়াদপোহ্যাঃ॥

ফলতঃ সুশ্রুতের মতে এই দেবতাদিগের কোটি সহস্র অযুত পদ্ম পরিচারক আছে, তাহারই অসৃক মাংস বসা লোলুপ এবং অতি ভয়ঙ্কর; তাহারা আলোক সহ্য করিতে পারে না। অন্ধকারে তাহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করে, এবং মানুষে আবিষ্ট হয়। "নৈঋতেয়া" বলিতে এই পরিচারক ও পরিচারিকাদিগের কথাই মনে করিতে হইবে।

তেষাং গ্রহানাং পরিচারকা যে
কোটি সহস্রাযুত পদ্মসংখ্যা :
অসৃগ্‌ বসামাংসভুজঃ সুভীমাঃ—
নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশন্তি॥

যেমন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব প্রবেশ করে, শীত উষ্ণ প্রাণীদিগের দেহে প্রবেশ করে, যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে, যেমন জীবাত্মা দেহে প্রবেশ করে, সেইরূপ ইহারা অদৃশ্য ভাবে জীবদেহে আবিষ্ট হয়।

দর্পণাদীন যথাচ্ছায়া
শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা
স্বমুনিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ
যথা দেহঞ্চ দেহভৃৎ
বিশন্তি চ ন দৃশ্যচ্ছন্তে
গ্রহাস্তদ্বস্থরীরিনম্।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে বিদ্যার দ্বারা এই ভূতদিগের বিষয় জানা যায় সেই বিদ্যার নাম ভূতবিদ্যা।

গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি
যস্মাদ্বেত্যনয়া ভিষক্
বিদ্যয়া ভূতবিদ্যাত্ব
মত এব নিচক্যতে।

সুশ্রুতসংহিতার উত্তর তন্ত্রে এই ভূতবিদ্যার বিষয় যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত! প্রাচীন কালে এদেশে ভূতবিদ্যা তন্ত্র স্বতন্ত্রাকারে বৃহৎ কলেবরে বিদ্যমান ছিল; সে তন্ত্র কালস্রোতে এখন অদৃশ্য হইয়াছে। ডল্লনের টীকা হইতে আমরা জানিতে পারি, কাশ্যপাদি ঋষিদিগের এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, তা ছাড়া কুমারতন্ত্র নামক স্বতন্ত্র তন্ত্রে এই সকল প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত ছিল, যাহার অর্থপিণ্ড, সুশ্রুতসংহিতাধৃত পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকমাত্র।

(ক) তত্র প্রথমং কুমার তন্ত্রস্য
অর্থপিণ্ডমুদ্দিশন্নাহ বালগ্রহানামিত্যাদিম্।
(খ) কাশ্যপাদি তন্ত্রান্তরোক্তাধিক
সংখ্যানিরাকরণার্থং" ইত্যাদি।

ডল্লন উঃ ২৭ অঃ

সকল আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেই ভূতবিদ্যা নামক বৃহদ্বপু স্বতন্ত্র তন্ত্রের অস্তিত্বের কথা আমরা অবগত হই বটে কিন্তু ইহাতে ভূতবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় যাহা দেখিতে পাই, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত—তাহাতে তৃপ্তিলাভ অসম্ভব।

সুশ্রুতে আছে—

ভূতবিদ্যা নাম দেবাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষঃ পিতৃ পিশাচ নাগ গ্রহাদ্যুপসৃষ্ট চেতসাং শান্তিকর্ম্ম বলি হরণাদি গ্রহোপশমনার্থম্।

তা ছাড়া কুমারভৃত্য তন্ত্রের একাংশ ও গ্রহসমুত্থানব্যাধীনামুপশমনার্থম্ এই উভয় তন্ত্র—কুমারতন্ত্র এবং ভূতবিদ্যাতন্ত্র-নিশ্চয়ই পাঁচ সাত পাতায় সম্পূর্ণ হয় নাই, দেহ চিন্তক অপণ্ডিত অল্পবিজ্ঞান বৈদ্যদিগের হস্তে পড়িয়া এই বৃহৎ তন্ত্র যেমন বিলুপ্ত হইয়াছে, তেমনি তাহাদেরই বুদ্ধির দোষে "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপিয়া ভারতীয় ভূতবিজ্ঞান আজ রোজার মন্ত্রে পরিণত। সুশ্রুতঃ ইহাদিগকে গালি দিয়া তাই লিখিয়াছেন।

কুমারস্কন্দসামান্যদত্র কেচিদপণ্ডিতাঃ
গৃহ্লাতীত্যল্প বিজ্ঞানাব্রুবতে দেহচিন্তকাঃ। সুঃ ৩৭ অঃ

এখন ভূতবিদ্যার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে অন্বেষণ করিয়া বুঝিতে হইবে সুশ্রুত যে নৈঋতেয়া বা নিঋতিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অর্থ কি?

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৬০ সূক্তের ১ ঋকে, যক্ষ্মারোগীকে নিঋতির অনুচর

সায়ন অর্থ করিয়াছেন পাপদেবতা দূতোনিঋত্যা ইদমাজগাম (ঋক ১০।১৬০।১ নিঋত্যাঃ পাপদেবতায়াঃ দূতোনুচরঃ (সায়ন) ঋগ্বেদের মতে যক্ষ্মারোগী যেমন পাপদেবতা নিঋতির অনুচর দিগের দ্বারা আক্রান্ত তেমনি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য অধিকাংশ ঋষির মতে বিষমজ্বর ভূতাবিভবদ্ধোথ কেচিদভূতাভিঘাথং ব্রুবন্তিবিষমজ্বরম্।

আবার স্কন্দ পুরাণে আছে, জ্বর ভূতা ভবঙ্গোথ হইয়া যেমন বিষম জ্বরে পরিণত হয় তদ্রূপ মসূরিকা, শীতলা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শীতলার (Smallpox এ পরিণত হয়। বিসর্প বিস্ফোটক প্রভৃতি, ব্যাধি সকলও এইরূপ গ্রহাধিষ্ঠিত।

দেব্যা শীতলয়াক্রান্তা মসূর্য্যোবহি শীতলা
জ্বর এব যথা ভূতাধিষ্ঠিতো বিষমজ্বরঃ

ফলতঃ যক্ষ্মা বিষমজ্বর, বসন্ত, হাম, ম্যালেরিয়া বিসর্প বিস্ফোটক, ক্ষতদুষ্টি প্রভৃতি ব্যাধি আজকাল প্রতীচ্য চিকিৎসকেরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর Vegetable micro orgnism এর আবেশ হইতে সমুৎপন্ন মনে করেন, তেমনি প্রাচীনেরা মনে করিতেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিসকল অদৃশ্য নিশাবিহারী (রাত্রৌ ভ্রমণ শীলাঃ—চল্লন) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিংসা পরায়ণ ভূতের আবেশ হইতে উৎপন্ন। অযুত লক্ষ কোটিপদ্ম তাহাদের সংখ্যা। অসৃকবসা ও মাংসের লোভে ইহারা ভিন্ন ভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই ভূত সকল এই জগতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যালোকে, বিশুদ্ধ বায়ু প্রদেশে, পবিত্র শুচি স্থানে অথবা যেখানে "বেদপাঠ হয়, হোম হয়, কিম্বা যেখানে বহু লোকে ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়া পুষ্পমাল্য পুষ্প চন্দনাদি গন্ধযুক্ত হইয়া শুক্ল বসন পরিধান করিয়া, শুচিভাবে অবস্থিতি করে, সেখানে ইহাদের প্রবেশাধিকার নাই। পদ্ম পুরাণ বলেন, যেখানে সকল প্রকার অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থানই নিঋতির প্রিয় (পাদ্মোত্তর খণ্ড ১৬১ অঃ) মার্কণ্ডেয় পুরাণকারের মতে ক্ষত কীট দূষিত উচ্ছিষ্ট অপক্ব অগ্নিদগ্ধ, অবলীঢ় অসংস্কৃত ভগ্ন ভাণ্ডস্থিত এবং অন্যান্যরূপে উপঘাত প্রাপ্ত যে কিছু অশুদ্ধ ভক্ষ্য বা জল তৎসমস্তই ইহাদের আহার। অবিশুদ্ধ শুক্রশোণিত ইহাদের আশ্রয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৬০ অঃ) তিনি আরও বলেন ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি অস্থি মর্জ্জা এবং বালকের দন্তে অবস্থিতি করে, লীকা (তৎপর্য্যায় লিকা লীক্ষা লীখা লিখিকা ইতি শব্দরত্নাবলী) যেমন একদিকে নৈঋতেয়া বলিয়া পরিচিত অন্যদিকে, শস্যহা ক্ষুদ্রক প্রভৃতি নৈঋতেয়া।

যব গোধূম শস্য সকলকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। (তথৈবকঃ ক্ষুদ্রকোনামনামতঃ। শস্যর্দ্ধিং স সদাহন্তি।)

ক্রমশঃ



কুইন ভিক্টোরিয়া।

যে মহিমান্বিতা গৌরবিনী মহিলা বাষট্টিবৎসর মহাগৌরবে রাজত্ব করিয়া সর্ব্বত্র যশোস্বিনী হইয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, তাঁহার জীবনী সর্ব্বলোকের আলোচ্য ও গৌরবের সামগ্রী ; অতএব আমরা সংক্ষেপে এই স্থলে সেই জীবনীর সারাংশ গ্রহণ করিতেছি।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে দিবসে ইংলণ্ডের কেনসিংটন প্রাসাদে ভিক্টোরিয়া আলেকজেন্দ্রিনা জন্মগ্রহণ করেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পুত্র ডিউক অব কেণ্ট তাঁহার পিতা। ভিক্টোরিয়া শৈশবে পিতৃহীনা; তাঁহার জননী ডচেস্ অব কেণ্ট পরম স্নেহ যত্নে তাঁহাকে লালন পালন করেন। লর্ড ক্লাইভের এক ভগ্নী রাজকন্যার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ডচেস্ অব কেণ্ট জর্ম্মাণকুলজাতা, অতএব কুমারী ভিক্টোরিয়া প্রথমে জননীর নিকটে জর্ম্মাণভাষা শিক্ষা করেন; শেষে তিনি ইংরাজীতে এতদূর সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব কালে ইংরাজীভাষা রাজ্ঞীর ভাষা (Queen's Language.) নামে গৌরব লাভ করিয়াছিল।

বাল্যজীবনে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া সর্ব্বজনের আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন। স্থিরা ধীরা নিরহঙ্কারা মাতৃ বৎসলা প্রিয়ম্বদা ভিক্টোরিয়া। ছোট বড় সকলের সহিত তিনি সহাস্যবদনে মধুর বচনে সম্ভাষণ করিতেন; রাজকন্যা বলিয়া কিছুমাত্র অভিমান রাখিতেন না।

একদিন একটি গৃহস্থরমণীর সহিত একটি বালিকা রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজ কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করে, রাজকুমারী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করেন, বালিকা বলে, "আমার নাম ভিক্টোরিয়া।" কৌতুকবশে রাজকুমারী তাহাকে বলিলেন, "তবে ত তোমার নামে আমার নামে এক, আজি অবধি তুমি আমার সই।" বালিকাটি রাজকুমারীর সমবয়স্কা; দুটি সইতে বেশ ভাব হইল, সইকে লইয়া রাজকুমারী ক্রীড়া করিতেন, এক সঙ্গে আহার করিতেন, এক সঙ্গে পুস্তক পাঠ করিয়া আমোদ করিতেন।

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম কুমারী ভিক্টোরিয়ার পিতৃব্য ছিলেন, ১৮৩৭ অব্দের ২০শে জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেইদিন উষাকালে আর্চ্চবিশপ, লর্ড চ্যান্সেলার এবং রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী একত্র হইয়া কেন্‌সিংটন প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হন, দ্বার পালের আহ্বানে রাজকুমারীর সহচরী নামিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। লর্ড চ্যান্‌সেলার তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজকুমারী কি করিতেছেন? সংবাদ দাও, বিশেষ প্রয়োজন। সহচরী বলে, এখনও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। চ্যান্‌সেলার বলেন, শীঘ্র জাগাও। সহচরী উপরে উঠিয়া গেল।

জননীর সহিত রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া একগৃহে শয়ন করিতেন, সহচরীমুখে

বার্ত্তা পাইয়া ডচেস্ অব কেণ্ট তৎক্ষণাৎ কন্যাকে জাগান, যাঁহারা দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলেন।

রাজকুমারীর বয়ঃক্রম তখন অষ্টাদশ বৎসর। নিদ্রাচ্ছন্ন নয়নে একখানি স্থূল বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাজকুমারী অবিলম্বে নামিয়া আসিয়া অভ্যর্থনাগৃহে প্রবেশ করেন। বিশপ ও লর্ডেরা গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন, রাজকুমারীও সমাদরে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে বলিলেন।

লর্ড চ্যান্‌সেলার বলিলেন, "গৌরবিনীরাজ্ঞি!"

সহসা "রাজ্ঞী" সম্বোধনে রাজকুমারী চমকিতা হইলেন, অনন্তর পিতৃব্যের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া দর্ দর্ ধারে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

"এই অল্প বয়সে আপনার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইবে, আপনাকে অদ্য রাজসভায় উপস্থিত হইতে হইবে।" এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া অভ্যাগতেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যথা সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যথা বিহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। এক বৎসর পরে অভিষেক। অভিষেকের দিন একটি কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজপরিবারে এইরূপ নিয়ম আছে যে, নূতন রাজা অথবা রাণীর অভিষেকের সময় পার্লামেণ্টের লর্ডেরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। নবরাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে লর্ডেরা যুক্তি করিয়া বলিলেন, তরুণ বয়স্কা রাণীকে সকলে অভ্যর্থনা করিলে অসুবিধার বিষয় হইবে, উপস্থিত লর্ডগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই একাকী অভ্যর্থনা করিলেই কুলাচারের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি বৃদ্ধ, তাঁহার নাম লর্ড লোলি; সিংহাসনের দুই তিন সোপান উঠিতে উঠিতে হঠাৎ তাঁহার পাদস্খলন্ হইল, গড়াইয়া গড়াইয়া তিনি নিচে পড়িয়া গেলেন! দ্বিতীয়বার তিনি যখন উঠিতে ছিলেন, রাজ্ঞী দুঃখিত চিত্তে তৎকালে দুই তিন সোপান নামিয়া আসিয়া সম্ভ্রমসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন।

সমারোহে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। রাজমন্ত্রীগণ, প্রজাগণ সৈন্যগণ সকলেই পরম পরিতুষ্ট।

অভিষেকান্তে নবরাজ্ঞী আপন প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, রাজ মুকুট খুলিয়া রাখিয়া, সর্ব্বাগ্রে আপন প্রিয় কুক্কুরটিকে স্নান করাইলেন, আদর করিয়া ভোজন করাইলেন; তদনন্তর বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিলেন. নিশাকালে

স্বজনবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাসাদ শিখরে আরোহন পূর্ব্বক উৎসব পূর্ণ নগরের আলোকমালা ও আতস বাজী দর্শন করিয়া পরম কৌতুকে নামিয়া আসিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্নকালে সেণ্টজেম্‌স্ ধর্ম্মমন্দিরে জর্ম্মাণির স্যাক্সকোবর্গ প্রদেশের অধিপতির পুত্র রাজকুমার প্রিন্স আল্‌বার্টের সহিত রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। সম্বন্ধে প্রিন্স আল্‌বার্ট রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মাতুলপুত্র। ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব হইতেই সম্বন্ধ সূচনা হইয়াছিল, অভিষেকের পর রাজ্ঞী বলিয়াছিলেন, দুই বৎসর পরে বিবাহ করিবেন। প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মনোমত পতিলাভ করিয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক পতিসেবা করিতেন, ইতিহাস তাঁহাকে পতিব্রতা ভিক্টোরিয়া বলিয়া গৌরব দান করে।

যে বৎসর বিবাহ হয়, সেই বৎসর নবেম্বর মাসের একবিংশ দিবসে রাজ্ঞীর প্রথমা কন্যার জন্ম হয়, কন্যার নাম ভিক্টোরিয়া মেরী লুইসা। জর্ম্মাণির সম্রাট ফ্রিডারিক উইলিয়মের সহিত (১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে) সেই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, তৎপুত্র এক্ষণে জর্ম্মাণির বর্ত্তমান সম্রাট।

১৮৪১ অব্দের ৯ই নবেম্বর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রথম পুত্রের জন্ম, নাম আল্‌বার্ট এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলস্। সেই পুত্র এক্ষণে সপ্তম এডওয়ার্ড উপাধি প্রাপ্ত, ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতবর্ষের সম্রাট। ১৮৬৩ অব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেক জেন্দ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহাদের চারিটি পুত্রকন্যা এক্ষণে জীবিত।

১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ২৫শে এপ্রেল রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম; নাম এলাইস্ মডমেরি।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ৬ই আগষ্ট রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম, নাম আল্‌ফ্রেড আরনেষ্ট আল্‌বার্ট, ডিউকব এডিন বরা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে লুসিয়া রাজ কুমারী মেরি আলেক জান্দ্রার সহিত বিবাহ, তাঁহাদের পাঁচটি পুত্র কন্যা বর্ত্তমান; ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে ডিউকব এডিন বরা পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার তৃতীয়া কন্যার জন্ম, নাম হেলেনা আগষ্ট ভিক্টোরিয়া।

কেরোলাইন; ১৮৭১ অব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখে ডিউকব আর্গাইলের পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে রাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্রের জন্ম, নাম আরর্থার উইলিয়ম পেট্রিক আল্‌বাট, ডিউকব কনাট। ১৮৭৯ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে প্রুসিয়ায় রাজকন্যা লুসিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহাদের তিনটি পুত্র কন্যা এক্ষণে জীবিত।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল তারিখে রাজ্ঞীর চতুর্থ পুত্রের জন্ম, নাম লিও পোল্ডজর্জ্জ:ডানকান আল্‌বার্ট, ডিউকব আলবানি। ১৮৮৪ অব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রিন্স লিওপোল্ডের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল তারিখে রাজ্ঞীর পঞ্চমা কন্যার জন্ম, নাম বিট্রা-ইস্ মেরি ভিক্টোরিয়া থিওডার। ১৮৮৫ অব্দের ২৩শে জুলাই তারিখে বটেন বর্গের রাজকুমার হেনেরির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৭ অব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে সেই কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার বিয়োগে রাজ্ঞী অতিশয় কাতরা হইয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞীভিক্টোরিয়া উপর্য্যুপরি দুটি মহাশোকপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জননী ডাচেস্অব কেণ্ট সেই বৎসরেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং বৎসরের শেষে ১৩ই ডিসেম্বর দিবসে প্রিন্স এল্‌বার্ট দারুণ জ্বর বিকারে ৪৩ বৎসর বয়সে ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাজ্ঞী একে মাতৃশোকে কাতরা তাহার উপর প্রিয়তম পতির অকাল মৃত্যু এই শোকে তিনি নিতান্ত অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। তদবধি ৪০ বৎসর কাল তিনি ধর্ম্মানুসারে সংযত চিত্তে বৈধব্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আর একটি কন্যাশোক; পিতৃবসৎলা রাজ কুমারী এলিসের মৃত্যু। এইস্থলে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। পার্লামেণ্ট মহাসভা দ্বারা চালিত ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী ইংলণ্ডবাসীগণের পক্ষে সুখকর, সে বিষয়ে আমরা বেশী কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, আমাদের ভারতবর্ষের কথাই আমাদের আলোচ্য।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন, তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ভারতের শাসনভার সমর্পিত ছিল। কোম্পানির

কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারির সহিত গোলযোগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সিপাই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, সেই বিদ্রোহে সৈন্য পক্ষের ও সিপাই পক্ষের লক্ষ লক্ষ প্রাণী-ক্ষয় হইয়াছিল। সুনীতিজ্ঞ ধৈর্য্যশীল শান্ত প্রকৃতি গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের বিজ্ঞতা প্রভাবে সেই নিদারুণ বিদ্রোহের শান্তি হয়, সেই সময় দয়াবতী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত রাজ্যের শাসন ভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বহস্তে গ্রহণ করেন, বিদ্রোহ শান্তি সূচক তাঁহার উদারতা পূর্ণ নিরপেক্ষ ঘোষণাপত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর দিবসে ভারতের রাজধানি কলিকাতা নগরে ও বিশাল ভারতক্ষেত্রের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে সেই ঘোষণা পত্র পঠিত হইয়াছিল। ভারতবাসীগণ চিররাজভক্ত, শোচনীয় বিদ্রোহ সময়েও বিদ্রোহ শান্তির উৎসব সময়ে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা তৎবিষয়ের অখণ্ড পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিশাল ভারত রাজ্য রাজ্ঞীভিক্টোরিয়ার খাসরাজ্য হইল, সেই আনন্দে ভারতের ছোট বড় সমস্ত প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বত্রই মহোৎসব করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘ জীবন ও চির কল্যাণ কামনায় ভারতের সমস্ত দেবালয়ে পূজা হোম ও উপাসনা হইয়াছিল, রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যথার্থ রাজধর্ম্মানুসারে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন, ভারতবাসী সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ যথাযোগ্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, স্বর্গ হইতে সেই বিদ্রোহানলে শান্তি জল বর্ষিত হইয়াছিল। জগতের রাজারাণীরা ন্যায়ানুসারে রাজধর্ম্ম পালন করিলে জগৎপিতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৌরব দান করেন, পুণ্যবতী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সেই আশীর্ব্বাদ ও সেই গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মহারাণী ভারতেশ্বরী Empress of India উপাধি গ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে ভারতে আনন্দোৎসবের সীমা ছিল না।

পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহে একটি প্রথা আছে, রাজা অথবা রাণীর পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব কাল পূর্ণ হইলে এক একটি জুবিলী নামে উৎসব হয়। ইংলণ্ডের রাজাগণের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ারাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম জুবিলী উৎসব সম্পাদিত হয়, দশ বৎসর পরে (১৮৯৭ অব্দে) দ্বিতীয় জুবিলী হইয়াছিল, সেই জুবিলীর নাম ডায়মণ্ড জুবিলী। ষষ্টিবর্ষ কাল রাজত্ব পূর্ণ হইলে ডায়মণ্ড জুবিলী হইয়া থাকে, ইংলণ্ডের কোন রাজা অথবা রাণীর ভাগ্যে যে সৌভাগ্য ঘটে নাই, সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন কেবল মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অধিকারে ভারতবাসী প্রজাবৃন্দ ঊর্দ্ধ হস্তে মুক্তকণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তাঁহারা দীন পালিনী জননী জ্ঞানে দেবীর ন্যায় পূজা করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী রমণী অধুনা ইহ-সংসারে বিরল। লোকে কথায় বলে শশাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর অথবা অধীশ্বরি মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই শশাগরা পৃথিবীর প্রায় ত্রিচতুর্থাংশের অধীশ্বরি হইয়াছিলেন, রাজ্যবাসী কোটি কোটি প্রজা তাঁহার নামকে অকপটে হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, ভাগ্যবতী দীন জননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, কোটি কোটি প্রজা মাতৃহীন হইয়াছে, তাঁহার দেবীমূর্ত্তি যদিও এখন পৃথিবীতে নাই, কিন্তু তিনি অমর। যশস্বিনী গৌরবিনী মহারাণী স্বর্গে শান্তিময়ের রাজ্যে শান্তিলাভ করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। রাজধানির দুর্গচত্বরে তাঁহার স্মৃতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইতেছে, ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নগরেও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত হইতেছে, পাষাণময়ী রজতময়ী স্বর্ণময়ী যেখানে যত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হউক, আমাদের হৃদয় মন্দিরে যে শান্তিময়ী দেবীমূর্ত্তি দিবারাত্রি বিরাজ করিতেছে, তাহার নিকটে অপর কোন প্রকার ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

জয় জয় ভিক্টোরিয়া, ইংলণ্ড ঈশ্বরী,
সুর পুর নিবাসিনী, প্রকৃতি রঞ্জিকা,
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী।
স্বর্গে আছ, স্বর্গে থাক, ভারত-সন্তান—
(চির রাজ ভক্ত মোরা বিখ্যাত জগতে)
সঁপিছে উদ্দেশে তব প্রেম ভক্তি হার,
পরগলে মহারাজ্ঞি, এই আকিঞ্চন।
ভুলিবে না তব নাম, জীবে যতদিন,—
কৃতজ্ঞ তেত্রিশ কোটি ভারতের প্রজা।
পুণ্যময়ী, পুণ্যবলে গেছে পুণ্য ধামে,
দেবীরূপে চাহ মাগো, সন্তানের পানে।
এসহে ভারতবাসী, সবে সমস্বরে—
মুক্তকণ্ঠে গাই আজি ভারত মঙ্গল।
গাও, গাও, জয় জয় ভিক্টোরিয়ার জয়,
গাও গাও, জয় জয়, সম্রাটের জয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত

[illegible]।

লেখক, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু এম, এ,

যক্ষ গিরিশিখরে নির্ঝরিনীর ন্যায়—বালুকাময় মরুভূমে তটিনীর ন্যায়, এই কঠোর সংসারে রমণী একমাত্র শান্তি-দায়ী। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত মরুভূমে যখন বায়ু দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে থাকে, যখন চতুর্দ্দিক প্রজ্জ্বলিত করিয়া অঙ্গারসম উত্তপ্ত বালুকাকণা উন্মত্ত প্রায় ধাবিত হয়, পথক্লেশ শ্রান্ত ক্ষুৎপিপাসা-ক্রান্ত পথিক যখন ব্যাকুলভাবে পানীয় অন্বেষণ করে, সেই সময়ে নির্ম্মল স্বচ্ছ-বারি যেরূপ আরাম দায়ী, প্রীতিপ্রদ - সেইরূপ হলাহল পরিপূর্ণ, মরুভূমি-তুল্য সংসারে যখন বিপদ চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া আসে, দ্বেষ হিংসা পূর্ণ ভ্রুকুটি মনুষ্যের হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে, সহনাতীত বেদনা, তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যখন নর দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা ও উন্মত্ত প্রায় হয়, সেই সময়ে কোমল পবিত্র রসনা সেইরূপ মধুর আরাম-দায়িনী ও মনোরঞ্জিনী। দৈনিক কঠিন পরিশ্রমের পর ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পত্নীর সহাস্য মুখ দর্শনে তাহার প্রেমপূর্ণ বাক্যালাপে শ্রমের পরিমাণ লাঘব হয়। প্রিয়তমার সেবা শুশ্রূষা, সরল বালক বালিকাদিগের অর্দ্ধশূন্য অর্দ্ধস্ফুট বাক্য সকল ক্লান্তি হরণ করে। আমরা অচিরে দৈনিক শ্রমের ক্লেশ ভুলিয়া যাই, বহির্জ্জগতের কঠোর ঘাত প্রতিঘাত, দেষবিদ্বেষ মানাপমান সবই বিস্মৃত হই। অবসর সময়ে পত্নীর সহিত সংসারিক কথাবার্ত্তা, কত তুচ্ছ ঘটনার বিবৃতি, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আমাদিগকে মোহিত করে। সেই গল্পের প্রতি কথা স্নেহ-বিজড়িত, তাহার প্রতি অক্ষর সরল প্রীতি, অকৃত্রিম—প্রণয়ের নিদর্শন—স্বরূপ। সে গল্পের অভ্যন্তরে যে প্রেম, যে ভালবাসা লুক্কায়িত থাকে, তাহা কত সুন্দর, কত মধুর, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সম্ভবে না। সে সুধা যে একবার পান করিয়াছে, সে প্রেম যে একবার হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, সেই মজিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে রমণী দেবতার আশীর্ব্বাদ, ঈশ্বরের অলৌকিক সৃষ্টি। প্রণয়হীন নরের হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন—তাহার অন্তঃকরণে স্নেহ নাই, মমতা নাই, প্রেম নাই, আত্মোৎসর্গ নাই—কেবল কর্ত্তব্য—কঠোর নীরস কর্ত্তব্য। জলাভাবে নিদাঘের তৃণের ন্যায় তাহার জীবন প্রণয়াভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। তাহার পীড়ার শুশ্রূষা করিবার কোন লোক নাই, ক্ষুধার সময় অন্নদিবার কেহ নাই, পিপাসায় বারি সেচন করিবার কেহ নাই। সে একাকী; বিশাল অসীম জগতে তাহার আপনার বলিবার কেহ নাই। তিনি রাজা বা রাজপুত্র হইলেও

সংসার উত্তমাধমের মিশ্রণ—ভাল মন্দের সমষ্টি মাত্র। এ সংসারে উত্তমেরও যেরূপ প্রাদুর্ভাব, অধমেরও সেইরূপ আধিপত্য। এ জগতে কত নারী আছে, তাহারা রমণী-কুল-কলঙ্ক। যাহাদের হৃদয়ে প্রেম নাই, প্রীতি নাই, কেবল হিংসা, হিংসাময় যাহাদের জীবন, কলুষিত যাহাদের অন্তঃকরণ—পাঠক! তাহারা কি রমণী। রমণী কোমলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি—স্বার্থ-ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত। নির্ম্মল প্রেম পূর্ণ হৃদয়, কোমল মন সামান্য দুঃখ দর্শনে যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয়—সামান্য কষ্টে যাহাদের মন চঞ্চল হয়—তাহারাই যথার্থ রমণী—তাহারাই এ সংসার মরুভূমির একমাত্র আশ্রয়—স্থল।

ভ্রমর রমণী-রত্ন। প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। পতিপ্রেম ও কর্ম্মানুরাগ এই দুই ভাবে তাহার চরিত্র গঠিত। এই দুইটি ভাবের মধ্যে প্রথমটি অতি উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও সহজ বোধ্য, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট জটিল ও দুর্ব্বোধ।' অন্যান্য নায়িকার ন্যায় ভ্রমর সুন্দরী ছিল না। ভ্রমর শ্যামবর্ণা, সেই জন্যই গোবিন্দ লাল আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ভ্রমর বা ভোমরা। তাহার পিতৃ প্রদত্ত নাম ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু শ্যামবর্ণা হইলেও তাহার কোমল কমনীয় মুখ-কান্তি, বিস্ফারিত লীলা চঞ্চল চক্ষু স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ড অতীব মনোরম।

ভ্রমর ধনি-কন্যা-ধনি পুত্রবধু। স্বভাবতঃই সে সংসার পালনে অনভিজ্ঞ ছিল। শ্বশুরালয়ে তাহার শ্বশ্রূ গৃহিণী—তিনি যাবতীয় গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ভ্রমর বধুমাত্র। বিশেষতঃ গৃহ দাসদাসীতে পূর্ণ, সকল কর্ম্মই দাসদাসীতে করে, ভ্রমরকে কিছুই করিতে হয় না। সে হাসিয়া, খেলিয়া, সেলাই করিয়া উল বুনিয়া নভেল পড়িয়া, পুতুলের বিবাহ দিয়া সময় অতিবাহিত করিত।

ভ্রমরের আট বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। সে এখন সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী। কিন্তু এখনও তাহার চঞ্চলতা দূর হয় নাই, এখনও তাহার গাম্ভীর্য্য জন্মে নাই, এখনও সে চঞ্চলা চপলা, আমোদ প্রিয়া বালিকা। "চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলেমানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহে, তারপর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিল না।"

ভ্রমরের আদর্শ পতিপ্রেম। প্রেমে সে আত্মহারা; তাহার সরল কোমল হৃদয়, নির্ম্মল পবিত্র মন, স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না। স্বামী তাহার নিকট আদর্শ-পুরুষ, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে [illegible]

স্বামীকে মনে পড়িত। যেরূপ আলো ছায়া ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ ভ্রমর গোবিন্দ লাল শূন্য হইয়া থাকিতে পারিত না। ভ্রমর গোবিন্দলালের ছায়া-মাত্র। তাহার নিজত্ব কিছুমাত্র ছিল না। তাহার সে অকৃত্রিম, উদ্বেলিত প্রেম যে অটল স্থির স্বামী ভক্তি, সে দৃঢ়পূর্ণ বিশ্বাস প্রতি কথায়, প্রতি চাহনিতে সুব্যক্ত, সু-প্রকাশিত। সে প্রেমের তুলনা নাই, সে প্রীতি অতুলনীয়।

পাঠক! এই প্রেমিক-দম্পতীর কথোপকথন একবার পাঠ করুন:—

ভ্রমর। ঘাড় নাড়িলে যে?

গোবিন্দ। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়!

ভোমর। বলিল, না।

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি।

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দ লাল হাসিল। বলিল "তুমি আগে বল।"

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। সে লজ্জাবনত মুখী হইয়া নীরব রহিল। গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়া ছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিনী যে নিরপরাধিনী ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস, ভ্রমরে উহার নির্দোষীতায় ততদূর বিশ্বাসবতী! কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিলাল বলিয়াছিলেন যে, "সে নির্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন; তাই সে কালো এত ভাল বাসিতেন।'

কি অতুল প্রেম, কি অগাধ বিশ্বাস। দাম্পত্যপ্রেমের কি মধুর মনোরম চিত্র; প্রণয়ের কি সুন্দর স্নিগ্ধ ছবি। পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় আনন্দাপ্লুত হয়, আমরা মোহিত হই।

পাঠক! পুনরায় পাঠ কর,—'গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভ্রমর নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল "ভাবছ কি?"

গো বল দেখি?

ভ্র। আমার কালোরূপ

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কি আমায় ভাবছ না? আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্ব্বে—সর্ব্বময়ী আর কি। আমি অন্যমানুষ ভাবিতেছে।

ভ্রমর তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া আধো আধো মৃদু মৃদু হাসি মাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্যমানুষ কাকে ভাবছ বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না।

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি করবো—বল না!

গো। সিয়াল কুলকাঁটা! রোহিণীকে ভাবছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব ছিলে।

গো। তা কি জানি?

ভ্র। জান—বল না?

গো মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভ্র। না। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি-তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্র। মিছে কথা-তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাহাকেও তোমায় ভাল

গো। যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ধাঁ করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী – আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?'

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া প্রফুল্ল নীলোৎপলদল তুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকর-পল্লবে গ্রহণ করিয়া মৃদু মৃদু অথচ গম্ভীর কাতর কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভাল বাসে।"

প্রেম ভ্রমরের সহজ জ্ঞান, তাই ভ্রমর প্রেম শাস্ত্রে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। প্রেম তাহার ক্রীড়ার সামগ্রী, প্রেমই তাহার জীবন, সুতরাং প্রেমশাস্ত্রে তাহার সতঃই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। সে জানিত যে যাকে ভালবাসে, সে তাহাকেই ভাবে। যখন গোবিন্দলাল রোহিণীর আসক্তির কথা ভ্রমরকে জানাইল, তখন সে রোহিণীকে আত্ম-হত্যা করিতে বলিয়াছিল। গোবিন্দলাল কর্তৃক মৃদু ভর্ৎসিত হইলে ভোমরা বলিল, 'ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে— সে কি মরিতে পারে?" ভ্রমর জানিত এ আশা, এ আকাঙ্ক্ষা, এ জ্বালা হৃদয়ে লইয়া কেহ মরিতে পারে না।

ভ্রমর অশিক্ষিত। গোবিন্দলাল গল্পচ্ছলে ভ্রমরকে নানাপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতেন। জীবনে ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সত্যই সকলের সারধর্ম্ম, চরিত্রহীন নর পশ্বাপেক্ষা হীন ইত্যাদি নানা বিষয়ক উপদেশ দিতেন। এই সকল শিক্ষা ভ্রমরের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সে মিথ্যাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, অধার্ম্মিক ও চরিত্রহীন পুরুষকে অতি হেয় জ্ঞান করিত। গোবিন্দলাল কর্তৃক এইরূপ শিক্ষিত হইয়া সে প্রবলা ধর্ম্মানুরাগিনী হইয়াছিল।

ভ্রমর সংযমও শিক্ষা করিয়াছিল। কে না জানে স্ত্রীলোকের কৌতুহলস্পৃহা কিরূপ প্রবল? কৌতুহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা অন্যায় কর্ম্ম করিতে ও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু ভ্রমর অযথা কৌতুহল চরিতার্থ করিবার প্রয়াসী ছিল না। পাঠক! জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধারের পর গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের কথোপকথন পাঠ করুনঃ—

ভ্র। কি হইয়াছে, তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল

নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও—আমার শুনিতে বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি,—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি,—আমার স্বামী রাগ করিবেন।" কিন্তু তথাপি ভ্রমর আর কোন কথা গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল না।

এইরূপে ভ্রমরের প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইল। সুখ যামিনী প্রভাত হইল। মানবাদৃষ্টে বিধাতা নিরবিচ্ছিন্ন সুখ লিখে নাই। কষ্টই মানব-জীবন, সুখ কয়দিন থাকে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে হৃদয় হইতে দূর করিবার নিমিত্ত বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। ভ্রমর ধরিল 'আমিও যাইব।' কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না।

কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। সে বেশ ভূষা, খেলাধুলা, আহার-নিদ্রা সবই পরিত্যাগ করিল। 'ক্রমে এতটা বাড়বাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।' ক্ষীরি বলিল, "ভাল বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? তুমি মরতেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। প্রায় কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা, তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠে যা।"

ক্ষীরি বলিল, "চড়-চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, সেদিন অত রাত্রে রোহিণী বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?" ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড়, কিলের উপর কিল্ মারিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরি বলিল, "তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্য আমরা বলি—। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রমর ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তুই কর্‌গে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা

বলিস্। ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।”

ক্ষীরি চলিয়া গেল। ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিল, “হে গুরো, শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্য স্বরূপ।' তুমি কি সেদিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে? “ভ্রমর হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল। অকলঙ্ক আদর্শ পুরুষ যে স্বামী ভ্রমর যাঁহার ছায়া-মাত্র, তাঁহার নিন্দা ভ্রমর কখন সহ্য করিতে পারে? সতীর নিকট পতি নিন্দা অসহ্য। সেদিনকার ঘটনা গোবিন্দলাল গোপন করিয়াছিল, বলিয়া তাঁহার মনের অশান্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু অবিশ্বাস এখনও তাহাকে স্পর্শে নাই। 'তাহার মনের ভিতর যেমন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্ম-প্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই।

কিন্তু হায়! সকলেই ভ্রমরের বাদ সাধিল! ক্রমে ক্রমে, দলে দলে ভ্রমরের সহচরীরা ভ্রমরকে আসিয়া জানাইল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহার সুখের অবসান হইয়াছে। ভ্রমরের আর সহ্য হইল না—দার রুদ্ধ করিয়া হর্ম্মতলে শয়ন করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, “হে সন্দেহ ভঞ্জন হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার এক সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই, আজ আমার সন্দেহ ভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহ-ভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।”

হায়! ভ্রমরের হৃদয়ে অবিশ্বাসের বীজ প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। তাহার মনে সন্দেহের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে—সত্যই কি তাহার স্বামী অবিশ্বাসী? ভ্রমর বিপদে পড়িল—সহসা স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে পারে না, সকলের কথাও উপেক্ষা করিতে পারে না। যাহা হউক, ভ্রমরের প্রবল পতিপ্রেম এখনও অক্ষুন্ন আছে, তাহার গাঢ় অনুরাগ আজও বিচলিত হয় নাই।

কিন্তু যখন পাপিষ্ঠা রোহিণী প্রতিবাসিনীর নিকট প্রার্থিকে সাড়ী ও গহনা গোবিন্দলাল প্রদত্ত বলিয়া ভ্রমরকে প্রতারিত করিল, যখন ভ্রমরের সুখাপরনাত্তি-

করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চনা করিল, তখন ভ্রমরের অস্পষ্ট সন্দেহ গভীর অবিশ্বাসে পরিণত হইল। সরলা সংসারানভিজ্ঞা বালা রোহিণীর চাতুরী বুঝিতে পারিল না। তাহার স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ জন্মিল—অটল বিশ্বাস হেলিল, দৃঢ়ানুরাগ বিচলিত হইল। তাহার আদর্শ ধার্ম্মিক স্বামী, তাহার গুরু শিক্ষক আজ ধর্ম্মে পতিত, পরদারনিরত, কলঙ্কিত চরিত্র। ভ্রমরের হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হইল, অভিমানে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ভ্রমর দুঃখে, ক্রোধে, অবিশ্বাসে অভিমানে গোবিন্দলালকে পত্র লিখিল। ... "তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা· তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও। আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল; অভিমানে ভ্রমর অন্ধ হইল। গোবিন্দলালের প্রত্যাবর্ত্তন কালে সত্যসত্যই সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। আপনার সর্ব্বনাশ ভ্রমর আপনিই আহ্বাণ করিল। গোবিন্দলালের অধঃপতন দ্রুততর হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হইল। গোবিন্দলালের চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে, দেখিয়া তাহার সংশোধনার্থে কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরকে দান করিয়া গেল। শ্বশুরের মৃত্যুর পর ভ্রমর পুনরায় হরিদ্রা গ্রামে আসিল—পুনরায় গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। সে সকল প্রিয়-সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই, সে হাসি সে চাহনি আর নাই। যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত "এত গুণ," যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ"—সে চাহনি আর নাই। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে, কার্ত্তিকী রাখায় গ্রহণ লাগিয়াছে।' সেই উদ্বেলিত প্রেম, সেই সরল প্রীতি অভিমানের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, সেই মধ্যাহ্ন রবিকর তুল্য দীপ্তিমান দুটি হৃদয় অন্ধকার—বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় ভারাক্রান্ত-ধিক্ অভিমানে।

কৃষ্ণকান্তর শ্রাদ্ধের পর ভ্রমরের সহিত গোবিন্দলালের কথোপকথন হইল! কিন্তু হায়! সে প্রীতিপূর্ণ বাক্যালাপ, স্নেহ-বিজড়িত কথাবার্ত্তা আর নাই।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে ?

গো। যাহাতে তুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে ?

ভ্র। তাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি তোমার দাসানু দাসী বই ত নই ?

গো। আজি কালি ওকথা সাজে না, ভ্রমর।

ভ্র। কি করিয়াছি ? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎ-সংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল—আমার কি অপরাধ হইল।

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়ালে, আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। ... ... ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল ?" গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদ-ত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাট বাঁধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।'

এই কথোপকথন পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধি হয় যে ভ্রমর পূর্ব্বের অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছে! ইহার প্রধান কারণ ভ্রমর গোবিন্দলালকে কষ্ট দিয়াছে। তাহার পিত্রালয়ে অবস্থান কালে গোবিন্দলালের যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাহার অভিমানের ফল ফলিয়াছিল। 'আমরা এইরূপ অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, আমরা একজনের উপর রাগ করিয়া যখন সেই রাগের কোন প্রতিবিধান করিতে পারি অর্থাৎ যাহার উপর রাগ হয়, তাহাকে কোনপ্রকার শাস্তি দিতে পারি, তখন আমাদিগের একটু দুঃখও হয়। আমরা তাহার জন্য কষ্ট অনুভব করি,—একটু অপরাধী থাকি। ভ্রমরের তাহাই হইয়াছিল। এখন সে গোবিন্দলালের নিকট আপনাকে অপরাধী মনে করিত।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের ক্ষার ও লবণ

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

নাম তত্ত্ব চরক বলিয়াছেন "ক্ষরণাৎ ক্ষারঃ।"

সুশ্রুত বলিয়াছেন "ক্ষরণাৎ ক্ষণনাৎ বা ক্ষারঃ।" এই দ্বিবিধ নিরুক্তির তিন প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে।

চক্রপানি অধো গমন (চরক) দুষ্ট মাংসাদি শাতন (সুশ্রুত ক্ষরণ দোষচালন ক্ষণন ত্বগাদি হিংসন। ডল্বন

চক্রপানির দুই প্রকার মত চক্রপানি চরকের টীকায় লিখিয়াছেন—"ক্ষরণাদধো গমন ক্রিয়া যোগং * * * ক্ষরণঞ্চ ক্ষারস্য পানীয় যুক্তস্য অধোগমনেন। বদন্তি হি লৌকিকাঃ "ক্ষারং স্রাবয়ামঃ।" ইতি সূত্র ২৬।১৪ অর্থাৎ ক্ষরণ অর্থাৎ অধোগমন রূপ ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকাতে (ইহার নাম ক্ষার)... ক্ষারের ক্ষরণ ক্রিয়াটী জল মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিতে হইলে যে অধোগমন হয় তাহাই! এইরূপ প্রচলিতও আছে যথা-"ক্ষার, স্রাব করিব।" সুশ্রুতের টীকায় কিন্তু তাহার এই মত পরিস্ফুট হয় নাই! যেখানে বলিয়াছেন,—"ছেদ্যাদি কর্ম্ম যোগ্যত্বং ক্ষারস্য নিরুক্ত দ্বারাই তাদ্রতি ক্ষরণাদিতি দুষ্ট মাংসাদি চালনাৎ শাতনাদিত্যর্থঃ। ক্ষণনাদিতি পক্ষে পৃষোদরাদিত্বাৎ রূপ সিদ্ধিঃ।" অর্থাৎ দুইটী নিরুক্তি দ্বারা ক্ষারের ছেদ্যাদি কর্ম্ম যোগ্যতার বিষয় বলা হইতেছে, ক্ষরণ দুষ্ট মাংসাদি চালন অর্থাৎ শাতন পৃষোদরাদি সূত্রে ক্ষণ ধাতু হইতে ক্ষার শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

অভিধান ও ক্ষার।

ক্ষার শব্দের অভিধানিক অর্থও বেশ স্পষ্ট নহে। শ্রীমদমর সিংহের মতে ক্ষার কাচের অনর্থান্তর-পর্য্যায় অর্থাৎ একার্থবাচী। যথা "ক্ষারঃ কাচঃ" (২৬৪ বৈশ্যবর্গ অমর।) ইহার টীকায় রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন, স্বয়ং কাচে অর্থাৎ ক্ষার ও কাচ এই দুইটীই কাচকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অভিধানিকের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—অভিধানকার শব্দ মেদিনাকর ধূর্ত্ত, লবণ, কাচ, ভস্ম।

রাজ নির্ঘণ্ট লবণ, কাচ, ভস্ম, টঙ্গন ক্ষার, মর্জ্জিকা ক্ষার, হেমচন্দ্র লবণ, কাচ, ভস্ম টঙ্গন ক্ষার, যবক্ষার গুড়।

এখানে এই কয়টী শব্দের অন্য কি অনর্থান্তর আছে তাহার আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেক না।

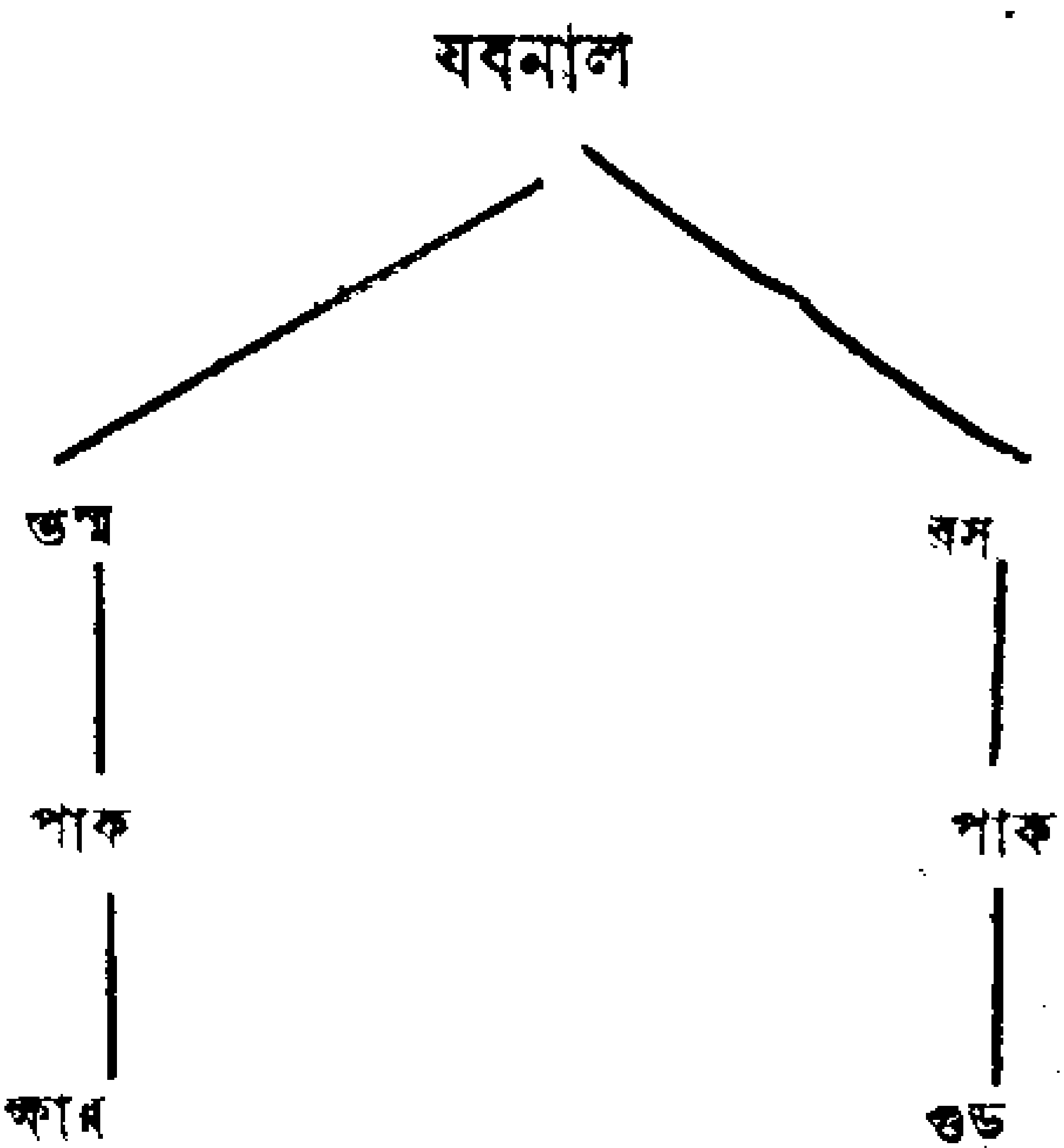
---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে কবিরাজ মহাশয় দ্বারা পঠিত। অং সং

শব্দ	অর্থ
ধূর্ত্ত	বিট্ লবণ। ধুস্তূর। মারী।
লবণ,	রস, পটু, (পাঁচ প্রকার লবণ)
কাচ　—　—　—	মোম, কাচ লবণ, মৃত্তিকা বিশেষঃ, ক্ষার।
ভস্ম　—　—	ছাই।
টঙ্গন　—　—	পাচনক, ক্ষার, রঙ্গদ মালতী তীরজ, (আরও ১০।১২টী)
স্বর্জ্জিকা ক্ষার,　—	ক্ষার, কাপোত, সুখ বর্দ্ধক, সৌরর্ব্বল (আরও ৭।৮টী।)
যবক্ষার　—	যবাগ্রস্ত, পাক্য ক্ষার, রেচক (আরও ১১।১২টী)
গুড়　—	গোন, ইক্ষুপাক, যবনাল রস পাকভব।

উল্লিখিত আভিধানিকগণের মত আলোচনা করিয়া ক্ষার শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থির করা বড় সহজ নহে।

ক্ষার ও গুড় ক্ষার শব্দে গুড় বুঝায়। গুড় শব্দের প্রচলিত ও অভিধানিক অর্থ—ইক্ষুরসপাক জাত পদার্থ বিশেষ। ইক্ষু রসের মত যবনালের রস পাক করিয়া এক প্রকার গুড় প্রস্তুত হইত. ইহারও নাম ছিল ক্ষার। ক্ষার শব্দে যবক্ষারকেও বুঝায়। যবক্ষার যবনাল পোড়াইয়া জলে গুলিয়া লইত। তাহাই পাক করিয়া যবক্ষার হইত। এইজন্য যবক্ষারের এক নাম পাক্য। (কেহ ইহার অন্যরূপ অর্থ ও করেন তদ্বিষয় পরে আলোচিত হইবে।)



যবক্ষার	যবগুড়
ক্ষার	গুড়
ক্ষার	গুড়
ক্ষার	গুড়

ক্ষারের প্রথমাবস্থা ভস্ম।

ক্ষার ও ভস্ম ভস্ম জল সহযোগে তরল করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। সেই তরল পদার্থকে পুনরায় পাক করিয়া জলহীন করিলে ক্ষার প্রস্তুত হয়। সর্ব্বত্রই এ নিয়ম রক্ষিত হয় না। বিক্রমপুরের কোন কোন স্থানের রজকগণ কলার বাস্না পোড়াইয়া ছাই করে। এই ছাইকেই তাহারা ক্ষার বলে। উক্ত অঞ্চলে পালিধা জাতীয় এক প্রকার গাছ হয়, তাহাকে মান্দার বলে। মান্দারের ফুল অনেকটা পালিধার মত। গাছের ছাল অত নির্ম্মল নহে। পালিধা অপেক্ষা এই গাছের কাঁটা অধিক। এই অঞ্চলের নিধ'নীরা উক্ত গাছের ভস্মকে ক্ষার বলে। উক্ত ছাইএর সহিত একটু জল মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া রাখে। সময় মত তাহা জলে গুলিয়া কাপড় কাচিবার জন্য ব্যবহার করে। উপরিউক্ত দুই প্রকার ক্ষারই জলে গুলিলে যে জল প্রস্তুত হয়, তাহার দেশজ নাম "বোল।" *

ক্ষার ও কাচ ক্ষারের একটী পর্য্যায় কাচ। অমর সিংহ এই কাচ শব্দে কি যে বুঝাইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট নাই। তবে ইহা যে বণিক্ দ্রব্যও পার্থিব (খনিজ) দ্রব্য জাতীয় তাহা কতকটা বুঝা যায়।

ইহার পরে অমর-যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অমরের সময় অব্যবহার্য্য ছিল না, তবে ইহাকে পার্থিব বলাই তাহার উদ্দেশ্য। এই কাচ, কাচ নহে। এক জাতীয় মৃত্তিকার নাম এই ক্ষারের নামানুসারে যদি কাচ বলা যায়; তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

কাচ শব্দে কাচ লবণকেও বুঝা যায়। এই কাচ লবণ কি তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ক্ষার ও লবণ ক্ষার ও লবণের পার্থক্য বুঝাইতে চরকে একটী সার গর্ভ তর্ক আছে। নিম্নে তাহার উদ্ধার করিলাম।

রস কি, কত প্রকার ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়ের জন্য ঋষি পরিষদের অধিবেশন

* তাহাতে আমাদের আবশ্যক নাই।

হইয়াছিল। (চরক আত্রেয় ভদ্রকালীয় অধ্যায়) তাহাতে ঋষিগণ বিভিন্নমত প্রকাশ করিতে থাকেন। কেহ বলেন, এক প্রকার কেহ বলেন দুই প্রকার, এইরূপে সকলেই ৩।৪।৫।৬ প্রভৃতি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন! তন্মধ্যে বৈদেহ নিমিবলেন, "সপ্তরসা ইতি মধুর, অম্ল, লবণ, কটুক, তিক্ত, কষায় ক্ষারাঃ।

মধুর অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু, কষায় ও ক্ষার এই সাত প্রকার রস! ইহার উত্তরে বিভিন্ন মতের সমধান স্বরূপ ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু বলেন, ষড়ে রসাঃ মধুরাম্ল লবণ তিক্তোষনবকষায়াঃ।

... ... ক্ষরণাৎ ক্ষারঃ নাসৌ রসঃ" অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ছয়টীই রস। ক্ষার রস নহে। ক্ষরণ ধর্ম্ম হইতে ইহার নাম ক্ষার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং ইহা গুণ নহে।

তবে ইহা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, "দ্রব্যং তৎ" উহা দ্রব্য। কেন দ্রব্য বলা হইবে তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম হেতু যথা "অনেক রসোৎপন্নং" অনেক রস বিশিষ্ট পদার্থ হইতে উৎপন্ন। অতএব ইহা "অনেক রসম্" অর্থাৎ অনেক রস বিশিষ্ট। তাহা হইলেও ইহা "কটু লবণ ভূয়িষ্ঠং" অর্থাৎ ইহাতে কটু ও লবণ রসেরই আধিক্য। দ্বিতীয় হেতু বলিতেছেন, ইহা "অনেকেন্দ্রিয়ার্থ সমন্বিতং"। অনেক ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহার অনুভূতি হইতে পারে। রস কেবল রসনেন্দ্রিয় বেদ্য। তৃতীয় হেতু "করণাভি নিবৃত্তম্।" ইহা করণ সাধ্য অর্থাৎ ভস্ম করণ পরিস্রাবণ প্রভৃতি কার্য্য কারণ পরম্পরা দ্বারা ক্ষার নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু রস এইরূপে নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং ক্ষার রস নহে। ইহা বিশেষ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের ভেদ মাত্র। লবণ এক প্রকার রস সুতরাং লবণ একটী গুণ। এই গুণটী যে দ্রব্যে অধিক পরিমাণে আছে তাহাই লবণ। যথা সৈন্ধব লবণ, শম্ভারী লবণ, পাঙা লবণ, কর্কচ লবণ, প্রভৃতি। ক্ষারেও এই গুণের (অর্থাৎ লবণ রসের) আধিক্য আছে, এই জন্য ক্ষার ও লবণ শব্দের ব্যবহার পর্য্যায় রূপে হইয়া আসিতেছে। নিম্নে দেশজ ভাষা হইতে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি, ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, এক প্রদেশে যাহাকে লবণ বলে, অন্য প্রদেশে তাহা ক্ষার বলিয়া পরিচিত। এইরূপ ব্যবহার হইতেই অভিধানে ক্ষার ও লবণ একার্থ বাচীরূপে স্থান পাইয়াছে—

১।	খাড়ী লবণ	=	খাড়ী হিন্দী খাড়ী লোংন
২।	কাঁচ লবণ	— —	হিন্দী কাচি লোংন মহারাষ্ট্র বাদবড়খার গুজরাট বদ্ধবড়ীখার
৩।	নিশানি	=	সংস্কৃত নাম ক্ষার শ্রেষ্ঠ— অমৃত ক্ষার— চূর্ণিকা লবণ— বজ্রক্ষার—

ক্ষার ও ধূর্ত } ধূর্ত্ত শব্দে বিট্ লবণ ও ক্ষার বুঝায়। ধূর্ত্ত শব্দের মূল অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ কিছু পাই নাই।

ক্ষার যবক্ষার টঙ্গন ক্ষার সর্জ্জিকা ক্ষার } আয়ুর্ব্বেদের বহু স্থলে "ক্ষারং" "দ্বৌ ক্ষারৌ" "ক্ষার ত্রয়ং" ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে পারিভাষিক নিয়মে "ক্ষারং' স্থলে "যবক্ষার" "দ্বৌক্ষারৌস্থলে যবক্ষার ও সর্জ্জিকা ক্ষার" "ত্রিক্ষার" স্থলে যবক্ষার, সর্জ্জিকা ক্ষার ও টঙ্গন ক্ষার ব্যবহার করিতে হয়। এই পারিভাষিক নিয়মই অভিধানে একার্থবাচী হইয়াছে।

এই ত গেল অভিধানের কথা। অভিধানের নিয়মে ক্ষার শব্দের এখন ব্যবহার নাই।

অভিধানিক প্রয়োগ হইতে বরং বর্ত্তমানে প্রচলিত ক্ষার শব্দ অধিক দ্যোতক। কাপড়ের ময়লা কাটিতে, ঘায়ের পচা মাংস তুলিয়া ফেলিতে ও ফোটমুখ বিদারণ করিতে এক জাতীয় দ্রব্যই ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের উদ্দেশ্য ক্ষরণ। এই ক্ষরণের অর্থ সুশ্রুতে চক্রপানি ও ডল্বন যাহা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ক্ষার ও কবিরাজ মহাশয়গণ } তবে বর্ত্তমানের ব্যবহারে, চরক বা সুশ্রুতের ব্যাখ্যায় চক্রপাণি ক্ষরণের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্ট হয় না। পুনর্ণবা, তিন্তিরী কুষ্মাণ্ড লাউ প্রভৃতির ভস্ম বা ক্ষার উল্লেখ থাকিলে তাহা ভস্মে পরিণত করা হয় না, বা ক্ষার বিধান মতে পাকও করা হয় না। কেহ কেহ

লেপ দেন। পরে তাহাতে জ্বাল দিতে থাকেন, দ্রব্যগুলি পুড়িয়া ভিতরে জ্বলিতে থাকে। পরে শীতল হইলে হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া তাহাই ক্ষার বলিয়া ব্যবহার করা হয়। ভস্ম স্থলেও এইরূপ।

সুশ্রুতে ক্ষারের স্বরূপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহা পাঠ করিলে বর্ত্তমান প্রণালী শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মনে হয় না। সুশ্রুতোক্ত ক্ষারের স্বরূপ—

শুক্ল	=	শ্বেতবর্ণ—
শ্লক্ষ্ণ	=	অকর্কশ—
পিচ্ছিল	=	পিছল—
অবিষ্যাদী বা অভিষ্যন্দী	}	অপ্রসরণ শীল

ক্ষার তিনপ্রকার } কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ক্ষারের লক্ষণ প্রতি সারণীয় (যাহা বাহ্যিক ছেদনাদি কর্ম্মের জন্য প্রযুক্ত হয়) ক্ষারের হইতে পারে। পানীয় ক্ষারের লক্ষণ—এরূপ হইতে পারে না। শাস্ত্রে ক্ষারের তিন প্রকার ব্যবহারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

১। প্রতি সারণীয়। ২। পানীয় ৩। চূর্ণ ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য। প্রতি সারণীয় ক্ষারের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পানীয় ক্ষার বা ক্ষারোদকের ব্যবহার গুল্ম রোগে আছে। প্রতি সারনীয় ক্ষার ছাকিয়া পুনরায় পাক করিবার বিধান আছে। কিন্তু পানীয় ক্ষারের ভস্ম পরিমাণ মত জলে গুলিয়া ছাঁকিয়ালইলেই পানীয় ক্ষার প্রস্তুত হইল। ইহা দেখিতে আরক্ত। তবে পিচ্ছিল। শুকাইলে ইহাও শ্বেতবর্ণ হয়। কিন্তু বৃহদগ্নি মুখ চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধে * যে নানাদ্রব্যের ক্ষার প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে—তাহাতে কিরূপ ক্ষার ব্যবহারকরা উচিত? এরূপ স্থলে প্রতি সারনীয় উক্ত বিধিতে প্রস্তুত ক্ষার লইবে কি পানীয় ক্ষার গ্রহণ করিবে, তাহার কোন ও উল্লেখ নাই। এরূপ স্থলেই কেহ কেহ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যবক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার প্রভৃতি বাজার হইতে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতে প্রতি সারণীয় বিধিঅনুসারে প্রস্তুত ক্ষার বলিয়া বোধ হয় না। এই ক্ষার গুলি একটী দ্রব্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়, শার্ঙ্গধর সংহিতা ও পুনার আনন্দাশ্রম প্রকাশিত যোগ রত্নাকর পাঠে আমাদের কথার সমর্থক বিধান দৃষ্ট হইবে। ক্ষার পাক বিধান স্থলে ইহা অভিহিত হইবেক।

* [illegible] কোকিলাক্ষ পলাশয়োঃ। ক্ষারাণি। বৃহদগ্নিমুচূর্ণ

আমার বোধ হয়, সুশ্রুতোক্তাগ্য অপ্রতী বা মৃদু ক্ষার ঔষধার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভৈষজ্য শ্রেণী বিভাগে

ক্ষার ও উদ্ভিদগণ } ক্ষার = স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা চরকের মত।

মূল ত্বক্ সার নির্য্যাসনাড় স্বরস পল্লবাঃ।
ক্ষারাঃ ক্ষীরং। * *
* * উদ্ভিদোগণঃ॥
চরক সূত্র ১ম অ ৬০ শ্লোক।

সুশ্রুতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে টীকাকারগণ চরকেরই মতানুবর্ত্তন করিয়াছেন।

তত্র স্থাবরেভ্যঃ ত্বক্‌পত্র, পুষ্প, ফল, কন্দ, মূল, নির্য্যাস স্বরসাদয়ঃ। সুশ্রুত প্রথমাধ্যায় ২৩

টীকা ডহ্বন—আদি গ্রহণাৎ তৈল, ক্ষার, ভস্ম, কণ্টক, প্রভৃতিনাং গ্রহণম্।
টীকা চক্রপানি— আদি গ্রহণাৎ তৈল, ক্ষার কণ্টকাদয়ো গৃহ্যন্তে।

বস্তুতঃ টীকাকারগণের এইমত সুশ্রুতের ছিল কি না সন্দেহ। এস্থলে পাঠক বর্গকে সুশ্রুতের নিম্নলিখিত শ্লোকের প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি—

"যবক্ষার সর্জ্জিক ক্ষার পাকিম টঙ্গন ক্ষারণাঃ॥
গুল্মার্শো গ্রহণী দোষ শর্করাশ্মরিনাশনাঃ
ক্ষারাস্ত পাচনাঃ সর্ব্বে—
রক্তপিত্ত করাঃ স্মৃতাঃ॥

সূত্র ৪৬ অঃ ইহার টীকায় আচার্য্য ডহ্বন বলিয়াছেন—

লবণ স্বারূপ্যা দাহ—যবক্ষারেতি যবক্ষারঃ যবশূকোদ্ভবং শীতলিকা যবক্ষার ইতি লোকে। পাকেন নিবৃত্তো যঃ স পাকিমঃ ক্ষারপাকবিধানেনোক্তঃ প্রতি সারণীয়ঃ পানীয়শ্চ, পাকিমস্ত্বপর পাংশুকাভিনিবৃত্তমিত্যন্যে। পাকিমাদ্ ভিন্নং- যবক্ষার মাহ। টঙ্গন ক্ষার সৌভাগ্যাপর পর্য্যায়ঃ সোহাগা ইতি লোকে, প্রভৃতি গ্রহণাদেবং জাতীয়ানাং ক্ষারানামববোধঃ॥

সুশ্রুত ক্ষার বর্গ মধ্যে প্রথমতঃ চারি প্রকার ক্ষারের কথা বলিতেছেন যথা—

১। যবক্ষার।
২। সর্জ্জিকা ক্ষার—
৩। পাকিম ক্ষার—

ইহা বলিয়া সাকল্যে ক্ষার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাকিম ক্ষার সম্বন্ধে টীকাকার বলিতেছেন, ইহা ক্ষার পাক বিধানোক্ত ক্ষার। কিন্তু কেহ কেহ বলেন তাহা নহে ইহা উষর মৃত্তিকা জাত ক্ষার। সুশ্রুত প্রত্যেকের গুণ নির্দ্দেশ স্থলে পাকিম ক্ষার ও উষক্ষারের গুণ স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাউক সেই তর্কে এখানে কিছু হইবে না। এখানে টঙ্গন ক্ষারের উল্লেখ আছে। টঙ্গন ক্ষার কিছুতেই উদ্ভিদগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এরূপ স্থলে ক্ষার বর্গকে স্থাবর শ্রেণীতে নির্দ্দেশ করা সুশ্রুতের উদ্দেশ্য ছিল কি না বলা যায় না। তবে চরকে এ বিষয়ে একটী কথা আছে চরকে সূত্র স্থানে ২৭ অধ্যায়—আহার যৌগিক-বর্গে লবণের গুণ বর্ণিত হইয়াছে—সর্ব্বশেষে যাবশূক বলিয়া যবক্ষারের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। বিমান স্থানের ৮ম অধ্যায় লবণস্কন্ধে অনেক প্রকার লবণের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উষর লবণের নাম আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে চরক ভূমি জাত দ্রব্যকে লবণ বর্গে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং ভস্ম জাত গুলিকে ক্ষার বলিয়াছেন। সুতরাং সুশ্রুতের আদি শব্দ দ্বারা চরকের মতানুসরণ কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

সীতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সীতাদেবী—মানবী নহেন। বৈকুণ্ঠ-বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মী—লীলার জন্য মানবী রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই হিন্দুর শাস্ত্রবাক্য-হিন্দু ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে ভগবান্ দেহ রচনা করিয়াই, সাধুদিগের রক্ষা, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ত্রেতাযুগে লঙ্কাধিপতি দশানন বড়ই দুর্দ্দান্ত হইয়া দেবগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার দমন সাধন দ্বারা দেবগণকে নিরুপ-

ঔরসে এবং তদীয় মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য লক্ষ্মীকেও বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। হিন্দুর চক্ষে সীতা চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক।

এই আদর্শ স্ত্রীচরিত্রের কথা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বাগ্রে কৃত্তিবাস পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত রামায়ণ মধ্যে শুনিতে পাই। মহামুনি বাল্মীকি ত্রেতাযুগে সূর্য্যকুল পাবন শ্রীরামচন্দ্রের সম সময়ে এই পবিত্র রামায়ণী কথা সংস্কৃত কাব্যে লিপিবদ্ধ করেন। অতএব বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় কেহ সমগ্র শ্রীরামচরিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কি না এপর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী কালে লক্ষ্মণ নামক কবি জগৎ রাম রায়, রঘুনন্দন গোস্বামী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেকেই বাঙ্গালা রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থকার যথাসাধ্য বাল্মীকির মূলের অর্থ রক্ষা করিয়া বাঙ্গালা পদ্যে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। অবশিষ্ট কবিগণ তাঁহাদের রামায়ণ মধ্যে অনেক কল্পিত বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহাতে কাহার গ্রন্থে সীতাচরিত্র কিরূপ পরিস্ফুট তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। দুর্ভাগ্য ক্রমে জগৎ রাম রায়ের রামায়ণ খানির সমগ্র অদ্যাপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং লক্ষ্মণ প্রণীত রামায়ণ আজিও মুদ্রাযন্ত্রে স্থান পায় নাই বলিয়া এই দুইখানি গ্রন্থ পরিত্যক্ত হইল, কেবল কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণ ৺ রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত রামরামায়ণ যাহা বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী এবং প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধার কর্ত্তা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে ও প্রচুর পরিশ্রমে ও অশেষ শ্রমযত্নে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এবং ৺ রাজকৃষ্ণ রায় দ্বারা অনুবাদিত রামায়ণ অবলম্বনে সীতা চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

সীতার জন্ম কথা অতি অপূর্ব্ব এবং বড়ই রহস্যময়। সাধারণ নরনারীর ন্যায় মাতাপিতার গর্ভোরসে তাঁহার জন্ম নহে। মিথিলার রাজা মহর্ষি জনক স্বহস্তে আপন যজ্ঞভূমি কর্ষণ কালে লাঙ্গলের সীতে (লাঙ্গল চিহ্নিত রেখায়) এই অযোনি সম্ভবা কন্যার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম সীতা—জনকরাজের পালিতা বলিয়া জানকী—মিথিলা দেশে তাঁহার উদ্ভব বলিয়া মৈথিলী এবং মিথিলার নামান্তর বিদেহ বলিয়া বৈদেহী নামে পরিচিতা, তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কয়েকটী

সীতার জন্মকথা বাল্মীকি রামায়ণের অনুযায়ী কবিবর রাজ-কৃষ্ণ রায় লিখিয়াছেন,—

অনন্তর একদিন হল দিয়া আমি।
কর্ষণ করিতেছিনু নিজ যজ্ঞভূমি॥
সহসা সম্মুখে মোর দেখি হেনকালে।
উঠিল একটী কন্যা লাঙ্গলের ফালে॥
হলের সীতায় কন্যা হইল উত্থিতা।
এ হেতু উহার নাম রাখিলাম সীতা॥

বালকাণ্ড, ৬৬ অধ্যায়।

বাঙ্গালার পূজনীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত লিখিলেন,—

শ্রীহরির জন্মকথা থাকুক এখন।
আগেতে কহিব এই লক্ষ্মীর জনম॥
যেথানেতে রেতবত ছাড়িল জীবন।
সেথানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন॥
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা জন্ম-ভূমি চষি॥
স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা চাসভূমি চসে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে॥
তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত।
হঠাৎ ঋষির বীর্য্য হইলা স্খলিত॥
দৈবযোগে পৃথিবী আছিলা ঋতুমতী।
ঋষিবীর্য্য পড়িলে হইল গর্ভবতী॥
ডিম্বরূপে ভূমি মধ্যে ছিলা বহুকালে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গল শিরালে॥
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।
কন্যা এক দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান॥
উঙা উঙা করি কান্দে যেন সৌদামিনী।
আচম্বিত আকাশে হইল দৈববাণী॥
চাসভূমি হৈতে এই কন্যার জনম।

তব কন্যা বটে এই করহ পালন ॥
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যা কোলে করিয়া তখন এলো ঘরে ॥

আদিকাণ্ড।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে আমরা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া জানি। তিনি নিজ গ্রন্থে আপনার পাণ্ডিত্যের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মানিতে হয় যথা,—

বৃহস্পতি বারে উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার-বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে ॥

* * *

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরু ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন ॥

* * * *

রাজ পণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
নানামতে শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসী হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৪৭।১৪৮ পৃষ্ঠা।

গৌড়েশ্বরের নিকট এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ সামান্য বিদ্যায় কুলায় না। এ হেন জ্ঞান গৌরব সম্পন্ন কবি সর্ব্ববাদী-সম্মত জিতেন্দ্রিয় রাজর্ষি জনকের চরিত্র এরূপ সঙ্কুচিত করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। রামায়ণে ও অন্যান্য পুরাণে জনকের চরিত্র যেরূপ উচ্চ আদর্শে চিত্রিত, তাহাতে উর্ব্বশী দর্শনে তাঁহার মনোবিকার অম্লান আকাশ কুসুম কল্পনা অপেক্ষাও অসম্ভব। ইহা দ্বারা তাঁহার মহান্ চরিত্র

স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা চাসভূমি চসে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে॥
তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত।
হঠাৎ ঋষির বীর্য্য হইল ক্ষরিত॥
দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুমতী।
ঋষিবীর্য্য পড়িলে হইল গর্ভবতী॥

ইহাতে বুঝায় এই যে রাজা জনক যৎকালে স্বহস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, তৎকালে উর্ব্বশী আকাশ পথে চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া জনক কন্দর্প বাণে অস্থির হইলে তাঁহার রেতঃপাত হয়, তৎকালে পৃথিবী ঋতুমতী ছিল বলিয়া গর্ভবতী হইল। বৎসরের মধ্যে পৃথিবী অম্বুবাচীর তিন দিন ঋতুবতী থাকে। চাসা ভূষাও সেইদিন খই দ্বারাও মৃত্তিকা খনন করে না, এরূপ স্থলে জনক যে সেদিন যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। তৎপরে—

ডিম্বরূপে ভূমি মধ্যে ছিল বহুকালে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গল শিরালে॥

ইহাতে সুস্পষ্ট হইল যে কোনকালে উর্ব্বশী আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া কামমোহিত জনকের বীর্য্যপাত হয়, সেদিন অম্বুবাচীর তিন দিনের একদিন কাজেই পৃথিবী গর্ভবতী না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার বহুকাল পরে জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করেন, তৎকালে পৃথিবীগর্ভে এক অণ্ড দেখিতে পান তাহা ভাঙ্গিবামাত্র একটী অণ্ডজা কন্যা পাইয়া কুড়াইয়া লয়েন। তৎক্ষণাৎ দৈববাণী সব সংশয় মিটাইল—কন্যাটী তাঁহারই ঔরসজাতা। কিন্তু কেন যে অণ্ডজা দৈববাণীতে তাহার কোন কৈফিয়ৎ নাই।

রাম রসায়ণ প্রণেতা গোস্বামী মহাশয় আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন— তিনি জনকের মুখ দিয়া সীতার জন্মকথা যেরূপ বলাইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

আমি যজ্ঞ লাগি কভু যজ্ঞের ভূমিতে।
লাঙ্গল দিবার আরম্ভিনু শাস্ত্র রীতে॥
সেই কালে মেনকারে দেখি আকাশেতে।
এই ইচ্ছা হয়্যাখিলা আমার মনেতে॥
ইহাতে যত্তপি হয় অপত্য আমার।
তবে নাহি থাকে মোর আনন্দের পার॥
উঠিলেন সীতা সেই লাঙ্গলের মুখে।
দেখিয়া পাইনু মুঞি অতি বড় সুখে॥
সেকালে আকাশ বাণী হইল উত্থিতা।
হল্যা মেনকাতে তব মানসী দুহিতা॥
লালন পালন কর তুমি স্নিগ্ধ চিতে।
অপূর্ব্ব পাইবে যশ এ কন্যা হইতে॥ ৭০ পৃষ্ঠা।

প্রার্থনা।

(গান)

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লেখক,-রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

গোপনে, আপনমনে, কতদিন আর থাক্‌বে মা!
পায়ে ধরি, ক্ষেমাঙ্করি, দুটো কথা শোনাও না॥
লজ্জাবতী-লতাসম, জড়সড় থাকো যেন,
এ সরম কি কারণ, দিবে নাকি পূজতে পা॥
অবিদ্যা-অজ্ঞানে মরি, দেনা তোর ঐ চরণতরী,
কাজনি আর এ দোকান দারী, পার কোরে মা নিয়ে যা॥
বিশ্বমাতা তুমি সতি, আদ্যাশক্তি-ভগবতী,
রামকৃষ্ণে দেনা মতি, নইলে আমার মাথা খা॥

——:o:——

কন্যাদায়।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পতি-পত্নী।

কলিকাতা সহরে কায়স্থ-কুলে একজন গৃহস্থ ভদ্রলোক, নাম করুণাময় বসু। তাঁহার পত্নীর নাম সরস্বতী। সরস্বতীর গর্ভে তিনটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রথমা কিরণময়ী, মধ্যমা হিরণ্ময়ী কনিষ্ঠা জ্যোতির্ম্ময়ী।

শারীরিক মানসিক উভয় প্রকার অসুখে করুণাময় শয্যাসায়ী, বেলা প্রায় চারিদণ্ড; সরস্বতী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কেমন আছ?"

ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করুণাময় বলিলেন, "আছি ভাল; কিরণ কোথায়?"

গৃহিণী বলিলেন, "ঘুমুচ্চে। কাল প্রায় সারারাত তোমায় বাতাস করেছে সমস্ত রাত্রি তুমি ছট্‌ফট্ করেছিলে।"

---

* বঙ্গীয় নাট্যকবি নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'বলিদান' শিরোনাম দিয়া যে সময়ানুগত উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই নাটকের গল্পটি সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ কিছু কিছু যোগবিয়োগে উপন্যাসের প্রণালীতে বিবৃত করা যাইতেছে। জং সং।

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করুণাময় বলিলেন, "আঃ! কিরণ আমাকে সারা-রাও বাতাস করেছিল? ওঃ! আমার অসুখটা কি জান? কন্যাদায়! সর্ব্বনেশে কন্যাদায়! কন্যাদায়ের জ্বলন্ত অনলে অহরহ আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে! হা পরমে-শ্বর! আমি বাপ হয়ে আমার সেই সাধের কিরণের মরণ কামনা কচ্চি!"

শিহরিয়া সাশ্রু নয়নে সরস্বতী বলিলেন, "ও কি! বালাই! ষেটের বাছা! অমন অলক্ষণে কথা কি বল্‌তে আছে?"

চক্ষে জল আসিতেছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া,অলক্ষিতে হস্ত দ্বারা নেত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ রুদ্ধকণ্ঠে করুণাময় বলিলেন, "বলিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু উপায় কি? কিরণের বিবাহের বয়স হইয়াছে, কাহার হস্তে সমর্পণ করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। বরের বাজারে আগুণ! বিধাতা আমাকে খাটো দড়িতে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আমার অবস্থা মন্দ, সে আগুণের কাছে আমি অগ্রসর হতে পাচ্ছি না। কিরণের উপযুক্ত পাত্র নিতান্তই দুর্লভ; সেই জন্যই বলিতেছি, কিরণ মরিলেই আমি বাঁচি।"

অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া স্তম্ভিত স্বরে সরস্বতী বলিলেন, "আবার ঐ অমঙ্গলের কথা! তুমি আমাকে পাগলিনী করিবে! হায় হায়! তুমি আমার পতি, আরাধ্য দেবতা, তোমার মুখে আমাকে ঐ কথা শুন্‌তে হলো?"

এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া সতীলক্ষ্মী কন্যাবৎসলা অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই মনস্তাপে করুণাময় বলিলেন, "তুমি যখন তিন তিনটি যম কিঙ্করীগর্ভে ধরিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই বার বার আমার মুখে ঐ কথা শুন্‌তে হবে। কিরণ আমার সুখের কণ্টক; এই বেলা কিরণের মরণই মঙ্গল!"

কষ্টে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া সরস্বতী বলিলেন, "কেন গা, লোকে কি আর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না? গৃহস্থঘরের মেয়েদের কি আর বিয়ে হচ্চে না? সকল গৃহস্থের মেয়েরাই কি চির আইবুড় থেকে যাচ্চে? আমাদের যেমন অবস্থা, সেই রকম অবস্থার একটি পাত্রদেখে মেয়েটিকে উৎসর্গ করে দিলেই ত হয়। মায়া-মম তায় বিসর্জ্জন দিয়ে, পাষাণে বুক বেঁধে বারবার অমন অমঙ্গলের কথা কেন বল?"

আরও অধিক কাতর হইয়া করুণাময় বলিলেন, "আহা! কিরণ আমার স্নেহের পুতুলী! কিরণের ভাবনায় আমি আফিসে গিয়াও নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার-

তেম্ না ; ছুটি হবার সময় হতে না হতে কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি দেখ্‌বার জন্য আমি তাড়া তাড়ি ঘরে ছুটে আস্‌তেম্ ; কিরণ আমার কাছে বোসে না থাকলে আমার খাওয়া হত না ; কিরণের মুখখানি দেখ্‌তে না পেলে আমি দশদিক আঁধার দেখ্‌তেম্ ; এখন আমি সেই কিরণের মৃত্যু বাঞ্ছা কর্‌ছি ! ভাবো দেখি গিন্নী, অল্প দুঃখে কি, অমন সাঙ্ঘাতিক কথা আমার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে ?"

পুনরায় সিক্তনেত্র একটু শুষ্ক করিয়া গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "ওসব কথা ছেড়ে দাও ; পাগ্‌লামী ছেড়ে দাও, মিছামিছি অত ভাব কেন ? ভেবে ভেবেইত তোমার এই অসুখ ; ভেবে ভেবেই ত অসুখটা আরো দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে ; রাতদিন তুমি অমন কোরে আর ভেবো না ; যা বোল্লেম্, তাই কর। দেখে শুনে একটি গৃহস্থঘরের ছেলে এনে মেয়েটির বিয়ে দাও। ছেলেটি দেখ্‌তে ভাল হয়, বয়স অল্প হয়, লেখাপড়া করে, কাঁণা খোঁড়া না হয়, মাথা গুজে থাক্‌বার একটু স্থান থাকে, সেই রকম একটি ছেলে পেলেই আমি বোত্তে যাই।"

নিশ্বাস ফেলিয়া করুণাময় বলিলেন, "বোত্তে যাওয়া ত মুখের কথা, সে রকম ছেলের দর কত জান ?—যার নাম পাঁ-চ—হা-জা-র !"

কিঞ্চিৎ বক্রমুখে সরস্বতী বলিলেন, "ঘটক গুলো কোন কাজের না ! যার যেমন অবস্থা, তার মতন ঘরবর ঠিক কোর্‌তে পারে না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "পার্‌বে না কেন ? এইত পেরেছে ; চারটে সম্বন্ধ জোগাড় কোরেছে। চার জায়গায় চার বর। একটি বরের বাপের দেড় কাঠা জমীর উপর খোলার তিনখানি ঘর ছিল, সেই জমি টুকু বাঁধা দিয়ে দু-খানি পাকাঘর তুলেছে ; ছেলের বয়স আঠারবৎসর, এই বয়সে স্কুল ছেড়ে সখের থিয়েটারে মেতেছে ; সেই ছেলের দাম নগদ হাজার টাকা, গহণা হাজার টাকা, খাট বিছানা, ঘড়ি ঘড়ির চেন। তিন হাজার টাকার ধাক্কা ! দ্বিতীয় ছেলেটির বাড়ীঘর নাই, বৌবাজারে ভগ্নীপতির বাড়ীতে এসে পড়াশুনা কর্‌ছে ; তারও খাঁই দু' হাজার টাকার কম নয় ! তৃতীয় ছেলের বাপ চিনেবাজারের এক ইষ্টেসনারী দোকানে মুহুরীগিরী করে, ছেলেও নাকি দিন কতক সেই দোকানে কাজ শিখ্‌চে। ঘটক বলে, দেশে বাড়ীঘর আছে, এখানে একখানি ঘরভাড়া করে বাপ বেটায় থাকে। সে ছেলের বাপও ওজনদরে সোণা চায়, ঘড়ি ঘড়ির চেন চায়, খাট বিছানা চায়। চতুর্থ ছেলের বাপ এক হাউসে চাকরি কর্‌তেন্, চোর অপবাদে চাকরি হারিয়ে বাড়ীতে বোসে আছেন, ছেলেটি দুবার পুলিশে জরিমানা দিয়েছে ; কাগুনোটের দালালী

করে ; মাসের মধ্যে ১৫ দিন বাড়ী থাকে না, বিয়ে করবার বড় ইচ্ছা নাই, তবে যদি অর্দ্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা পায়, তাহলে রাজী হতে পারে। এখন দেখ, কোন্ পাত্র তোমার পছন্দ হয়।"

পছন্দের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সরস্বতী বলিলেন, "তা হ্যাঁগা, ঘরে ঘরে ত এই বিপদ্, কেউ কি কোন উপায় করে না? শুনতে পাই, কত লোকে কত জায়গায় কত সভা করে, কত লোকে কত বক্তিমা করে, আরও কত কি করে, সে সব তবে কি? যাতে কোরে ভদ্রলোকের জাতকুল রক্ষা হয়, তার কি কেউ কোন উপায় করতে পারে না?"

চক্ষু ঘুরাইয়া করুণাময় বলিলেন, "যার ছেলে আছে সে দাঁও মারবার তাগ টেঁকে বোসে আছে ; আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মতন হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হচ্চে ; আর তার গৃহিণী তোমার মতন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করচেন, হ্যাঁগা, এর কি কোন উপায় কেউ করে না? আরে পাগ্‌লি! ভিতরের খবর কিছু রাখ কি? যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা যাঁরা মেয়ের বিয়ের খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা উঠ্‌লে তাঁরা বলেন, ছেলের বিয়ে দিবার এখনো সময় হয় নি। মুখে বলেন ঐ কথা, কাজে কিন্তু গোপনে গোপনে ঘটক পাঠিয়ে সন্ধান লন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়্‌বে। মেয়ের বিয়ের খরচ কমাবার সভার একজন মুল গায়নের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবার কথা আমি একবার তুলে ছিলেম, হাতমুখ নাড়া বক্তা মহাশয় সেই কথা শুনে সাতদিন আর আমার সঙ্গে দেখা করেন নি।"

সরস্বতী বলিলেন, "পোড়া দশা আর কি! মুখের কথায় আর কাজের কথায় এত গোল! তা আচ্ছা, একটি দোজ পক্ষের বর দেখ ; তাও ত অনেকে দিয়ে থাকে।"

অনেক কষ্টে হাস্য করিয়া করুণাময় বলিলেন, "দোজ পক্ষেও পক্ষাঘাত! দোজ পক্ষের বরের বয়স যদি কিছু অল্প হয়, তাহলেও তাঁর খাঁই মিটানো বড় কম কথা নয়। তবে যদি সে রকম বরের দু-টি পাঁচটি ছেলে মেয়ে থাকে, বয়স যদি চল্লিশে থাকে, তাহলে শ পাঁচেক টাকার মধ্যে হতে পারে।"

চঞ্চলা হইয়া সরস্বতী বলিলেন, "রোসো রোসো ;—পুরুষ ঘটকের কর্ম্ম নয়, আমি বিন্দী ঘটকীকে ডাকাচ্ছি, অল্প টাকায় সে বেশ জোগাড় করতে পারবে। বিন্দী ঐ যে সেদিন সরকারদের মেয়ের বে দিলে, তাতে কি এমন নগো পঞ্চাশ

সূত্র পাইয়া করুণাময় বলিলেন, "খরচ কিছু কম হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষটা দাঁড়ালো কি? বিয়ের ছয়মাস পার হতে না হতে জামাইটি মনিবের তহবিল্ ভেঙ্গে শ্রীঘরে বাস কোচ্ছেন, মেয়েটি মা বাপের গলায়পড়া হয়ে রয়েছে। তা তো জানো, তবে আর ওসব কথা কেন বল।"

সরস্বতী বলিলেন, "ওসব অদৃষ্টের কথা।"

গৃহিণীর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া করুণাময় প্রতিধ্বনি করিলেন, "সমস্তই অদৃষ্টের কথা। মেয়ে যখন গর্ভে ধরেছ, তখন অবশ্যই আমাদের পোড়া অদৃষ্ট! উমানাথ একটা সম্বন্ধ এনেছিল; তার কথা শুনে আমি রাগ করে ছিলাম, কিন্তু আমাদের অবস্থার উপযুক্ত সম্বন্ধই সে এনেছিল।"

চকিতা হইয়া সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম সম্বন্ধ? কার সঙ্গে?"

করুণাময় বলিলেন, "শুন্‌বে তবে? তখন তোমায় বলিনী, এখন শোন। তোমাদের পাড়ার সেই হরবিলাস মিত্র, যার মরণ কাল আসন্ন, সেই হরবিলাসের সঙ্গে উমানাথ তোমার কিরণের বিয়ে দিতে চেয়েছিল।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সরস্বতী বলিলেন, "এঁ্যা? বল কি? সেই ঘাটের মড়া? তার সঙ্গে আমার কিরণের বিয়ে? হা আমার পোড়া কপাল! আজ আমি মেয়ের বিয়ে দিব, কাল আবার সেই মেয়ের হবিষ্যির আয়োজন কত্তে হবে। উমানাথের মুখে ছাই!"

করুণাময় বলিলেন, "নাক সিট্‌কোনা নাক সিট্‌কোনা উমানাথকে দুষো না; উমানাথ আমাদের অবস্থা বুঝে ঠিক সম্বন্ধই এনেছিল।"

সরস্বতী বলিলেন, "ঠিক সম্বন্ধ!—হতে পারে হতে পারে। আগে আমি মরি, তারপর ঐ রকম ঠিক সম্বন্ধ হবে। তুমি অমন কথা মুখে আন্‌ছ কি করে?"

গৃহিণীর বাক্যে কর্তা উত্তর দান করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বাহির হইতে কে একজন ডাকিল, "বোস্‌জা মশায় বাড়ী আছেন?"

চমকিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া সরস্বতী মৃদুস্বরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীঘটক বুঝি?"

করুণাময় বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি একটু সরিয়া যাও, কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন কালীঘটক কেমন বরের কাহিনী গায়।"

সরস্বতী সরিয়া গিয়া দ্বারের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঘটকের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে করুণাময় বলিলেন, "আছি, উপরে এসো।" অল্পক্ষণ মধ্যেই

সাদর অভ্যর্থনার পর কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ঘটক ঠাকুর ?"

ঘটক বলিলেন, "শুভসংবাদ, শুভ সংবাদ। আপনি যেমনটি চান, ঠিক তেমনি সম্বন্ধ আমি স্থির করে এসেছি। এখন আমার বিদায়ের দফাটা—

ব্যস্ত হইয়া করুণাময় বলিলেন, "সম্বন্ধটা কি রকম আগে শুনি, তারপর সে কথা।"

ঘটক বলিলেন, "ছেলেই কর্ত্তা, বাপ নাই। ছেলে এণ্ট্রেন্সে জলপানি পেয়ে কলেজে পড়ছে, রূপে কার্ত্তিক, দুটি ভাই বিষয় আশয় যথেষ্ট। মিন্সে চাপা ছিল, বিষয় আশয় যা করে গেছে, ছেলেরা তিন পুরুষ চাকরি না কল্লেও স্বচ্ছন্দে বাবুগিরী কোরে বোসে খেতে পার্‌বে। বসতবাড়ী ভাড়াটে বাড়ী, জায়গা-জমী, আর বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। তা ছাড়া বরের মায়ের তিনসুট জড়োয়া গহনা। মাগী বলেছে, দুইবৌকে সোনায় দানায়মুড়ে অষ্টাঙ্গ সাজিয়ে ঘরে তুল্‌বে।"

সম্পদের ব্যাখ্যা শুনিয়া করুণাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাজার দরে সে কার্ত্তিকটির দাম কত ?"

বাহুসঞ্চালন করিয়া ঘটক বলিলেন, "দামের জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না, সর্ব্বসমেত তিন হাজার টাকার ভিতরে আমি সেরে দিব। মেয়ের রূপের কথা শুনেই আপনার বেন ঠাক্‌রুণ ঢ'লে পড়েছেন। তিনি বলেন, "তাঁর ঝি জামাই, তিনি যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন, তাই দিবেন, তাঁর উপর আমার কোন কোটকাট নাই।"

শেষের কথায় কর্ণপাত না করিয়া করুণাময় বলিলেন, "তবেই আমার দফা রফা ! তিন হাজরের কথা শুনেই আমি অতল জলে ডুবে গেছি ! ও বাবা, তিন হাজার টাকা ! আমাকে নীলামে চড়িয়ে বিক্রী কল্লেও তিন হাজার টাকা হবে না।"

যে কপাটের অন্তরালে গৃহিণী লুকাইয়া ছিলেন, এই সময় সেই কপাট খানি খট্ খট্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। চকিতে সেইদিকে চাহিরা ঘটক ঠাকুর বুঝিয়া লইলেন, কপাটের পার্শ্বে কর্ত্তাঠাকুরাণীর অবস্থান ; দম্ভভরে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখুন, বাসুকী মাথা নাড়িলেন। মা ! সব শুন্‌লেন ত ? কর্ত্তা মহাশয়ের মত করুন, ধারকর্য্য করে, তিন হাজার টাকা জোগাড় করে, সেই ছেলেটিকে হাত করুন, ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে। আপনারা পরামর্শ করুন, আমি ততক্ষণ ঘনশ্যাম বাবুর বাড়ীথেকে হয়ে আসি। আপনাদের মেয়ের বিয়ের দেরি করা হবে না ;

তিনমাস আর শুভদিন নাই, অকাল; অতএব পরশু বিবাহ, কাল গায়ে হলুদ দিতে হবে। মাগী বলে, কালাশৌচ ঘুচে গেছে, শীঘ্র শীঘ্র কুলকর্ম্ম সেরে ফেল্‌ব। বুঝলেন বোসজা মহাশয়, মত করুন, মনে আর কোন দ্বিধা রাখ্‌বেন না।

করুণাময় বলিলেন, "মত হলেও, এত শীঘ্র কি করে হয়? আর অত টাকাই বা আমি পাব কোথা?"

হস্ত বিস্তার করিয়া ঘটক বলিলেন, "কলিকাতার সহর, টাকা জোগাড়ের ভাবনা কি? আপনি পাটাওয়ালা, অনেকেই আপনাকে হ্যাণ্ডনোটে ধার দিতে রাজী হবে। আমিই জোগাড় করে দেব।"

কপাটের শব্দের সঙ্কেতে করুণাময় বুঝিয়া ছিলেন, দ্বারের পার্শ্বে সরস্বতী বিরাজমানা; তিনি আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দ্বারের নিকটে গেলেন, চুপি চুপি স্ত্রীপুরুষে পরামর্শ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া ঘটককে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন এসো, আমি তোমায় খবর দিব।"

ঘটক ঠাকুর বিদায় হইলেন, সরস্বতী সম্মুখে আসিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "আর তুমি এ সম্বন্ধে দ্বিধামত কোরো না, এমন সুযোগ ছেড় না; বাড়ীখানা বাঁধা দিয়ে টাকা জোগাড় কর। আমার দু-একখানা গহনা বাঁধা দিতে হয়, তাতেও আমি রাজী।"

করুণাময় বলিলেন, "বাঁধা দিলে কি আর এজন্মে খালাস কর্‌তে পার্‌ব? ঘটকের শেষ কথার ভাবে বোঝা গেল, দু-হাজারের কমে হবে না। দু-হাজার টাকা কর্জ্জ কর্‌লে আমার ভিটে মাটি সব যাবে। আমি বলি রামী ঘটকী যে দোজ-পক্ষের বরের সম্বন্ধ এনেছে, সেই বরেই দেওয়া যাক্, খুব কম খরচে হবে।"

মুখ ভারি করিয়া সরস্বতী বলিলেন, "ওমা! সেই হাড় হাবাতে লক্ষীছাড়া উন্‌ পাঁজুরে বুড়র হাতে কিরণকে তুমি সোঁপে দিতে চাও? তার চেয়ে বরং গলায় কলসী বেঁধে মেয়েটাকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া ভাল।"

মর্ম্মে আঘাত পাইয়া করুণাময় বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি তুমি পথে বোস্‌তে চাও?"

চঞ্চল স্বরে সরস্বতী বলিলেন, "বরাতে যদি তাই থাকে, পথেই বোস্‌ব, তাতে আর কি? তা বোলে, আমি সোনার প্রতিমাকে জলে ভাসাতে পার্‌ব না।"

গম্ভীর বদনে করুণাময় বলিলেন, "তুমি মেয়ে মানুষ, অগ্র পশ্চাৎ ভাল করে তলিয়ে বুঝতে পার না। আমাদের সাহায্য করবার একটি লোকও নাই। মুখে

বলা যায়, বটে, অমুক আমার বন্ধু,অমুক আমার বন্ধু, সেটা কেবল কথার কথা। সংসার তুমি জান না ; সংসার বড় কঠিন স্থান ; আমাদের পক্ষে সংসার একপ্রকার বন্ধু বান্ধব হীন অরণ্য ; আমরা পথের ভিকারী হলে, কেহই আমাদের মুখপানে চাবে না। একটা মেয়ের বিবাহে বাড়ী বাঁধা দিয়ে ফতুর হব, জলজ্যান্ত আর দুটো রয়েছে, তাদের গতি কি হবে? ওঃ! কন্যাদায়! কন্যাদায়! কন্যাদায়ের বজ্র আমার মাথায় পড়্‌বে একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েই গাছতলা সার হব!"

সরস্বতী বলিলেন, "হয় হবে, সে ভয় আমি করি না। অদৃষ্টে যা থাকে, কে তা খণ্ডায়, মেয়েটাত আগে পার কর, তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবে।"

করুণাময় বলিলেন, "অদৃষ্টে যা আছে, আমি তা নখদর্পণে দেখ্‌তে পাচ্ছি! পৈত্রিক ভিটাটুকু যাবে, তোমার গহনা ক-খানি যাবে, ছোট মেয়ে দু-টো হয় ত চিরদিন আইবুড় থাক্‌বে কিংবা অঘরে পড়বে, জাতকুল পর্য্যন্ত রক্ষা হওয়া দায় হবে। লোকের কাচে আর মুখ দেখান যেতে পার্‌বে না, পেটেও অন্ন জুট্‌বে না, বনবাসী সন্ন্যাসীদের মত গাছতলা সার হবে! মুখে আমরা সমাজের দোহাই দিয়া চলি, কিন্তু সমাজ আজকাল আমার মত গরীব গৃহস্থের সর্ব্বনাশ কর্‌চে, এই যে বরকর্ত্তাদের এত জুলুম, এই যে, কন্যাদায়ের এত তেজ এর গোড়া হচ্চে, নিস্তেজ মুখ সর্ব্বস্ব হিন্দু সমাজ। হিন্দু সমাজের কর্ত্তারা যদি পূর্ব্বাবধি এখনকার মতন নির্দ্দয় স্বার্থপর হয়ে থাকৃত তা হলে এতদিন কোন কালে হিন্দুনাম, হিন্দুজাতি, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু আচার, নিশ্বাসে লোপ-পেয়ে যেত, বর্ত্তমানসমাজের দোষেই কন্যা-দায়ের এতদূর প্রতাপ।"

কিঞ্চিৎ তীব্রস্বরে সরস্বতী বলিলেন, "কন্যাদায় একটা মহাদায়, এ কথাটা ত চিরদিন সকলেই জানে, লোকের অর্থলোভ আজকাল কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, এইমাত্র কথা। আগে তো মেয়ের বিয়ে দিয়ে জাতরক্ষা কর, একটা দায় থেকে উদ্ধার পাও, তারপর সমাজের দোষ দিও, আমার দোষ দিও, যা ইচ্ছা হয়, তাই কোরো, কিছুই আমি বোল্‌বনা, আমার গহনাগুলি আমি বার করে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, বাঁধা দিয়ে টাকা আনো।"

পুনর্ব্বার মর্ম্মে-বেদনা পাইয়া করুণাময় বলিলেন, 'না না, তোমার গহনা তোমার থাক্‌, সেগুলি বাঁধা দিলে আমি আর খালাস করে দিতে পার্‌ব না। এই আমি চল্লেম, বাড়ী বাঁধা দিয়ে টাকা সংগ্রহ কর্‌বার চেষ্টা করিগে।"

এই বলিয়া গৃহিণীকে সান্ত্বনা দিয়া কন্যাদায়-বজ্রাহত করুণাময় বসু, ভদ্রাসন বন্দক দিবার জোগাড় করিবার জন্য, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছিল, সেদিন আর তাঁহার স্নানাহার পর্য্যন্ত হইল না। মস্তকের উপর প্রখর রবি-তাপ, তাহার উপর প্রখরতর কন্যাদায়ের উগ্রতাপ।

তীর্থযাত্রীর ডাইরি।

(৺গয়াধাম।)

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ জ্যোতিষী।

আমার একটি বন্ধু তীর্থদেবগণের কৃপায়, ভারতের অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের এক এক প্রান্ত পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া যেদিন কলিকাতায় আমার কুটিরে পদার্পণ করিতেন, যখন তাঁহার অনন্ত ঘটনাময়ী ভ্রমণ কাহিনী "কূপমণ্ডুকবৎ" কলিকাতার অধিবাসীদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন, তখন আমরা তদগত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতাম। তাঁহাকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমরা পত্রিকায় ছাপাইব, অনেক লোকে পড়িবে। তিনি বলিতেন, এ আর কি লিখিব? অমুক, অমুক তাহার ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছেন, ওকথা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, সে কথায় আমি উত্তর দিলাম, ভ্রমণ কাহিনী পুরাতন হয় না। ইহা নিত্যই নূতন, একজন লোক দেখিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে লিখিতে সেই স্থান নূতন হইয়া যায়। অথবা এক সময়ে দুইজনে একস্থান দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিলেও উভয়ের বর্ণনায় অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

এখানকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা, ইহার দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এখানে ম্যাকলিওড গঞ্জনামে একটি প্রান্তর আছে। আমি প্রথমে যেদিন সে স্থানে বেড়াইতে যাই, সেইদিন সেখানে বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসি নাই—অথবা তাহা আমার লক্ষ্যের মধ্যেই আইসে নাই। কিন্তু তৎপর দিন সেখানে গিয়া দেখিলাম, তাহা অনন্ত সৌন্দর্য্যকর। স্থানটি একটি চৌমাথার রাস্তার একটি কোন। প্রথমে একবিঘা আন্দাজ শস্য শালিনী ভূমি, তাহার পরেই একখানি সাহেব বা বাঙ্গালী বাবুর বাঙ্গালাঘর, তাহার পরই আম্র কাঁঠালের বাগান, তাহার গায়ে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, যেন আম বাগানের গাত্র হইতেই উঠিয়াছে। সে যে কি সুন্দর তাহা কাগজে কলমে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তুলিকা থাকিলে চিত্র করিয়া দেখাইতাম, যেন একখানি জীবন্ত ছবি (Landscope) এইরূপ ভূ-চিত্র বিলাতে বা জার্ম্মাণিতে ছাপা হইয়া কলিকাতার ট্রেটির বাজার বা সাহেবদিগের প্রাসাদ শোভা করে। এই স্থানটি যেন সেইরূপ একটি জীবন্ত ভূ-চিত্র। আমি অদ্য লইয়া অষ্টাহ এখানে আসিয়াছি। এই স্থানটি দেখা অবধি, আমি প্রত্যহই সেই স্থানটিতে যাই এবং একটি বটতলার শিকড়ের উপর এক ঘণ্টা করিয়া বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেইস্থান দর্শন করি।

এখন বক্তব্য হইতেছে—একই ব্যক্তি, একই সময়ে, একস্থানে আসিয়া, যখন সকল সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, তখন বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া, একই সৌন্দর্য্য কি করিয়া দর্শন করিবে? কাজেই তাঁহার কথিত দুই একখানা ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তক, বাঙ্গালাভাষায় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেও, আমার এই ক্ষুদ্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত লোকে পড়িবে।

গতবর্ষে শরৎকালে আমি স্বাস্থ্যলাভের জন্য, রাঁচি ভ্রমণ করি। তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া "জন্মভূমি"র সম্পাদককে দিই, তিনি দয়া করিয়া তাহার কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র জন্মভূমিতে প্রকাশ করেন। তাহাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক লোকে আদরের সহিত পড়িয়াছিলেন; একজন তাহাও আমায় বলিলেন, গতবর্ষে এই শীতকালে ৺বৈদ্যনাথ ভ্রমণ করি। এই বর্ষে শরৎকালে দুমকা ভ্রমণ করি। কলিকাতায় গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত লিখিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কলিকাতায় গিয়া নানা ঝঞ্ঝাটে আর তাহা লেখা হয় নাই। এবার বাটি হইতে মনে করিয়া বাহির হইয়াছি, তৎ-তৎ স্থান হইতেই তৎ-তৎ বৃত্তান্ত লিখিয়া লইয়া আসিব।

তীর্থ দর্শনটা পূর্ব্ব জন্মের পাপক্ষয় না হইলে ত আর হয় না। এবং সেই পাপ ক্ষয়টা কেমন ঝটিতিই হইয়া যায়। আমার অদৃষ্টেও যে সকল তীর্থ হইয়াছে; তাহাও ঝটিতিই হইয়াছে। এবারেও সেইরূপ ঝটিতিই, এই তালে আসা হইয়া গেল। ১৩১৬ সাল এবারে ২৫শে অগ্রহায়ণ দিবা ৩টার সময় কলিকাতার এক জন বড়লোক ঝটিতি তীর্থ যাত্রায় আমাকে সঙ্গী করিয়া লইলেন। আমি তাহার কথামত দুই ঘণ্টার মধ্যে, জিনিষ পত্র গুছাইয়া তাহার ঝটিতি সহযাত্রী হইবারজন্য উপস্থিত হইলাম।

২৫শে অগ্রহায়ণ শনিবার। রাত্রি ৯টায় বোম্বাইমেল ছাড়িল। আমরা গ্রাণ্ডকর্ডলাইনে আসিবার জন্য ঐ গাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝোলার উপরে চড়িয়া শুইলাম। একে ইণ্টার ক্লাস, তাহার উপর বোম্বাইমেল, কাজেই একঘুমে একেবারে গয়া।—না তাহা বড় নয়। পাহাড়ের গাড়ি আসিবামাত্র, ভয়ানক শীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাত্রি ২টা হইতে প্রাতঃকাল অবধি জাগিয়াই ছিলাম। পাছে বরফ হইয়া রক্ত ও মাংসটা জমিয়া যায়।

২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার। প্রাতে ৮টার সময় গয়া ষ্টেসনে নামিলাম। আমাদের দলবল কম নহে। গয়ার যত গাড়ি ও পাল্কী আমরা এক চেটিয়া করিয়া ফেলিলাম। আমি একখানি গয়ার ফাষ্ট ক্লাস গাড়িতে চড়িয়া, গয়ার একজন [illegible]

শুদ্ধ খট্ খটে, একখানি বাগান বাড়ি। আমরা সাদরে সেখানে অভ্যর্থিত হইয়া উপযুক্ত স্থান করিয়া লইলাম। আমাদের লট বহরই বা কত। সেইদিন রাত্রির অনিদ্রা জনিত দিবসেই নিদ্রা গেলাম। সেইদিন আর কোথাও বেড়ান হইল না। গয়ায় ভয়ানক মশা। পূর্ব্বে জানা না থাকায়, এবং মশারি না আনায় গয়ার যাবতীয় মশাগণ, মহানন্দে রাত্রিকালে আমাদের দুর্ব্বল বাঙ্গালী দেহের ক্ষীণ শোণিত টুকু, পান করিয়া ফেলিল। তবে পূর্ব্ব রাত্রির শ্রম জনিত তাহা টের পাই নাই।

২৭শে অগ্রহায়ণ সোমবার। প্রাতঃকাল হইতে নগর ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম। জেলার হেডকোয়াটার সকলের মধ্যে গয়া একটি বৃহৎ সহর। এখানে ৪টি পোঃ আফিস। একটা সিটিবুকিং আফিস। রেল ষ্টেসনে তিনটা বুকিং অফিস। নগরের ভিতর দিয়া বড় বড় নর্দ্দমা থাকায়, এই মশার প্রকোপ হইয়াছে। আমাদের চক্ষুতে এ নগর কেমন শ্রীছাঁদ বিহীন। দুই একখানা বড় বড় কোঠা ছাড়া, প্রায়ই খোলার ঘর বা কাঠের দোতালা। বিস্তর ধর্ম্মশালা দেখিলাম। একটি সুন্দর প্রস্তরে ধর্ম্ম শালা নির্ম্মাণ হইতেছে দেখিলাম। অনেকেই অন্ন বা চাউল দান করেন, আমার আশ্রয় বাটিতে প্রত্যহই অন্নদান হয়। পুরাতন গয়া বা যে ধারে বিষ্ণুমন্দির, সে পাড়া অতি জঘন্য। আমরা থাকি সাহেবগঞ্জ বা আদালতের পাড়ায়, তাহাও অতি নিকৃষ্ট। পুরাতন গয়া—বেহারী গয়ার কথায় ত আর কার্য্যই নাই। অতি সরু সরু গলি, তাহার মধ্যে বড় বড় ইট বা পাথরের সে কেলে ধরণের বাটি। রাস্তায় ভীষণ ধুলা, তাহার উপর জল দেওয়া হয় না। বিহারীরা স্বভাবতই নোঙ্গরা। কাজেই কোথায়ও সহরের কিছু সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলাম না।

ব্রহ্ম যোনির পাহাড় হইতে রামশিলার পাহাড় পর্য্যন্ত গয়া সহর উত্তর-দক্ষিণে দুই মাইল লম্বা। এবং ফল্গু নদীর তীর হইতে, ম্যাকলিয়ড গঞ্জ পর্য্যন্ত, প্রায় এক মাইল প্রস্থে হইবে। আমাদের বাসটি নগরের মধ্য স্থানে, কালেক্টারি আদালতের সম্মুখে। আমাদের বাসা হইতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়, প্রায় এক মাইল দূরে এবং রামশিলাও তদ্রূপ উত্তরে প্রায় এক মাইল দুরবর্ত্তী। উত্তরার্দ্ধ সাহেব গঞ্জ বা নূতন সাহেবী সহর। আর দক্ষিণার্দ্ধ বা পুরাতন গয়া হিঁদুয়ানী সহর। গয়াতে তিনটি রেল আসিয়া পড়ায়, শীঘ্রই রেল বাজার নামে অপর সহর প্রস্তুত হইবে। আরও কিছুদিন পরে তাহা দেখা যাইবে। এখানে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। নগরের বুকের উপর দিয়া একটা ময়লা ফেলা গাড়ি—২ ফুট গজের বা মাপের রেল গিয়াছে। ইহাতে কেবল বিষ্ঠা যায় মাত্র। রাস্তায় সামান্য একটু একটু জল দেওয়া হয় মাত্র, [illegible]

কাঠের পিপের মধ্যে পুরিয়া ছিঠান হয়। সহরে সামান্য বাজার বসে। একটি বড় রাস্তার দুধারে দুই দশ ঝাঁকা চাঁপানটে শাক, এবং বিশ ত্রিশ ঝাঁকা ফুলকপি, দুইচারি ঝাঁকা পিয়ারা (স্থানীয় কাঁটা আমরুৎ) এইমাত্র বসে। গয়ায় সমস্ত দ্রব্যই মহার্ঘ। বাজার দেখিলে মনে হয়—মনে হয় কেন ঠিকই। গয়া জেলার লোকেরা বড় দরিদ্র। তরকারি খাইবার সামর্থ্য নাই। কষ্টে সৃষ্টে খান কয়েক আটার রুটি, এবং একটু একটু শাগভাজি এইমাত্র খাইয়া জীবন ধারণ করে। তবে এখানে সুন্দর কুমড়া পাওয়া যায় এক একটা ওজনে একমনের কম নহে, এবং খাইতেও সুমিষ্ট। এবারে জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের পরিবর্ত্তন হওয়ায়, কুমড়ার আস্বাদন বলিতে পারিলাম না। কারণ এইবর্ষে ফল খাইয়াই জীবন ধারণ আরম্ভ করায়, এখানকার বিলাতী কুষ্মাণ্ড কিরূপ, তাহা পাঠক দিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমাদের মধ্যে একজন বাবু একদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, তাহাতে দেখিলাম, ব্রাহ্মণগণ কুষ্মাণ্ডের তরকারি সমাদরের সহিত ভোজন করিলেন, এবং আমাদেরই একজন বলিলেন, এ কুষ্মাণ্ড বাঙ্গালার কুষ্মাণ্ড হইতে, অত্যুৎকৃষ্ট, মিষ্ট গুড়ের মত।

ক্রমশঃ

প্রজাপতি

লেখিকা,—শ্রীমতী ভগবতী দত্ত।

কে তুমি বিচিত্র রূপি ! নয়ন রঞ্জন,—
উড়িতেছ হেথা সেথা যখন তখন,
কত রঙ শোভে গাত্রে বলিহারি যাই !
তবসম চারুরূপ দেখিতে না পাই ;
আঁধারে মিশিছে তব উজ্জ্বল বরণ,
অমানিশা পূর্ণিমার একত্র মিলন।
চিনেছি চিনেছি আমি, তুমি প্রজাপতি।
গুটিপোকা ছিলে তুমি রেশম প্রসূতি।
এখন ধরেছ রূপ অতি চমৎকার,—
প্রকৃতি বাসেন ভাল এরূপ তোমার।
যুবক যুবতী হাসে তোমারে দেখিলে—
শিহরিয়া উঠে-অঙ্গ তুমি পরশিলে,
যুবকের লাভ হয়, প্রেয়সী রতন,
লভে মনোমত বর কুলাঙ্গনাগণ
সবার আমোদ হয় হেরিয়ে চটক,
নরনারী বিবাহের তুমি হে ঘটক।

—:০:—

সমালোচনা।

মুদীর দোকান।—শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, পুণ্যযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা আট আনা।

পুস্তকখানির গ্রাম্য নাম দর্শন করিয়া কেহ যেন ইহা উপেক্ষনীয় মনে না করেন। সচরাচর মুদীর দোকান যেমন গৃহস্থ লোকের নিত্য ব্যবহার্য্য, তণ্ডুল, দ্বিদল, তৈল লবণাদি সর্ব্বারহ করে, ঋতেন্দ্র বাবুর মুদীর দোকান খানি গৃহাশ্রম-বাসীদিগের পক্ষেও সেইরূপ উপকারে আসিবে। এই দোকানে আইবুড়ভাত, বৌ-ভাত, গরু, দেবনামে অনাদর, কমলালেবু, গণেশবাহন ইন্দুর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, ও ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল, খাবারের নামতত্ত্ব (জলপান) সন্দেশ, লুচি তরকারি তামাক ও ধূমপান থরে থরে সুসজ্জিত। নির্ঘণ্টের নামগুলি পাঠ করিয়াই বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন, পুস্তকখানি সারগর্ভ। যিনি যে অংশটি দর্শন করিবেন, তাহাতেই অনেক শিক্ষার বিষয় দেখিতে পাইবেন। আইবুড় ভাত, এই বাক্যটি আজকাল বিদ্যাভিমানি পণ্ডিতগণের দ্বারা সংস্কৃত বসনে সজ্জিত হইয়া যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে,—তাহা কতদূর ভ্রমাত্মক, ঋতেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যা ও টিপ্পনি দর্শনে তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে। ভারতবর্ষ যেমন প্রাচীন ভারত উৎপন্ন দ্রব্য জাতেরও সেইরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপী প্রসার। পাশ্চাত্য খাদ্য পিষ্ঠকাদি ভারতবর্ষীয় পিষ্ঠকাদির উপাদানে প্রস্তুত, ভাষাভেদে নাম ভিন্ন প্রকার, দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋতেন্দ্র বাবু তাহাও দেখাইয়াছেন। তাঁহার গবেষণার এক উচ্চতম নিদর্শন তামাক ও ধূমপান। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানেরা এদেশে তামাক আনিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, ইংরাজেরা স্পেন দেশের বাগান হইতে সিগার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঋতেন্দ্র বাবু এই উভয় মত খণ্ডন করিয়া ভারতবর্ষকে তামা-কের উৎপত্তি স্থান সপ্রমাণ করিয়াছেন। বৈদিককাল হইতে এতদ্দেশে ধূমপানের ব্যবহার আছে, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি বিশেষে ধূমপানের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন; পূর্ব্বকালে তামাক অথবা তাম্রকুট শব্দের ব্যবহার ছিল না, ইহা সত্য, কিন্তু পদার্থ ছিল, তাহাতে সংশয় নাই, বাল্মীকি রামায়ণের প্রমাণ দেখাইয়া ঋতেন্দ্র বাবু প্রতিপাদন করিতেছেন, তামাক শব্দটা তমালপত্রের অপভ্রংশ; ইয়োরোপীয়েরা যাহাকে সিগার বলেন, তাহা সংস্কৃতের ঋষীকা শব্দের অপভ্রংশ। যাঁহারা প্রত্ন তত্ত্বের আলোচনা ভাল বাসেন, তাঁহারা এই মুদীর দোকানে দু-একঘণ্টা সময় ক্ষেপ করিলে সুখী হইতে পারিবেন। মুদীর দোকানের পারিপাট্য দর্শনে আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। এতৎপাঠে কেবল পাঠেচ্ছা চরিতার্থ হয়, কৌতুহল পরিতৃপ্ত হয় কেবল ইহাই নহে, এই দোকানখানি এদেশের অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পাঠি।

পরলোকগত ভারত-সম্রাট।



সপ্তম এড্ওয়ার্ড।

ভারত-সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড ফুস্ফুস্প্রদাহ রোগে গত ৭ই মে উনসত্তর বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। } ১৩১৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ ও নারদসংবাদ।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল।

একদা দেবর্ষি নারদ হরিগুণ কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া, আকাশমার্গের ছায়াপথে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; সেই সময় বীণাযন্ত্রে সুর মিলাইয়া এই গীতটী ধরিলেনঃ

* ফাল্গুন মাসের জন্মভূমি পত্রিকায় "মায়া" শিরোনামে শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্য চরণ দত্ত লিখিত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। মূলাংশে ঠিক থাকিলেও এ বিষয়ে কিছু কিছু মতান্তর আছে। একজন গণনীয় পৌরাণিকের মুখে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমি এই প্রবন্ধটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

ভৈরব,—মধ্যমান।

জয় নারায়ণ, অনাদি কারণ,
গোলোকেশ্বর সনাতন হে।
তুংহি পরম গতি, সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি,
বাক্য মানস অগোচর হে।
নরের আকারে, দেবকী উদরে,
জনম লইলা ভুবনে হে।
দুষ্কৃতি নাশন, ধর্ম্ম সংস্থাপন,
জগতে প্রেম প্রচারিলে হে।
হে শ্যামসুন্দর, পরম যোগীশ্বর,
পাণ্ডব সখা বাসুদেব হে।
হে রাধা-বল্লভ, কংশারি কেশব,
কে জানিবে তব মহিমা হে॥

গীত শ্রবণে যক্ষঃ রক্ষঃ কিন্নর ও গন্ধর্ব্বাদি সকলেই বিমোহিত হইল।

নারদ মনে মনে চিন্তা করিলেন, বহুদিন হইল, ভগবান্ নারায়ণ ভূভার হরণার্থ গোলোক পরিত্যাগ করিয়া, ভূলোকে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; লীলাময় কিরূপ লীলা করিতেছেন, একবার দেখিয়া আসি।

এইরূপ ভাবিয়া দেবর্ষি নারদ সেই অভিলাষ সিদ্ধ করণার্থ ঐ গীত গাহিতে গাহিতে দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন; দেখিলেন, প্রকাণ্ড স্বর্ণময়ী পুরী। অন্তঃপুরের কোন ঘরে স্ত্রীলোকেরা পাশা খেলিতেছে, কোন ঘরে কোন কামিনী কেশবিন্যাস করিতেছে, কেহবা সন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছে, কোন ঘরে স্নেহ-বতী জননী শিশু সন্তানকে লইয়া সোহাগ করিতেছে, কোন ঘরে চারি পাঁচজনে কলহ করিতেছে, কোন ঘরে রন্ধনের পারিপাট্য সাধিত হইতেছে। একটী ঘরে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিয়া আছেন, একটী রমণী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। কোন ঘরে কৃষ্ণের নিকট স্ত্রীলোকেরা হাস্যপরিহাস করিতেছে; কোন ঘরে কোন রমণী কৃষ্ণের নিকট অভিমান করিতেছে।

নারদ এই সমস্ত দেখিয়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, লীলাময়ের কি চমৎকার লীলা! ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে কি এক ভাবোদয় হইল, তিনি আপন মনে এই গীতটী ধরিলেন :—

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

কি খেলা খেলিছ হরি, বুঝিবারে সাধ্য কার।
মায়াতে মোহিত করি, রাখিয়াছ ত্রিসংসার॥
নিজে নর কলেবরে, খেলা দেখাইছ নরে,
বিশ্বধামে চরাচরে, অপূর্ব্ব খেলা তোমার॥
তুমি প্রভু, লীলাময়, লীলা খেলা বিশ্বময়,
ধাঁধিয়া সবার আঁখি, করিছ লীলা প্রচার॥

দেখিতে দেখিতে নারদ আর এক ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। নিকটে গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নারদ বলিলেন, "ঠাকুর! প্রণাম করি। তোমার একি বিচিত্র লীলা? অনুগ্রহ করিয়া আমায় বলুন, আপনি কি কি লীলা করিয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "নারদ! আমি কত যুগে কত প্রকার লীলা করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না।

নারদ। তুমি যে এত বড় সংসার ফাঁদিয়া বসিয়াছ, তাহা আমি জানিতাম না। কাণ্ড দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি।

কৃষ্ণ। এ সব মায়ার কাণ্ড, মায়ার সৃষ্ট।

নারদ। মায়া কি? তাহার আকৃতি কিরূপ? তাহার কার্য্য কিরূপ? কিছুই আমি জানি না। মায়ার কোন ধারও আমি ধারি না।

কৃষ্ণ। (মৃদু হাস্য করিয়া) তুমি মহাযোগী, মায়া তোমার কাছে ঘেঁসিতে পারে না, সেই কারণেই তুমি মায়ামুক্ত।

সংক্ষেপে এই কয়টী কথা বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মায়ার বাড়ী যাবে?"

নারদ। যাবো। মায়া কি রকম, মায়ার প্রকৃতি কি রকম, মায়ার বাড়ী কি রকম, সেইগুলি আমি দেখ্‌বো।

আরো কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, সহসা দণ্ডায়মান হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তবে এসো আমার সঙ্গে।"

নারদকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। উভয়ে অনেক দূর অতিক্রম করিলেন। পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! মায়ার বাড়ী কতদূর? আর আমি চলিতে পারি না!"

ঠাকুর বলিলেন, 'আর বেশীদুর নয়, অতি নিকটে।"

নারদ অগত্যা মৌনাবলম্বন করিয়া ঠাকুরের অনুগামী হইলেন।

আরো কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে একটু জল অন্বেষণ করিয়া আনো।"

নারদ জল অন্বেষণে চলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

ত্রিপান্তর মাঠ। নারদ কতদূর গমনকরিলেন, কুত্রাপি জলাশয় দেখিতে পাইলেন না; অতঃপর প্রান্তরের প্রান্তভাগে দিব্য একটী সরোবর তাঁহার নয়নগোচর হইল অগ্রসর হইয়া নারদ দেখিলেন, অতি দীর্ঘ মনোহর সরোবর চতুর্দ্দিকে বিচিত্র কানন, ফলে ফুলে বৃক্ষ সকল অতি শোভাময় হইয়া রহিয়াছে, জলে রাজহংস ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে, বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গমগণ নানাপ্রকার কলরব করিতেছে। নারদ আরো দেখিলেন, সেই কানন প্রান্তে একটী পরমা সুন্দরী কামিনী একখানি পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে বসিয়া কেশবিন্যাস করিতেছে।

কামিনীর রূপ দেখিয়া নারদ বিমুগ্ধচিত্তে অচলা প্রতিমার ন্যায় ক্ষণকাল অতৃপ্ত নয়নে কামিনীর সুন্দর মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! তুমি কে?"

কামিনী উত্তর করিল, "আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী, এই বনে আমি বাস করি।"

নারদ। বনে কি তুমি একাকিনী থাকো?

কামিনী। সঙ্গী কোথায় পাইব?

নারদ। তোমার কি বিবাহ হয় নাই?

কামিনী। না, আমি অনূঢ়া।

নারদ। তোমার কি বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না?

কামিনী। (গদ্‌গদ্ বচনে) হয়; কিন্তু যাহাকে ভাল বাসিতে পারি, তেমন মনের মত পাত্র আমার চক্ষে ঠেকে না; দেখিতেছি, তুমি পরম সুন্দর, তুমি কি আমাকে বিবাহ করিতে চাও?

নারদের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। বিভ্রান্ত হইয়া তিনি উত্তর করিলেন,

মৃদু হাসিয়া কামিনী বলিল, 'তবে তাহাই হউক।'

সেই বনে গান্ধর্ব্ব বিধানে বন কন্যার সহিত নারদের বিবাহ হইল। উভয়ে পরম সুখে সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। পিপাসু শ্রীকৃষ্ণের কথা নারদের আর মনেই রহিল না।

প্রাতঃকাল হইলে নগরে বহির্গত হইয়া নারদ ভিক্ষা করিয়া আনেন, কামিনী রন্ধন করে, উভয়ে ভোজন করেন, সুখে সুখে দিন যায়।

কিছুদিন পরে নারদের ব্রাহ্মণী অন্তঃসত্তা হইলেন; অরুচি হইল। ব্রাহ্মণী নারদকে আমড়া, চাল্‌তা ও তেঁতুল আনিতে বলিল। নারদ যথাসাধ্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণীর সাধ পুরাইলেন। পূর্ণকালে ব্রাহ্মণী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। নারদের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে ক্রমে পাঁচটী পুত্রকন্যা জন্মিল।

দশ বৎসর অতীত। এক বৎসর সেই দেশে বড় মারীভয় হইল। নারদ বলিলেন, "ব্রাহ্মণি, সন্তানগুলি মারা যায়, চলো আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যাই।"

ব্রাহ্মণী। সেখানে কিরূপে চলিবে?

নারদ। চলিবার ভাবনা কি? এখানেও ভিক্ষা, সেখানেও ভিক্ষা।

ব্রাহ্মণী সম্মত হইলেন। পোঁট্‌লা পুঁট্‌লী বাঁধা হইল। আস্‌বাবের মধ্যে মেটে কলসী, কুশ, কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, কোশা-কুশী।

নারদ ব্রাহ্মণীর মাথায় পুঁটুলী তুলিয়া দিলেন, ছেলেগুলির ভার আপনি লইলেন। বলা হইয়াছে, পুত্রকন্যা পাঁচটী। নারদের কক্ষে দুটী, স্কন্ধে দুটী, মস্তকে একটী।

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাঁহারা একটী নদী দেখিতে পাইলেন। নদী অপ্রশস্ত, অল্প জল; ঝুর্ ঝুর্ করিয়া জল চলিতেছে; পথিকেরা পদব্রজে নদী পার হইয়া যাইতেছে। নারদ ও ব্রাহ্মণী নদীতে নামিলেন; মধ্যস্থলে গিয়াছেন, এমন সময় তরঙ্গ উঠিল; প্রবল বেগে জল বাড়িতে লাগিল। কাঁকের ছেলেরা বলিল, বাবা! একি হইল? যাই যে!

কাঁকের ছেলেরা স্রোতে ভাসিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নারদের কাঁধ পর্য্যন্ত জল উঠিল। সেই সময় কাঁধের ছেলেরাও জলে ভাসিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে

নারদ অনেক নাকানি চোবানি খাইয়া, সাঁতার দিয়া কোনমতে পর পারে উঠিলেন; "কোথায় গেলে ব্রাহ্মণী হে! কোথায় গেলে ব্রাহ্মণী হে! কোথায় গেল আমাদের ছেলেগুলি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দূর হইতে কে যেন 'নারদ, নারদ' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। নারদ পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "কি আপদ! কে আমাকে এমন সময় নারদ নারদ বলিয়া ডাকে! একে আমি স্ত্রীপুত্র শোকে কাতর, এমন সময় কে আমায় বিরক্ত করে?"

আবার সেইরূপ আহ্বান। "নারদ, নারদ, নারদ!"

নারদ কথা কহিলেন না। তৃতীয়বার ঐরূপ আহ্বান।

নারদ তখন একটু দূরে চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক দিব্যমূর্ত্তি। মায়াবিমুগ্ধ দেবর্ষি প্রথমে সে মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?'

পাঠক মহাশয় অনুভবেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন, মূর্ত্তিটী লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া নারদের গাত্র স্পর্শ করিলেন, হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'জল কোথায়? আমি যে পিপাসার্ত্ত হইয়া তোমার নিকট পানীয় জল চাহিয়াছিলাম, জল আনিয়াছ?"

নারদ কাঁদিয়া বলিলেন, "হায় হায়! আমার ব্রাহ্মণী কোথায় গেল? আমার পুত্রকন্যা সব কোথায় গেল? আমার আসবাবের পুটুলিটী কোথায় গেল?"

ঠাকুর হাস্য করিয়া বলিলেন, নারদ! তুমি মায়ার বাড়ী দেখিতে চাহিয়াছিলে, তাহা ত দেখা হইল? মায়াও আমি, নদীও আমি, তোমার ব্রাহ্মণীও আমি, পুত্রকন্যাও আমি, সেই পুঁটুলীও আমি।"

তখন নারদের পুনরায় দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইল, মায়াঘোর ঘুচিয়া গেল। সাশ্রু নয়নে করযোড়ে প্রণিপাত করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! তোমার মহিমা অনন্ত! মায়াও তুমি, অমায়াও তুমি, দয়াও তুমি, নিদয়াও তুমি, চরাচর বিশ্বসংসার সমস্তই তুমি। আমি তোমার নিকট যে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। মায়ার এমন মহীয়সী শক্তি, তাহা আমি জানিতাম না। প্রভু! তোমাতেই সব সম্ভবে। তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত।"

এইরূপে স্তব করিয়া নারদ বীণাযন্ত্রে স্বর মিশাইয়া এই গান ধরিলেন:—

তুমি জগদীশ্বর, অমিয় সাগর,
নিখিল ভুবন কারণং।
হরি কৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধু,
পাতকী জন তারণং ॥
অনাদি অনন্ত, পূর্ণানন্দ,
পতিত জন পাবনং।
প্রভু নিষ্কলঙ্ক, পূর্ণজ্যোতি,
ভকত জন রঞ্জনং।
অগতির গতি, তুমি বিশ্বপতি,
ঘোর ভবভয় ভঞ্জনং।
সুখমোক্ষদাতা, ত্রিজগৎ ত্রাতা,
নিত্য-প্রেম নিকেতনং ॥
জ্ঞানের আকর, অখিল ঈশ্বর,
অসহায়জন শরণং।
হৃদয়-রতন, নয়ন-অঞ্জন,
সর্ব্ব সন্তাপ নাশনং।
হরিতে ভূভার, লীল অবতার,
ধরিয়ে মূরতি মোহনং।
গোলক-বিহারী, দয়াময় হরি,
দাওহে রাতুল চরণং ॥

—:•:—



রায় দীনবন্ধুমিত্র বাহাদুর ।

রাজ-সংসারে ও এদেশের সাহিত্য-সংসারে কীর্ত্তিমান দীনবন্ধুমিত্র সর্ব্ব-জনের সুপরিচিত। ১২৩৬ বঙ্গাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তি চৌবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যৌবনসীমায় উপস্থিত হইয়া তিনি স্কুল কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বিষয়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ডাক-বিভাগে তাঁহার চাকরি হয়, সেই বিভাগেই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া জীবনের অধিকাংশকাল সেই বিভাগেই যাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঢাকা, নদীয়া ও কলিকাতা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র; কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি বিভাগীয় রাজপুরুষ-গণের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কার্য্যদক্ষতা গুণেই বহুমানে গভর্ণমেণ্ট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

বিষয়ক্ষেত্রে রাজসংসারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল; ডাকবিভাগে তাঁহার পদ হইয়াছিল, ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার। সরকারি কার্য্য পরিত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সুপার নিউমারি ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত দীনবন্ধু বাবুর বৈষয়িক কার্য্যের পরিচয়, তৎভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুরোধে সর্ব্বদাই তাঁহার বঙ্গের নানাস্থানে গতিবিধি ছিল, নীলকর সাহেবদিগের ভীষণ প্রতাপের সময়

তাঁহার লেখনী হইতে জগৎবিখ্যাত নীলদর্পন নাটকের উৎপত্তি। দর্পনে আপনাদের মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া বঙ্গের নীলকরেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ছিল, কে লিখিল, কে লিখিল বলিয়া চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়াছিল। নাটকে নাট্যকারের নাম ছিল না। বঙ্গবন্ধু রেভারেণ্ড লং সাহেব সেই অনুপম নাটকখানি ইংরাজী ভাষার অনুবাদ করেন।

নীলদর্পন নাটক রচনার পর রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর আরও অনেকগুলি নাটক প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। নবীনতপস্বিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী, সধবার একাদশী, জামাইবারিক, বিয়ে পাগল বুড়ো, যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন মাঠ, এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসের উদ্ভাবনী শক্তিতে তিনি অতুল্য।

দীনবন্ধু বাবু কবি ছিলেন। কাব্য রচনায় তিনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছাত্র। সুরধুনি কাব্য, দ্বাদশ কবিতা ও পদ্য সংগ্রহ, তাঁহার সুললিত কাব্যের নিদর্শন।

সামাজিক ব্যবহারেও দীনবন্ধু বাবু বিলক্ষণ জনরঞ্জন ছিলেন। মধুরভাষী সুরসিক সমদর্শী বন্ধুবৎসল অমায়িক ইত্যাদি বিশেষণে তাঁহাকে আমরা আমাদের চিত্তপটে চিরদিন সাজাইয়া রাখিব।

নিষ্ঠুর কাল সেই বহু সদ্‌গুণশালী বিদ্বজ্জনপ্রিয় দীনবন্ধুকে অকালে গ্রাস করিয়াছে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া দীনবন্ধু বাবু ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৫ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। গৌরবের বিষয় তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠপুত্র চারুচন্দ্র মিত্র, দ্বিতীয়পুত্র জ্যোতিশ চন্দ্র মিত্র, তৃতীয় ললিতকুমার মিত্র, পুত্রগণ সুশিক্ষিত ও প্রিয়ম্বদ। আমরা আশা করি, তাঁহারা দীর্ঘজীবি হইয়া উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে গণনীয় হইবেন।

ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে—

শোক-সঙ্গীত।*

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিরচিত।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তড়িৎ ছুটিল।
শোকবার্ত্তা সসাগরা ধরায় রটিল॥
নিবিড় আঁধার ধরা, আঁধার হৃদয় ভরা,
স্থলে জলে হাহা রব গগনে উঠিল॥
নাই নাই প্রাণে রব, নাই নাই শূন্য সব,
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই, তমসা যামিনী তাই,
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই হৃদয়ে ফুটিল।
নাই নাই কঠিন কামান প্রকটিল॥

* ৮ই মে মিনার্ভা-থিয়েটারে গীত হয়।

শ্রীবৃন্দাবন।

লেখক,—শ্রী অ, কু, এম, এ,

মধুর যমুনাকূল, মধুর বিহঙ্গকুল,
মধু মধু বহে তাহে মধু সমীরণ।
বিহগের কলনাদে, চারি দিক কেন কাঁদে,
কাহার লাগিয়া তারা করে অন্বেষণ?
শাখিশাখে শিখী কত, ভ্রমিতেছে অবিরত,
দেখি কেন তাহাদের উদাসীন মন?
এই ত যমুনাবারী, স্রোতোবেগে দিশি ভরি,
চলিতেছে অবিরত না মানি বাধন।
আলুলিত বেণীভার, বহি ঘনাবর্ত্ত তার,
ধাইছে কাহার পানে জানে কোন জন?
সব আছে এক নাই, যাহারে পাইলে ভাই,
বিশোক মনেতে থাকে সব সাধুজন॥
কোথা গেল মোর শ্যাম, যাহারে পাইলে ধাম,
শ্রীরাধিকা সযতনে হেরে অনুক্ষণ।
এইত যমুনাকূল, এই ত কদম্বমূল,
যথায় গোপনে বসি সে নীলরতন।
করেছিল বংশীরব, যাহার প্রভাবে সব,
মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল তরুলাগণ।
কি ছার ব্রজের নারী বড় বড় ব্রহ্মচারী,
মুরলীরবে ভাবে মুরলীমোহন॥
যাহার শ্রবণে মধু ঢালে বংশীরব।
সার্থক জনম তার হৃদয়ে উৎসব।
তরু নাচে পাখী নাচে নাচে কুঞ্জবন,
মধু বংশীরবে গায় মধু বৃন্দাবন॥

কুষ্ঠরোগ।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরী।

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রোগী আজকাল অনেক দেখা যায়। পাপী ভিন্ন কেহ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় না, ইহা অনেকেরই ধারণা। বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে পাপকার্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়মের অন্যায় আচরণ করিলেই কঠিন রোগের উৎপত্তি হয়। কুষ্ঠরোগ বড় ঘৃণাজনক রোগ। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা শীঘ্র শীঘ্রকরা উচিত; নতুবা ভবিষ্যতে প্রাণান্তকর হইতে পারে।

নিম্নের কয়েকটী কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

১। অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে, ২। বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিলে,
৩। আহারের অব্যবহিত পরেই পরিশ্রম বা মৈথুনক্রিয়া সম্পাদন করিলে,
৪। অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, ৫। অধিক অম্লদ্রব্য আহার করিলে,
৬। মূত্র, পুরিষ বা বমির বেগ ধারণ করিলে,
৭। অধিক রৌদ্র ও অধিক অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করিলে,
৮। অধিক রাত্রি জাগরণ ও অধিক দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে,
৯। ব্রহ্মহত্যা, গুরুদার গমন, গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে,
১০ গুরুজনের অবমাননা, অপরিমিত মৎস্য, নূতন চাউলের অন্ন, দধি, লবণ, এবং অধিক পরিশ্রমের পর বা কোনরূপ ভয় পাইবার পরে শীতল জল পান করিলে,

১১। পূর্ব্ব পুরুষের থাকিলে, এবং কুষ্ঠরোগীর সহবাসে থাকিলে, এই সকল কারণে বাতাদি দোষসকল প্রকুপিত হইয়া দেহস্থিত মাংস, শোণিত, চর্ম্ম, ও রস-ধাতু সকল দূষিত হওয়ায় কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হয়।

কুষ্ঠ অনেক প্রকার তন্মধ্যে ১১টী ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ও সাতটী মহাকুষ্ঠ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ—এককুষ্ঠ, চার্ম্মখ্য কিটিম, বৈপাদিক, অলসক, দদ্রুমণ্ডল, চর্ম্মদল, পামা, কচ্ছু, বিস্ফোটক ও সতাজ।

মহাকুষ্ঠ—কপাল, ঔডুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্য, জিহ্ব, পুণ্ডরিক, সিধ্ম, কাকণ। ইহা ভিন্ন পদে একপ্রকার কণ্ডু ও স্রাব বিশিষ্ট যে ফুস্কুরী হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে, ইহাও কুষ্ঠ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে ঃ—এককুষ্ঠের লক্ষণ—দাহ, কণ্ডু, খরস্পর্শ, বিবর্ণতা, বেদনা রুক্ষত্ব, রোমাঞ্চ প্রভৃতি।

চর্ম্মাখ্যা—যে কুষ্ঠ ঘর্ম্মশূন্য, অনেকস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত, মৎস্যের ত্বকতুল্য এবং হস্তি চর্ম্মবৎ কর্কশ, তাহাই চর্ম্মাখ্যা কুষ্ঠ।

যে কুষ্ঠের ব্রণস্থল খরস্পর্শ ও রুক্ষ, তাহার নাম কিটিম।

যে কুষ্ঠে কর ও চরণে স্ফোটক জন্মে এবং দারুণ বেদনা হয়,তাহার নাম বৈপাদিক।

যে কুষ্ঠের স্ফোটকগুলি কণ্ডু ও রাগযুক্ত তাহার নাম অলসক।

কণ্ডু ও রোগযুক্ত পীড়িকা জন্মিলেই তাহাকে দদ্রুমণ্ডল বলে।

যে কুষ্ঠ শোণিত বর্ণ, শূলযুক্ত, কণ্ডুবিশিষ্ট স্ফোটক সমন্বিত এবং যাহা বিদীর্ণ হইলেও সম্যকরূপে স্পর্শসহ, তাহাই চর্ম্মদল।

যে কুষ্ঠের পীড়িকাগুলি অতি ক্ষুদ্র, যাহাস্রাব সমন্বিত এবং কণ্ডু ও দাহযুক্ত তাহার নাম পামা। পামা কুষ্ঠ স্ফোটকযুক্ত ও অত্যন্ত দাহযুক্ত হইলে তাহাকে পানিকুষ্ঠ বলা যায়।

যে কুষ্ঠ কণ্ডুযুক্ত পাঁচড়ার ন্যায় তাহাকে কচ্ছু বলে। ইহার অপর নাম স্কীচ কুষ্ঠ

কপিশ মিশ্রিত অরুণবর্ণ স্ফোটক জন্মিলেই তাহাকে বিস্ফোটককুষ্ঠ বলে।

যে কুষ্ঠদাহ ও পীড়াসমন্বিত, লোহিতবর্ণ, কপিশ, বহুব্রণ বিশিষ্ট তাহার নাম সতারু।

মহাকুষ্ঠের মধ্যে—ত্রিদোষ জন্য কুষ্ঠ মেদ আশ্রয় করিলে উহা আরোগ্য হয় না কিন্তু যাপ্য থাকে।

ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠ মজ্জা ও অস্থি আশ্রয়পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে এবং সেই স্থলে জ্বালা বিদ্যমান থাকিলে অথবা কীট জন্মিলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। যে কুষ্ঠে কোন অঙ্গ খসিয়া যায়, কুষ্ঠস্থান ফাটিয়া পড়ে, রোগীর নেত্র শোণিতবর্ণ ও স্বর বিকৃত হয়, সেই কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়।

কুষ্ঠরোগের কয়েকটী মুষ্টিযোগ লিখিবার পূর্ব্বে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

কোন স্থানের এক ব্যক্তি অখাদ্য ভোজন ও অত্যাচার করার জন্য কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হন। ডাক্তারী, কবিরাজী অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন ফল পান নাই, ভগবদ্‌কৃপায় হঠাৎ একদিন কোন সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হওয়ায় সন্ন্যাসী নিম্নের মত ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।—

১। আতপান্ন ভক্ষণ,

২। গব্যঘৃত সহ্যমত ব্যবহার করা,

৩। মৎস্য, মাংস ভক্ষণে এককালে বিরত থাকা,

৪। সহবাস ত্যাগ

৫। মদ্য ও ধূমপান অথবা কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার না করা,

৬। ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দমন করা,

৭। ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করা।

আশ্চর্য্যের বিষয় তিন মাস এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করায় তাঁহার শরীরের কাল কাল কুষ্ঠগুলি (ধবলে তথনও পরিণত হয় নাই) অন্তর্হিত হইল। তিনি একেবারে নিরাময় হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিয়া ছিলেন।

এডুকেশন গেজেটে মহাত্মা শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ স্বামীকর্ত্তৃক নিম্নের ঔষধটী কুষ্ঠ ব্যাধির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কুষ্ঠরোগী মাত্রেরই পরীক্ষা করা উচিত।

"নিমপাতার রস ✓০ তিন ছটাক বা আধপোয়া। ৪০ দিন খাইবে। ২২।॥ সাড়ে বাইশ দিন বাদ একপোয়া। সকালে ৭।৮ টার মধ্যে উহা খাইতে হয়। জল যেন পাতায় থাকে না। চানার রুটী পথ্য। ৫।৬ সের ছোলা জলে ভিজাইয়া সেই জল মাত্র পানীয়। এ ছাড়া জগৎ সংসারের কোন কিছুই খাইতে পাইবে না। ইহাই শ্বেত বা গলিত সকলপ্রকার কুষ্ঠের ঔষধ। ৪০ দিন বাদ আধা চানা ও আধা গমের রুটী। নিমের রস ৪০ দিন পরে বন্ধ। আধপোয়া করিয়া ঘি তথন খাইবে। সকল তরকারী তথন খাইতে পার—অলবণ। ছয়মাস পর্য্যন্ত নিমক, দধি ও অম্ল বারণ; খাইলে শরীর ফাটিয়া যাইবে। অন্যান্য ব্রণ বা ফোড়াতে অল্পমাত্রায় কয়েক দিন এ নিয়মে ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া রক্ত শুদ্ধ হইবে। ৪০ দিন বাদে দুগ্ধ খাইতে পার। নিমক ছয়মাস পর্য্যন্ত খাইবে না।"

১। সজিনার ছাল ও চিতার মূল একত্র মর্দ্দন করিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে ঘা হয়। সেই ঘা আরোগ্য হইলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

২। কুঁচফল ও চিতার শিকড় এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

৩। পেদো পোকা বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ ভাল হয়।

৪। চারিতোলা সোমরাজ বীজ ও এক তোলা হরিতাল এই দুই দ্রব্য গো-মূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ ভাল হয়।

৫। চারি আনা খদির ও দুই তোলা নিমের শিকড়ের ছালের রস একত্র করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনাশ পায়।

৬। কুষ্ঠরোগীর গাত্রে প্রথমতঃ তৈল মাখাইয়া পরে করবীর ছাল গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া ঘর্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৭। পাতি লেবুর রসের সহিত হরিতাল ঘসিয়া রৌদ্রপক করিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে ছলি নামক কুষ্ঠ পরাজিত হয়।

৮। নিসিন্ধা চূর্ণ গোমূত্রের সহিত খাইলে আঠার প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

৯। আমড়ালু বীচি বাটিয়া গোমূত্রের সহিত প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য হয়

১০। হাতির ছাল ও চিতার মূল অন্তর্ধূমে পোড়াইয়া কটু তৈলের সহিত শ্বেত কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

১১। কনকচাঁপা ফুলের গাছের ছাল এক তোলা বাঁটিয়া এক পোয়া জল দিয়া গুলিয়া খাইবে। সাতদিন ভাত খাইবে না। ছোলার বেসমের রুটি খাইবে, রৌদ্রে বাহির হইবে না। প্রাতে স্নান করিয়া সমস্ত দিন ঘরের ভিতর থাকিবে। এইরূপ করিলে গলিত কুষ্ঠ ভাল হইবে।

—————:০:০:—————

কন্যাদায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বর ও ঘটক।

"ঘনশ্যামবাবুর বাড়ী থেকে একবার হ'য়ে আসি।" কালীনাথ ঘটক এই কথা বলিয়া করুণাময়ের বাটী হইতে বিদায় হইয়াছিলেন। কথাটা বাস্তবিক দম্‌বাজী; তিনি ঘনশ্যামবাবুর বাড়ীতে যান নাই, মোহিতমোহন মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মোহিতমোহন তাহার একটি নির্ব্বাচিত বর। মোহিতের পিতা নাই, মাতা মাতঙ্গিনীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কালীনাথ ঘটক মাতঙ্গিনীর কাছে, মোহিতের বিবাহের সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বে উত্থাপন করিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনী বেশী টাকার দাবি করাতে ঘটক কিছু মন মরা হন; মনমরা হন বলিয়া নিজের সঙ্কল্পটা ছাড়িয়া দেন নাই।

ঘটকদলের বুদ্ধি অতি তেজস্বিনী; এক এক জায়গায় তাঁহারা দিনকে রাত করিতে পারেন। মাতঙ্গিনীর দাবিতে হতাশ না হইয়া কালীনাথ ঘটক আর

একটা বড় বুদ্ধি খাটাইয়াছিলেন ; দম্ দিয়া ফুস্ লাইয়া মোহিতকে রাজী করাই তাঁহার মতলব ; সেই মতলব হাঁসিল করিবার উদ্দেশেই সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে মোহিতের বাড়ীতে তাঁহার আসা। বৈটকখানায় মোহিতকে বসাইয়া একে একে তিনি জাদু-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া মোহিত হইয়া মোহিতমোহন একবার জিজ্ঞাসা করিল, "যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইবে ত? সত্য সত্য করুণার মেয়েটি অপ্সরার মতন সুন্দরী হইবে ত?"

আস্ফালন করিয়া ঘটক বলিলেন, "আমার কথায় প্রত্যয় করিবার দরকার কি? তাহাদের বাড়ীতে গিয়া নিজের চক্ষে একবার দেখে এসো। রূপ দেখে তোমার তাক্ লেগে যাবে। আজ বৈকালেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে ফেল। কল্যই তোমার বিয়ে হবে, আর দিন নাই, অকাল পড়্বে। করুণাময় বসু পাকা হিন্দু, অকালে কন্যাদান কর্‌বে না। আমি কল্যই তোমার বিয়ে দিব আজ বৈকালেই তুমি মেয়ে দেখ্তে যেয়ো ; আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌ব না, একাই তুমি যেয়ো। আর দেখ যাবার সময় একটা নীলরঙের গাউন, একজোড়া ইয়ারিং আর একজোড়া ব্রেস্‌লেট কিনে নিয়ে যেয়ো। সেইগুলি তাকে পরা'লে তাকে যদি ঠিক ইহুদির মেয়ে না দেখায়, তাহা হলে খুড়ি থাক্ আমার নামে!"

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'লেখাপড়া জানে?'

ঘটক উত্তর করিলেন, "সাক্ষাৎ সরস্বতী, কোন বিদ্যা বাকি নাই। নাটক পড়ে, নভেল পড়ে, পাঁচলী পড়ে, আর নূতন নূতন কত যে কি পড়ে তার নাম পর্য্যন্ত আমি জানি না। নাটকের একটিং সে যা করে, তা যদি তুমি শোন তা হলে জন্মে আর তোমার থ্যাটার দেখ্‌বার ইচ্ছা থাক্‌বে না। গান বাজনাতেও বিলক্ষণ পাকা, পোক্ত কোকিল পাখির মতন গলার আওয়াজ। সে যখন বড়ি এঁটে বেণী ঝুলিয়ে হারমনি বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে গান ধরে, তখন বড় বড় নামজাদা বাইজীরাও ঝক্‌মেরে যায়। যেয়ো তুমি আজ বৈকালে ; ভুলোনা ভুলোনা টাকাটা কিছু কম পাবে বটে, কিন্তু মেয়ের রূপ দেখ্‌লে সে আপশোষ থাক্‌বে না, বিনা পয়সায় বিয়ে করবার সাধ হবে।"

মাতঙ্গিনী বোধ হয়, সেই ঘরের পার্শ্বে অন্দরের দিকের দরদালানের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা শুনিতে ছিলেন, শেষ কথাটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আধ ঘোমটায় নাক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া তিনি চঞ্চলচরণে বৈটক-খানায় প্রবেশ করিলেন ; ঘটকের দিকে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "কিগো ঘটক ঠাকুর! আবার বুঝি সেই পুরোণো কাশুন্দির হাঁড়ি খুলেছ? দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই মেয়েটাকে আমার বৌ করে দেওয়া তোমার একান্ত ইচ্ছা। আচ্ছা, তুমি যখন এত করে বোল্‌ছ, তখন আর আমার অমত করা ভাল হয় না, দিব আমি সেই মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে; কিন্তু ঠাকুর, পোণের টাকাটা আর কিছু বাড়ীয়ে নিয়ো, দান সজ্জাগুলি খুব ভাল জমকাল কোরে দিতে বোলো।"

ঘটক বলিলেন, "সে আশাটা তোমায় ছাড়তে হবে। যে কথা আমি বোলেছি তার উপর আর এক পয়সাও বাড়্‌বে না। দম্‌বাজী আমি ঢের জানি; তাদের কাছে তোমাকে আমি বেজায় বাড়িয়ে তুলেছি, তাতেই তারা রাজী হয়েছে। আমি বোলেছি, সহরে তোমার পাঁচসাত খানা ভাড়াটে বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, বাক্স ভরা গহনা পাঁচসুট। বুঝলে আমার কথা? যে রকম টানা-টানিতে তুমি সংসার চালাও, পয়সার অভাবে ছেলেটিকে তুমি স্কুলে দিতে পারনি, খাওয়া পরার জন্যও অনেক সময় অনেক ভাব্‌তে হয়, সব আমি জানি তবুও বলেছি, রাজরাণীর সংসার। করুণাময়কে আর তার গিন্নিকে ধাপ্পা দিয়ে জানিয়ে এসেছি, ছেলেটি এণ্ট্রেন্সে পরীক্ষা দিয়ে জলপানি নিয়েচে, কলেজে ভর্ত্তি হয়েচে, দিন কতক পরে সে একজন হাকিম হবে। এই সব কথা আমি বলেছি। বুঝ্‌লে আমার বুদ্ধির দৌড়?"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, "খুব বুঝেছি। বেশ কোরেছ। নূতন কুটুম্বুর কাছে পশার বাড়ানটা খুব ভাল। তা আচ্ছা, আর আমার অমত নাই; টাকাটা যদিও নিতান্ত কম হ'ল, কি করা যায়, তোমার খাতিরে খুব সস্তায় আমি ছেলে ছাড়্‌লুম।"

ভরসা পাইয়া ঘটক বলিলেন, 'তা তো ছাড়্‌লে বটে, কিন্তু সময় বড় কম; কল্যই ছেলের বিয়ে দিতে হবে।'

শিহরিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন, "ওমা! সে কি কথা? একদিনের মধ্যে বিয়ে? তা কি ক'রে হয়? গায়ে হলুদ হবে না, আইবুড়ভাত হবে না; পাঁচজনকে নিম-ন্ত্রণ করা হবে না, এ আবার কি রকম বিয়ে।"

ঘটক বলিলেন, 'খাসা বিয়ে। ঐ দিনটি ভিন্ন আর দিন নাই। একেত অকাল হবে, তার উপর আরও ভয় আছে। আমি জানি, আশে পাশে চারদিকে তোমার শত্রু, হিংসা কোরে কে কোন দিক থেকে ভাঙ্‌চি মারবে, অমন সুন্দরী

পরীর মতন মেয়েটি হাত্ ছাড়া হয়ে যাবে। কল্যই বিয়ে দেওয়া চাই। গায়ে হলুদ, আইবুড়ভাত, এইযে ছুটি কথা তুমি বোল্‌লে, তাও খণ্ডন কর্‌বার মজীর আমার মুটোর ভিতর। ভাল ভাল কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরের অনেক সময় তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়; যে দিন গায়ে হলুদ, সেই দিন আইবুড়ভাত, সেই রাত্রেই বিয়ে, তাতে দোষ হবে না; কল্যই বিয়ে দেওয়া চাই।”

অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন, “আচ্ছা, তবে তাই হউক। জোগাড় যন্ত্র কর, আমি চোললুম্। একটা কথা বোলে যাই; আগাম কিছু টাকা আদায় করে নিয়ে এসো, আমার অবস্থা তো জানো, খরচপাতি আছে, তোমাকে দেওয়া আছে, কোথা থেকে আস্‌বে? আগাম আমার কিছু টাকা চাই।”

ঘটক বলিলেন, “সে কথা এখন আমি বোল্‌তে পারি না। করুণাময় আজ বৈকালে পাত্র দেখ্‌তে আস্‌বে, যা বোল্‌তে হয়, তুমি নিজেই বোলো; সে মোকদ্দমায় আমায় ওকালতি কর্‌তে হবে না; নিজেই বোলো; লজ্জা কি? শাস্ত্রেই আছে,—‘আহারে ব্যবহারেচ ত্যক্ত লজ্জা সদা ভবেৎ। অর্থাৎ আহারের জন্য টাকাকড়ির কথায় লজ্জা করিতে নাই।”

হাস্য করিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন, “আচ্ছা তবে সেই কথাই ভাল। তুমি এক খানা ফর্দ্দ কর।”

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাতঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিলেন, বৈটকখানায় ঘটক একাকী।

মাতঙ্গিনী বৈটকখানায় প্রবেশ করিয়া ঘটকের সহিত বিবাহের কথা আরম্ভ করিবামাত্র লৌকিক লজ্জার খাতিরে মোহিতমোহন তথা হইতে সরিয়া গিয়াছিল, মাতার প্রস্থানের পর আবার তথায় প্রবেশ করিল; সহাস্যবদনে ঘটককে বলিল, “শত শত ধন্যবাদ তোমায়! চমৎকার ঘটকালী হয়েছে। সমস্তই ঠিক ঠাক, করুণাময়ের কন্যাকে আজ বৈকালেই আমি দেখিয়া আসিব। তোমার বর্ণনা সত্য হইলে তোমাকে উত্তমরূপে খুসী করিব।”

বদন গম্ভীর করিয়া ঘটকঠাকুর বলিলেন, “আমাকে কি কম বান্দা ঠাওরাও? বক্তিমার চোটে আমি মানুষের হাতে আকাশের চাঁদ ধরে দিতে পারি, একটা মেয়ে মানুষকে ভুলিয়ে ফেল্‌তে কত ক্ষণ?”

ফুল্লবদনে মোহিত বলিল, বেশ—বেশ! বেশ বাহাদুরী দেখিয়েছ। বুঝ্‌লেম্, তুমি একজন পাকা ঘটক; তোমার মতন ঘটক এই কলিকাতা সহরে আর একটাও আমার চক্ষে ঠেকে না।'

অল্পক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া, একপ্রকার ভঙ্গি করিয়া ধূর্ত্ত কালীনাথ ঘটক কপট ধীরস্বরে বলিলেন, "আমাকে গোটা দশেক টাকা কর্জ্জ দিতে পার? ছোট মেয়েটার ভারি অসুখ, ডাক্তার বদ্দির খরচ আমার হাতে নাই, এই বিয়ের ঘটকালী পেলে তোমার টাকা আমি আনা সুদে শোধ দিব।'

ম্লানবদনে মোহিত বলিলেন, "বড়ই লজ্জা পেলেম; আমার হাতে এখন একটি কপর্দ্দকও নাই।

নিরাশ না হইয়া ঘটক বলিলেন, "এখন তবে থাক, বৈকালে দিও। বৈকালে তোমার শ্বশুর তোমাকে দেখতে আসবে, গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ কর্‌বে, তাই থেকে আমায়——মোহিত বলিল, 'গিনি? তবে ত খুব ভাল। আচ্ছা, সেই গিনিটি আমি তোমায় দিব, তুমি আমাকে পাঁচটি টাকা ফেরৎ দিও। বুঝ্‌লে কি না? গিনির দাম এখন ১৫৲ টাকা।

দিব্য সপ্রতিভ হইয়া ঘটক বলিলেন, তা দিব বৈকি, তা দিব বৈ কি। ১০৲ টাকা আমার দরকার, ১৫৲ টাকা কেন লইব?

গাত্রোত্থান করিয়া মোহিত বলিল, "বেলাটা অনেক হলো, তবে তুমি এখন যাও, আমার এখন স্নান আহ্নিক বাকি আছে, আমি বাড়ীর ভিতর যাই, প্রণাম।

মোহিত চলিয়া গেল, ঘটক ঠাকুর উঠিয়া দাড়াইয়া আহ্লাদে আপন মনে স্বগত আলোচনা করিতে লাগিলেন; বাঃ! কি চমৎকার বুদ্ধি আমার! খানিক ক্ষণের মধ্যে এত বড় প্যাঁচাও কাজটা আমি হাঁসিল ক'রে তুল্‌লেম! লোকে বলে, লক্ষ কথার কমে বিয়ে হয় না। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আমি একাকী এক লক্ষের অধিক মিথ্যা কথা বোলে কত লোকের মন ভুলাইলাম।

মনে মনে কত প্রকার সুখের আন্দোলন করিতে করিতে দিগ্‌বিজয়ী কালীনাথ ঘটক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

——:০:——

ভ্রমর।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু এম, এ,

(২)

এই কারণে ভ্রমর এখন কাতর হইয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিল। কিন্তু এখন গোবিন্দলালের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে অপর্য্যাপ্ত প্রেম, সে চারু প্রীতি সকলই লুপ্ত হইয়াছে। তাহার হৃদয় কুলিশ-কঠিণ হইয়াছে—মমতার আর স্থান নাই। তাহার অন্তঃকরণ প্রেমশূন্য হইয়া শ্মশানের চিতার ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই চিতানলে গোবিন্দলাল ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভক্তি সকলি আহুতি প্রদান করিয়াছে। সে এখন রূপ-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত উন্মাদের ন্যায় ধাবিত হইয়াছে। তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী রোহিনীর ধ্যানে নিমগ্ন—গুণের সেবা ছাড়িয়া গোবিন্দলাল এখন রসের সেবায় ব্যস্ত—সে এখন রোহিণীর ভ্রমরের নহে; সুতরাং ভ্রমরের কাতর প্রার্থনা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। সে পাষাণাপেক্ষা কঠিন হৃদয়ে ভ্রমরের করুণ ক্রন্দন রেখাঙ্কিত করিতে পারিল না। গোবিন্দলাল বলিল, 'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব।" ভ্রমর দেখিল, সে গোবিন্দলাল আর নাই। যাহার হৃদয় পরের দুঃখ দেখিলে কাঁপিয়া উঠিত;—যাহার মন অপরের কষ্টনিবারণার্থে ছুটিত, সে পরদুঃখকাতর গোবিন্দ-লাল আর নাই; যাহার ভ্রমরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, যে ভ্রমরের সামান্য ইচ্ছা পুরোণে ব্যাগ্র হইত, সে পত্নীপ্রেমিক গোবিন্দলাল আর নাই; তাহার প্রিয়তমা ভার্য্যা, তাহার স্নেহের ভ্রমর আজ পদতলে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, কাতরকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, গোবিন্দলাল নির্ম্মম নিষ্ঠু-রের ন্যায় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! হায়! সে গোবিন্দলাল আর কি আছে? অমল ধবল তুষারের ন্যায় যাহার নির্ম্মল চরিত্র, পূতঃ ঋষিদিগের ন্যায় যাহার পবিত্র চিত্র ও সে শুদ্ধ পবিত্রচেতা গোবিন্দলাল আর কি আছে? ভ্রমর দেখিল, গোবিন্দলাল এখন অপবিত্র, কলঙ্কিত, বেশ্যাসক্ত। ভ্রমরের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল, অভিমানের পুনঃ সঞ্চার হইল, হৃদয়ে অহঙ্কার জাগ্রত হইল। সে গোবিন্দ-লালের পদত্যাগ করিয়া উঠিল, ভ্রমরের কিসের এ অহঙ্কার? তাহার কিসের গর্ব্ব পতি ভক্তিই তাহার একমাত্র গর্ব্বের কারণ। সতীর অন্য কি কোন গর্ব্ব থাকিতে পারে? ভ্রমর যে পতির প্রতি কর্ত্তব্যে কখনও কোন ত্রুটি করে নাই, প্রকৃত সাধ্বীর ন্যায় সতত তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে, প্রাণের সহিত তাহার স্বামীকে ভালবাসিয়াছে—ইহাই তাহার গর্ব্ব। ভ্রমর যে গোবিন্দলালের শিক্ষায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়া একান্ত ধর্ম্মানুরাগিনী হইয়াছিল, ইহাই তাহার

অহঙ্কার। পতি ভিন্ন সে আর কিছুই জানিত না। বাল্যকাল হইতেই এ অহ-ঙ্কার তাহার হৃদয়ে বিরাজিত ছিল; ক্রমে ক্রমে ইহা পুষ্ট হয়। ভ্রমর যখন কালো বলিয়া আপনাকে গোবিন্দলালের অযোগ্যা ভাবিত, তখন এই অহঙ্কার তাহার অন্তঃকরণে সান্ত্বনা প্রদান করিত। অধুনা এ অহঙ্কার অতিশয় বর্দ্ধিত হয়।

পাঠক! যথার্থই কি ভ্রমর অপরাধিনী? ভ্রমরের অপরাধ—সে গোবিন্দ-লালের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমান করিয়া, অসময়ে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যেখানে স্নেহ, সেখানেই ত অবিশ্বাস; জননী পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকেন, পুত্রের বিপদ সদাই আশঙ্কা করেন, তুচ্ছ ঘটনাকেও বিশ্বাস করেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে আন্তরিক ভালবাসিত বলিয়াই সে স্বামীর উপর অভিমান করিয়াছিল, পতির অকলঙ্ক চরিত্রোপরি দোষার্পিত হইয়াছে, দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার অপর কোন অপরাধ ছিল না। স্বামীর গর্ব্বেই সে গরবিনী, স্বামীর বিশ্বাসই সে বিশ্বাসবতী। সেই গর্ব্বে সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগিয়া ছিল বলিয়া, ভ্রমর ঐরূপ কাতর হইয়াছিল।

ভ্রমরের অদৃষ্টাকাশে মেঘ ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাহার শ্বাশুড়ী কাশী চলিলেন। গোবিন্দলাল তাহাকে রাখিতে চলিলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।" গোবিন্দলাল বলিলেন, 'বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই!"

তৎপরে শেষ বিদায়। স্থিরীকৃত যাত্রার শুভলগ্ন আসিয়া পড়িল। গোবিন্দ-লাল ভ্রমরের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন, বলিলেন 'ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।' ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, 'মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?'

এ কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়া-ছিল, তাহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন; হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, 'দেখ, তুমি আমাকে শিখাইয়াছ সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম; সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিতা বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?

গোবিন্দলাল বলিলেন 'তবে সত্য শোন, ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্র। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর আমার প্রবাস হইতে আমার প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিবে, তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকিবে না।

ভ্র। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি, এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা, তোমার দাসানুদাসী, তোমার কথার ভিখারিণী, আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চোখের জল রোধ করিল। হুকুমে চখের জল ফিরিল, ভ্রমর জোড় হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'তবে যাও— আর আসিও না। বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর—কিন্তু মনে রাখিও দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও, একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কায়মনবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে, আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও, দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, আর ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই, রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া, গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।'

শেষ বিদায়ের সময়ে ভ্রমর পদ-বিলুণ্ঠিত হইয়া গোবিন্দলালের নিকট পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত কাতর অনুনয় করিল, কিন্তু

স্থিরপ্রতিজ্ঞ গোবিন্দলালের মন কিছুতেই বিচলিত হইল না; তাহার সংকল্প হেলিল না। ভ্রমর ধার্ম্মিকপ্রবর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ধর্ম্ম নাই কি?' গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, বুঝি আমার তাহাও নাই। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিল। হায়! কতদূর অধঃপতন—নিরপরাধিনী পত্নীকে তাহার সহৃদয় পতি বিনাঅপরাধে অম্লানবদনে অক্লেশে ত্যাগ করিতেছে! ভ্রমর কাঁপিতেছিল, তাহার হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল। গোবিন্দলালের নিষ্ঠুর কঠোর উত্তর ভ্রমরের ধর্ম্মভাবে আঘাত করিল। তাহার প্রাণের প্রবল ঘৃণা প্রবলতর হইয়া উঠিল, হৃদয়ে অপ্রতিহত তেজের উদ্রেক হইল। অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠের নিকট ভ্রমর কি তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে? কখনই না; সেইজন্য অসহ্য যন্ত্রণা স্বত্বেও ভ্রমর চক্ষের জল রুদ্ধ করিল, অমিত বলে সে চক্ষের জল ফিরাইল। তাহার নয়নবারি শুকাইল। স্বর স্পষ্ট হইল, ভাষা গম্ভীর হইল। ভ্রমর দেশ-কালপাত্র ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া গেল, যে সে গুরু শিক্ষকের নিকট কথা কহিতেছে—ভুলিয়া গেল সে প্রিয়তম পতিকে শেষ বিদায় দিতেছে। তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন পাপীকে ভৎসনা করিতেছে, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় ঘোষণা করিতেছে। তাই সে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিল, "তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই, হায়! পাঠক, ভ্রমরের হৃদয়ে কি ভীষণ অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা আমার এ অক্ষম লেখনী কি জানাইবে? স্বামীর শিক্ষাতেই শিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, সত্যবাদিনী, পতির গর্ব্বেই সে গরবিনী, পতির সোহাগেই সে সোহাগিনী—স্বামীকে বিদায় দিতে সে যে মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিয়াছিল, তাহা সতী ভিন্ন আর কেহ অনুভব করিতে পারে না। পতির বিরহে সে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, অবশেষে কঠিন ব্যাধিদ্বারা সে আক্রান্ত হইল, এবং তৈলাভাবে প্রদীপের ন্যায় কান্তাভাবে তাহার জীবন-দীপ অনতিবিলম্বেই নির্ব্বাপিত হইল। পাঠক! বুঝিলে, ভ্রমরের কি দুঃখ, কি মর্ম্মস্পর্শী বেদনা। তবে ভ্রমর কিরূপে বলিল, "আমার দুঃখ নাই।" তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন স্বামীই শিখাইয়াছিলেন, ধর্ম্ম পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই নিমিত্তই আজ ভ্রমর ধর্ম্মের নিকট স্বামীকে বিসর্জ্জন করিল, সত্যের নিকট স্নেহ আহুতি দান করিল, তাহার সমুদ্র-তুল্য অতুল্য প্রেম শমিত করিল। কিন্তু প্রেমেই তাহার জীবন গঠিত, পতিই তাহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল; সুতরাং প্রেম প্রীতি প্রভৃতি স্বর্গীয় সদ্ভাব বিসর্জ্জনই ভ্রমরের আত্মবিসর্জ্জন, ভ্রমর ধর্ম্মের নিকট

সত্যের নিকট তাহার জীবন উৎসর্গ করিল এবং দীর্ঘযন্ত্রণার পর দেবতার আশীর্ব্বাদে ভ্রমর পতিপদ স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

গোবিন্দলালের গমনের পর ভ্রমরের ধর্ম্মভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। স্বামীর অদর্শনে সে ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়াছিল। অধুনা তাহার ধর্ম্মই একমাত্র সহায়, ধর্ম্মই একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু হায়! তাহার ধর্ম্মভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাপে ঘৃণাও বর্দ্ধিত হইতেছিল। ভ্রমর পাপকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাই গোবিন্দলালের অধঃপতনের পর, তাহার এরূপ দারুণ অভিমান, বিষম ক্রোধ। তথাপি অদ্যবধি ভ্রমরের স্নেহের কোন লাঘব হয় নাই। সে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সমীপে গোবিন্দলালের মঙ্গল কামনা করিত।

রোহিণীর হত্যার পর ভ্রমরের আরও চিত্তবিকার হইল। স্বামীর প্রতি তাহার অল্প যে ভক্তি ছিল, তাহাও লুপ্ত হইল। গোবিন্দলাল এক্ষণে নরঘাতক, নরঘাতককে সে কিরূপে ভক্তি করিবে? গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল। পাঠক! ভ্রমর ও যামিনীর কথোপকথন একবার পাঠ কর।

ভ্র। কিন্তু আমার বিপদের দিনে তোমরা দেখা দিও।

যা। কি বিপদ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'যদি তিনি আসেন।'

যা সে আবার বিপদ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে তার চেয়ে আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি? আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে?

ভ্রমর আর কথা কহিল না। * * * ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন যামিনী কিছুই বুঝিল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

ক্রমশঃ

অন্ধ-রমণী।

লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল।

কুসুম-সুবাসে মন হয় পুলকিত,
বীণার ঝঙ্কারে চিত হয় প্রফুল্লিত।
কিন্তু তার পরশনে,　　কি সুখ উপজে মনে,
ফুল-বাস বীণা ধ্বনি, তাহাতে জড়িত।

যখন মধুর বাণী বর্ষে প্রাণেশ্বর,
লক্ষ বীণা-স্বরে পুরে শ্রবণ কুহর।
কামিনী গোলাপ যুথী, মল্লিকা সেফালী জাঁতি,
অযুত কুসুম ফুটে হিয়ার ভিতর!

যখন প্রাণেশ দেন অধরে অধর,
সুখেতে গলিয়া যায় অন্তর অন্তর।
হৃদয় কানন ময়, মলয় সমীর বয়,
অসংখ্য পাপিয়া পিক গায় নিরন্তর।

বঞ্চিত দর্শন-সুখে আমি অভাগিনী,
সে মধুর রূপ শুধু চিত্তে অনুমানি।
কোকিল-কূজত লয়ে, পদ্ম গন্ধে মিশাইয়ে,
বিধি নিরমিল তারে, সর্ব্বসুখ খনি।

কহে সবে, সূর্য্যদেব উদিয়া গগনে,
ধরণী উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে।
বুঝি তারে উষ্ণতায়, কিন্তু নাহি বুঝি হায়,
তার সমাগমে দিবা উদয় কেমনে।

মম প্রাণেশ্বর যবে নিকটেতে রন,
প্রেমের আলোকে চিত্ত হয় বিনোদন।
সুখ উৎস উৎসারিত, হয় হৃদে অবিরত,
দিনমান দীপ্তমান, পরাণে তখন।

কহে সবে সূর্য্য-দেবে, হেরি নভস্থলে,
প্রেমানন্দে প্রমোদিনী, কমলিনী জলে,
নেহারি সখার মুখ, অন্তরেতে পায় সুখ,
চেয়ে থাকে অনিমেষে, পলক না ফেলে।

উদয় আমার যবে প্রাণেশ তপন,
সাদরে আমার করে কর পরশন।
যেন কোটি রবি-করে, চির আলোকিত করে,
আমার আঁধার ময়, হৃদয়-কানন।

প্রেম-পিকে হৃদিকুঞ্জে ডাকে অনুক্ষণ,
দিবারাতি বহে তাহে প্রেম-সমীরণ।
সুখের কুসুম ফুটে, সকল বিবাদ টুটে,
সতত উজলে হৃদে, প্রেমের কিরণ।

—— :•: ——

ভূতবিজ্ঞান।

২

লেখক,—ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিএ, এল, এম,এস,

মার্কণ্ডেয় পুরাণ যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, নির্ঋতির বংশজাত নৈর্ঋতেয় এবং নৈর্ঋতেয়াগণ সকলেই যে বহদ্বপু "Demons" তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে লীক যেমন ক্ষুদ্রকায় তেমনি শস্যহা ক্ষুদ্রক প্রভৃতি শস্যঋদ্ধি বিনাশকারী ভূত সকল অতি ক্ষুদ্র। ভূত বলিতে যে তালপ্রাংশু মহাভুজ অলৌকিক পদার্থই বুঝাইবে, এমন কোন স্থিরতা নাই। মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহা হইতে মাংস, অসৃক্, বসা ক্ষতের রস শুক্র শোণিত প্রভৃতি আহার করিয়া জীবনধারণ করে, এমন অদৃশ্য প্রাণী সকল যে কেশাগ্রের শত ভাগের মত ক্ষুদ্র, Micro organisin নহে, তাহা কে বলিতে পারে? জীবাণুই হউক আর উদ্ভিজ্জাণু হউক, এই পর্য্যন্ত স্থির নিশ্চয় যে তাহারা প্রাণী, আর ইহাও নিশ্চয় যে, তাহারা পরভূত Parasites। পাশ্চত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যেন স্থির করিয়াছেন, টুবার কিউলসিস্ টাইফয়েড জ্বর এন্‌থ্রাকস্, বিসর্প, হাম, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ এই পরাঙ্গপুষ্ট অতি সূক্ষ্ম প্রাণিদিগের আবেশ হইতে সমুৎপন্ন, তেমনি এ দেশের প্রাচীন ঋষিগণও নিশ্চয় করিয়াছিলেন, যে বিসর্প, বিস্ফোটক ব্রণ, হাম, মসূরিকা, বসন্ত, বিষ জ্বর ভূতাভিষঙ্গে সমুৎপন্ন হয়, আর এই সকল অদ্ভুত প্রাণী, জীবাণু এবং উদ্ভিজ্জাণু Animal parasites এবং Vegetable parasites এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। অর্থাৎ ইহার একদিকে লীক, অন্যদিকে শস্যহা ও ক্ষুদ্রক, শুক্র শোণিত ক্ষতের রস, বিসর্প, বিস্ফেটক, হাম ও বসন্ত, ব্রণে ও বিষমজ্বরে উৎপাদকরূপে যাহারা মানুষের দেহে অদৃশ্যভাবে আবিষ্ট হয়, তাহারা জীব হইলেও চেতন,

উদ্ভিদ হইলেও চেতন। ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতগণ জীবজগৎকে যে চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন, উদ্ভিদ-জগৎকেও সেই চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উভয়ই প্রাণী, উভয়েই ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। চক্রদত্ত তাঁহার চরকসংহিতার টীকায় এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, তিনি দেখাইয়াছেন; শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ. তন্ত্র, কাব্য, সর্ব্বত্রই এই কথা, সর্ব্বত্রই বৃক্ষাদির চেতনত্ব, কল্পিত হইয়াছে। যথা :—

অত্র সেন্দ্রিয়ত্বেন বৃক্ষাদীনামপি
চেতনত্বং বোদ্ধব্যং তথাহি
সূর্য্যভক্তায়া যথা যথা সূর্য্যো ভ্রমতি
তথা তথা ভ্রমণাৎ দৃগ্ নুমীয়তে;
তথা লবলী মেঘ স্তনিত শ্রবণাৎ
ফলবতীস্যাৎ, বীজপূরকমপি
শৃগালাদি বসাগন্ধেনা তীব
ফলবদ্ভবতি, বৃতানাস্ত মৎস্য
বসাসেকাৎ ফলাঢ্যতয়া
বসনমুনুসীয়তে অশোকস্য
চ কামিনী পাদতলাহতি সুখিনঃ
স্তবকি তস্য স্পর্শানুমানং।
স্মৃতিশ্চানুমানং দৃঢ়য়তি যথা
অভিবাদিতস্ত যো বিপ্রো
মাশিষং সপ্রযচ্ছস্থতি।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষো
গৃধ্র কঙ্কোপসেবিতঃ।
তথা বৃক্ষ গুল্ম বহুবিধঃ।
তত্রৈব তৃণজাতয়ঃ
তস্মাৎ ধর্ম্ম রূপেন
শব্দিতা কর্ম্মহেতুনা
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে
সুখদুঃখসমন্বিতা।

এতদাস্তশ্চগতেয়া
ব্রহ্মাদ্যৈঃ সমদারৃতা ॥
তথা তন্ত্রাকারশ্চ বানস্পত্যান্
মূকান্ প্রাণিনো বক্ষ্যতি।
তেনাগম সম্বনিতয়া যুক্ত্যা

চেতনা বৃক্ষাঃ।

পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাই, এখনও বলিতেছি যে, যেমন লীক (Vermin) সকল নৈঋতেয়া, তেমনি যব, গোধূম প্রভৃতি শস্যের সমৃদ্ধি বিনাশক শস্যহা ও ক্ষুদ্রক প্রভৃতি Bunt fngus এবং মানুষের শুক্র শোণিত ও ব্রণ বিসর্প বিস্ফোটকে অবস্থিত Bacills সকল ও নৈঋতেয়া; উভয়েই চেতন,উভয়েই ইন্দ্রিয় সম্পন্ন; উভয়েই প্রাণি—কিন্তু বৃহদ্বপু নহে—ক্ষুদ্র—microscopics micro organis.।

প্রাণি হইলেও উর্দ্ধস্রোত দেবতা; তির্য্যকস্রোত পশু, পক্ষী, অর্ব্বাকস্রোত মনুষ্য হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি ছাড়া এই তামস সৃষ্টি। এই পরাঙ্গপুষ্ট জিঘাংসু নিশাবিহারী fungus এবং bacteria or bacillns শ্রেণীর নৈঋতেয়গণের পার্থক্য এই যে, ইহারা ধর্ম্ম হইতে অপবৃত্ত এবং মনুষ্য সৃষ্টির অনেক পরে জগতে উদ্ভূত হইয়াছে, আর ইহাদের বৃত্তি অন্যান্ত প্রাণীদিগের বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণের—হিংসাই ইহাদের বৃত্তি আর ইহারা পরভূত ঘৃণিত parasits তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

ধর্ম্মাদপ বৃত্তিষু বৃত্তিস্তেষাং গণৈকৃতাঃ।

হিংসাই ইহাদের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে; পরদেহ আশ্রয় করিয়া ইহারা তাহা হইতে রক্ত, মাংস, বসা, শুক্র শোণিত ব্রণের ক্লেদ, শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে ইহাও সত্য, কিন্তু তাহাদের সহিত একটা Condition একটা সর্ত্ত এই হইয়াছে যে তাহারা মানুষে আবিষ্ট হইতে তখনই সমর্থ হইবে। যদি মানুষ অশুচি (Unclean) হয়, ক্ষত থাকে ভালই অক্ষত শরীরেও তাহাদের আশ্রয়ের স্থান হইবে—যদি তাহা অশুচি হয়। তাই সুশ্রুত কহিয়াছেন।

অশুচিং ভিন্ন মর্য্যাদং
ক্ষতং বা যদি ক্ষতং

বিধাতার এই নিয়ম, ইহার ফলে এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই Vegetable এবং animal parasites সকলের এই নৈঋর্তেয়গণের অশুচি শরীরই একমাত্র আশ্রয়স্থান।

অশুচি শরীরেই নৈঋর্তেয়াগণ আবিষ্ট হয় এবং তাহা হইতে আপনার ভক্ষ্য, পেয় সংগ্রহ করে। এই জটিল তত্ত্বের ভূতবিদ্যার এই পিণ্ডার্থের ইংরাজিতে সাদাসিদে কথা এই যে, ইহার parasites আমাদের জটিল সংস্কৃত ভাষায় বিশেষতঃ প্রাচীন ঋষিদিগের সংস্কৃতে 'আবেশ', 'অশুচি', 'নৈঋর্তেয়া' 'ভূতগণ' 'নিশাবিহারী' স্বভমা।

হিংসাবিহারিণি হি মহাবীর্য্যাণি
রক্ষাংসি পশুপতি কুবের কুমারানুচরাণি
মাংস শোণিত প্রিয়ত্বাৎ ক্ষতজনিমিত্তং
ব্রাণনং উপসর্পন্তি, সৎকারার্থং
জিঘাংসুনি বা কদাচিৎ"
'নিশাচরেভ্যো রক্ষ্যস্তু
নিত্যমেব ক্ষতাতুরা" প্রভৃতি ভূতবিদ্যা সম্বন্ধীয় যে সকল প্রসঙ্গ এবং উপদেশ আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। সুশ্রুতোক্ত অল্প বিজ্ঞান অপণ্ডিত দেহ চিন্তক ভূতবিদ্যা বিষয়াদপোহ্যা প্রভৃতি কটূক্তি সুকঠিনতারই পরিচায়ক—বুঝাইলেও লোক তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, তাই অতি দুঃখে সুশ্রুতের এই সব গালাগালি। এখনও যেমন তখনও তেমন। চিরদিনই লোক ভূতবিদ্যা যে কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ভূত বলিতে তালগাছের মত দীর্ঘাকৃতি, কোটরগত চক্ষু, অনুনাসিক কণ্ঠস্বর, Demons বা দৈত্যের কথা যে সহজে লোকের মনে আসে, ইহা কিন্তু ঠিক, লোকের বুদ্ধির দোষ নহে; ভাষার দোষেই Bacteria বা Bacillus এর স্থানেও লোক demon বুঝিয়াছে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া অপণ্ডিত, অল্প বিজ্ঞানদেহ চিন্তকগণ—ভূতবিদ্যায় যে জগা খিচুড়ি পাকাইয়াছেন। তাহাতে তাহাদের অপরাধ তত নাই, যত অপরাধ তাঁহাদের যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, অথচ, গ্রন্থসংগ্রহ করিয়াগিয়াছেন! আয়ুর্ব্বেদের জটিল কথা ত অনেকবার শুনিয়াছেন, আর শুনুন, একজন প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিদের কথা একই বিষয় একই ভাব একি কথা; কিন্তু ভাষা কেমন সহজ! কেমন সরল! কেমন নিশংসয়! ডাক্তার হ্যামিল্টন বলিতেছেন :—

(I) The living organism is a rich storehouse of the very materials from which parasites, both animal and vegetable can best derive their nourishment. Some means is necessary, therefore, to protect the one from the encroachments of the other. A plant or animal in perfect health is more resistant to parasitical invasion than one which is illnourished and weekly. Of a number of plant growing side by side, those which become infected with moulds are the most weakly, and an animal in low health is more subject to contagious disease than one which is robust. Each organism possesses within itself the means of protection against enemies : and these properties are more in evidence when the organism is in perfect health than when it is debilitated.

অর্থাৎ জীবদেহের উপাদান সকল এই পরভূত প্রাণিদিগের প্রিয়তম খাদ্য ; স্নুতরাং এই ভূৎসকলের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, অপুষ্ট দুর্ব্বল প্রাণী যাহারা, তাহারা ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে একবারে অসমর্থ। একস্থান হইতে সংগৃহীত কতকগুলি উদ্ভিদ লইয়া যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ইহাদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল এবং অসুস্থ তাহাদের দেহে, এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও যেমন জীব সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ! সুস্থ দেহে সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই বলিলেই হয় ; আর ক্ষীণ জীর্ণ দেহের উপর ইহাদিগের যত প্রকোপ। এই হিংসাপরায়ণ ভূতসকল যাহাতে জীব শরীরকে বিদ্ধস্ত করিতে না পারে, তাহার উপায় জীবের স্বীয় দেহেই বিদ্যমান আছে। (১)

(2) One chief means employed by Nature in accomplishing this object is the investment of those part of the organism liable to be attacked with an armour-like covering of epidermis, periderm, bark &c. The grape is proof against the inroads of the yeast-plant so long as the husk is intact, but on the

husk being injured the yeast-plant finds its way into the interior and fets up vinous fermentation of its sugar. The root of the French vinit is attacked by the Phylloxera, but that of the American vine, whose epidermie is thecker is protected from it. The larch remains free from parasitism so long as its covering is intact, but as soo as this is punctured by insects or its coutinuity interfered with by cracks or fissures, the Pazrza penetrates, and before lon brings about the destruction of the branch. So long as the ePidermis of auimals remains sound, discase germs many come in contact with it almost with impunity, but immediately on its being fissured, or a larger wound made through it, the underlying parts, the blood and soft tissues, are attacked by them.

"স্বভাব যে উপায়ে এই আত্মরক্ষা সম্পন্ন করিবার সহায়তা করেন তাহা এই। স্বভাব ত্বকের সৃষ্টি করিয়া সেই আবরণে জীব ও উদ্ভিদ দেহ এমন করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন, যে ইহা বর্ম্মের মত আততায়ীর আক্রমণ বিফল করিতে সক্ষম হয়! দৃষ্টান্ত আঙ্গুর ফলে; আঙ্গুরের খোসা যতদিন অক্ষত থাকে, ততদিন ইহাতে ছাতা ধরে না, এবং ইহা পচিয়াও যায় না। কিন্তু যেই ইহার অঙ্গে ক্ষত উৎপন্ন হয়, অমনি দেখিতে দেখিতে ইহা পচিয়া যায়। যেমন আঙ্গুর ফল, তেমনি মানবদেহ। মানবদেহের যতদিন চর্ম্ম অক্ষত রহে, ততদিন রোগোৎপত্তিকর এই ভূতসকল তাহার সহিত সংযুক্ত হইলেও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু কোন কারণে যদি চর্ম্ম ক্ষত বা বিঘৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই অসৃক মাংসলোলুপ সূক্ষ্ম ভূতসকল দলে দলে সেই ছিদ্র দিয়া জীবের রক্ত এবং কোমল মাংসের প্রতি ধাবমান্ হয়।" (২)

(3) Of all external aguenst acting for evil however probably vegetable and animal micro-organism with a pathological bent are most to be feared. When we consider that tuberculosis, diphtheria, chleara tetanus, typhoid fever, anthrax,

malaria, and a hest of other contgious deseases have each been proved to be of parasitiesl origin, an idea may bo conveyed of the rauge of the subject. The living organism may be regarded as constantly engaged in a warfare with these silent and apperently insignificant messengers of destruction and death, with result that too often the battle ends in favour of the attacking enemy.

ডাক্তার হ্যামিলটন্ লিখিয়াছেন, অনিষ্টকর বাহ্যিক কারণের মধ্যে হিংসাপরায়ণ উদ্ভিদ এবং জীবজাতীয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিমানচারী ভূতসকলকে আমাদের বেশী ভয়। যক্ষ্মা, ক্ষয়, ডিপথিরিয়া, কলেরা ধনুষ্টঙ্কার, টাইফয়েড জ্বর অ্যানথ্রাক্স, ম্যালেরিয়া এবং এইরূপ সংক্রামক বহুবিধ রোগের নিদানই পরদেহপুষ্ট অদৃশ্য ভূতসকল, এই কথা যখন আমাদের স্মৃতি পথারূঢ় হয়, তখন ভূতবিত্তার প্রসারতা কতদূর আমাদের ধারণায় আসে। সজীব প্রাণাধার পদার্থ সকলকে এই তুচ্ছ নিশব্দে ভ্রাম্যমান মৃত্যুর কিঙ্করগণের সহিত অহরহঃ সংগ্রামেনিযুক্ত থাকিতে হইতেছে, কিন্তু দুঃখ এই সংগ্রামে জীবের ভাগ্যে অধিকাংশ স্থলেই পরাজয় ভিন্ন জয়ের আশা করা যায় না।

অস্থিক বসা, মাংস ভক্ষণ করিতে লোলুপ হইয়া অধিকাংশ স্থলেই যাহারা আপনাদের হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইতেছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র গ্রাহ্য এই সকল প্রাণী যে আমাদিগকে ঋষিদিগের ধ্যাননেত্রে ভূতগ্রহরূপে সম্ভবতঃ একদিন প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, সুশ্রুত সংহিতাধৃত পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির সহিত ডাক্তার হ্যামিলটন্ সাহেবের এই অমূল্য উপদেশগুলির তুলনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না

ক্রমশঃ

রাজা সপ্তমএড্ওয়ার্ড।

ধূমকেতুর উদয়ে সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর একটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্রপাত হইয়া গেল! গ্রেটবৃটেন এবং আয়রলণ্ড সংযুক্তরাজ্যের প্রজারঞ্জন রাজা এবং ভারতবর্ষের মহিমান্বিত সম্রাট মহামান্য সপ্তমএডওয়ার্ড গত ২৩ শে বৈশাখ (৬ই মে) শুক্রবার রজনীতে অকস্মাৎ মর্ত্তধাম পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন! তাঁহার বিয়োগে সমগ্র পৃথিবী মহাশোকে সন্তপ্ত হইয়াছে। শনিবার প্রাতঃকালে এই নিদারুণ শোকসংবাদ বিদ্যুৎবার্ত্তাবহযোগে ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়; বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, পঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, বারানসী, প্রয়াগ, আগ্রা ও সিমলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে দুর্জ্জয় শোকপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল; দেশের সমস্ত বিচারালয়, সমস্ত কার্য্যালয় ও সমস্ত বাণিজ্যালয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; সরকারী কর্ম্মচারী দেশের সম্ভ্রান্ত লোকসমূহ এবং ভারতের রাজভক্ত যাবতীয় প্রজাপুঞ্জ এই শোকাঘাতে যেন বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ মৃত্যু! অভাবনীয় মৃত্যু! সমুদ্রপারে সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পৌঁছে নাই, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। কি পীড়া, তিন দিন পূর্ব্বে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই, আসন্নকালে বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অবধারণ করিয়াছিলেন, শৈত্যপ্রভাবে গলনালিক্ষত, তাহাতেই প্রাণান্ত!

সৌদামিনী প্রমুখাৎ শোকবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া ভারতের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রাম নগরাদিতে অবিলম্বে শোকসভা আহূত হইয়াছিল, সর্ব্ব স্থান হইতেই আন্তরিক সহানুভূতিসূচক সান্ত্বনা পত্র বিলাতে বিধবারাজ্ঞী ও রাজপরিবারের নিকটে প্রেরণার্থ সিমলা পর্ব্বতে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের দরবারে স্তূপাকারে প্রেরিত হইয়াছিল, কয়েক দিবস বর্ষাধারার ন্যায় ভারতবাসীর শোকাশ্রুধারা সর্ব্বত্রই পরিবর্ষিত হইয়াছিল। দয়াময় প্রজারঞ্জন নরপতির অকস্মাৎ মৃত্যুতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজা আকুলহৃদয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। প্রজারঞ্জনে ও প্রজার মঙ্গলসাধনে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের এতদূর অসামান্য অনুরাগ ছিল যে, শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেই অনুরাগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বধু, বৃহস্পতি, শুক্র এই তিন দিন রাজচিকিৎসক মহাশয়েরা বাঙ্গার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এবং লর্ড চ্যান্সেলার ... রাজকার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য নির্ব্বন্ধসহকারে বারম্বার

পরলোকগত সম্রাটের মহিষী।



মহারাণী আলেকজান্দ্রা।

ইনি পরোলোকগত ভারত-সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মহিষী ও বর্ত্তমান সম্রাটের মাতা। ইনি ৬৬ ছেষট্টি বৎসর বয়সে বিধবা হইলেন।

অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে এই উত্তর দিয়া ছিলেন যে, "না না, তাহা হইবে না, তাহা আমি পারিব না, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি কার্য্য করিব।"

বাস্তবিক তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। বুধ বৃহস্পতি দুই দিবস স্বয়ং উঠিয়া বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দেওয়ালের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া, উপাধান অবলম্বনে উপবেশন করিয়া, রাজাস ক্রান্ত কাগজপত্র দর্শন করিয়াছেন, দলিল পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, অমাত্যবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, যন্ত্রণায় কষ্টবোধ হইলেও অবসন্ন হন নাই; শুক্রবার দিবাভাগেও পরিবারবর্গের সহিত কথা কহিতে তিনি বিরত ছিলেন না; উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন নাই, শায়িত অবস্থাতেই যথা বক্তব্য আধ আধ ক্ষীণস্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর অচেতন হইয়া পড়েন, আর চৈতন্যলাভ হয় নাই; রাত্রিকালে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের নবম দিবসে (জনক-জননীর বিবাহের দ্বিতীয় বৎসর) প্রিন্স এডওয়ার্ড আলবার্ট জন্মগ্রহণ করেন, ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি প্রিন্স অব্ ওয়েলেস ছিলেন, দয়াবতী পুণ্যময়ী রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণের পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব্ ওয়েলেস্ সপ্তম এডওয়ার্ড উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, অপূর্ণ নয়বৎসর অতুলগৌরবে রাজত্ব করিয়া, পুত্রহস্তে রাজ্যসমর্পণপূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পার্থিব লীলা শেষ হইয়াছে, জগদীশপ্রসাদে পরলোকে তাঁহার নির্ম্মল আত্মা সুখস্বচ্ছন্দে বিশ্রামলাভ করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস্ এডওয়ার্ড আলবার্ট ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তদানীন্তন ষ্টেটসেক্রেটারী লর্ডসালিসবরি রাজকুমারের ভারত ভ্রমণের প্রধান উৎসাহদাতা, ভারতবর্ষের তাৎকালীক গবর্ণরজেনারেল লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর তংবিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজকুমারের ভারত ভ্রমণে লর্ড নর্থব্রুকের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ভারতের সমৃদ্ধি প্রাচীন প্রাচীন নগরের স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং প্রাচীন স্থাপত্য কার্য্যের বৈচিত্র্য দর্শন ও প্রবান প্রধান ভারতবাসীর সহিত সদালাপ করিয়া প্রিন্স অব ওয়েলস্ পরম সন্তোষলাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহার আগমনে সাতমাস

কাল আর্য্যভারতভূমি উৎসবময় হইয়াছিল, ভারতের সাধারণ প্রজাবর্গের অবস্থা দর্শনে ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, ভারতবাসীর সহিত সহানুভূতি আসিয়াছিল, সেই সূত্র হইতেই রাজ্যাভিষেকের পর ভারতের প্রতি তিনি সমধিক স্নেহ, মমতা, দেখাইয়াছিলেন।

নবরাজ পঞ্চম জর্জ্জ।

সর্ব্বজন রঞ্জন ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড এখন পরলোকে; বিধি বিড়ম্বনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এলবার্ট ভিক্টর ইত্যগ্রে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স জর্জ্জ ফ্রেডারিক আরনেষ্ট আলবার্ট এক্ষণে পঞ্চম জর্জ্জ উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার জননী পতিব্রতা রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা পতিশোকে কাতরা হইলেও পুত্রের রাজমুকুট ধারণে কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণে সমর্থ হইয়াছেন, ভারতের প্রজারা একবাক্যে নিত্য নিত্য তাঁহার নিকটে সান্ত্বনাপত্র প্রেরণ করিতেছেন, ইহাও তাঁহার প্রবোধের একটি প্রধান হেতু।

নবরাজ পঞ্চম জর্জ্জ পিতৃ দৃষ্টান্তে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে ভারতবাসীগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। ভারতের অবস্থা জ্ঞানে তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন, এখান হইতে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া তথাকার গিল্ডহল নামক সভামন্দিরে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন. তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে, তিনি একান্তমনে ভারতের মঙ্গলাভিলাষী। সিংহাসনে উপবেশনের সময় সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচারের অগ্রে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতেও প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি পিতৃপন্থার অনুসরণ করিয়া চিরজীবন প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলসাধনে নিরত থাকিবেন, রাজধর্ম্ম হইতে কদাচ বিচ্যুত হইবেন না। অঙ্গীকারের উপসংহারে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "রাজধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনের অঙ্গীকার পালনে জগদীশ্বর আমাকে শক্তিদান করুন; মন্ত্রীগণ আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করুন; প্রজাপুঞ্জ সন্তুষ্টচিত্তে আমার সহায় থাকুন, রাজ্যপালনে আমার প্রিয়তমাসহধর্ম্মিণীও আমার সহায়তা করুন।"

নবরাজের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ইংলণ্ডের নবরাজ্ঞী আমাদের নবসাম্রাজ্ঞী শ্রীমতী মেরি সর্ব্বগুণে গুণবতী, স্বামীর অঙ্গীকার পালনে তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামীর সহায়ভূতা হইবেন, আমরাও এইরূপ আশা রাখি।

এখন আমরা সর্ব্বান্তকরণে জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, মহারাজ পঞ্চম জর্জ্জ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পিতার ন্যায় প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক মহিষী ও পুত্রগণ-সহ পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ করুন; তাঁহাদিগকে সুখী দেখিয়া পতিবিয়োগ বিধুতা মহারাণী আলেকজান্দ্রা ইহ-সংসারে শান্তিলাভ করুন।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু উপলক্ষে—

শোক-গাথা।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ রাগ্‌চী।

হায় হায় অকস্মাৎ,   বিনা মেঘে বজ্রপাত,
হয়েছে তপন পাত আঁধার সংসার;
নাহি রাজ-রাজেশ্বর,   শোকমুগ্ধ চরাচর,
ওই শুন কোটিকণ্ঠে শব্দ হাহাকার!
হা হা তরুলতা স্বনে,   হা হা ক্ষিপ্ত সমীরণে,
তটিনী কাঁদিয়া পড়ে নীলাম্বুধি বুকে!
স্তব্ধ গ্রহ তারা রাজী,   প্রভাহীন শোকে আজি,
বিষাদ কালীমা মাখা পূর্ণশশী দুখে!
গিরিরাজ হিমাচল,   ফেলিতেছে অশ্রুজল,
আঁধার সাগর তলে ডুবেছে রতন!
অশ্রুবারি ধারা চক্ষে,   নেহার সাগর বক্ষে,
আছাড়ি তরঙ্গ তার পড়ে কি ভীষণ!
এত গুণ একাধারে,   পাইবে কি দেখিবারে,
সপ্তম এডোয়ার্ড নাই—কাঁদ ঘরে ঘরে!
কাঁদ গো ভারত-মাতা,   তোমার অদৃষ্টে ধাতা,
লিখেছে অনেক দুঃখ সহিবার তরে!
এসো সবে মিলি আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ধরাবক্ষে শোক চিহ্ন প্রদানি আঁকিয়া।

ধূমকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

দেখেছি দেখেছি কেতু, দেখেছি তোমারে,
পূর্ব্বাকাশে দিব্যমূর্ত্তি, জ্যোতির্ম্ময়ী আভা,
শুক্রগ্রহ বামপার্শ্বে জ্যোতির্ম্ময় বপু ;
অর্দ্ধবক্র জ্যোতির্ম্ময় সুদীর্ঘ লাঙ্গুল।
জানি না জ্যোতিষ তত্ত্ব, সুধাই তোমায়,
কোথা থাক, কোথা যাও, কোথা হ'তে পুনঃ—
আসিয়া উদয় হও বহুদিন গতে।
কিছুই বুঝিতে নারি তব স্থিতি গতি।
এবারে এসেছ তুমি বহু কালান্তরে,
উষাকালে দেখা দাও উদয় অচলে ;
শুনিতেছি শীঘ্র যাবে অস্তাচলমুখে ;
সকলি সম্ভব হয় সৃষ্টি প্রকরণে।
লোকে কয় (সত্য মিথ্যা বুঝিবারে নারী)
তব আগমনে কেতু, ঘটে অমঙ্গল ;
সুমঙ্গল হেতু কেতু, গণনার ফলে—
নির্দ্দেশেন কোন কোন জ্যোতিষী পণ্ডিত।
শেষের গণনা যদি ভুল শূন্য হয়,
তোমার উদয়ে যদি শুভ ফল ফলে,
হৃদি-ভক্তি উপচারে পূজিব তোমায়।
এই বেলা বোলে রাখি আর এক কথা।
সাহেবেরা বলিতেছে, "হ্যালির কমেট্।"
হ'তে পারে, আগমন গণিয়াছে হ্যালি,
তা বলে কি হবে তুমি হ্যালির বিগ্রহ ?
হ্যালির কমেট নও। যাঁহার রচিত—
মেদিনী, পাতাল, ব্যোম, বিশ্বচরাচর,
তাঁহারি সৃজিত গ্রহ তুমি ধূমকেতু।
কেহ বলে তবোদয়ে সংঘটে প্রলয় ;

মঙ্গলময়ের রাজ্যে ইহা কি সম্ভব ?
বিতর মঙ্গল ফল দেবগ্রহরূপী—
ধূমকেতু। জ্যোতিদানে উজলো ধরণী।
ভক্তিভাবে সবে মেলি প্রণমি তোমার।

—:•:—

সমালোচনা।

রাণীভবানী।—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

"রাণী ভবানী" রাজসাহী জেলার নাটোর রাজপরিবারের লক্ষ্মীরূপিণী। এ দেশে এ পরিচয় কাহাকেও দিতে হইবে না।

বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী উপাখ্যানের প্রণালীতে রাণী ভবানীর চরিত্র চিত্র করিয়াছেন। চিত্রটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই পুস্তকের আলোচনা করিব।

ভবানীর পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতা কস্তুরী দেবী, দ্বিতীয় নাম জয়দুর্গা, কন্যার জন্মের পূর্ব্বে আত্মারাম ও জয়দুর্গা স্বপ্ন দেখেন, ভগবতী ভবানীদেবী তাঁহাদের গৃহে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইবেন, মাতাপিতা ভবানীকে উমা বলিয়া ডাকিতেন। ভবানী যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পাষ্যপুত্র কুমার রামকান্তরায়ের সহিত ভবানীর বিবাহ হয়। সেই অবধি তিনি রাণী ভবানী নামে সুপরিচিতা। সংসারে রাণী ভবানীর বুদ্ধি, কার্য্যনৈপুণ্য, ও গুরুভক্তি প্রভৃতি সংগুণের পরিচয়অসংখ্য ; অনেক সময় সৎ পরামর্শ দিয়া স্বামীকে তিনি অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দীঘাপতি রাজবংশের আদি পুরুষ দয়ারাম রায় নাটোর রাজ সংসারের দেওয়ান ছিলেন, তিনি সেই রাজসংসারের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজা রামজীবনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। ভবানীর সহিত রামকান্তের বিবাহে তিনিই প্রধান ঘটক।

বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী এই পুস্তক রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটোর রাজধানীর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি বর্ণনে যেরূপ ক্ষমতা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা অতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উপন্যাসের প্রণালীতে নায়ক-নায়িকাদিগের

রূপ বর্ণনার অংশ এ পুস্তকে অল্প; আমাদের বিবেচনায় তাহাই প্রকৃতিসিদ্ধ। সংসারের চিত্র, জ্ঞাতিবিরোধ, গৃহবিবাদ, শত্রুতা, বড় মানুষের ছেলেদের উশৃঙ্খলতা, তাদৃশস্থলে মোসাহেবদিগের প্রতাপ এবং দয়ারামের মধ্যস্থতা অতি বিশদ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ভাষাপারিপাট্যও অতি সুন্দর। আমরা এই পুস্তকখানিকে উপাখ্যান বলিতেছি, উপাখ্যান বলিয়া পরিচিত করাও বোধ হয় গ্রন্থকারের ইচ্ছা, কিন্তু এখানি ইতিহাসের স্থল অধিকার করিবে। পক্ষান্তরে এখানি অতি বিশুদ্ধ সংসার-চরিত্র।

সংসারে রাণী ভবানীর গুণের পরিচয়ই অধিক, পাঠক মহাশয়েরা পদে পদে তাহা দেখিতে পাইবেন। রাণী ভবানীর দানধর্ম্মের তুলনা এ দেশে অতি অল্পই আছে; দেবসেবা ও বিপ্রসেবার নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র বিঘা উর্ব্বরা ভূমি দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশে যে মহা দুর্ভিক্ষ হয়, এ দেশে যে দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" নামে বিখ্যাত, দয়াবতী রাণী ভবানী সেই মহাদুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোককে আহার দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, দীয়তাম্ ভোজ্যতাম্ রাণী ভবানীর সিদ্ধ ব্রত, দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্রদান করা তাঁহার দয়ায় অতুল্য পরিচয়। ধর্ম্মানুগত ক্রিয়াকর্ম্মে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, তাঁহার দুর্গোৎসবের তুল্য দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে কেহ কখন করিতে পারেন নাই, বোধ হয় পারিবেনও না। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয়েরা আমাদের এই বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

রাণী ভবানীর পুত্র সন্তান হয় নাই, তাঁহার পোষ্য পুত্র ছিলেন, রাজা রামকৃষ্ণ। তিনি পরম ধার্ম্মিক সাধুপুরুষ; শেষকালে তিনি সংসার ত্যাগী যোগী হইয়াছিলেন। সেই অংশ গুলি পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে।

পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বে মুর্শীদাবাদের আম্রকাননে, জগৎসেট রায় দুর্ল্লভ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি যে মন্ত্রণা করেন, সেই মন্ত্রণা সভায় রাণীভবানী যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে ও নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশী যুদ্ধ' কাব্যে প্রকাশ আছে।

আলোচ্য পুস্তকের শেষ ভাগে নাটোর রাজ পরিবারের বংশতরু এবং রাণী ভবানীর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর দানের আদর্শ-চিত্রিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য দর্শনীয়

রাণী ভবানী নামে আমরা আরও কয়েক খানি ক্ষুদ্র বৃহৎ আখ্যায়িকা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি, কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না, দুর্গাদাস বাবুর এই পুস্তকের তুল্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক একখানিও নহে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি, নাট্যকুশল নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রঙ্গালয়ে অভিনয় করাইবার জন্য দুর্গাদাস বাবুর এই পুস্তকখানি সম্প্রতি নাটকাকারে গ্রন্থিত করিতেছেন। বাবু অমরেন্দ্রনাথ আমাদের প্রশংসার পাত্র; বাবু দুর্গাদাসের রচিত রাণী ভবানীকে দৃশ্যকাব্যে পরিণত করিয়া রঙ্গভূমিতে প্রদর্শন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; ইহাতে বঙ্গীয়রঙ্গমঞ্চের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। একটি চরিত্র চিত্রণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকটিত বহু চিত্রের সমন্বয় রাখিতে দুর্গাদাস বাবুর এতদূর ক্ষমতা আছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না।

ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকা।—বহুশাস্ত্র দর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ ঐ নাম দিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ৺কাশীধামে অবস্থানকালে বহুদিন যাবৎ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনায় তাঁহার এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য বৈশ্য অথবা সৎশূদ্র, ইহাই তাঁহার আলোচনার ফল। প্রকৃত পক্ষে এ দেশের কায়স্থ জাতির বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে অধুনা নানা প্রকার বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে; আজিও অভ্রান্ত মীমাংসা হইয়া উঠে নাই। সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, তথাপি তিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। কাশীবাসী শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি এবং পণ্ডিতবর চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার প্রভৃতি মহামান্য গণনীয়পণ্ডিত মহাশয়গণ এই পুস্তকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব ও পণ্ডিত মহাশয়গণের প্রশংসাবাদ দর্শন করিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া প্রকৃত মীমাংসার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সমাজের যে সকল ব্রাহ্মণকায়স্থ মহাশয়েরা সাগ্রহ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাঠ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, অনেক দূর মীমাংসা পাইবেন, সন্দেহ নাই। মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী।

শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার বিরচিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তকে বন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাতী—ভক্ত সম্মিলন, শ্রীরামকৃষ্ণের পাঠ-যাত্রা, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ রাজলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবালীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্ত্তনলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ আরতি, শ্রীরামকৃষ্ণ শয়নলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ মকরমঙ্গল, প্রার্থনা, মাতৃগীতি, গুরুস্তুতি, এই বিষয়গুলি গীতিকাব্যে বিরচিত; পদাবলী বলিলে গীতিকাব্য বুঝায়, অতএব ইহা তাহাই। 'অষ্টকালী' শব্দের প্রয়োগের হেতুটি পরিস্ফুটরূপে সকল পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না, তথাপি এই পদাবলী যে ভক্তিরসপূর্ণ, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। লীলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বরে সঙ্গীতরূপে বিরচিত। রামকৃষ্ণসেবক বিজয়নাথ মজুমদার পবিত্র সংগীত প্রিয়, গীতগুলি পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয় দৃষ্ট হইল রামকৃষ্ণভক্তেরা এতৎ পাঠে আনন্দলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই পদাবলীর আকার ক্ষুদ্র বারো পেজি ৩৮ পৃষ্ঠা মাত্র, এই ক্ষুদ্র আয়তনের পুস্তকখানি দোকানে রাখিয়া অর্থলোভের আশা না করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গৌরবে বিনামূল্যে বিতরণ করিলে ভাল হইত।

পি, এম, বাক্‌চি কোম্পানির ডাইরেক্টারী পঞ্জিকা।

বৎসর বৎসর ইহা প্রকাশ হয়, উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। ১৩১৭ সালের ডাই-রেক্টারী পঞ্জিকা পূর্ব্বাপেক্ষা নানাবিষয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সহর ও মফঃ-স্বলের অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে এই বৃহৎ পঞ্জিকার গর্ভে স্থান পাই-য়াছে। কাগজ উত্তম, চিত্র উত্তম, পণ্ডিতগণের গণনাও উত্তম। বাক্‌চি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন বাক্‌চি মহাশয় পরিশুদ্ধ প্রণালীতে এই পঞ্জিকার অঙ্গরাগসাধনে বিশেষযত্ন করিয়াছেন। আমরা আর অধিক কি বলিব, ডাইরেক্টারীখানিই প্রকৃতপক্ষে সে পরিচয় দিবার উত্তম সাক্ষী।

তান্ত্রিক রহস্য (দ্বিতীয় ভাগ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহিত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

তন্ত্র শাস্ত্রের নিগূঢ় ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তলোকেরা মদ্য মাংসাদি সেবন ও স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতিই তন্ত্রের সার বলিয়া অধঃপাতিত হয়; সাধকের ভাল করিয়া কোন কোন ধর্ম্ম ধ্বজী তান্ত্রিক অনবরত কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন! পঞ্চতত্ত্বই নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ ইহা বুঝাইয়া শিষ্যগণকেও কুক্রিয়াসক্ত করিতে-ছেন। প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া অনেক লোক মদ্য মাংসাদি পঞ্চমকারকেই পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া ভ্রমকূপে নিমজ্জিত হইতেছেন। কবিরাজ কালীশ চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় অজ্ঞলোকের সেই ভ্রম দূর করিবার অভিলাষে এই পুস্তক প্রচার করিয়াছেন যাঁহাদের মনে মনে তন্ত্রের উপর ভক্তি আছে, তাঁহারা এই তান্ত্রিক রহস্য পাঠ করিয়া বিস্তর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

সীতা।

২

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পণ্ডিত কবি উর্ব্বশীকে দেখিয়া জনকের মনশ্চাঞ্চল্যের কথা তুলিয়া পৃথিবী-গর্ভে তাঁহার বীর্য্যপাতে সীতার জন্মকথা বলিয়াছেন। ইনি আবার ঠারেঠোরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই বুঝিতে হয় যে, মেনকাদর্শনে কামোন্মত্ততাপ্রযুক্ত মানস সঙ্গমে মেনকা হইতে যেমন সীতার জন্ম, অমনি লাঙ্গলের শিরালে সীতার উৎপত্তি। এ এক তাজ্জবব্যাপার! ফলতঃ যিনি যেরূপেই সীতার জন্মকথা বলিতে গিয়াছেন, তাঁহাকেই পৃথিবীর সহিত সংস্রব রাখিতে হইয়াছে; কেহ

কেহ বলিতে সাহসী হয়েন নাই যে, আশমান্ হইতে সীতাঠাকুরুণ মাটিতে পড়িয়া উঙা উঙা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যদি কেহ তাহা লিখিতেন, তাহা হইলে জনক রাজা দারুণ কুখ্যাতির দায়ে অব্যাহতি পাইতেন।

বাল্মীকির সময়ে ঋষিবাক্যের প্রভূত বল ছিল। ঋষিবাক্যে কাহার অনাস্থা ছিল না, তাহা অমোঘ, অলঙ্ঘনীয়রূপে সর্ব্বত্র সকলের নিকট সমাদৃত হইত। তাই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক মহাকবি বাল্মীকি আপনার ইষ্টদেবী বৈকুণ্ঠবিহারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীকে সামান্য মানব-মানবীর সংযোগে জন্মের কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাকে অযোনিজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী সাগর সম্ভূতা, সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূতা, সে বিষয়ের অন্যথা করায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের অসম্মান করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীনকবি কৃত্তিবাস ঠাকুর এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গোস্বামী মহাশয় বেশ্যার সংস্রবে সীতাদেবীর উৎপত্তির পরিচয় দিয়া তাঁহার দেবত্বে গুরুতর আঘাত করিয়াছেন, অন্ততঃ আজিকালিকার দিনে কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ সীতার জন্মসম্বন্ধে তাঁহারা যে ধরিত্রীর মাতৃত্ব লোপ করেন নাই, ইহাই বাল্মীকির সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

রাজর্ষি জনক সীতাকে যজ্ঞভূমি হইতে গৃহে আনিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সীতা দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার নয়নের প্রীতি জন্মাইতে থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার বিবাহকাল উপস্থিত হইল দেখিয়া জনক কন্যার উপযুক্ত পাত্রের জন্য চিন্তিত হইলেন। বহুকাল হইল, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দেবরাত ও জনকের নিকট সুরলোকবাসী দেবগণ একটী মহাকায় হরধনু গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তদবধি জনকবংশীয় রাজগণ বহুযত্নে সেই শাম্ভব ধনু রক্ষা এবং পুষ্পচন্দন দ্বারা পূজা করিতেন। রাজা জনক এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যিনি সেই হরশরাসন ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতার পাণিগ্রহণে সক্ষম হইবেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সংবাদ প্রচারিত হইলে নানাদেশ হইতে রাজা ও রাজপুত্রগণ সীতার পাণিপীড়নার্থী হইয়া মিথিলা নগরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ধনুর আকার দর্শনেই ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি জনকের এই কঠিন পণ প্রযুক্ত তাঁহারা এই কন্যালাভে বঞ্চিত হইলেন; অতএব জনককে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য তাঁহারা রোষাবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক সীতাহরণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। একবৎসরের তুমুল সংগ্রামে রাজর্ষির সমস্ত যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তিনি দেবগণের

শরণীপন্ন হইলেন, এবং তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দেবগণ জনকের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চতুরঙ্গ সেনা সমর্পণ করিলেন। সেই সৈন্য সাহায্যে রাজর্ষি জনক প্রোৎসাহিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলে লঘুবীর্য্য দুরাচারগণ পরাভূত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিলেন।

অতঃপর রাজর্ষি জনক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত রাজা ঋষি ও সর্ব্বসাধারণ জনগণকে সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন, এই সময় অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজর্ষি জনকের যজ্ঞকাল উপস্থিত হইলে ভগবান্ গাধেয় তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত যজ্ঞদর্শনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং সেখানে এক অপূর্ব্ব ধনুর অস্তিত্বের কথা জানাইলেন। রামচন্দ্র সম্মত হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলাযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পদরেণুস্পর্শে অহল্যার উদ্ধার হয়। অনন্তর তাঁহারা মিথিলা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রাজর্ষি জনক তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিশ্বামিত্রকে রামলক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ঋষিপ্রবর উত্তর করিলেন, "ইহাঁরা অযোধ্যাধিপতি দিগন্ত বিশ্রুত মহারাজ দশরথের পুত্র, হরধনু দর্শনে ইহাঁদের এখানে আগমন।" রাজর্ষি জনক প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে হরধনু প্রদর্শনার্থ সচিবগণকে তাহা বাহির করিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। সেই দিব্য শাম্ভব শরাসন আটখানি চাকাবিশিষ্ট লৌহ মঞ্জুষা অর্থাৎ লৌহাধার মধ্যে ছিল। মঞ্জুষাটী গন্ধমাল্য পরিশোভিত। পাঁচ হাজার ভৃত্য উহা টানিয়া বাহিরে আনিল। রামচন্দ্র ধনুর নিকটবর্ত্তী হইয়া আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তাহা দর্শন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে কি ইহা উত্তোলনপূর্ব্বক ইহাতে জ্যারোপণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে?" রাজর্ষিজনক ও ঋষি বিশ্বামিত্র ইহাতে অনুমোদন করিলে,রামচন্দ্র সভাসীন রাজন্যগণ সমক্ষে ধনুর মধ্যদেশ ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহা উত্তোলন করিলেন, এবং তাহাতে গুণারোপণ করিয়া আকর্ণ পুরিয়া যেমন আকর্ষণ করিলেন, অমনি সেই ধনু দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তাহাতে বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুতিপীড়ক একটা বিকট শব্দ হইল। চতুর্দ্দিকবর্ত্তী ভূভাগ কাঁপিয়া উঠিল, যেন ভূমিকম্প হইল। জনক বিশ্বামিত্র এবং রামলক্ষ্মণ ব্যতীত সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনন্তর

সভাস্থ সকলের চৈতন্য সম্পাদন হইলে রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আজি আমি রামচন্দ্রের বলবীর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইলাম। ইনি এতাধিক পরাক্রমশালী আমি স্বপ্নেও কখন ভাবিতে পারি নাই। আমার মনে হইয়াছিল, ধনুর্ভঙ্গ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব জানকীর বিবাহও নিতান্ত অসম্ভব; কিন্তু এতদিনে আমার সেই ভয় ভঞ্জন ঘটিল। রামচন্দ্র যেরূপ মহোচ্চ সূর্য্যবংশ সম্ভূত, তেমনি সদ্‌গুণরাশির আধার। এতদিনে জানিলাম আমার কন্যা জানকী হইতে আমাদের বংশ চিরকীর্ত্তিত হইবে। রামচন্দ্রের সহিত সীতার শুভবিবাহ স্থিরীকৃত হইয়া গেল। মিথিলার রাজদূত অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথকে এই শুভবিবাহের সংবাদ জানাইয়া তাঁহাকে মিথিলায় আনিবার জন্য অযোধ্যা যাত্রা করিল। রাজর্ষি জনক বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দূতগণ অশ্বারোহণে তিন দিনেই অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের সমাচার দিল এবং তাঁহার অভিমত হইলে রাজর্ষি জনক রামচন্দ্রকে তাঁহার সীতানাম্নী কন্যা সম্প্রদানের প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। মন্ত্রী ও ঋষিগণের সহিত এক মত হইয়া রাজা দশরথ তাহাতে সম্মতি দিয়া আত্মীয় অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে তৎপরদিন মিথিলা যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

রাজা দশরথ সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত যথাকালে মিথিলার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া জনক দ্বারা সৎকৃত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি জনকের অনুজ কুশধ্বজ সাঙ্কস্যৎকারীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিবাহোৎসব সম্পাদনোপলক্ষে জনক তাঁহাকে মিথিলায় আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। কুশধ্বজ মিথিলায় উপস্থিত হইলে রামসীতার বিবাহের দিন স্থির হইল। সে দিন উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র। ইহা ব্যতীত মাস বার তিথি প্রভৃতির উল্লেখ নাই। বিবাহে উভয় পক্ষের কুল পরিচয় হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের পরিচয় দিলেন, রাজর্ষি জনক আপনিই আপনার চন্দ্রবংশের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, অতঃপর তিনি রামচন্দ্রকে সীতা এবং লক্ষ্মণকে আপনার ঔরস-পুত্রী উর্ম্মিলাকে সম্প্রদান করিবার জন্য সর্ব্বসমক্ষে অঙ্গীকার করিলেন। এমন সময়ে মহামুনি বিশ্বা-

মিত্রের প্রস্তাবে এবং বশিষ্ঠের অনুমোদনে মহারাজ কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরতশত্রুঘ্নের বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিবাক্যে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন। পিতার সহিত ভরতশত্রুঘ্নও মিথিলায় আসিয়াছিলেন। রাজা দশরথ পুত্রচতুষ্টয়ের বিবাহোপলক্ষে গো-ভূমি হিরণ্যাদি-দান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা দশরথ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ঋষিগণের সহিত যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রও বিবাহোচিত হস্তসূত্রাদি বন্ধন ব্যাপার সম্পাদনান্তে সর্ব্বালঙ্কারভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত শুভলগ্নে বিজয়াখ্য মুহূর্ত্তে বশিষ্ঠাদির পশ্চাদগমন করিলেন। এদিকে যজ্ঞ-বেদিকার সম্মুখে প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, ও শ্রুতকীর্ত্তি চারিভগ্নী উপবিষ্টা ছিলেন। রাজা দশরথের আগমনে রাজর্ষিজনক বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,—"বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত বিবাহোচিত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করুন।" মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বিদেহ-কুলপুরোহিত গৌতমতনয় শতানন্দ উভয়ে শাস্ত্রবিধানানুসারে যজ্ঞশালা মধ্যে এক বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার চতুর্দ্দিক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা সমালঙ্কৃত হইল। যবাঙ্কুর বিশোভিত বহুল চিত্রিত কুম্ভ অঙ্কুরপূর্ণ শরাব, ধূপময় ধূম্রপাত্র, শঙ্খাধার, স্রুব, মাল্য, অর্ঘ্যপাত্র, লাজপাত্র এবং হরিদ্রা-রঞ্জিত পবিত্র, আতপ তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র সমূহ বিবাহ-বেদিকার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতে লাগিল। বশিষ্ঠদেব সমদীর্ঘ দর্ভসকল মন্ত্রপূত করিয়া বেদীর উপরি-ভাগে সমাকীর্ণ করিলেন, এবং যথাবিধানে বহ্নিস্থাপন করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাজর্ষি জনক সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা সীতা-দেবীকে রামচন্দ্রের পুরোভাগে অগ্নি সমক্ষে আনয়ন করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে বৎস! আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি পাণি দ্বারা পাণিগ্রহণ করিয়া ইহাকে পত্নীত্বে স্বীকার কর। ইনি নিরত পতিব্রতা থাকিয়া ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হইবেন।" এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের হস্তে মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে রাজা জনক আপনার দুই কন্যা ও কুশধ্বজের দুই কন্যা চারিটী কন্যাই রাজা দশরথের চারিটী পুত্রকে সম্প্রদান করিলেন। রাজকুমারেরা আপনাপন পত্নীর পাণি-গ্রহণ করিলে, শাস্ত্রমার্গানুসারে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। পরিশেষে রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় স্ব স্ব ভার্য্যাগণের সহিত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথ ঋষি ও অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া আনন্দোৎসব দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিবিরে গমন করিলেন।

বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপার এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ঋষিবর বাল্মীকি রামচন্দ্রের উপাসক। তাঁহাকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করিতেন, সীতা তাঁহার শক্তি। রামচন্দ্র পুরুষ, সীতাদেবী প্রকৃতি। তাহাদের দ্বারাই ইহজগতের উদ্ভব, স্থিতি এবং প্রলয়। সৃষ্ট বস্তুর সহিত স্রষ্টার কোনরূপেই সাদৃশ্য তুলনা চলিতে পারে না বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সামান্য নায়িকার ন্যায় সীতাদেবীর রূপবর্ণনা দ্বারা আপনার পাপ সঞ্চয় ও লেখনীকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহ-জগতের যাহা কিছু সৌন্দর্য্যের সার, তাহাই যাঁহার ইচ্ছাসমুদ্ভূত তাহার আবার উপমেয় কি আছে? কবিবর বাল্মীকি মোটের উপর রামায়ণের স্থানে স্থানে সীতার সৌন্দর্য্য লালিত্যের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত তাঁহার মুখখানি "বিকশিত কমল" 'শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রমা' ইত্যাদি কথায় সীতার রূপের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু কালসহকারে সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা এবং প্রবৃত্তি অনুসারে মনুষ্যের মতি গতি ও রুচি একরূপ থাকে না। ত্রেতার কবি বাল্মীকি যুগযুগান্তর পরে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের হাতে পড়িলেন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণপ্রভাবে হিন্দুর অবতারবাদ ও সাকার উপাসনার একটু পার্থক্য জন্মিয়াছিল, তাই তাৎকালিক কালিদাস, বররুচি, মাঘাদি সংস্কৃত কবিগণের তুলিকায় হিন্দুর দেবদেবীগণ ভিন্নাকারে চিত্রিত হইয়াছেন,—তাঁহারা মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আকারপ্রকার, ভাবভঙ্গী, বসনভূষণ, চালচলন সমস্তই মানবের ন্যায়। তাহাতে কাব্যামোদীর আমোদ জন্মিলেও ভক্তের তৃষা নিবৃত্তি পায় না। কৃত্তিবাস সংস্কৃত কবির অনুসরণ করিতে গিয়া সীতা দেবীকে কাব্যের নায়িকারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সাত্ত্বিক হিন্দুর নিকট "দেবীমাহাত্ম্যের" যতটা আদর যত্ন, কুমার সম্ভবের ততটা নহে। বাল্মীকির আমলে সাধারণ মানবচরিত্র যতটা সরলতাপূর্ণ বিকারশূন্য ছিল, কালক্রমে তাহার ব্যভিচার ঘটিয়া আসিতেছে। সমাজের ও জাতীয় চরিত্রের অবস্থানুসারে কাব্যনাটকাদির নায়কনায়িকার চরিত্র চিত্রিত হইয়া থাকে। তাই বাল্মীকির সীতায় যাহা দেখিতে পাই, কৃত্তিবাসের সীতায় তাহা পাই না।

ঘন কেশপাশ তার যেমন চামর।
পাকা বিম্বফল তুল্য তার ওষ্ঠাধর॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাহার কাঁকালী।
হিঙ্গুলে মুণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলি॥
পরমসুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
শিরালে হইল জন্ম নাম রাখ সীতা॥ আদিকাণ্ড।

ক্রমশঃ

ফুল ও সমীরণ।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

১

ফুল কহে সমীরণে,
"ছি ছি তব একি ব্যবহার!
চুরি ক'রে লয়ে গেলে
হৃদি হ'তে সুরভি আমার!"

২

"এত নিরদয় তুমি—
ফিরে আর দেখনা চাহিয়া,
কীটের দংশনে—বিষে—
দিবানিশি দহে মোর হিয়া!"

৩

সমীরণ কহে "ফুলবালা—
কি যাতনা জান না আমার,
নাহি দেয় তিলেকের স্থান
এই ধরা মোরে দাঁড়াবার।"

৪

"পূতিগন্ধ, ধূলারাশি আর—
জীবের সে তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস,
বুকে ল'য়ে ফিরি সদা আমি
অবিরামে হায় বারো মাস!"

৫

"তোমার সুরভি বুকে লয়ে,
ফুলবালা—ক্ষণতরে তাই—
শ্রান্ত, ক্লান্ত, শক্তিহীন এই
হৃদয়ের সন্তাপ জুড়াই!"



ভক্তবীর সুরেন্দ্রনাথ।

জন্মভূমির পাঠকমহাশয়েরা বোধ হয়, এই ভক্তবীরের নামটি অল্পই শুনিয়া থাকিবেন; সেই সিমুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ মিত্রবংশের বংশধর বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। গাঢ়তর ধর্ম্মানুরাগ বশতঃই তাঁহার উপাধি ধর্ম্মবীর। ভগবান পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের প্রতি সুরেন্দ্রবাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় সুরেন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত, অথচ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। একদা তিনি বাটীর সম্মুখে ত্রিশূলধারিণী কৃষ্ণবর্ণা একটি ভৈরবী দর্শন করেন, ভৈরবী তাঁহাকে বলেন, "বাবা! সব মিথ্যা, কেবল সেই সত্য।" কেবল

ঐ কথাটি বলিয়াই ভৈরবী অদৃশ্য হন। তদবধি সুরেন্দ্রবাবুর চিত্তবিচলিত হয়। সেই অবস্থায় তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান। পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র আদর করিয়া এরূপভাবে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তৎপ্রভাবে সুরেন্দ্রনাথের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, "লোকে বাঁদরছানা হইতে চায় কেন, বিড়ালছানা হইলেত ভাল হয়। বাঁদরছানার স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে তবে মাতা তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায়; কিন্তু বিড়ালছানার স্বভাব সেরূপ নহে; তাহার মাতা তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সে সেই স্থানেই পড়িয়া মিউ মিউ করিতে থাকে। বাঁদরছানার স্বভাব জ্ঞানপ্রধান, বিড়ালছানার স্বভাব ভক্তিপ্রধান; সাধকদিগের সহিত ইহার তুলনা করা যায়।"

ঐ উপদেশ শ্রবণেই সুরেন্দ্রবাবুর হৃদয় এককালে দ্রবীভূত হয়। তিনি তদবধি প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে না গেলে সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। যদি কোন রবিবারে কার্য্যগতিকে যাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে পরমহংসদেবের কোন কোন ভক্ত পরমহংসদেবকে বলিতেন, "আপনার সুরেন্দ্র আজ আইসে নাই, বোধ হয় অন্য কোন কার্য্যে মাতিয়া গিয়াছে।" ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেন, "দিনকতক তাহার আমোদ আহ্লাদ করিবার সাধ আছে, করুক; ইহার পর ও সকল কিছুই থাকিবে না, পরিণামে তাহার কার্য্য দেখিয়া লোকে মোহিত হইয়া যাইবে এবং তাহারই আদর্শে চলিতে ইচ্ছা করিবে।"

তখন সে কথার মর্ম্ম কেহই অনুধাবন করিতে পারে নাই, শেষকালে বুঝিয়াছিল। যে দিনের কথা, তাহার পরদিন সুরেন্দ্রবাবু কোন ভক্তের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গতকল্য ঠাকুরের সম্মুখে আমার সম্বন্ধে কি কি কথা হইয়াছিল?"

ভক্ত যতটুকু স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রবাবুর প্রশ্নে তত টুকু উত্তর দিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু তখন আর কোন কথা প্রকাশ করিলেন না; তৎপর রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। সে দিন কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট না বসিয়া তিনি অন্য লোকের পশ্চাতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঠাকুর তৎকালে সুরেন্দ্রনাথের কুণ্ঠিতভাব দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, "চোরটির মতন অমন করিয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন? নিকটে আইস।"

সুরেন্দ্রবাবু অগত্যা পূর্ব্ব স্থান হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া পরমহংসদেবের চরণবন্দনাপূর্ব্বক নতশিরে নিকটে বসিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "দেখ, লোকে যখন কোথাও যায়, মাকে সঙ্গে লইয়া যায় না কেন? মাকে সঙ্গে লইলে বিস্তর উপকার। যে শুভকার্য্যে লোকের সংকল্প ছিল না, জননীর কৃপায় তাহা সিদ্ধ হয়। পুরুষার্থ সর্ব্বদা প্রয়োজন।"

তিনি নিজেই ঐ সকল কথার লক্ষ্য, সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন। পুরুষার্থের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি মনে করিলেন, ঐ পুরুষার্থের জ্বালাতেই ত অস্থির হইয়াছি।

অন্তর্যামী পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রবাবুর অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলেন, সুরেন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি বলিলেন, "শৃগালকুক্কুরের পুরুষার্থকে পুরুষার্থ বলে না, পুরুষার্থ ছিল অর্জ্জুনের; অর্জ্জুন যখন যাহা করিব মনে করিতেন, তখনি তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সুরেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইলেন; বিনম্রস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি অন্তর্যামী, আপনি আমার মনের কথা টানিয়া বাহির করিলেন, লুকাইয়া কোথায় আমি কি করিয়াছি, তাহা আপনি জানিতে পারিয়াছেন, আপনার কাছে আর গোপন করিব কি? ঠাকুর! যাহা বলিলেন, তাহাই যথেষ্ট, আর বেশী বলিবেন না; ভক্তমণ্ডলী সকলেই জানিতে পারিবেন।"

পরমহংসদেব নিরস্ত হইলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে সুরেন্দ্রবাবু কিছুদিনের মধ্যে একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতি পরমহংসদেবের অসীম কৃপা হইল। পরমহংসদেব প্রায় সর্ব্বদাই সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসিতেন। তৎকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার ভক্ত, একেশ্বরবাদ প্রচারক পরিব্রাজক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সেই ভক্তির অনুরাগী, বিজয়কেশবাদি ভক্তগণকে লইয়া পরমহংসদেব তথায় বহুক্ষণ আনন্দ করিয়া যাইতেন। ঠাকুরের উপদেশমতে সুরেন্দ্রবাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরমভক্তিসহকারে তাঁহার ইষ্টদেবীর পূজা করিতেন।

এই স্থানে সুরেন্দ্রবাবুর মহৎ কার্য্যের পরিচয়। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে যে সকল ভক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের অশন বসন ও পরিচর্য্যার নিমিত্ত

যত টাকা ব্যয় হইত, সুরেন্দ্রবাবু নিজ তহবিল হইতে অকাতরে অধিকাংশ অর্থ প্রদান করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের নামও পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না, সুরেন্দ্রবাবুই সেই জন্মোৎসবের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা।

সুরেন্দ্রবাবু মুক্তহস্ত পুরুষ, তাঁহার নিয়মিত আয়ও প্রচুর ছিল, ঠাকুরের সেবা ও পরিচর্য্যের নিমিত্ত, ভক্তগণের অভাব মোচনের নিমিত্ত, প্রসন্নবদনে তিনি তাঁহার সেই বিপুল আয় ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিতেন। ঠাকুর যখন পীড়িত হইয়া শয্যাগত হন, সুরেন্দ্রবাবু তৎকালে নিজ ব্যয়ে কাশীপুরের বাগান ভাড়া লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে সেই বাগানের সুরম্য নিকেতনে আনিয়া রাখেন, ঠাকুরের বালক ভক্তেরা প্রায় বাগানে থাকিতেন; নিশিদিন তাঁহারাই ঠাকুরের সেবা করিতেন; গৃহী ভক্তেরা সর্ব্বদাই তথায় যাইতেন, মধ্যে মধ্যে রাত্রিবাসও করিতেন; তাহারও অধিকাংশ ব্যয় সুরেন্দ্রবাবুর।

পরমহংসদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ভাব বুঝিতে পারিয়া সুরেন্দ্রবাবু একখানি ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেই ছবির নাম 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়'। সেই ছবিতে একটি শিবমন্দির ও একটি গির্জ্জা চিত্রিত আছে; গির্জ্জার সম্মুখে প্রভু চৈতন্যদেব ও প্রভু যিশুখৃষ্ট পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন; সকল সম্প্রদায়ের এক একটি ভক্তের চিত্র সেই ছবিতে আছে; ভক্তেরা খোল, করতাল, শিঙ্গা ও মন্দিরাদি যন্ত্র বাজাইতেছেন। পরমহংসদেব কেশবচন্দ্র সেনকে সেই ছবি দেখাইতেছেন।

সেই ছবিখানি চিত্রিত করাইবার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল; প্রথম উদ্দেশ্য—পরমহংসদেবের সাধনের ফল সকলকে প্রদর্শন করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—কেশব বাবু ঐ ভাবটি পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাহাই সকলকে প্রদর্শন করা।

কেশব বাবুর নববিধান ভাবটি যে পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃতি, সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিয়াছিলেন, সেই কারণেই ছবিখানি তিনি কেশববাবুর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন; ছবি দর্শন করিয়া কেশববাবু সুরেন্দ্রবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এইস্থলে গৃহীত হইল:—

"যাঁহা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য।"

সুরেন্দ্রবাবু সেই ছবির ভাবে একটি যন্ত্র * নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই যন্ত্রে বৈষ্ণবের খুন্তি, খৃষ্টানের ক্রুশ, মুসলমানের পঞ্জা এক স্থানে মিশাইয়াছেন। কেশববাবু সেই যন্ত্রটি লইয়া একবার সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন।

* যন্ত্রটির প্রতিরূপ আমাদের এই 'জন্মভূমি' পত্রিকার শিরোভাগে অঙ্কিত আছে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ছবিখানিও জন্মভূমিতে মুদ্রিত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁহার অস্থিভস্ম লইয়া জন্মাষ্টমী দিবস তখনকার ভক্তমণ্ডলী কাঁকুড়গাছীরবাগানে সমাধি দেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ তাহার প্রধান উদ্যোগী। কাঁকুড়গাছীর বাগানখানি পরমহংসদেবের অন্যতম প্রিয়ভক্ত সিমুলিয়ার বাবু রামচন্দ্র দত্তের অধিকৃত। জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিন সুরেন্দ্রবাবু নিজ খরচে সেই বাগানের জঙ্গল কাটাইয়া একটা সুঁড়ীপথ প্রস্তুত করিয়া দেন, সেই পথ এখন প্রশস্ত হইয়াছে, সেই পথে এখন বহুলোক গতিবিধি করিতেছে। কাঁকুড়গাছীর বাগানের নাম যোগোদ্যান, সেই রাস্তাটির নাম যোগোদ্যান লেন।

যোগোদ্যানে পরমহংসদেবের দেহাস্থি সমাহিত করিয়া ধর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ নিজ ঐ যোগোদ্যানের পার্শ্বস্থিত তাঁহার নিজ উদ্যানে খিচুড়ী রন্ধন করাইয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া ভক্তগণকে প্রসাদভক্ষণ করাইয়াছিলেন। সেই উৎসবে মহাসমারোহে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সমস্ত ব্যয় প্রায় সুরেন্দ্রবাবুর নিজের।

যোগোদ্যানের অনুষ্ঠাতা ভক্তগণকে আমাদের শত ধন্যবাদ, সেই উৎসব স্মরণ করিয়া তাঁহারা তদবধি এখনও পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমীরদিবস শতশত কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সহিত সিমুলিয়া ষ্ট্রীটস্থ সুরেন্দ্রবাবুর আবাসবাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সংকীর্ত্তন করেন, সেইস্থান হইতেই কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে চলিয়া যান।

ভক্তিগৌরবে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একজন ধর্ম্মবীর। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর তদীয় ভক্তসন্ন্যাসীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছিলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বরাহনগরে গুড়ের বাগান ভাড়া লইয়া যত্নপূর্ব্বক উদ্‌ভ্রান্ত সন্ন্যাসী-গণকে একত্র মিলিত করেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ ব্যয় নিজে প্রদান করিতে থাকেন। সে বাগানের নাম হয়, "বরাহনগরের মঠ।" সেই মঠের কোন ভক্ত সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসিলে তিনি পরমাদরে তাঁহার সেবাযত্ন করিতেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অকপট ভক্ত, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফাল্গুন মাসে জন্মোৎসবের একমাত্র প্রবর্ত্তক, জন্মাষ্টমীতে যোগোদ্যনের উৎসবের উৎসাহদাতা, বরাহনগরে মঠের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ছবি ও যন্ত্রসৃষ্টি তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন।

প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৌরবসূচক এতগুলি মহৎকার্য্য সুরেন্দ্রবাবু করিয়াছেন, সেই গৌরবে তিনি অকাতরে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন,ঠাকুরের নামের আধুনিক ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি ভক্ত এক্ষণে সেই পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথের নামটি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশ রাখিয়াছেন।

আর একটি প্রশ্ন।—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতিথিতে সুরেন্দ্রবাবু দেহ রক্ষা করেন, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কি সেই তিথিটি স্মরণ করেন? ভক্ত-বীরের তীরোভাবের দিনে একটি উৎসব করা কি উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় না? আমরা বোধ করি, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে সেই দিনটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মসংসারে ইহা কি যারপরনাই পরিতাপের বিষয় নহে?

———০ః০ః০———

শুচিবাই।

(কাশী যাই কি মক্কা যাই?)

লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বি, এল,

শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের দেশে স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীতে শতকরা প্রায় দুইএকটী শুচিবাই থাকে। চক্ষেও আমরা দুইচারিটী দর্শন করিয়াছি। এই কলিকাতা সহরের কোন এক পল্লীতে সম্ভ্রান্ত এক পরিবার মধ্যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী-লোক অত্যন্ত শুচিবাই ছিলেন। স্থানের ও দেহের পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার অনেক গুলি অনুষ্ঠানের পরিচয় আছে। একটী পরিচয় বড় অদ্ভুত। হিন্দুর অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ মুটেরা তাঁহার বাটীতে জ্বালানকাষ্ঠ আনিয়া দিত, প্রথমে তিনি সেই সকল কাষ্ঠের উপর গঙ্গাজল ছড়াইতেন, মুটেরা বাড়ীর মধ্যে যে স্থান দিয়া আসিত, যাইত, সেই পথে তিনি গোবর জল ছড়াইতেন, তাহাতেও চিত্তশুদ্ধি হইত না; তিনি কাপড় ছাড়িতেন; বাড়ীর পশ্চিমদিকে ছোট একটি পুষ্করিণী ছিল, কাষ্ঠের বোঝা হইতে এক একখানি কাষ্ঠ তুলিয়া তিনি সেই পুষ্করিণীকে নামিতেন, সেই কাষ্ঠখণ্ডসহ প্রত্যেকবারে এক এক ডুব দিতেন, কাষ্ঠখণ্ড একশত হইলে এক শত ডুব! বাটীতে হিন্দুর অস্পৃশ্য মেথর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থলোকের সংস্রবে পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার বিবিধ অনুষ্ঠান কথিত আছে। শুচিবাই লোকের ঐ প্রকার কার্য্য দেখিয়া দেখিয়া বুদ্ধিমান বিজ্ঞলোকেরা ঐ প্রকার কার্য্যের নাম

দিয়াছেন "বাই"। ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে উহাও একপ্রকার বাই বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, যাহারা ঐ প্রকার আচরণ করে, তাহাদের আখ্যাও শুচিবাই।

দৃষ্টান্ত অনেক আছে তন্মধ্যে নিম্নে যে দৃষ্টান্তটী প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নূতন, সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত, সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার।

অতি প্রাচীনকালে কোন এক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি শুচিবাই। একদা নিকটস্থ সরোবরে প্রাতঃস্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে তিনি বাটীতে আসিতেছিলেন, একজন যবন সেই পথ দিয়া যায়, ব্রাহ্মণের অনুমান হইয়াছিল, সেই যবনের অঙ্গবস্ত্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে। মহা বিভ্রাট! ব্রাহ্মণ ফিরিলেন, পুনর্ব্বার সেই সরোবরে গিয়া অনেকগুলি ডুব দিলেন, জল হইতে উঠিয়া অশুদ্ধচিত্তে কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাটী আসিলেন, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "আমি ঘরে উঠিব না; যবনে ছুঁইয়াছে, আবার স্নান করিয়া আসিয়াছি, তাহাতেও মনঃপূত হইতেছে না; আমি গঙ্গাস্নানে যাইব।"

হাস্য করিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "অত করিতে হইবে না; গঙ্গা ষোল ক্রোশ দূরে, যাইতে আসিতে চারি পাঁচদিন কাটিয়া যাইবে, গঙ্গায় যাইতে হইবে না। গঙ্গার মাহাত্ম্য তো তুমি জানো, শত যোজন দূর হইতে গঙ্গার নাম করিলে মানুষের সকল পাপের মোচন হয়। তুমি গঙ্গানাম কর, তাহাতেও যদি দ্বিধা থাকে, গঙ্গাজল স্পর্শ কর। নূতন ভাঁড়ে করিয়া ঘরে আমি গঙ্গাজল রাখি, গঙ্গাজল ঘরে আছে, আমি তোমার মাথায় সেই জল ছিটাইয়া দিতেছি, শুদ্ধ হও।"

মুখ বিকৃত করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "উঁহু, তাহা হইবে না; ছিটা দিলে চলিবে না, গঙ্গায় অবগাহন আবশ্যক। তুমি একখানা কাপড়ে চা'ল চিড়া বাঁধিয়া দাও, গোটাকতক পয়সা দাও, আমি গঙ্গাস্নানে যাই।"

বিস্তরকথা কাটাকাটি হইল, ব্রাহ্মণ কিছুতেই বর্গ মানিলেন না; শুচিবাই। পবিত্রাচারের জন্য শুচিবাইদিগের যেটা যখন ঝোঁক হয়, কেহ সে ঝোঁক ফিরাইতে পারে না। ব্রাহ্মণী পরাস্ত হইলেন, কাপড়ে চালচিড়া বাঁধিয়া দশটী পয়সা লইয়া দুর্গানাম করিতে করিতে ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে বেলা দুইপ্রহর অতীত হইয়া গেল; ক্ষুধা হইল, পথের ধারে একজন গৃহস্থের বাড়ী দৃষ্ট হইল, বাড়ীখানির বহির্ভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ব্রাহ্মণ সেই বাড়ীতে অতিথি হইলেন। গৃহের কর্ত্তা তখন গৃহে ছিল না, গৃহিণী

ছিল; ব্রাহ্মণ দেখিয়া গৃহিণী ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইল, পরিষ্কারস্থানে রন্ধনাদির আয়োজন করিয়া দিল, পুনর্ব্বার স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ রন্ধন করিলেন; আলস্য হইল, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে তিনি শয়ন করিলেন, শয়নমাত্রেই নিদ্রার আবির্ভাব; ব্রাহ্মণ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে গৃহিণী আসিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ঘুমাইতেছেন, আহার হয় নাই; একটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রস্তুতান্ন ভক্ষণ করিতেছে। দেখিয়াই তাহার অঙ্গ শিহরিল, কুকুরটাকে তাড়াইয়া দিয়া সে তখন ভোজনপাত্রের দিকে চাহিল; দেখিল অন্নের অর্দ্ধাংশ কুকুরে খাইয়াছে; যাহা আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণের উদর পূর্ণ হইবে না। ভাবিয়া ভাবিয়া সেই স্ত্রীলোক নিজের রন্ধন গৃহ হইতে অন্ন আনিয়া কুকুরের উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট অন্নের সহিত মিশাইয়া রাখিল।

নিদ্রাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ উঠিয়া সেই অন্ন ভোজন করিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহের কর্ত্তা ফিরিয়া আসিল, তাহার স্কন্ধে একটা ঢোল, হস্তে একখানা চামড়া। ব্রাহ্মণ সে দিকে লক্ষ্য করিলেন না। রাত্রিকালে সেই বাড়ীতে ব্রাহ্মণের অবস্থান করা স্থির হইল। রাত্রে আর তিনি রন্ধন করিলেন না। বাড়ীতেও তিনি একাহারী, তথায় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন করিলেন।

যে ঘরে ব্রাহ্মণ, তাহার পার্শ্বেই কর্ত্তাগৃহিণীর শয়ন ঘর। ব্রাহ্মণ জাগিয়া আছেন, শয়ন ঘরে কর্ত্তাগৃহিণীতে কথা হইতেছে। যাহা যাহা হইয়াছিল, গৃহিণী তাহা অবিকল কর্ত্তাকে বলিল, শেষে বলিল, "উনি ব্রাহ্মণ, আমরা মুচি; অর্দ্ধেক ভাত কুকুরে খাইয়াছে, ব্রাহ্মণের পেট ভরিবে না, সেই জন্য আমি আমাদের ঘরের ভাত মিশাইয়া দিয়াছিলাম। যদি পাপ হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফলে ভগবান দয়া করিবেন।"

ব্রাহ্মণ তাহাদিগের সকল কথা শুনিলেন, সর্ব্বশরীর অবশ হইল, নিশ্বাস ফেলিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "রাম—রাম—রাম!"

শুচিবাই ব্রাহ্মণ কুকুরের উচ্ছিষ্ট এবং মুচির অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, রাত্রে নিদ্রা হইল না; অন্ধকার রাত্রে কোথায় যাইবেন, ভাবিয়া ভাবিয়া জাগিয়া অতি কষ্টে নিশা যাপন করিলেন; ভোরে উঠিয়াই প্রস্থান।

পরদিন ব্রাহ্মণের আর আহার হইল না। সমস্ত দিন পথ চলিয়া শেষ বেলায় তিনি একটী স্থানে উপস্থিত হইলেন; সঙ্কল্প করিলেন, কাশীধামে গিয়া এই

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পথের ধারে ব্রাহ্মণ দেখিলেন একখানা দোতালাবাড়ীর উপরের জানালা হইতে একটী স্ত্রীলোকের মুখ তাঁহাকে দেখিতেছে। মুখখানি সরিয়া গেল; পরক্ষণেই একটী সুন্দরী কামিনী তাঁহার নিকটে উপস্থিত।"

অনেকক্ষণ মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কামিনী বলিল, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?"

ব্রাহ্মণ।—না, কখনো তোমাকে দেখি নাই।

কামিনী।—দেখেছেন বই কি, মনে হোচ্চে না। আমার নাম বিনোদিনী, আমার মায়ের নাম ছিল তারামণি; আপনার স্ত্রী আমার মাসী হন।

ব্রাহ্মণ। ওহো! বটে বটে! অনেক দিন দেখিনি, সেইজন্য ভ্রম হচ্ছিল।

কামিনী। সন্ধ্যা হয়, এখন আর কোথায় যাবেন, বাড়ীর ভিতরে আসুন।

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, যোগাযোগ মন্দ নয়, সত্যই রাত্রি আসিল, এ রাত্রে যাবই বা কোথা? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "চলো।"

কামিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কামিনী তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া একটী মনোরম কক্ষে বসাইল। চমৎকার বাড়ী, দিব্য বড়মানুষী কেতায় সাজানো, গৃহমধ্যে বহুমূল্য আসবাবপত্র, দুগ্ধফেননিভ পরিষ্কার শয্যা, জোড়া জোড়া বাতী দেওয়া বেলোয়ারী সেজ।

সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বিনোদ! তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া আমি বড় খুসী হইলাম; রাজরাণীর মত তুমি বেশ সুখে আছ, আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখে বাস কর।"

মাথা হেঁট করিয়া বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল।

একজন দাসী আসিয়া বাতী জ্বালিয়া দিয়া গেল। কামিনীর সহিত ব্রাহ্মণ গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্পাবসানে কামিনী জলযোগের আয়োজন করিয়া দিল, ব্রাহ্মণ বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ নিত্য একাহারী, কিন্তু সে দিন উপবাস। কামিনী স্বহস্তে রন্ধন করিল, অসন্দিগ্ধ অন্তরে ব্রাহ্মণঠাকুর সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। আহারান্তে পুনরায় গল্প আরম্ভ। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কামিনী বলিল, "মেসো মশায়! আমার একটী নিবেদন আছে। একটী সমস্যা আপনাকে পূরণ করিয়া দিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সমস্যা ?"

বিনোদিনী বলিতে লাগিল, "আমার স্বামী নবাব-সরকারে চাকরি করেন, তাঁর কাছে আমি থাকি। নবাব আমার স্বামীকে নবাবী খেতাপ দিবার অভি-প্রায়ে কল্মা পড়াইয়া মুসলমান করেন, তখন আমি তাহা জানিতাম না; লজ্জার কথা; - সেই স্বামীর ঔরসে আমার একটী পুত্রসন্তান হয়েছে। নবাব বলেন, সুন্নত দাও, আমি বলি, হিন্দু মতে অন্নপ্রাশন হবে। বিষম সমস্যা! এখন আপনি বলুন, কি করা কর্ত্তব্য ?"

ব্রাহ্মণের চক্ষুস্থির। ভাবিয়া ভাবিয়া বিনোদিনীর কথায় তিনি উত্তর দিলেন, "সমস্যা বড় শক্ত, কল্য প্রাতঃকালে তোমার সমস্যা পূরণ করিব।"

বিনোদিনী শয়ন করিতে গেল, ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি ভাবি-লেন, সর্ব্বনাশ! আমি শুচিবাই, যবন স্পর্শে পবিত্রতা লাভের আশায়, গঙ্গাস্নানে বাহির হই, মুচির বাড়ীতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট মুচির অন্ন ভক্ষণ করি, তার পর আবার এই যবনীর অন্ন গ্রহণ করিতে হইল, বিপরীত! এক পাপের জায়গায় তিনপাপ মিশিল!

"হায়—হায়—হায়! বিধির খেলা! হায়রে শুচিবাই!
জাত খোয়ায়ে ভাবছি এখন কাশী যাই কি মক্কা যাই ?"

ক্ষোভে, ঘৃণায়, অনুতাপে রজনী অবসান হইল। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বিনোদিনীকে কিছু না বলিয়াই তিনি রাস্তায় বাহির হইলেন; ভাবিলেন, "কাশীও নয়, মক্কাও নয়, গৃহস্থাশ্রমও নয়।"

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না, মনে ধিক্কার জন্মিল, সংসারে বিরাগ উপজিল, উদাসীন হইয়া তিনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা শুচিবাই হন, তাঁহারা এই গল্পটি স্মরণ রাখিয়া কার্য্যাকার্য্য বিচার করিবেন।

শিশু-পালন।

লেখক----কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত।

গৃহীলোকের যত প্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সন্তানপালন একটি প্রধান কর্ত্তব্য। শিশুই ভবিষ্যতে যুবা হইয়া সমাজের বহুতর কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। শৈশবে রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য, বিকলেন্দ্রিয়, দুর্ব্বল ও চিররোগী হইলে তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে কোন কার্য্যেরই আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। একে ত বাঙ্গালী সমাজে পিতামাতা প্রায়ই বালক-বালিকা, অপুষ্ট ও দুর্ব্বল, কাজেই তাঁহাদের সন্তানগণ বিকলেন্দ্রিয় ও দুর্ব্বল হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে এবং পুরুষের একবিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে সর্ব্বাবয়বের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু বহুস্থলে আমাদের বঙ্গদেশে ১৩।১৪ বৎসরের অপুষ্টা বালিকাকে প্রসূতি হইয়া সন্তান পোষণ করিতে হয় এবং ১৮।১৯ বৎসরের বালককেও সন্তানের পিতা হইতে দেখা যায়। ঐ সকল পিতামাতারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সন্তানগণের লালন-পালনে অধিকতর সতর্কতার আবশ্যক। বস্তুতঃ আমাদের দেশে সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে আজকাল চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপদেশ আদৌ অনুসৃত হয় না বলিয়াই আমাদের সন্তানসন্ততি এত নির্জীব ও অল্পায়ু।

শাস্ত্র বলিতেছেন—"ঊনষোড়শ বর্ষাম অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিঃ।

যত্তধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥

জাতো বা ন চিরং জীবেৎজীবেৎ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়।

তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভধানং নকারয়েৎ॥

পূর্ণ ষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণ বিংশেন সঙ্গতা।

শুদ্ধে গর্ভাশয়েমার্গে রক্তশুক্রে নিলে হৃদি॥

বীর্য্যবন্তং সুতং সুতে ততো ন্যূনাদয়ো পুনঃ।

রেল্যল্যায়ুরধন্যো বা গর্ভোভবতি নৈবব॥ বাগ্ভটঃ

দেশে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব এবং বাল্যবিবাহের প্রচলন বশতঃ উক্ত শাস্ত্রোপদেশ মত চলা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। বালকের আর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয় না। বালিকার বিবাহের পরেই "ধুলাপায়ে ঘরবসত" দ্বিরাগমন হইয়া থাকে। অধুনাতন সামাজিক প্রথানুসারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বালকবালিকার সন্তান হওয়ায় তাহারা নিশ্চয়ই দুর্ব্বল, বিকলেন্দ্রিয় ও অল্পায়ু হইতেছে। ঐ সকল শিশুর প্রতিপালনকল্পে বিশিষ্ট যত্ন করা সকল গৃহীরই কর্ত্তব্য।

শিশুর কিশোর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তিন অবস্থা হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশু তিন প্রকারের—দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী ও অন্নজীবী। কেবলমাত্র দুগ্ধপান করিয়া যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তদবধি তাহারা দুগ্ধজীবী। অন্নপ্রাশনের পর যে বয়স পর্য্যন্ত উহারা দুগ্ধপান ও অন্নভোজন করিয়া বর্দ্ধিত হয় তৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা দুগ্ধান্নজীবি এবং যে বয়সে তাহারা দুগ্ধপান না করিয়াও মাত্র অন্নভোজন করিয়া জীবিত থাকিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, তখন তাহারা অন্নজীবী শিশু।

শৈশবের আহারই ভবিষ্যতের ভারসহ দেহের বর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, অতএব শৈশবে পরিপাকশক্তি অর্থাৎ জঠরাগ্নি সমতা থাকিলে এবং ধাতু পোষক আহার পাইলে শিশু দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ট হইবার পরেই দুগ্ধই তাহার একমাত্র জীবনপোষক খাদ্য। প্রসব করিবার ২।৩ দিন পরে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ আমে। ঐ ২।৩ দিন আন্তরিক শ্লেষ্মায় আছন্ন থাকায় নবকুমারের বড় কিছু পোষক পদার্থের আবশ্যক হয় না। এবং ক্ষুধাও থাকে না, তজ্জন্য ঐ ২।৩ দিন উহাকে মধ্যে মধ্যে খাঁটি মধু চাটাইলে শ্লেষ্মার পরিপাক হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, আবশ্যক হইলে ঐ ২।৩ দিন কখন কখন ঈষদুষ্ণ গাভীদুগ্ধ পলিতা করিয়া খাওয়াইতে হয়। মাতৃস্তনে দুগ্ধ আসিলে শিশুর মুখে স্তনের বোঁটা দিয়া স্তন্যপানে অভ্যস্ত করিবে। পলিতা অথবা Feeding Bottle এ করিয়া শিশুকে দুগ্ধপানে অভ্যস্ত করিলে স্তন্যপানের অনুরূপ কার্য্য হয়; শিশু আপন ইচ্ছা ও ক্ষুধানুযায়ী দুগ্ধ পান করে; ঝিনুক ও চামচে করিয়া দুগ্ধপান করাইলে সে সুযোগ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু অনেক সময়ে শিশুর অক্ষুধার উপর দুগ্ধপান করাতে অনেক অপকার হইয়া থাকে।

জগতে যত প্রকার পোষক পদার্থ আছে, তন্মধ্যে মাতৃস্তনই শিশুর বিশিষ্ট উপযোগী ও সহজ-পাচ্য, কিন্তু মাতার ব্যাধি হেতু অথবা বায়ু পিত্ত কফের আধিক্য বশতঃ সময়ে সময়ে স্নেহময়ী মাতার স্তন্য-পীযূষও দূষিত হইয়া গরলের ন্যায় কার্য্য করে। করুণাময়ী মা দুগ্ধ দূষিত হইয়াছে না জানিয়া স্নেহভরে সন্তানকে অমৃত নির্ঝরিণী পান করাইয়া যান, কিন্তু সন্তান তাহা পরিপাক করিতে না পারায় পীড়িত হইয়া পড়ে—সে কখন বমি করে, কখন অপাক দাস্ত করে, কখন তাহার উদর বায়ু কর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়া মন্দ মন্দ বেদনা অনুভব করায় বড়ই কাতর হয়, এবং ক্রমে অগ্নিমান্দ্য ও যকৃৎপীড়াগ্রস্ত হয়।

মাতৃস্তন্য কখন দূষিত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারাতেই অনেক সময়ে শিশুর নানা অসুখ হইয়া থাকে; শাস্ত্র উপদেশ মতে পুরাকালে শিশুকে স্তন্য-পান করাইবার পূর্ব্বে, প্রথমে একটু স্তনদুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া তাহার বর্ণাদি দেখিয়া তবে প্রসূতি সন্তানকে উহা পান করাইতেন, অদ্যাপি উক্তরূপ দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবার প্রথা থাকিলেও এখনকার গৃহলক্ষ্মীরা উহার তাৎপর্য্য অবগত নহেন। স্তন্যপরীক্ষাই উহার মুখ্য অভিপ্রায়, অধিকন্তু প্রথমে অল্প দুগ্ধ গালিয়া ফেলিলে, হঠাৎ অধিক দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া সন্তানের শ্বাসরোধ করিতে পাবে না মাতৃস্তন্য কখন স্বাভাবিক অবস্থায় ও কখন বিকৃত অবস্থায় থাকে, তাহার লক্ষণও জানিবার উপায় নিম্নে কহিতেছি।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ।—পাণ্ডুবর্ণ ও ঈষৎ শীতল স্তন্যই বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোশ, উহা জলে ফেলিলে বিবর্ণ ও তুলার আঁশের মত কোন পদার্থ পরিলক্ষিত হয় না, জলের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়। ইহা সুস্বাদু ও গন্ধহীন।

বিকৃত দুগ্ধ।—বাতদুষ্ট স্তন্যদুগ্ধ কিঞ্চিৎ শ্যাব (শাকের মত) অরুণ বর্ণ স্বাদে কষা, জলবৎ তরল এবং ফেনা ফেনা। পিত্তদুষ্ট দুগ্ধ স্বাদে অম্ল, তিক্ত অথবা ঝাল, জলে দিলে নীল পীত, কাল অথবা তাম্রবর্ণ দেখায়, রক্ত বা শবগন্ধি এবং উষ্ণ। শ্লেষ্মাদুষ্ট স্তন্য স্বাদে অতি মিষ্ট অথবা লবণ রস; ঘন পেছলা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এবং পেঁজা তুলার মত জলের সহিত অমিশ্রিতভাবে দেখা যায়, শুক্লবর্ণ এবং ঘৃত চর্ব্বির মত, গন্ধ বিশিষ্ট।

ঐ সকল স্তনদুগ্ধ পান করাইলে শিশুর যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া পরিপাক শক্তির হীন করে ও নানাব্যাধির উৎপাদক হইয়া থাকে। প্রসূতি পুনঃ গর্ভবতী হইলে তাহার দুগ্ধ ঘন, ভারি ও দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে ঐ দুগ্ধ পান করিলে শিশুর অহিস্তিকা (এঁড়ে) রোগাদি হইয়া থাকে।

বাতদুষ্ট দুগ্ধপানে শিশুর নানাপ্রকার বায়ুরোগ, তড়্‌কা, হৃদ্রোগ, হাঁপানি প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে এবং শিশু ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়ে, এবং উহার কঠিন গুট্‌লে দাস্ত হইতে থাকে। পিত্তদুষ্ট দুগ্ধ সেবনে শিশুর গাত্রের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়, গাত্রদাহ অজীর্ণ, যকৃতের দোষ, পাণ্ডু, কামলা (নেবা) প্রভৃতি রোগ জন্মায়, প্রায়ই শিশুর পীতবর্ণের তরল পুরীষ নিসৃত হয়। শ্লেষ্মাদুষ্ট দুগ্ধ সেবনে শিশুর সর্দ্দি, কাশী, ক্ষুধামান্দ্য ও দেহ ভার হইয়া থাকে; মলের রং সাদা হয় এবং পরিমাণে অনেকটা থ্যাস্ থেসে মল নির্গত হয়। বাতাদির

প্রকোপ বশতঃ স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে প্রসূতিকে মুগের যূষ পান করাইলে বিকৃত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে; অধিকন্তু বামুনহাটী, দেবদারু, আতাইচ ও বচ এক আনা মাত্রায় শীলায় পেষণ করিয়া খাওয়াইলে অথবা আকনাদী, দুর্ব্বা মুতা, চিরতা, দেবদারু, শুঠ অনন্তমূল এবং কটকী প্রত্যেক ।০ চারি আনা মাত্রায় ৷৷৹ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এক ছটাক মাত্রায় দিনে দুইবার করিয়া খাওয়াইলে বিকৃত স্তন্য বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রসূতির গুরুপাক ও দূষিত পদার্থের আহার এবং অহিতকর বিহারাদি দ্বারাই শরীরে বাতাদি দোষ কুপিত হওয়াতেই স্তনদুগ্ধ বিকৃত হইয়া থাকে এবং ঐ রূপে বিকৃত দুগ্ধই শিশুর ব্যাধি হইবার প্রধান কারণ তজ্জন্য প্রসূতি সর্ব্বদা অতি সাবধানে আহারবিহার করিবেন। প্রসবের পর দেড়মাস পর্য্যন্ত অতি সতর্কতা সহকারে প্রসূতি আহারবিহার করিবেন। ঘৃতাদি স্নেহসংযুক্ত অন্নাদি আহার করিবেন এবং সর্ব্বদা পরিস্কার উষ্ণ বস্ত্রাদিদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত রাখিবেন। দেড় মাস অতীত হইলে বা পুনঃ রজঃ দর্শন হইলে তবে প্রসূতির সূতিকাদোষ নষ্ট হয়, তখন যদিও আর পথ্যাদির কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না, তথাপি প্রসবের পর চারিমাস পর্য্যন্ত প্রসূতির সুপথ্যাশিণী হইয়া থাকা বিধেয়।

বিশুদ্ধ বা বিকৃত স্তন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলে এবং বিকৃত হইবামাত্র উপরোক্ত মুষ্টিযোগ দ্বারা তাহা শোধিত (বিশুদ্ধ) করিয়া পান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গের কোন আশঙ্কা থাকে না। স্তনদুগ্ধ শুকাইয়া গেলে বা কমিয়া গেলে— ময়দা, অন্ন, মাংস বা ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল, লাউ, নারিকেল, কেশুর, পাণিফল প্রভৃতি সেবনে স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়

প্রসূতি রুগ্না বা ব্যাধিগ্রস্থা হইলে শিশুর জন্য (স্তন্যপান করাইবার জন্য) পৃথক ধাত্রী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, কিন্তু মাতা নীরোগ স্বাস্থ্যবতী হইলে অপর ধাত্রী রাখার আবশ্যক নাই। অবশ্য লালনপালনার্থ একটা ছাড়া দশটা দাসী রাখা যাইতে পারে, কিন্তু মাতৃস্তন্যের প্রাচুর্য্য স্বত্বেও নীচ জাতীয়া ধাত্রীর স্তন্য পান বিধেয় নহে, বিশেষতঃ স্তন্যপান না করাইলে সেই দুগ্ধ প্রসূতির শরীরে সঞ্চারিত হইয়া নানাপ্রকার স্ত্রীরোগ উৎপাদন করে। অপিচ স্তন্যের সহিত ধাত্রীর (যে স্তন্য পান করায়) প্রকৃতি ও গুণ সন্তানে বর্ত্তে, তজ্জন্য মাতার স্তন দুগ্ধই প্রশস্ত ও প্রশংসনীয়। মাতৃস্তনে দুগ্ধ না থাকিলে বা তিনি পুনঃ গর্ভবতী হইলে বা রুগ্না হইলে স্তন্য পানার্থে স্বজাতীয়া বা সৎকুলজাতা উচ্চবংশোদ্ভবা

সাধ্বী সচ্চরিত্রা ধাত্রী নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। দরিদ্রা, লোভপরায়ণা, ক্ষুধার্ত্তা, রোগক্লিষ্টা, কুপথ্যাশিনী ও নীচবংশোদ্ভবা ধাত্রী স্তন্যপান করাইবার জন্য কদাচ নিয়োগ করিবে না। তদপেক্ষা মাতৃস্তন্যের অভাবে গাভী বা ছাগদুগ্ধ পান করাইয়া শিশুপালন বরং শতগুণে শ্রেয়ঃ। নবকুমারের পোষণার্থ প্রথমতঃ ৪ ঘণ্টা অন্তর দিবসে এবং রাত্রে দুইবার স্তন্য পানই যথেষ্ট। তৎপরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান অথবা দিবারাত্রে ৬বার গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ এবং ৩।৪ বার স্তন্যপান করাইলেই শিশুর যথোচিত তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। অধিক রাত্রে দুগ্ধপান অথবা নিদ্রিত শিশুকে জাগাইয়া দুগ্ধপান করাইলে তাহার স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে।

মাতৃস্তনের অনুকল্পে বা পরিবর্ত্তে যত প্রকার দুগ্ধ শিশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে গাভী ও ছাগীদুগ্ধই প্রশস্ততর; কারণ ঐ দুই প্রকার দুগ্ধেই প্রায় মাতৃস্তেনর অনুরূপ গুণ আছে। গ্রাম্য পশুর মধ্যে মহিষদুগ্ধও খাদ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুর পক্ষে উহা বড় দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ ও গুরু। ধীরোষ্ণ গব্যদুগ্ধই অমৃতোপম এবং মাতৃস্তনের ন্যায় প্রায় সমগুণ সম্পন্ন, কিন্তু সর্ব্বদা উহা পাওয়া কঠিন বিধায়ে এবং গোয়ালারা নানাস্থানের জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ জোগান দেওয়ায় উহা দূষিত হওয়ায় অগ্নিসংযোগে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধই পান করান বিধেয়। ছাগীদুগ্ধ কিঞ্চিৎ শৈত্যগুণসম্পন্ন তজ্জন্য উহাও জ্বাল দিয়া খাওয়ান উচিত। কিন্তু গাভীদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ এবং ছাগীদুগ্ধ জ্বাল দিয়া শীতল করিয়া খাওয়াইলে অধিকতর গুণকারী হইয়া থাকে। পৈত্তিকব্যাধিগ্রস্থ উদরাময়, আমাশায়, আমরক্ত যকৃতপীড়ায় পীড়িত শিশুর পক্ষে ছাগীদুগ্ধ বিশেষ উপকারী।

দুগ্ধে কোন অম্লদ্রব্য বা গোমূত্রাদি পড়িলে জ্বাল দিলেই যেমন ছিঁড়িয়া গিয়া জলীয় অংশ পৃথক হইয়া পড়ে এবং নিম্নে ছোট ছোট কুচা কুচা ছানার মত ঘন পদার্থ জমিয়া যায়, তদ্রূপ পাকস্থলীতে দুগ্ধ গিয়া পড়িবামাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানার মতঅংশে বিভক্ত হইয়া যায়; মাতৃস্তন্যে যে ছানা বাঁধে তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তজ্জন্য সে গুলি পরিপাক করিতে শিশুর বিলম্ব হয় না। কিন্তু অন্যান্য দুগ্ধের ছানার আকার অপেক্ষাকৃত বড় বড় ও ডেলা ডেলা হয়, তজ্জন্য গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ হজম হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে এবং তজ্জন্য শিশুর উদর ভার হইয়া থাকে; অতএব গাভীদুগ্ধাদি খাওয়াইবার সময় যদি শিশুর পরিপাক

শক্তি প্রখর না থাকে, তাহা হইলে উক্ত দুগ্ধের সহিত অল্পপরিমাণে যবমণ্ড (বার্লী, পার্নিফিলের গুঁড়ার মণ্ড প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। আজকাল অনেক স্থলে জমান দুগ্ধ (Con densed milk.) শিশুকে খাওয়াইবার প্রথা হইয়াছে; কিন্তু উহাতে গো মহিষাদি নানারূপ দুগ্ধ মিশ্রিত থাকাই সম্ভব, বিশেষতঃ চিনি মিশ্রিত থাকায় উহা শিশুর পক্ষে দুষ্পাচ্য, ঐ জমান দুগ্ধ শিশুর দুর্ব্বল পাকযন্ত্রের পক্ষে কদাচ উপযোগী নহে।

শিশুর প্রকৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া যদি উহার শ্লেষ্মা প্রধান প্রকৃতি না হয়, তাহা হইলে অন্নপ্রাশনের পর (৬ হইতে ৮ মাসের পর) অন্ন (ভাত) চটকাইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেই ভাতের অল্প অল্প মাত্রায় দিনে ২।১ বার দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে অভ্যাস করাইলে শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতি এবং শরীর স্নিগ্ধ ও পুষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু যকৃতপীড়া হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। দুধতোলা ও পাতলা দাস্তের সহিত সাদা সাদা কুচি কুচি ছানার মত অপাক ও টকগন্ধাদি মল নিঃসরণ শিশুর বদহজমের লক্ষণ। সর্ব্বদা ক্রন্দন বা থাকিয়া থাকিয়া বিকট ক্রন্দন প্রায়ই শিশুর পেটে সঞ্চিত আমের পরিচায়ক। অপাক দুর্গন্ধি মল নিঃসরণে গাভীদুগ্ধ ও স্তন্যদুগ্ধের মাত্রা বারে কমাইয়া দিবে। দুধতোলা (বমি) হইলে মৌরীবাটা জল এবং পাতলা বাহ্য হইলে ৫+১০ ফোটা চুণের জল দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করাইলে উপদ্রবের উপশম হয়। পেটব্যথায় ও পেটে আম হইলে ১০+১৫ ফোঁটা আমরুল শাকের রসে লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিয়া সেই রস খাওয়াইলে শান্তি হয়। কুচান শুক্‌নো কাঁচা বেল এবং মুতা দিয়া সিদ্ধ করা সর্জ্জল দুগ্ধও শিশুর উদরাময়ের ঔষধ। দূষিত দুগ্ধপান জন্য নানা অসুখ অবশ্যম্ভাবী তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে শিশুকে অল্প বমন ও মৃদু বিরেচন করান কর্ত্তব্য—তজ্জন্য উহাকে তিক্তরস সেবন করাইলেই যথেপ্সীত কার্য্য সাধিত হয়। পূর্ব্বকালের প্রসূতিরা শিশুকে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু উচ্ছে পাতার রস নাল্‌তে ভিজা জল এবং আলুই খাওয়াইতেন। ঐ সকল সামান্য সামান্য ঔষধ শিশুর কোষ্ঠশুদ্ধি, অগ্নিবৃদ্ধি এবং যাবতীয় ক্রিয়ার পোষকতা করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন সকল গৃহেই ঠাকুরমার টোট্‌কার হাঁড়ির অভাব হইয়াছে। নাল্‌তে, আলুই পুরাতন ঘৃত গুড় এবং তেঁতুল আর কোন গৃহে প্রায়ই স্থান পায় না। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐ সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যে অবহেলা করিয়া Infantile Liverদুধে যকৃত প্রভৃতির প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছি ও করিতেছি।

যদি সে কালের পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের উপদেশ মত গৃহলক্ষ্মীরা নিজ নিজ শিশু-দিগকে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন একটু আলুই ঘসিয়া খাওয়ান, তাহা হইলে যে কত কল্যাণ সাধন হয়, তাহা অল্প দিনেই দেখিতে পান। আলুই খাওয়াইতে ত বলিলাম, কিন্তু আলুইএর পাঠ এখন লোপাঠ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আলুই কি পদার্থ ও কি কি উপাদানে প্রস্তুত তাহা লিখিত হইল।

খোসা সহিত বড় এলাচ ২টা, জোয়ান, মৌরী ও লবঙ্গ প্রত্যেক আন্দাজ ।৹ আধ ভরি, কাঁচা কালমেঘের পাতা সর্ব্বসমান আন্দাজ ২॥৹ ভরি, শীলায় পেষণ করিয়া লম্বা লম্বা দাটি বা বড় বড় বড়ী পাকাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে আলুই প্রস্তুত হয়! আবশ্যক মত ঐ দ্রব্য (২—৬ রতি) পাথরের পাত্রে জল দিয়া ঘসিয়া প্রত্যুষে খালি পেটে শিশুকে খাওয়াইতে হয়।

সময়ে সময়ে শিশুর পরিপাক শক্তি এত কমিয়া যায় যে, দুগ্ধাদি কিছুতেই জীর্ণ হয় না, তখন ডাক্তারেরা Peptonised milk ও আশু পাচ্য Patent Food খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু অম্ল সংযোগে দুগ্ধ নষ্ট করিয়া ছানার জল অনুমোদন করিলেও সকল সময়ে আমরা Patent food এর পোষকতা করিতে পারি না। ঐ সকল খাদ্যের মধ্যে কি কি দ্রব্য কত পরিমাণ মিশ্রিত আছে, ব্যবস্থাপক ডাক্তারেরা যখন তাহা জ্ঞাত নহেন, তখন ঐ সকল খাদ্য শিশুর আহারার্থে ব্যবস্থা দিতে পারি না। খইএর মণ্ড, সাগু, শঠীর পাল বা বার্লী, পাণিফলের গুঁড়ার মণ্ডই আমরা ব্যবস্থা দিতে পারি। শিশুর পরি-পাকশক্তি কিরূপ, পুরীষ, তরল কি কঠিন আমযুক্ত কি অম্লগন্ধি; ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিলে অচিরেই উহার অগ্নি দীপ্ত হইয়া উঠিবে। অত্যধিক দিন উপর্য্যুপরি লঘু খাদ্য খাওয়াইলে বালকের অগ্নি একে-বারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অতএব কেবল আবশ্যকমত সময় পর্য্যন্ত লঘু আহার দিয়া ক্রমশঃ উহার সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাওয়াইতে খাওয়াইতে শেষে লঘু পথ্য বন্ধ করিয়া পুনশ্চ দুগ্ধ ও অন্নাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। উপরোক্ত খাদ্যের মধ্যে অপাকের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ বা কঠিন দাস্ত হইলে খই, তরল দাস্তে ও আমে যব-মণ্ড (বার্লী) ও পাণিফল, পুষ্ট্যর্থে সাগু ও যকৃতদোষে শঠীর পালই উত্তম ব্যবস্থা; ঐ সকল দ্রব্য জল সহ পাক করিয়া পথ্যরূপে ব্যবহার করাইবে। কেবলমাত্র দুগ্ধজীবী শিশুর অসুখ হইলে অনেক সময়ে প্রসূতিকে সুপথ্য ও ঔষধ খাওয়া-ইলে তাঁহার স্তন্য পান করিয়া সন্তান নিরাময় হইয়া থাকে।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর যত প্রকার ব্যাধি হয় তন্মধ্যে ঘুংড়ী কাশী, হাঁপানি প্রভৃতি শ্লেষ্মা প্রধান রোগ এবং অপাক হেতু দুধে যকৃতই প্রধান। ঐ সকল ব্যাধি হইবামাত্র তাঁহাদের প্রতিকারের জন্য চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য। বাল্যকালে সকলেরই শরীর শ্লেষ্মাপ্রবল থাকে তজ্জন্য ঐ সময়ে অধিক শৈত্যক্রিয়া বা অধিক শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্যাদি ব্যবহার করান উচিত নহে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যের অনুকূল অন্ন ও পানীয় ক্রমশঃ শিশুকে অভ্যস্ত করিবে।

শিশুর আহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন জননীর অবশ্যকর্ত্তব্য, তদ্রূপ শয্যা ও শিশুর গাত্রবস্ত্রাদি যাহাতে সর্ব্বদা সুকোমল, শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়েও মাতার দৃষ্টি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়—ধূলি, মলমূত্রাদি দূষিত বস্ত্রাদি ও কঠিন শয্যা বালকের নানা ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে। সর্ব্বদা রজকের সুবিধা না হইলেও উষ্ণজলে বা ক্ষারজলে শয্যাবস্ত্র, কাঁথা, জামা, মোজা প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে ধৌত করিয়া শুষ্ক কস্মতঃ ব্যবহার করান কর্ত্তব্য। কোন প্রকার ভিজা বা সেঁতানে শয্যাদিতে বালককে কথনই শয়ন করাইবে না। মলমূত্রাদি সংলগ্ন ছিন্ন বস্ত্রাদি কথনই বালকের শয্যায় রাখিবে না। তৎক্ষণাৎ উহা ত্যাগ করাইয়া অপর শুষ্ক ও পরিষ্কৃত বস্ত্র বদলাইয়া দিবে। উপরোক্ত প্রণালীতে সন্তান পালিত হইলে তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইবেই এবং পরে সেই শিশু পুষ্টবপু, কর্ম্মঠ, মেধাবী ও দীর্ঘজীবী হইবেই। আর একটি কথা গৃহী মাত্রেই স্মরণ রাখিবেন—সন্তানকে অযথা তাড়না কিম্বা ভয় প্রদর্শন অতীব গর্হিত; রোদনই বালকের বল, বৃথা তাড়নায় ও ভয় প্রদর্শনে ক্রন্দন জন্য শিশুর মনে ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার হওয়ায় নানা বৃত্তির বিকৃতি বশতঃ শিশুর শারীরিক ও মানসিক পীড়া হইয়া থাকে; অনেক সময়ে শিশুদিগকে জুজুর ভয় দেখাইয়া আমরা ছেলে মেয়েদের প্রকৃতই একটি একটি অদ্ভুৎ জুজু করিয়া তুলি; বাল্যের ভীতি প্রদর্শন ও নানাপ্রকার ভূতের গল্প শিশুর ভবিষ্যৎ বয়সে সাহসহীনতার একটি প্রধান কারণ। শিশু যাহাতে সদা প্রফুল্ল ও নির্ভীক থাকে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্যকর্ম্ম! হঠাৎ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ বা শয্যাদিতে বিক্ষেপ বা নিদ্রাভঙ্গ করাও শিশুর বিবিধ ব্যাধির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। শিশুকে মধ্যে মধ্যে শয্যা ও দোলায় শয়ন করান ভাল, সর্ব্বদা কোলে কোলে থাকিলে বালকের স্বাস্থ্য ভাল না থাকারই কথা। বয়সের বৃদ্ধির সহিত তাহার নয়ন

তৃপ্তিকর ঝারা ও খেলনা দেখাইয়া শিশুর প্রীতিবর্দ্ধন করিবে। হামা টানিতে শিখিলে তাহাকে ভূমিতে খেলা করিয়া বেড়াইতে দিবে, ক্লান্ত হইলে ক্রোড়ে লইবে, এইরূপ অল্প অল্প ব্যায়াম দ্বারা শিশুর অঙ্গ পুষ্ট হয়। ঔষধ সেবন, তৈল মর্দ্দন, গা মুছান ও স্নান প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য। কার্য্যানুরোধ ভিন্ন সন্তান সন্ততিকে বৃথা কাঁদাইও না; যাহাতে তাহাদের মন সদাই প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়ে যত্নের ক্রটী করিবে না; মন সন্তুষ্ট থাকিলে শিশুর দেহও উত্তরোত্তর সম্পূর্ণভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। বায়ু, অগ্নি, ধূম, রৌদ্র জলাশয় উচ্চস্থান গহ্বর প্রভৃতির নিকট শিশুকে কোন ক্রমেই একা গমন করিতে দিবে না।

এই সকল বিধি নিষেধ পালন করা কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই আয়ত্বাধীন একটু যত্ন, একটু পরিশ্রম করিলেই প্রত্যেক প্রসূতিই এই উপায়ে নিজ নিজ সন্তান পালন করিতে সমর্থা হইবেন। বাল্যের এই চেষ্টায় পরে সুফললাভ সতঃসিদ্ধ এবং শিশুর চিকিৎসার্থে শত শত মুদ্রা খরচের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভও নিশ্চিত। রোগ হইলে তাহার আরোগ্যকল্পে চেষ্টা করাপেক্ষা যাহাতে রোগ না জন্মাইতে পারে সে উপায় উদ্ভাবন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্যাধি যদিই জন্মায় অঙ্কুরেই তাহার উৎপাটন প্রার্থনীয়। বাল্যকালে যকৃতাদি পীড়ার শান্তি ও মূলোৎপাটন না করিলে কালে ঐ সকল ব্যাধিই অগ্নি; বিষ বা শত্রুর ন্যায় প্রবল হইয়া দেহের ধ্বংসসাধন করিতে থাকে, যে হেতু;—

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্য স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়াগদঃ।
বহ্নিশত্রু বিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥

অপিচ— সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যশ্চাসাধ্যতাং তথা।
ঘ্নন্তি প্রাণান সাধ্যস্ত নরানামক্রিয়াবতাং॥

—০:০:০—



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।

ইনি স্বর্গীয় রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতভ্রমণে আসিয়া স্বদেশে প্রতিগমনপূর্ব্বক অতি অল্পদিন পরেই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম যৌবনে লোক-লীলা সংবরণ করেন, অতএব প্রিন্স জর্জ্জ সেই সময় প্রিন্স অব ওয়েল্স উপাধি

প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠের অভাবে এই দ্বিতীয় পুত্রই এখন ইংলণ্ডের রাজা হইলেন, রাজা পঞ্চম জর্জ্জ আমাদের ভারতবর্ষের নবীন সম্রাট।

সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যু এবং দ্বিতীয় পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি এতৎসম্বন্ধে একটি পূর্ব্বকাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম, দ্বিতীয় উভয় রাজকুমার যখন শিশু, সেই সময় ইংলণ্ডের সুপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত জ্যাডকিল তাঁহাদের ভাগ্যফল গণনার নিমিত্ত রাজপ্রাসাদে আহূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যাডকিল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গণনা করিয়া বলেন, "জ্যেষ্ঠ কুমারের ভাগ্য অপ্রসন্ন; রাজপদ প্রাপ্তির অগ্রেই তাঁহার প্রাণান্ত ফল দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় কুমারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন; সময়ে ইনিই পঞ্চম জর্জ্জ উপাধি ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন।"

পণ্ডিতবর জ্যাডকিলের ভবিষ্যৎ গণনাই সার্থক হইল; রাজকুমার জর্জ্জ পঞ্চম-জর্জ্জ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিলেন।

"পঞ্চম জর্জ্জ উপাধির মূল কারণটি এই স্থলে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে। তাঁহার পিতা "সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড" উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত হেতু এই যে, সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এড্‌ওয়ার্ড নামে ইংলণ্ডে একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড। তাঁহার মৃত্যুর পর তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এড্‌ওয়ার্ড নামে ইংলণ্ডে আর কেহ রাজা হন নাই; দীর্ঘকাল অবসানে মহারাণীভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্তমএড্‌ওয়ার্ড হইয়া রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এখন যিনি রাজা হইলেন, তিনি পঞ্চম জর্জ্জ হইলেন কেন, এই সমস্যারও পূরণ করা উচিত। রাজা তৃতীয়জর্জ্জ মহারাণীভিক্টোরিয়ার পিতামহ, পিতা ছিলেন ডিউকঅবকেণ্ট, তিনি পিতৃ বর্ত্তমানে লোকান্তরগমন করাতে তৃতীয় জর্জ্জের পরলোক প্রাপ্তির পর মহারাণীভিক্টোরিয়ার এক পিতৃব্য চতুর্থ জর্জ্জ উপাধি লইয়া কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, সুতরাং তদীয় অপর এক ভ্রাতা চতুর্থ উইলিয়ম উপাধি ধারণ করিয়া উত্তরাধিকারী হন, তাঁহার কিন্তু জর্জ্জ উপাধি হয় নাই, চতুর্থ জর্জ্জ পর্য্যন্ত সেই উপাধির অবসান হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, চতুর্থ উইলিয়মও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতৃব্য; তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক যাত্রা করেন, অতএব তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে রাজ্যাধিকারিণী হইয়াছিলেন। চতুর্থ জর্জ্জের পর

৮০ বৎসর কাল জর্জ্জ উপাধি বিলুপ্ত ছিল, ৮০ বৎসর পরে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চম জর্জ্জ হইলেন।

বাল্যাবস্থায় এই রাজকুমার সমুদ্রযাত্রায় ও সামুদ্রিক পোতবাহনে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে রণতরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গীয়া পিতামহীরও তাহাতে অনুমোদন ছিল। রাজকুমার জর্জ্জ যুদ্ধজাহাজে নাবিকের কার্য্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুত্র, জাহাজে কিন্তু রাজগৌরবের কিছুমাত্র অভিমান রাখিতেন না; জাহাজের নাবিকেরা তাঁহাকে রাজসম্মানানুরূপ সম্বোধন করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন, সকলের সঙ্গে সখাভাবে বাক্যালাপ করিতেন। এমন কি পাল-রজ্জু আকর্ষণ, পাল উত্তোলন, দণ্ডাদি বহন ও কেবিন মার্জ্জন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য সামান্য সামান্য কার্য্য করিতেও তিনি কষ্ট অথবা লজ্জা বোধ করিতেন না। নাবিকের কার্য্য করিতেন বলিয়া তিনি যে, সাধারণ শিক্ষায় উদাসীন ছিলেন, তাহা নহে, উপযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে যুদ্ধবিদ্যা ব্যায়াম বিদ্যা, রাজনীতি বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ও কাব্যসাহিত্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, সামাজিক ব্যবহারে ইনি মিতব্যয়ী, সরলচিত্ত, মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কার। পদগৌরবে কদাচ তিনি কাহারও প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন না, গৌরবান্বিত সম্ভ্রান্ত জনগণ অবধি আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার সদ্‌গুণে ও সদ্‌ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট।

দুর্ভাগ্যক্রমে জ্যেষ্ঠ সহোদরের অকালমৃত্যুতে জাহাজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হয়, তিনি তখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে টেকরাজ্যের রাজকুমারী মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়, ইহা ভাগ্যের কথা; তিনি স্বয়ং যেমন নিরভিমানী, নিরহঙ্কার, রাজমহিষী মেরীও সেইরূপ, সর্ব্ববিষয়ে সদ্‌গুণবতী সহধর্ম্মিণী সাংসারিক কার্য্যেও এই গৌরবিণী রাজবধূ সর্ব্বাংশে সুনিপুন বিবিধ বিদ্যাতেও ইনি পরম গুণবতী। ইহাঁর গর্ভে পাঁচটি পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ড এখন প্রিন্স অব ওয়েলস। বহুপূর্ব্বে একটি ভাগ্যবতী মেরী ইংলণ্ডের রাজরাণী ছিলেন। এক্ষণে আবার এই রাজবধূ মেরী ইংলণ্ডের রাণী হইলেন, ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী।



সম্রাজ্ঞী মেরী।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব্ ওয়েলেস্ যুবরাজ জর্জ্জ ভারতভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এখানকার গবর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড কর্জ্জন। রাজকুমার কোন রূপ নিয়মে আবদ্ধ থাকেন নাই, তিনি অবাধে এতদ্দেশের যোগ্যাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের অবস্থা জানিয়াছেন। ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ

করিয়া স্বচক্ষে প্রজাপুঞ্জের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন, প্রাচীন প্রাচীন নগরের সমৃদ্ধি কারুকার্য্য, বড় বড় অট্টালিকা, প্রাচীন প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ ও দেবালয়াদি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া প্রকাশ্য সভায় তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের শোভা, ভারতের কৃত্তিকলাপ এবং ভারতবাসীর সরলতা, ধর্ম্মানুরাগীতা, রাজভক্তি এবং কার্য্যকুশলতার প্রশংসা ত ছিলই তদ্ভিন্ন একটি নিগূঢ় বিষয় তিনি অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ যে ভারতের রাজপুরুষেরা যেরূপ সরলভাবে ভারতবাসীর সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহাতে অধিক পরিমাণে ভারত রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, এবং ভারতবাসীর রাজভক্তিও আরও অধিক পরিমাণে প্রদীপ্ত হইয়া সমুজ্জ্বল হয়। কথাগুলি সুসঙ্গত ও প্রকৃত ইংলণ্ডের যে সকল মহাত্মা ভারতবর্ষের প্রকৃত হিতৈষী তাঁহারা তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। প্রিন্স জর্জ্জ লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া যখন ভারতরাজ্যের প্রশংসা করেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া পৃথিবীতে ছিলেন না; তিনি স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দর্শন করেন নাই, জ্যেষ্ঠপুত্রের ভারতভ্রমণের সুবর্ণনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্তরে অসীম আনন্দ জন্মিয়াছিল, সে আনন্দের কথা তিনি নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, সৌভাগ্য-বতী পৌত্রের মুখে তিনি যদি ভারতভ্রমণের ফলশ্রুতি শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে প্রিন্স ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সকল স্থানের উন্নতিবিধান করিতে নিশ্চয়ই যত্নবতী হইতেন। সেইরূপ শুভসংযোগ ঘটিলে আমাদের তীর্থস্থানগুলির কি যে মঙ্গল ফল ফলিত তাহা এখন কেবল কল্পনা পথে আইসে, মুখে অথবা লেখনিমুখে ব্যক্ত করা যায় না।

প্রিন্সজর্জ্জ এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজা ভারতবর্ষের নবীন সম্রাট। আমরা এখন আশা করিতে পারি, ভারতদর্শনের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে মহৎ ভাব অঙ্কিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং এখন ভারতের প্রতি কৃপা করিয়া সেই মহৎ ভাবটী কার্য্যে পরিণত করিবেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন, তাঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণী মহারাজ্ঞী মেরি পুত্রকন্যাসহ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ স্বামীর শুভ সংকল্পের সুসিদ্ধিকল্পে সহকারিণী হউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। সদাশয় নরপতি পঞ্চম জর্জ্জ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, পিতামহীর আদর্শে ও পিতৃ আদর্শে প্রজপুঞ্জের মঙ্গলসাধনে নিয়ত যত্নবান থাকি-

বেন। ঈশ্বরের নিকটেও সেই কামনা করিয়া কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন, রাজ-মন্ত্রীগণের সৎপরামর্শের প্রার্থী হইয়াছেন, রাজমহিষীরও সহায়তার আশা করিয়াছেন, করুণাময় জগদীশ্বর এই নব নরপতির কামনা, প্রার্থনা ও আশাপূর্ণ করুন, নরপতির অঙ্গীকার সার্থক হউক।

প্রসাদি প্রসঙ্গ।

লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু।

"কাব্য-সুধা কবি ভোগ্য অন্য যোগ্য নয়।
শ্রীফল সুফল, কাক কখনো কি কয়॥"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বঙ্গদেশের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ সাধক কবি ছিলেন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরের নিকট-বর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলে রামরাম সেনের ঔরসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভাবময়ী লেখনী-প্রসূত শক্তি-ভক্তি রসাভিষিক্ত পদাবলী বঙ্গদেশে অদ্যাপি অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত। প্রসাদীসঙ্গীত কেবল সঙ্গীত-ব্যবসায়ী বা পন্থা-য়াহী ভিক্ষুকের কিম্বা কালীভক্তের আদরের সামগ্রী নহে; ইহা কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের সমান আদরের জিনিষ। শৈব, শাক্ত, সৌরী, গাণপত্য, বৈষ্ণব ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়েই ইহার পরমার্থ প্রার্থী।

প্রসাদীসঙ্গীত তিনপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে—সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো ভাবা-ত্মিক। এই তিন প্রকার সঙ্গীতের মধ্যে সাত্ত্বিক সঙ্গীত শুদ্ধরূপে গীত হইলে শ্রবণসুখজনক হয়—ভক্তের চক্ষে অশ্রু নিপতিত হয়। আর যে সকল সঙ্গীত আছে, তাহাতে মনোরঞ্জন হইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তের প্রাণ বিগলিত হয় কিনা সন্দেহ।

প্রসাদের কাব্য অগ্রে পাঠ করিয়া ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতচন্দ্রনানাস্থানে প্রসাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসাদী

ও হইতেছে। ব্রহ্ম-সঙ্গীত, সাধন সঙ্গীত, গীতরত্ন, মির্জ্জা হোসেন আলীর কোন কোন সঙ্গীত তাহার নিদর্শন।

প্রসাদীপদাবলীর প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম্মভাব অন্য কোন প্রকার সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমার্থিক কবিতায় প্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব রত্ন বলিয়া গণনীয়। বঙ্গদেশে একাধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব এই দুই নিত্য বস্তু অতি বিরল। কিন্তু তাহার মধ্যে এই দ্বিবিধ গুণের যুগপৎ আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নবরসের একত্র সমাবেশ যদি কোথাও দেখিতে হয়, তবে প্রসাদী সঙ্গীতেই তাহা দেখা যায়। প্রকৃত-হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতির প্রবলতা বশতঃ প্রসাদের মন বিষয়বাসনায় নিতান্ত উদাসীন ছিল। তাঁহার সঙ্গীত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, তিনি সংসার বিরাগী ও বাসনাশূন্য ছিলেন। তাঁহার কল্পনা এক অপূর্ব্ব পথে বিচরণ করিয়াছে। সেই কল্পনা অতি তেজস্বিনী এবং অনির্ব্বচনীয় মনোময় স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ। সেই কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে নাই, সে কল্পনাসম্মুখে যাহাই দেখাইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া তিনি একটি একটি মনোহর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নবোদ্গত কল্পনার কমনীয় কান্তি যেন নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। যে ক্ষুদ্র জগতে তিনি বাস করিতেন, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাত্ত্বিক ভাবের কল্পনাদ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রসাদের পদাবলী তাঁহার সাধকত্ব ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন। তাঁহার পদাবলীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভিকতা আছে, তাহা অন্য কোন কবির ভাষায় দৃষ্ট হয় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি সরল, সে গুলি পাঠ করিলে যেন বোধ হয়, কবি যেন ত্রিসংসার পরাজয় করিয়াছিলেন; সে গীতগুলি ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, সে গুলি গাহিবার সময় গায়ক যেন তদ্রূপ সাহসে পরিপূর্ণ হয়।

প্রসাদের পদাবলী সমূহ বঙ্গসাহিত্যে পদ্মরাগ মণি। সঙ্গীতই তাঁহার সাধনা ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি শক্তিসাধনার জন্য প্রত্যহ নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রে যে সালোক্য সামীপ্য, সাযোজ্য ও নির্ব্বাণ মুক্তির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নির্ব্বাণ মুক্তি অন্যতম। কিন্তু প্রসাদ তাহা মানিতেন না। তিনি ভক্তিকেই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়াছেন। তিনি বেদকে

অভ্রান্ত বলিতেন না এবং পুণ্য সঞ্চয়ার্থ তীর্থ পর্য্যটনকে নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব ও পরজন্ম মানিতেন এবং আনন্দের সহিত পরত্র গমনে সদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতে মানুষের মনুষত্বের পরিণামের পূর্ণ বিকাশ।

কবিরঞ্জনের পদাবলীই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। সঙ্গীত সাধনাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বাল্যকাল হইতে যখনই তাঁহার মনে ভক্তির উদয় হইত, তখনই তিনি স্বতঃই মধুর সঙ্গীতে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদা ভক্তিরই উচ্ছ্বাস হইত। তিনি মুখে মুখে অবলীলাক্রমে গীত রচনা করিতে পারিতেন। সঙ্গীত রচনা করিতে হইলে তাঁহাকে তিলার্দ্ধও ভাবিতে হইত না। তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রসাদীসুর এত সহজ ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তাহাতে লোক সহজেই বিমোহিত হয়; যে আদৌ সঙ্গীত জানে না, সেও তাহা গাহিতে পারে।

প্রসাদের একটি গানে "লাখ উকীল করেছি খাড়া" এই কথার উল্লেখ আছে। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে তিনি একলক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন, কোন কোন সঙ্গীতের দ্বিবিধ ও ত্রিবিধ পাঠান্তর, এক এক কথার পুনঃ পুনঃ উক্তি ও এক ভাবাত্মক অনেকগুলি সঙ্গীত দ্বারা বোধ হয় যে, তিনি অতর্কিতভাবে সঙ্গীত রচনা করিতেন। কিন্তু যে স্থানে যে প্রকার বর্ণনা করা উচিত, সে বিষয়ে প্রসাদ বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিয়াছেন। অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন মানসিক ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মে না এবং ছন্দোবন্দে গ্রথিত না হইলে তাহা চিত্তাকর্ষক হয় না। প্রসাদ সে বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কবি রামপ্রসাদ আলোকসামান্য ধীশক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া মহীয়সী শক্তি-সমন্বিত প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকে জগৎকে প্রভাসিত করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

———:o:———

রামরূপে গিরিশবাবু !

বঙ্গের নাট্যাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাকার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ কেবল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন, ইহা নহে, রঙ্গালয়ে নাটকের এক এক চরিত্রের প্রতিরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করিতেও তিনি সুদক্ষ। দক্ষযজ্ঞ ও সীতারবনবাস নাটক অভিনয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুজ্জ্বল পরিচয় আছে। সীতারবনবাসের অভিনয়ে তিনি রাম সাজিতেন, সেই ভূমিকার অভিনয়ে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত বিমোহিত হইয়া যাইত। ইদানীং বয়োধিক্যবশে তিনি আর প্রায়ই রঙ্গমঞ্চে দর্শন দেন না, কিন্তু নাট্যাভিনয় প্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা তৎকৃত অভিনয় দর্শনে নিতান্ত অভিলাষী ; অনেকেই তাঁহাকে আর একবার সীতার-বনবাসের অভিনয়ে রাম সাজিবার জন্য আগ্রহসহকারে অনুরোধ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নাট্যসম্রাট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাগবাজার সখের থিয়েটারে প্রথমে "সধবার একাদশী" অভিনয়ে নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি অভিনয় কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাহা হইলেই ৪০ বৎসর তিনি অভি-নেতারূপে বঙ্গবাসীকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন। তিনি যে সময়ে প্রথমে নিম-চাঁদের অভিনয় করেন, তখন তাঁহার পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং সমবয়স্ক বন্ধু প্রভৃতি শ্রোতা ছিলেন, এক্ষণে সেই সঙ্গীগণ বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুত্রেরা এক্ষণে স্বীয় শিশু সন্তানের হস্ত ধরিয়া রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতে আসেন। ইহাতে বুঝা যায়, চারিপুরুষ ধরিয়া রঙ্গালয়ে দর্শকগণ গিরিশবাবুকে রঙ্গমঞ্চে দেখিতেছেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতাপচাঁদ জহুরীর 'ন্যাসান্যাল্ থিয়ে-টারে' 'সীতার বনবাস' প্রথম অভিনীত হয়, ইহাতে নাট্যাচার্য্য রামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এক্ষণে গিরিশবাবুর বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর ; এই বয়সে সাধারণের অনু রোধে গত মাসের পঞ্চদশ দিবসে রবিবারে তাঁহাদিগের সেই অনুরোধ সুরক্ষিত হইয়াছিল। ঐ রজনীতে মিনার্ভা নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে সীতারবনবাসের অভিনয় হয়, সুপণ্ডিত নটরাজ গিরিশবাবু রাম সাজিয়াছিলেন। অধুনা রঙ্গমঞ্চে অপ্রকাশ থাকিবার প্রকৃত হেতুগুলি তাঁহার স্বরচিত ভাবার্থপূর্ণ একটি কবিতায় প্রকাশ করেন। বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অঙ্গ অবশ ও কণ্ঠস্বর নীরস, তাহাতে রসভঙ্গ হইবার ভয় ; এই হেতুবাদে তিনি উক্ত কবিতায় শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ক্ষমাচাহিয়াছিলেন।

অভিনয় হইয়াছিল, রামের অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ পূর্ণরস আস্বাদন করিয়াছেন, গিরিশবাবু যেরূপ প্রকৃতি, সেইরূপ সরলভাবে তিনি স্বাভাবিক নম্রতা সহকারে হেতু প্রদর্শন করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন। তিনি অশেষ গুণের আধার, তাঁহার নম্রতা শ্লাঘনীয় ; কিন্তু যাঁহারা অভিনয় দর্শন করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ গুণগ্রাহী, অখণ্ড প্রত্যয়ে তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছেন বার্দ্ধক্য হেতু গিরিশ-বাবু নাট্যাভিনয়ে লব্ধ শক্তিতে আদৌ বঞ্চিত হন নাই। কবিতামধ্যে তিনি হৃদয়োচ্ছ্বাসে ক্ষণেকের জন্য যৌবন কামনা করিয়াছেন। কামনা অবশ্য তাঁহার কল্পনাপ্রসূত ; বস্তুত রামের অভিনয়ে তাঁহার পূর্ণ যৌবনের পূর্ণ মধুরতা সাময়িক

লীলাভঙ্গী প্রভৃতি সর্ব্বশক্তি পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যে কবিতায় তিনি বার্দ্ধক্যের জন্য সঙ্কুচিত সেই কবিতাটি এই ঃ—

নিবেদন।

পিতার স্থানীয় যাঁরা, রঙ্গালয়ে আসি তাঁরা,
কতবার এ দাসেরে দেছেন উৎসাহ ;
সমান বয়স্ক জন, বান্ধব স্বজনগণ
ক'রেছেন অভিনয় দর্শনে আগ্রহ।
পুত্রসম বয়ঃক্রমে, তাঁরাও দর্শকক্রমে,
ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁরা জনক এখন ;
করে-কর পুত্র সনে, এবে হেরি রঙ্গাঙ্গনে,
অবিরাম বহে মম শ্রমের জীবন।
হৃদে সাধ বলবান, সম উৎসাহিত প্রাণ,
করিতে দর্শকবৃন্দ-মানস রঞ্জন ;
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে হায়, দিন দিন ক্ষীণকায়,
বিফল-প্রয়াস জন-মন-বিমোহন।
অঙ্গ নহে ইচ্ছাধীন, কণ্ঠস্বর রসহীন,
পুরাইতে মনোসাধ ঘটে বিড়ম্বনা
ত্রুটি হবে অভিনয়ে, তাই রসভঙ্গ ভয়ে,
ক্ষণেকের তরে হয় যৌবন কামনা।
ভরসা কেবল মম শ্রোতার মার্জ্জনা॥

ভূত-বিজ্ঞান।

লেখক-ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ. এল. এম. এস.

(৩)

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এবং পুরাণাদি হইতে আমরা যে সকল শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে যদি কেহ এখন ধারণা করেন যে, ভূতযোনি বলিতে আর্য্য ঋষিগণ উদ্ভিজ্জাণু এবং জীবাণু সকলকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তিনি কোন অযথা ধারণায় উপনীত হন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই পরভূত প্রাণিসকলের মধ্যে যাহারা মানব শরীরে আবিষ্ট হয়, তাহারা তিনটি

বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি বালদেহে আবিষ্ট হয়, আর কতকগুলি আবাল অর্থাৎ প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। চল্লনকৃত নিবন্ধ সংগ্রহের এক স্থানে আছে ;

তত্র গ্রহা বালানাং নব

অষ্টৌ পুনরবালানাং ভূতবিদ্যায়াং নির্দ্দিষ্টব্যাঃ।

অর্থাৎ বালগ্রহের সংখ্যা নয়টি, আর অবাল গ্রহের সংখ্যা আটটি, ইহা পরে ভূতবিদ্যায় কথিত হইবে। চল্লন আরও বলিয়াছেন, কাশ্যপাদিতন্ত্রে যদিও ভূতের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আবিষ্কৃততমের সংখ্যা এইরূপ মনে করিতে হইবে। চরক সেইজন্য লিখিয়াছেন।—

অপরিসংখ্যেয়ানাং গ্রহণামাবিষ্কৃতমা হ্যষ্টাবেতি ব্যাখ্যাতাঃ।

গ্রহাদির সংখ্যা অপরিসংখ্যেয় হইলেও আবিষ্কৃতম আটটি এখানে বর্ণিত হইল। ফলকথা বালকদিগের শরীরে আবিষ্কৃততম গ্রহের সংখ্যা নয়টি, এবং অবাল অর্থাৎ প্রৌঢ় শরীরে আবিষ্ট আবিষ্কৃততম গ্রহের সংখ্যা আটটিমাত্র। সুশ্রুতেরও এই মত ; কেবল হারীতসংহিতায় একটি শ্লোক আছে, তাহাতে আমরা দেখি কাহার কাহার মতে গ্রহসংখ্যা একবিংশতি; কিন্তু অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ গ্রহ-সংখ্যা দশটি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

দশ প্রোক্তা মহাচার্য্যৈঃ

কেশ্চিদপ্যেকবিংশতিঃ।

তে চাপি প্রথিতা গ্রহা

দশবিধা ব্যক্ষামতঃ সাম্প্রাতম্।

হারীত যেমন এইরূপ মতভেদের কথা বলিয়াছেন, বাগভটও সেইরূপ মতভেদ স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিলেও, বলিয়াছেন গ্রহসংখ্যা (আটও নয়, দশও নয়, একবিংশতিও নয়) অষ্টাদশ।

সোঽষ্টাদশবিধো

দেবদানবাদি বিভেদতঃ।

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে যিনি যে সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট করুন না কেন, বালগ্রহ নয়টি, এবং অবালগ্রহ আটটি, ইহা সকলকেই আপনাদিগের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে। তাহার কারণ, এই গ্রহ কয়েকটি আবিষ্কৃততম।

চল্লন কাশ্যপতন্ত্রনির্দ্দিষ্ট অপরিসংখ্যেয় গ্রহ সম্বন্ধে যে টীকা করিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা জানিতে পারি, যে গ্রহ অপরিসংখ্যেয় বটে, কিন্তু সকলগুলিই যে

জিবাংস্থপরায়ণ হইয়া মানব শরীরে আবিষ্ট হয়, তাহা নহে,—ভক্ষক ছাড়া রক্ষক গ্রহও অনেক আছে, যাহারা আমাদের অনিষ্ট না করিয়া বরঞ্চ আমাদের ইষ্টসাধন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে। সে ইষ্ট যে কি তাহা পরে বলিব। এখন এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এই রক্ষকগ্রহ সকলের সাধারণ নাম পিতৃগ্রহ। চক্রনে আছে :—

নবমো নৈগমেষ ইতি সংখ্যাকরণং
কণ্ডন্তপাদি তন্ত্রারোক্তাধিক সংখ্যা নিরাকরণার্থং
পিতৃগ্রহ সংজ্ঞিত ইতি বালস্থান্যগ্রহেভ্যো রক্ষকত্বাদিতি
নবগ্রহঃ সৈব সংজ্ঞা সংজাতা যস্য সঃ।

উল্লিখিত উপদেশ হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

গ্রহ

বালগ্রহ।	আবাল গ্রহ।
নৈগমেষাদি	অনাবিষ্কৃততম
নব	অপরসংখেয়
আবিষ্কৃতম—	পিতৃগ্রহ সংজ্ঞিত—
ভক্ষক—	রক্ষক

ইহার মধ্যে ভক্ষক শব্দ আমরা নিজে দিয়াছি, রক্ষক শব্দটি আয়ুর্ব্বেদে আছে। আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় "ভক্ষক" শব্দ নাই; তৎপরিবর্ত্তে আছে "জিঘাংসু" তাহা হইলে এখন দাঁড়াইতেছে, গ্রহ সকল 'জিঘাংসু' এবং 'রক্ষক' ভেদে দ্বিবিধ। উভয়েই আমাদের শরীরে বিদ্যমান আছে। এখন আমরা যদি বলিতে সাহসী হই যে, আর্য্যঋষিগণের মতে উদ্ভিজ্জাণু ও জীবাণু নামক পরভৃত সূক্ষ্ম ভূত সকল, যাহা মানবদেহে আবিষ্ট হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি জিঘাংসু, আর কতকগুলি রক্ষক, তাহা হইলে মোটের উপর আমরাও ঠিক কি তাহাই বলিতেছি না, যাহা Berdoe তাঁহার গ্রন্থে Phagocyte Theory বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"Yet the germ theorists have not left us eutirely without hope."

যদি বেদান্তাদি গ্রন্থধৃত রেতোসিগ্‌ভাবাদি সূত্র হইতে কোনরূপে প্রমাণ করা যায় যে, পিতৃগণ বা গ্রহের অনুচর সকল ব্রীহি ধান্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া মানুষের

রক্তকণায় অবতরণ করে এবং সেখানে রক্ষকস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া আততায়ীর আক্রমণ বিফল করিয়া দেয়, তাহাহইলে, বর্ত্তমান প্রতীচ্য বিজ্ঞানের দুইটি প্রধান তত্ত্ব ;—Phagocyte theory এবং Germ theory. এই রক্ষক ও ভক্ষক শব্দ দ্বয়ের যে অন্তর্নিবিষ্ট, এইরূপ অনুমান বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোন কারণ থাকে না।

বালগ্রহই হউক, আর অবাল গ্রহই হউক, তাহাদিগকে মানবশরীরে আবিষ্ট হইতে কেহই দেখেন নাই। সুশ্রুত বলিয়াছেন আপ্তবাক্যই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ।

ঐশ্বর্য্যাস্তে ন শক্যা বিশন্তি।
দেহং দৃষ্টং মানুষৈর্বিশ্বরূপাঃ
আপ্তং বাক্যং তৎসমীক্ষ্যাভিধাস্যে
লিঙ্গন্যেষাং যাণি দেহে ভবন্তি !

ফলতঃ কতকগুলি লিঙ্গ auto intoxication এর মত মানবশরীরে সমুৎপন্ন হইলে আপ্তেরা তাহাদিগকে শ্রেণীগত করিতে গিয়া এই ভূত সকলের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। ক্রমশঃ

সমালোচনা।

ভক্তের জয়।—এতন্নগরীয় সিমুলিয়ানিবাসী প্রভুপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ইহার সঙ্কলন কর্ত্তা। মূল্য একটাকা।

পণ্ডিতবর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নূতন পরিচয় কিছু দিতে হইবে না, বঙ্গদেশ তাঁহার গুণের পরিচয়ের, পাণ্ডিত্যের পরিচয়ের, সাধুতার পরিচয়ের এবং উদার ধর্ম্মভাবের পরিচয়ের সুন্দর অভিধান। হরিভক্ত সমাজে, শৈব সমাজে, শাক্ত সমাজে তিনি মহাসমাদরে ভক্তিভাবে সুপরিচিত, বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে তিনি পরমগৌরবে সুপরিচিত এবং আচারানুগত আর্য্যসমাজেও অকপট ভক্তসমাজে তিনি সদাশয়, ভক্তিমান্, সামাজিক বলিয়া সুপরিচিত। তাদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত প্রবরের দ্বারা এই 'ভক্তের জয়ের' জীবন্যাস।

গোস্বামী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, আমাদের দেশে ভক্তমাল গ্রন্থের অস্তিত্ব অতি বিরল। নাভাজী প্রণীত একখানি হিন্দি ভক্তমাল সুপরিজ্ঞাত, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত সেই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, এইমাত্র। উৎকল প্রদেশে "দার্ঢ্য ভক্তি রসামৃত" নামে একখানি ভক্তমাল গ্রন্থ আছে, পণ্ডিতবর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সেই গ্রন্থ অবলম্বনে এই "ভক্তের জয়" রচনা করিয়াছেন। রচনা পারিপাট্য দর্শনে আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি; যাঁহারা

পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকেও বিমুগ্ধ হইতে হইবে। আলোচ্যখণ্ডে আটটি ভক্তের পরিচয় আছে;—গণপতি ভট্ট, বলরাম দাস, দীনবন্ধু দাস, বিশ্বম্ভর দাস, বন্ধু মহান্তি, রঘু অরক্ষিত, দামোদর দাস এবং কৃষ্ণপ্রিয়া। এই অষ্ট ভক্তের ভক্তিভাব সর্ব্বাংশে ভক্তজনের হৃদয়গ্রাহী। এই খণ্ডখানি ভক্তসমাজে আদৃত হইলে (অবশ্যই আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।) গোস্বামী মহাশয় অপরাপর ভক্তচরিত প্রকাশ করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত গ্রন্থে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেবের উদ্দেশে ভক্তিমতী কৃষ্ণপ্রিয়ার একখানি পত্র আছে। কৃষ্ণপ্রিয়া একটি রাজকন্যা, পিতা শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিম সীমাবর্ত্তি জয় নগরের রাজা জয়সিংহ, মাতা চন্দ্রাবতী। কৃষ্ণপ্রিয়া প্রকৃতই কৃষ্ণপ্রিয়া ছিলেন, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের একজন পারিষদ বন্ধু মহাপাত্র জয় নগরে উপস্থিত হন, কৃষ্ণপ্রিয়ার দানশক্তি ও ভক্তির পরিচয় শ্রবণে দানার্থি হইয়া তিনি কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করেন; জগবন্ধুর পারিষদের লিখিত পত্র পরম পবিত্রজ্ঞানে কৃষ্ণপ্রিয়া সেই পত্রখানি একবার বক্ষে ধারণ করিলেন, একবার মস্তকে রাখিলেন, তাহার পর পরম-পুলকে চুম্বন করিলেন; অনন্তর পত্র পাঠান্তে জগবন্ধুর নামে একখানি দানপত্র লিখিলেন। বিশুদ্ধ প্রেমের উদাহরণ স্বরূপ সেই দানপত্রখানি এইখানে অবিকল উদ্ধৃত করা হইল:—

"ওহে ও জগতস্বামি!
এ বিশ্বসংসার সকলি তোমার,
তোমারে কি দিব আমি॥
(শুধু) মনটি তোমার নাই।
যত গোপনারী, রেখে দেছে হরি,
তাহাতো তোমার চাই॥
এই ধর নাও মন।
দিয়া হ'নু দাসী, নীলাচল শশী,
দানপত্র এ লিখন॥
কৃষ্ণপ্রিয়া মম নাম।
জয়সিংহ পিতা, চন্দ্রাবতী মাতা,
জয় নগরেতে ধাম॥"

ভক্তিও চমৎকার, দানপত্রও চমৎকার। ধর্ম্মজগতে বাক্য আছে, কৃষ্ণপূজা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের পূজা বড়। কৃষ্ণভক্ত বৃন্দাবন দাসের উক্তি:—

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥

অতএব কৃষ্ণভক্তের মহিমাই অধিক। ভক্তকবি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই ভক্তেরজয় রচনা করিয়া ভক্তসমাজে সাধুবাদের পাত্র হইয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। অতঃপর তিনি স্বীয় অঙ্গিকার পালন করিয়া অন্যান্য ভক্তবৃন্দের চরিত্র প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহাকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিব।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

ধর্ম্ম।

সাধন ও প্রচার।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ।

ধার্ম্মিকগণ সমক্ষে, ধর্ম্মচিন্তায় প্রবীণ ধর্ম্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ সভ্যগণ সমক্ষে, আমার মত ধর্ম্মসাধন-বিরহিত লোকের পক্ষে এই প্রবন্ধ উপস্থিত করা কতদূর সঙ্গত হইল বলিতে পারি না।

ধর্ম্ম কি? সংসারের লোক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লইয়া মারামারি করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। ধর্ম্ম কি ও অধর্ম্ম কি, এই দুইটী প্রশ্ন, বা এক প্রশ্নেরই

দুইটী দিক, মানব-বুদ্ধির বিকাশের সময় হইতেই মানব-আত্মাকে উদ্বেলিত করিয়াছে।

তৃষিত ব্যক্তি যেমন পথে চলিতে চলিতে নির্ম্মল বারি-রাশি দেখিলে, লালায়িত হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তেমনি আমিও কার্য্যবশতঃ সংসারের ধর্ম্ম-রহিত সহবাসে থাকিয়া, মাঝে মাঝে যখন নিজের জীবনের গতির বিষয়ে হতাশ হইয়া উঠি, তখন তৃষিত-ভাবে ধর্ম্ম ও তৎসাধনের দিকে নেত্রপাত করি ; সেইজন্য কর্ম্ম হইতে অবসর সময়ে সহজেই 'ধর্ম্ম। সাধন ও প্রচার' বিষয়ে চিন্তা ধাবিত হয়। যাহার যে বিষয়ে অধিক অভাব,সে সেই বিষয়েই চিন্তা করিবার ততই অধিকারী।

ধর্ম্মকে বস্তু বিশেষের স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা এবং কার্য্য বলা যায় ; যথা,—লৌহের কঠিনতা, অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলের শীতলতা। ইহাকে লৌহের ধর্ম্ম, অগ্নি ও জলের ধর্ম্ম বলা যায়।

"ধর্ম্ম" শব্দটি একটী বিশেষ অর্থে আমরা ব্যবহার করি। উহা কি, বুঝাইবার জন্য বহু শাস্ত্র, সাধক, পণ্ডিত, ও প্রচারক ব্যস্ত রহিয়াছেন। মানব আত্মার প্রকৃত সুস্থ অবস্থা ও ক্রিয়াকেই ধর্ম্ম বলা যায়। হৃৎপিণ্ডের পক্ষে নিশ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া যেমন সহজ, সুস্থ আত্মার পক্ষে ধর্ম্মাচরণ করাও তেমনি সহজ ; কিন্তু মানব-আত্মার প্রকৃতির বিকৃতি দেখা যায়। সেইজন্যই ধর্ম্ম বিষয়টা এত অসাধারণ বা কঠিন বোধ হয়। সেইজন্যই বিকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মার প্রকৃত অবস্থাকে পুনঃ স্থাপিত করাই বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম ও সাধন।

যে প্রণালী দ্বারা আত্মাকে নিরাময় করা যায়,তাহাকেই ধর্ম্ম-সাধন বলা যায়। দেহকে নীরোগ করিবার জন্য, যেমন, নানা দেশে, নানা কালে, নানা উপায় অবলম্বিত হয় ; তেমনি কবিরাজি, হাকিমি, এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথীর মত, ধর্ম্মমতও নানাপ্রকার এবং ধর্ম্ম-সাধনও বিভিন্ন প্রণালীর। কিন্তু সকলেরই সাধারণ উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ আত্মার রোগ, শোক দূর করা, আত্মাকে সুস্থ, সুন্দর, সবল ও সহজ করা।

দেহকে রোগমুক্ত করিতে হইলে যেমন কতকগুলি অকাজকে বর্জ্জন করিতে হয়, এবং কতকগুলি কাজ করিতে হয়, তেমনি ধর্ম্মের পথে চলিতে হইলে কতক গুলি নিষেধ ও আদেশ পালন করিতে হয়। এই নিষেধ বর্জ্জন ও আদেশ পালনের পদ্ধতিকেই সাধন বলা যায়।

দেহ যেমন অখাদ্য খাইয়া অকার্য্য করিয়া রুগ্ন হইয়া পড়ে, আত্মাও তেমনি কুচিন্তা ও কুভাবে পূর্ণ থাকিয়া, কুকার্য্য ও অকার্য্য করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহাকেই অধর্ম্মাচরণ বলা যায়।

দেহকে সুস্থ করিতে হইলে যেমন রোগের কারণ স্থির করাই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, তেমনি ধর্ম্মসাধনে প্রবিষ্ট হইতে হইলেই আত্মজ্ঞান ও আত্মানুসন্ধান দ্বারা নিজের ব্যাধির মূল কারণ নির্দ্ধারণ করা প্রধান ও প্রথম কার্য্য।

কুকার্য্য বর্জ্জন, কুস্থান-বাস ত্যাগ না করিলে যেমন রোগ বিনাশ হয় না; তেমনি কুচিন্তা, কুভাব, কুসঙ্গ ও কুকার্য্য বর্জ্জন না করিলে ধর্ম্ম অঙ্কুরিত হয় না। ইহাই ধর্ম্মসাধতর বর্ণমালার প্রথন অক্ষর।

বনভূমিকে শস্য-শ্যামলা করিতে হইলে, যেমন বৃক্ষাদি ছেদন ও দূরীকরণ প্রয়োজন; তৎপরে ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনাদি কর্ত্তব্য। তেমনি আত্মার মধ্যে যে সকল আবর্জ্জনা থাকে, তাহাকে দূর করিয়া, তৎপরে মানব আত্মারূপ সোণার জমিতে ধর্ম্মের বীজ বপন ও ভক্তি-প্রেমবারি সেচন করিতে হয়।

কুবাতাসে দেহের পীড়া জন্মিলে, উহা হইতে দূরে যাইতে হয়, স্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা হাওয়া বদলাইতে হয়; তেমনি যে সঙ্গে, যে কার্য্যের মধ্যে থাকিলে আত্মা বিকৃত হইয়া পড়ে, আত্মার প্রকৃত অবস্থার ও সুস্থতার হানি হয়; তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে হয়, করিলে ভাল হয়। ম্যালেরিয়া বিষে পূর্ণ জল হাওয়ার ভিতর থাকিলে ভীমবলও যেমন নষ্ট হয়, তেমনি কুসঙ্গ ও কুকার্য্যে রত থাকিলে সুস্থ ও বলিষ্ঠ আত্মা ক্রমশঃ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কঠিন ব্যাধির কঠিন চিকিৎসা ও সংযম প্রয়োজন।

ভগবান্ বৈদ্যনাথ। তিনি নিতান্ত রুগ্ন আত্মার কঠোর ঔষধ প্রয়োগ করেন। আমরা ক্রন্দন করিলেও অস্ত্রাঘাত করিতে ছাড়েন না। আমরা সর্ব্বদা মিষ্ট বিষয় সম্ভোগ করিতে চাহিলেও, আমাদিগকে বলপূর্ব্বক তিক্ত ও বিস্বাদ ঔষধ সেবন করান।

তবে, সংসারের বাজারের ঔষধবিক্রেতাগণও যেমন, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দ্বারা কঠিন রোগের সহজ আরোগ্যের ঔষধ বিক্রয় করেন, তেমনি ধর্ম্মপ্রচারক ও পুরোহিতেরা আয়াস-কাতর মানবকে সহজ ধর্ম্মের পথ বলিয়া দেন। যথা, অমুক যোগে, অমুক নদীতে অবগাহন করিলে কোটী জন্মের পাপক্ষয় হয়। অমুক স্থানে যাইলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় ও স্বর্গের সিঁড়িতে পা দেওয়া যায়। কেহ কেহ ব্রহ্ম

নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে,—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে,
পাপী হয়ে তত পাপ করিবারে নারে।"

আমি ৩৬৫ দিন কুচিন্তা ও কুকার্য্য করিব, আর একটীবার করিয়া কোন নদী বা কুপোদকে স্নান করিব, বা একবার নাম উচ্চারণ করিব, ইহাতেই সকল দুষ্টকর্ম্মফল নষ্ট হইবে? ধর্ম্মকে এত সহজ করিয়া জনসমাজের লোককে আধ্যাত্মিক হজমিগুলি খাওয়ান দণ্ডার্হ কার্য্য মনে হয়।

ধর্ম্ম আত্মার সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা বটে; কিন্তু এই প্রকারের সহজ নহে। একদিকে যেমন সহজ আর একদিকে তেমনই কঠিন,—সাধন-সাপেক্ষ।

ধর্ম্মাচরণের পথে অগ্রসর হইতে হইলে কি কি কার্য্য নিষিদ্ধ, তাহা সকল শাস্ত্র ও মহাপুরুষই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। যীশু এক যুবা পুরুষকে তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "বিধিপালনই অমরত্বলাভের, অমৃতলাভের উপায়।" যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! সে কি কি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "হত্যা করিও না, মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না, পিতামাতাকে ভক্তি করিও, সকলকে আত্মবৎ ভালবাসিও।"

ধর্ম্ম কেবল বক্তব্য নহে, উহা কর্ত্তব্য। উহা কবিতা নহে, উপন্যাস নহে, সঙ্গীত নহে। উহা অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায় না। উহা গদ্যে পদ্যে বিদ্যা প্রকাশ নহে। উহা অর্থবল নহে, লোকবল নহে, বাহুবল নহে। উহা মনের কার্য্য নহে, ইচ্ছার কার্য্য নহে, শুধু হৃদয়েরও কার্য্য নহে। উহাকে দেহমনঃপ্রাণ যোগের কার্য্য বলিলে ঠিক হয়।

ধর্ম্মকে আত্মার ত্রিবেণীসঙ্গম বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ মন হৃদয় ও ইচ্ছার ত্রিধারায় অবগাহন করিতে পারিলে ধর্ম্মরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। মন চিন্তা করিবে, হৃদয় বাসনা করিবে, ইচ্ছা বলপূর্ব্বক চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবে, তবে ধর্ম্মলাভ হইবে। কেবল মনের দ্বারাও নহে, ইচ্ছার দ্বারাও নহে, বা ভাবের দ্বারাও ধর্ম্ম লব্ধ হয় না।

ধর্ম্মের অনেকগুলি অঙ্গ আছে। মানব যেমন কেবল দেহও নহে, কেবল আত্মাও নহে, সে দেহ-আত্মা কিম্বা আত্মাদেহ, তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম কেবল বাহিরের পূজাপার্ব্বনাদি ক্রিয়াতেই সমাপ্ত নহে। তাঁহার একটা সূক্ষ্ম, অস্থূল, অজড় অংশ আছে।

ধর্ম্মের চিন্তার সহিত সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য কি, ইহারও চিন্তা জড়িত আছে। সৃষ্টিকর্ত্তাকে বাদ্ দিয়াও অনেক ধর্ম্মমত জগতে প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাকে ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি বলা যায় না। অন্ততঃ আমরা ঐ প্রকার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে পারি না। স্বভাবতই, ঈশ্বরের স্বরূপ, মনের ও আত্মার স্বরূপ ও গতি প্রভৃতি অনেক বিষয় ধর্ম্ম শব্দটীর অন্তর্গত রহিয়াছে। মানব চিরদিনই এই সমুদায় শব্দ লইয়া বাকৃবিতণ্ডা ও মারামারি করিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহার সমাচার অবগত আছেন। আমাদের এত বিশেষ কথার আলোচনার ভিতর প্রবেশের প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্ম আত্মার সুস্থ ও সহজ অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে যাহা করিতে হয়, তাহাকেই আমরা সাধন বলি। আমাদের প্রত্যেকের দৈহিক চেহারাও যেমন বিভিন্ন, তেমনি মনের ভাব ও প্রবৃত্তিও বিভিন্ন এবং তদনুযায়ী ধর্ম্ম ও তাহার সাধন সম্বন্ধে মত বিভিন্ন,—নিজের নিজের প্রকৃতি, মতি, গতি, সংস্কার ও সমাজ অনুসারে বিভিন্ন।

বিনা চেষ্টায় যেমন দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয় না, তেমনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ন্যায়, হৃদয়, মন ও আত্মার অনুশীলন প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মসাধন নানাপ্রকারের। মানব যেমন দেহ-আত্মা, বা আত্মা-দেহ, তেমনি, দেহ ও আত্মা এই উভয়কেই লইয়া তাহার সাধন। প্রথমে দেহ ও আত্মার সংযম হইতেই সাধনের সুরু।

আত্মসংযম না হইলে সাধন কথাটা অলীক। সেইজন্য বৌদ্ধসাধকের কথা এই যে,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"।

শরীরকে সংযত করিবার নানা প্রক্রিয়া নানাদেশে প্রচলিত আছে। ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক, মূর ও রোজিক্রুসিয়ানদের মধ্যে, মিসর দেশে, য়ীহুদী ও আরব দেশে, মুসলমান হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মধ্যে, নানা প্রণালী প্রচলিত।

শরীরের নানা বৃত্তি ও শক্তি সংযম করিতে, কেবল যে দেহেরই শক্তি প্রয়োজন হয়, তাহা নহে। ইহাতে মনেরও ব্যায়াম বা কসরৎ আছে। মন না হইলে শরীরকে শাসন করে কে?

প্রাণায়াম, নেতি, ধৌতি প্রভৃতি কার্য্যে যথেষ্ট মানসিক আগ্রহ ও বলের প্রয়োজন। ইহাতে মনের বল বা উইল্ পাওয়ার (Will power) বর্দ্ধিত হয়।

এই সকল প্রক্রিয়ারও মূল্য আছে। অতএব ইহা অগ্রাহ্য ও উপহাসের বিষয় নহে।

শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা অনেকের বিক্ষিপ্ত চিত্ত ঐ কার্য্যে আকৃষ্ট ও একাগ্র হয়। যাহাদের চিত্ত ঐ প্রণালী ব্যতীত একাগ্র হইবে না, তাহাদের পক্ষে উহাই ভাল।

সকলের প্রকৃতি ও বিকৃতি একপ্রকার নহে। অতএব সকলের উপযোগী সাধনও ঠিক্ একপ্রকার হইলে চলে না। সকল রোগীর পথ্য কি এক হইতে পারে? না, সকল ব্যায়ামকারীর আহার এক হইতে পারে? প্রকৃতি ও বিকৃতি অনুসারে আহার ও ঔষধ বিভিন্ন প্রকার হওয়ার প্রয়োজন।

প্রসিদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী প্রেমভক্তি সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেও তাহা ব্যক্ত হইতে পারে।

যথা,— "কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়;
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়।
কিন্তু যার যেই রূপ, সেই সর্ব্বোত্তম,
তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তর, তম।"

ভক্তি সহকারে যিনি যে প্রকার সাধনে প্রাণে আরাম পান, তাঁহার পক্ষে তাহাই ভাল। আমি তাহার নিন্দা করি না, বা নিষেধ করি না। তবে আমার যাহা মত তাহাই বলিতেছি।

প্রাণায়াম, কুম্ভক ও হঠযোগের বিরুদ্ধেও দুই একটি কথা বিচার করিয়া দেখিবার আছে;—

(১) ঐ পথে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে উপায়টীই উদ্দেশ্য হইয়া উঠে।

(২) ঐ পথে সদা সিদ্ধ গুরু বা উত্তর সাধকের সান্নিধ্য ও সাহায্য প্রয়োজন, নচেৎ বিঘ্ন ও বিপদ আছে।

(৩) ঐ পথে, শিরোরোগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বধিরতা, স্মৃতিলোপ, চক্ষুহীনতা, যক্ষ্মা, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি হইতে পারে।

এই সকল রোগ প্রায় দুশ্চিকিৎস্য। যোগজ রোগের চিকিৎসা স্বতন্ত্র।

(৪) দেহশুদ্ধি হইলেই যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা নহে। রন্‌জিৎ সিংহের দরবারের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী ও কুম্ভককারী সাধু হরিদাস, অবশেষে জয়পুর রাজ্যে যাইয়া এক রজনির কুহকে পড়িয়া, কুম্ভক ও সিদ্ধির ঝুলি ছাড়িয়া,

কাশ্মীরের শ্রীনগরে পলায়ন করেন। ইহঁার জীবনচরিতে আছে। চিত্তশুদ্ধির পর দেহশুদ্ধি বা তজ্জনিত শুদ্ধি হইলে, আর রজকিনী তাঁহার আত্মায় ধোপ দিতে পারিত না।

(৫) দুই প্রকারে সামাজিক নীতি প্রণালীর সংস্কার চেষ্টা হইতেছে। উহাকে আমি অনুলোম ও বিলোম প্রণালী বলিব। অর্থাৎ একটী প্রণালী সমগ্রসমাজের সংস্কার করিয়া পরে তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন। অন্য পক্ষীয় লোকে ব্যক্তিবর্গের সংস্কার করিয়া পরে সমগ্র সমাজের সংস্কার করিতে চান। ব্যক্তিগত সাধনক্ষেত্রেও ঐ একই প্রণালী। কেহ কেহ দেহ হইতে সাধন স্নরু করিতে বলেন। আর এক দল আত্মা ও মনের সাধনকে প্রথম লক্ষ্য বলেন।

কোন্‌টী আগে? গাড়িটী, না ঘোড়াটী? আমার মতে ঘোড়াটী। যে টানিয়া লইয়া যাইবে, সেই আগে।

দেহ ও আত্মার মধ্যে দেহই নিকৃষ্ট। তাই মনে হয় যে, দৈহিক সাধনপ্রণালী মানসিক বা আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আত্মা যেমন দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ, তেমনি অধ্যাত্ম প্রণালীটীও শ্রেষ্ঠ।

দেহের প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মাকে সংযত ও বিশুদ্ধ করিতে যাওয়া যেন উল্টা রকম পথ মনে হয়।

আত্মার দ্বারাই দেহকে শাসিত ও পবিত্র করা উচিত। আত্মসংযম বিষয়ে আত্মার সাধনই, উপর হইতে শাসনই, যেন, উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

তীব্র আনন্দে চক্ষু হইতে অশ্রুকণা বিগলিত হয়। প্রথমেই যাহা ঘটিতেছে, তাহা মনে, হৃদয়ে, আত্মাতে। পরে, বহিরঙ্গে যাহা হইতেছে, তাহা চক্ষে, দেহে, অশ্রুকণায়। "সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।" ইহাই পাতঞ্জলের সূত্র। সমাধি, বা ধ্যান, ধারণাতেও যে সকল শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোন প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই লক্ষণ উৎপন্ন করিলেই কি মনে সেই ভাব জন্মে? ধূম বা অন্য বস্তু চক্ষে লাগিলেও অশ্রুপাত হয়। কিন্তু তাহা হইলে ত মনের তীব্র আনন্দ উৎপন্ন হয় না। কুম্ভক হইলেই ত চিত্তের সমাধি হয় না।

দেহের উপর মন, হৃদয়, আত্মা,—যেমন অশ্বের উপর আরোহী। উত্তম আরোহীর ন্যায় উপর হইতেই অশ্বকে সংযত করিতে হইবে। মন বিশুদ্ধ হইলে, দেহ পাপ করিতেই পারে না। মন ও আত্মাই যদি সংযত হইল, তবে পাপ

করিবে কে? সাধন একপ্রকার আত্মার Self-mesmerism প্রণালী। সাধনের প্রধান লক্ষ্য, আত্মাকে জড়তা হইতে, দেহের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া, জড়ীভূত ভাব হইতে মুক্ত করা। আত্মা দেহের জড়তায় জড়ীভূত বলিয়াই সে দেহের সঙ্গে এয়ারকি দিতে যাইয়া নানা কুকর্ম্মে জড়িত হয়। তাহাকে সে সমুদয় হইতে বিরত করিতে হইবে। অতএব চিন্তার দ্বারা, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার দ্বারা, অধ্যাত্মমার্গে গমন দ্বারা, যদি আত্মার গতি ফিরিল, তবে কুকার্য্য করিবে কে? করায় কে?

সাধন বিষয় অনেকটা যমে মানুষে টানাটানির মত। দেহেতে ও আত্মাতে টানাটানি,—জড়েতে ও আত্মাতে টানাটানি,—জড়ে ও অজড়ে পলোয়ানী, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ! দেহ টানে জড়তার দিকে, পাপের দিকে, মৃত্যুর দিকে। আত্মা বলে জড়তা ত্যাগ করিতে, পাপের কজা এড়াইতে, মৃত্যুকে দূরে ফেলাইয়া অমৃতের দিকে অগ্রসর হইতে।

এই সাধনে আত্মাকে দেহ হইতে ছাড়াছাড়ি করিয়া লওয়াই ভাল মনে হয়। জড়াজড়ি ভাল নহে। আত্মাকে দেহমুক্ত. জীবনমুক্ত, দেহ হইতে স্বতন্ত্র, উন্নত করিতে হইবে। আত্মা যেন দেহকে ছাড়াইয়া উঠে। আত্মা জড়, নশ্বর, মরণশীল দেহের উপর সম্রাট হইয়া বসিবে। যথা—"সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্ক্তে"। দেহকে আত্মার পশ্চাতে চলিতে হইবে।

মনে হয় প্রাণায়াম অপেক্ষা বাসনায়ামই শ্রেষ্ঠ প্রণালী। আত্মাকে বিশুদ্ধ ও বলীয়ান করিতে হইবে, সে যেন কিছুতেই দেহ বা ইন্দ্রিয়, বা কোন বিষয়ের সম্মুখে অবনত না হয়,—এক ভগবানের চরণে মস্তক অবনত করে। আত্মাতে এই প্রকার তীব্র স্বাধীনতার ভাব থাকিলে, কে তাহাকে শৃঙ্খল বা পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে পারে,—কে তাহার জন্য কারাগার রচনা করিতে পারে? দেহ কি আর সে আত্মার পিঞ্জর হইতে পারে? তসর ও রেসমের পোকা বড় হইলে আপনা-আপনিই গুটি কাটিয়া বাহির হয়। গুটী কাটিয়া তাহাকে বড় করিতে বা বাহির করিতে হয় না।

অধ্যাত্ম ব্যায়ামে অভ্যস্ত আত্মাকে কি আর সহজে ইন্দ্রিয় ও সংসার পদানত ক্রীতদাস করিতে পারে, বা চক্ষে ঠুলি দিয়া, কলুর ঘানীর গরুর মত ঘুরাইতে পারে? না, কুকুরের মত গলায় রজ্জু দিয়া বিপথগামী করিতে পারে? অধ্যাত্ম মার্গে ব্রহ্মনামের বেলুনে চড়িয়া, তাঁহার চরণরূপ প্যারাসুট ধরিয়া আমরা এই মহাশূন্যে

নিরালম্ব ভাবে, সংসারের, জড়ের ও দেহের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিব। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,—"সে কথার কথা নয়! সে বড় উচ্চ কথা। কেবল উচু উচু কথা বলিলেই চলিবে না তো। কাজে করা চাই। উহা এক রকম জ্যাঠামী।" বেশ! তাহা স্বীকার করিলেই আমার কথা প্রমাণিত হইল।

জ্যাঠামীই হউক, আর যাহাই হউক, আধ্যাত্মিক প্রণালী উচ্চতর প্রণালী বলিয়া স্বীকার করিলেই হইল। পৌত্তলিকগণ একেশ্বরবাদী ও নিরাকার-বাদীদিগকেও ঐ প্রকার ধমক্ দেন। তাঁহারা বলেন, একবারেই কি চক্ষু মুদিত করিয়া নিরাকার দেখা যায়? সাকার হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। পরে যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, তখন বিষ্ঠা ও চন্দনে সমজ্ঞান হইবে।" এ প্রকার সমালোচনা গ্রাহ্য নহে।

সাধনে লক্ষ্য উচ্চ চাই। নচেৎ ব্রহ্মসাধন, ব্রহ্মজ্ঞান, এ সব কথা ছাড়িয়া দিয়া গাছ, পাথর, ষষ্ঠী, মাকাল, বরাহ ও কূর্ম্ম অবতারাদি লইয়াই থাকিতে হয়। লক্ষ্য উচ্চ হওয়া চাই। কার্য্যে যতদূর সেই দিকে যাওয়া যায়, যাক্। যদি পূর্ণ সফলতা না হয়, না হউক, আংশিক হবে।

কে মানব আত্মাকে ধম্‌কাইয়া বলিতে সাহসী যে, "এ বড় উচ্চ সাধন। তোমার পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার প্রয়াসের ন্যায় ইহা উপহাসাস্পদ।"

যদি ব্রহ্মই সাধনের শেষ লক্ষ্য হয়েন,—

"ধনুর্গৃহীত্বৌপদনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপসা নিসিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥
প্রণবো ধনুঃশরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।" মুণ্ডক।

ইহা যদি উপহাসের কথা না হয়, তবে ব্রহ্ম-বেলুনে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় ও সংসারের বহু ঊর্দ্ধে গমন করা কেনই বা উপহাসজনক হইবে? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথই লক্ষ্য হওয়া চাই। নিজের শক্তি না থাকে, মায়ের আঁচল ধরিয়া, হাতে

ধরিয়া চলিব। সাধনে অবতীর্ণ হইয়া যে কেবল নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করে, তাহাকে আমি জ্ঞানী বলি না। "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" পতাকার ছায়াই নিরাপদ। ব্রহ্মতে বিশ্বাস করিয়া কে কখন ঠকিয়াছেন? বলিতে পারেন? অর্জ্জুনের সারথি যেমন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তেমনি সাধন-পথে ব্রহ্মই আমাদের সারথি হউন!

তিনি আমাদের প্রাণ। "প্রাণো হ্যেবঃ।" তিনি প্রাণে রহিয়াছেন। যতক্ষণ প্রাণ রহিয়াছে, ততক্ষণ তিনি আমার মধ্যে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ও লীলা করিতেছেন। আমার জীবনে ও উন্নতিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থবান্। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে, চেষ্টার মধ্যে, সাধনের মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছা, সাধন, ও লীলা হইতেছে না কি? যখন আমরা সত্যসত্যই ধর্ম্মপথে চলি, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে আমাদের পক্ষে, আমাদের সহায়, সাহায্যকারী,—কারণ তিনি সত্যং শিবং ও সুন্দরং। ইহা জানিয়া রাজপুতগণের ন্যায় "হর! হর! মহাদেব!" নাদে যেন আমরা গোপন অধ্যাত্ম-সাধনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই ও কাহারও কথাতে, কোন ভয়ে পশ্চাৎপদ না হই। আমাদের সঙ্গীতে আছে, "মুক্তিপথে নিরন্তর হও সবে অগ্রসর। সম্মুখে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে॥" পথে ভয় পাইলে আমরা যেন জটিলের ন্যায় "দীনবন্ধু দাদা! দীনবন্ধু দাদা! কোথায় গো? আমাকে দাঁড়াইয়া দাও," বলিয়া ডাকিতে পারি। সাধন-ক্ষেত্রে কত অদৃশ্য ও অশরীরী আত্মার সাহায্য পাওয়া যায়। অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। যিনি পূর্ণ ও পূর্ণসিদ্ধি ও মঙ্গলের আলয়, তিনিই আমাদের লক্ষ্য ও গুরু ও সারথি। আমাদের চেষ্টা কেবলি বিফল হইবে না। কিছু না কিছু ফল পাইবই পাইব।

ধর্ম্মকেই প্রকৃত জীবন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ধর্ম্মকে কেবল কতকগুলি মতামতের সমষ্টি বা কেবল বক্তৃতার বিষয় বলিয়া বিবেচনা হয় না।

দেহকে সুন্দর, সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার প্রক্রিয়াকে একপ্রকার সুচারু শিল্প বলা যায়। আত্মাকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করার প্রণালীকে আমি কোন একটী সুকুমার শিল্প বলি না! উহাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুকুমার শিল্প বলি। উহা কলাবিদ্যার মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

প্রকৃতির নিয়মের অধীন থাকিয়া, প্রকৃতির মত করিয়া, কোন বিষয়ে সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব ফুটাইয়া তোলাকেই সুন্দর শিল্প বলা যায়। তবে কি আত্মাকে ঐরূপ করা, জীবনটিকে ফুটাইয়া তোলা ও তাহাতে প্রকৃতির রূপ ও সৌরভ ফুটাইয়া

তোলা স্থকুমার শিল্প নহে? মেরী বা যোসেফের ক্রোড়ে ঈশা বা যশোদার ক্রোড়ে নন্দকুমারকে তুলিকাদ্বারা, বর্ণপরিবারের অলৌকিক সদ্ভাব ও সংযোগ দ্বারা, পটস্থ বা প্রস্তরস্থ করাকেই কি আমরা সর্ব্বোত্তম শিল্প বলিয়া ক্ষান্ত রহিব? কিন্তু ঐ শিশু কৃষ্ণ বা খ্রীষ্টকে মানুষ করিয়া তোলা, বা যে সাধনের বলে তাঁহারা জগতের ইতিহাসে মানবজাতির চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছাকে, নব ভাবে, নব বর্ণে, নব কৌশলে সৌন্দর্য্য-রাশিতে পরিণত করিলেন, তাঁহাকে উত্তম কলা বলিব না? কলাবিদ্যা কি অচেতন প্রস্তর, তুলিকাদিতে আবদ্ধ থাকিবে, না, মানব-আত্মায় ধর্ম্মে ও জীবনে সজীবতা ও পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়া, সৌন্দর্য্যের আকাশ হইতে আনন্দ ও অমৃতের অনন্ত ও অজস্রধারা বর্ষণ করিবে? আমি সেই কলাবিদ্যার অনুশীলন করিতে চাহি, যাহা মানব জীবনকে ধ্রুপদ খেয়াল, গজল ঠুংরী অপেক্ষাও মধুময় করিবে, যাহার মধুরতার নিকট বীণা-নিক্বণও লজ্জিত হইবে, ও সমুদায় জড়শিল্প পরাস্ত হইবে, যাঁহার শক্তিতে মৃতশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলে সজীব হইয়া উঠিবে, মৃত অস্থি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে ও জগৎকে অবাক করিবে।

এই প্রকার শিল্পের অনুশীলনকেই আমি সাধন বলি। উহা একটা আজগেবী বুজরকী নহে, একটা অদ্ভুত ভোজবাজী নহে,—উহা সামান্য সহজ নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মত একটী সহজ কার্য্য। উহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই, কারণ আত্মাকে অস্বাভাবিকতা হইতে স্বাভাবিকতার দিকে টানিয়া আনারই নাম ধর্ম্মসাধন। কেবল দিন দিন লক্ষ লক্ষ নাম জপ বা উর্দ্ধবাহু বা দণ্ডী হইয়া নানাতীর্থ পর্য্যটন বা সূর্য্যমুখী হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশজনক বা অসম্ভব বুজরুকিদ্বারা জনসমাজে শূন্য, ভুয়ো, অর্থশূন্য করতালি লাভ করাকে আমি ধর্ম্ম বা তৎসাধন বলি না।

নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন, নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া নিজের মেধা, রচনা, বক্তৃতা বা মুন্সীআনা দ্বারা লোকচিত্ত হরণ করাকেও আমি ধর্ম্ম বা তৎসাধন বলি না। ধর্ম্মসাধন একটী লোকচক্ষের অগোচর জিনিষ। ক্রমশঃ জল বা জীবনসঞ্চার কেহ অনুভব করে না, আত্মার যৌবন ফুটিয়া উঠিলে সংসার দেখে এবং দেখিয়া মুগ্ধ হয়।

সাধকের পক্ষে সংসার সহায় ও সংসার অন্তরায়। অর্থাৎ যাহার যে প্রকার প্রকৃতি। সংসারে প্রতিভার হানি হয়। চরিত্রের বিকাশ হয়। নির্জ্জনে প্রতিভা ফুটিয়া উঠে, কিন্তু চরিত্র অপ্রকট থাকে।

আমাদের আত্মার শক্তি, কি খাইবে, কি পরিধান করিবে, কোথায় থাকিবে, ইহা ভাবিয়াই আকুল। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কার্য্যেই আমাদের দেহ মন আত্মার

শক্তিনিচয় ব্যয়িত হয়। ধর্ম্মসাধন করিতে যখন বসি, তখন দেখি, সংসারে ক্রমাগত লিপ্ত থাকিয়া, মনে যেন সংসারচিন্তার ধূম উঠিয়া কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকার রচনা করিয়াছে, মন যেন চক্ষু মেলিয়াও সে অন্ধকার ভালরূপ দেখিতে পায় না ; যেন ধ্যান-ধারণায় বসিয়া আর মেরুদণ্ডে বল পাওয়া যায় না, মস্তিষ্কের এমন বল পাওয়া যায় না, যে ছড়ান মনকে কুড়াইয়া আনা যায়, বিক্ষিপ্ত চিত্ত-বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া, আত্মাকে মনোবিজ্ঞাণ-আগারে তন্ময় করি। ব্যাধের শর যেমন আহত শিকারের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেই প্রকার ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে আত্মারূপ শর বিদ্ধ হইয়া তন্ময় হইতে হইলে, চিত্ত অপ্রমত্ত হওয়া প্রয়োজন কোন্ সংসারী মানব দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারেন যে, সংসারের অশেষ গণ্ডগোল ও প্রতিকূল ঘটনা ও বিষয়ের মধ্যে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাহিত থাকে ? এবং তিনি সমান ভাবে তন্ময় হইয়া ধর্ম্মচিন্তা বা সাধন করিতে পারেন ?

তাহাই যদি না হইবে, তবে ঈশা ও শাক্যসিংহের মত প্রতিভাশালী সাধক ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণ কেন বলিবেন, "যদি সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, তবে সর্ব্ব-ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আইস।" জগতের প্রতিভাশালী ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ যদি ভ্রান্ত হয়েন, তবে তাঁহাদের পথে ভ্রান্ত হওয়াই যেন ঠিক বলিয়া মনে হয়। তবে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাঁহাদের জন্যই ও পথ। যাঁহারা সংসারে থাকিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী, আত্মীয় স্বজন, জমিদারী-তেজারতি লইয়াও থাকিবেন এবং সাধনও করিবেন, এই ইচ্ছা প্রাণের ভিতর সুগুপ্ত রাখেন বা পঞ্চাশ ঊর্দ্ধে বন গমনের মত, দাঁত ভাঙ্গিলে পর মাংস ত্যাগ করিবেন, এ প্রকার সঙ্কল্প পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংসার-কার্য্যে লিপ্ত থাকাই বিধেয়। অন্ততঃ তাহাই তাঁহাদের বিধেয় বলিয়া আমার বোধ হয়। কারণ প্রেয়কেই তাঁহাদের শ্রেয় বোধ হয়। আমরা এই শ্রেণীর।

মানবের দৈহিক ও ব্যক্তিগত পার্থক্য যতই থাকুক, দেহতত্ত্বানুসারে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিধির যেমন একটা সাদৃশ্য আছে, তেমনি ধর্ম্ম ও সংসারের সকল বিভিন্নতার মধ্যে এক একটা ঐক্যের স্থলও আছে।

রোগের নিদান স্থির হওয়া যেমন প্রথমেই প্রয়োজন, তেমনি রুগ্ন আত্মার নিদান স্থির করা বা আত্মানুসন্ধান, সাধনের প্রথমাক্ষর।

আত্মানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞান প্রয়োজন হইবে, নচেৎ অজানা বন-ভূমির মধ্যে পথ হারাইয়া চলিলে যে দশা উপস্থিত হয়, তাহাই ঘটিবে।

আত্মজ্ঞান মানে, আমি কি, জানা। আমি কি, জানিতে হইলেই আমি নহি কি; আমি কি, কিরূপে হয়েছি, রয়েছি, থাকিব; আমি কাহাতে, কে আমাতে; আমার জীবনের গন্তব্য পথ ও স্থান ইত্যাদি বিষয়, তৎসাধন ও তৎ-সাধনের উপায় সকল ভাবিতে ভাবিতে তাহার মীমাংসা আপনিই হৃদয়ে উদিত হইবে। যেই জানিব আমি কি, অমনি জানিব ব্রহ্ম কি? তাই ঋষিগণ বলি-য়াছেন,—"তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদ্ যদ্ আত্মবিদো বিদুঃ।" শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—"ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরিবে অন্তরে।" যীশু বলিয়াছেন,— "চাও তবেই পাবে, খোজ তবেই মিলিবে, দ্বারে আঘাত কর তবেই দ্বার খুলিবে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"যাহারা আমাতে সতত যুক্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধি ঘটাইয়া দি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করে।" প্রহ্লাদ প্রতি বাণী এই যে,—"আমাতে একান্ত অনুরক্ত হইলে, আমি নির্ব্বাণ দি।"

সকল সাধনেই শিক্ষকের উপদেশ প্রয়োজন। বুকে হাত চাপড়াইয়া কেহ প্যাখোয়াজি হয় নাই। কেবল সেতারে বুং বুং করিয়া কেহ সেতারী হয় নাই। একটি ইমনের ধ্রুপদে আছে যে,—"গুরু বিনু কেইসে গুণ গাওবে; বে গুণী গুণ কাঁহাসে আওবে? গুণী-অন্মে বে-গুণী গুণ কাঁহাসে আওবে?" সাধারণের পক্ষে শিক্ষক প্রয়োজন। প্রতিভা নিজেই নিজের শিক্ষক। শিক্ষকের দ্বারা প্রতি-ভার হানি হয়।

ধর্ম্মেতে সিদ্ধিলাভ যিনি করেন, তিনি স্বয়ং ভূ,—স্বয়ম্ভূ। তাঁহাকে কাহারও Junior বা apprentice হইতে হয় না, কাহারও উমেদারী করিতে হয় না। বৌদ্ধ যোগশাস্ত্র বলেন,—The adept grows. He is not grown. সিদ্ধ-ব্যক্তি স্বয়ম্ভূ ও আত্মভূ। কেহ তাঁহাকে তৈয়ারী করিয়া দেন না। ভাগবতের উদ্ধব সংবাদে উৎকল দেশীয় জগন্নাথ দাস গাহিয়াছেন,—"তো মন তোতে গুরু। উদ্ধব মোতে কাঁহিকি পচারু?" যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ভাব আছে, ধর্ম্মের পিপাসা আছে, তাঁহার জন্য মোক্ষ সলিল, জাহ্নবী-ধারা, হৃদয় ভেদ করিয়া উৎসারিত হইবে। অন্য ধারায় মোক্ষ কোথায়? সহস্রার বিগলিত অমৃতধারায়, জ্ঞান, প্রেম, শক্তির ত্রিবেণীতে স্নাত হইয়া মানব-আত্মা সাধনে সিদ্ধিলাভ করে।

ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা পিপাসা হইলেই আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিশ্চয় মিটিবে ও আত্মা ধন্য হইবে, ইহাই ঈশার মানব-আত্মার প্রতি আশীর্ব্বচন।

আত্মানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞান যেমন ধর্ম্মসাধনের সোপান, তেমনি বিনয় ও অনুতাপও তাহার অঙ্গ। যেই আমাকে আমি বুঝিতে পারিব, ওমনি আমার চরিত্রের মলিনতা, দুর্ব্বলতা, ত্রুটী বুঝিতে পারিব। নচেৎ আত্মানুসন্ধান হইল না, আত্মপ্রবঞ্চনা হইল এবং উহা বুঝিতে পারিলেই পাপ জন্য অনুতাপ ও উন্নত মস্তকের অবনত ভাব আসিবেই আসিবে। সেইজন্য জন-দি-বেপ্‌টীষ্ট প্রচার করিতেন, যে,—"অনুতাপিত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকট।" আমি নিউষ্টেমেণ্টের মূল গ্রীক-ভাষা জানি না। "কিন্তু অনুতাপিত হও, তবেই স্বর্গরাজ্য অতি নিকট, হইবে," বলিলেও জন্ ভুল করিতেন না, বরং সাধন-পথের অবশ্য দ্রষ্টব্য ও অনুভবনীয় একটী মহাসত্য প্রচার করিতেন। যতক্ষণ না পাপজনিত মনে গভীর ও প্রকৃত দুঃখ উদয় হয়, ততক্ষণ ধর্ম্ম-সাধন কি সম্ভবে? কুকার্য্যের জন্য পিতা-মাতার চরণে যদি অজ্ঞান শিশু অশ্রুপাত করে, তবে পিতামাতা কি হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া থাকিতে পারেন? রক্তমাংসের, ও সামান্য ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীল পিতামাতা যদি অনুতপ্ত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করেন, তবে জীবনদাতা অনন্ত পিতা-মাতা কি আমাদিগকে পাপের জন্য ক্ষমা করিবেন না? নিশ্চয় করিবেন, এবং পিতামাতার চরণে যদি ক্ষমাই লাভ করিলাম, তবে তো নিশ্চয়ই পিতৃসম্পত্তি স্বর্গধামে মানব-আত্মার উত্তরাধিকার স্বত্ব বলবৎ থাকিবে। কেহ ও কোন বিষয়, সে অধিকার ও স্বত্ব দখলে বাধা দিতে পারিবে না। যদি দেন, তবে উহা অগ্রাহ্য, বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। জীবমাত্রই স্রষ্টার ধনের অংশীদার। কোন শাস্ত্র, স্মৃতি বা ধার্ম্মিক এবং প্রচারক পাপাত্মাকে নরকে পাঠাইতে পারিবেন না।

অনুতাপ যেন স্বর্গদ্বারের "Open sesame," মন্ত্র। পারশীক প্রেমিক কবি ওমার খায়য়ুম গাহিয়াছেন :—

"Who is the potter, pray? who the pot?"
"Why" said another, "some there are who tell,
"Of one who thereatens He will toss to hell,
"The luckless pots he marred in making." Pish!
He is a good fellow and it will all be well."

স্মৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তাকে মন্দ লোক ভাবিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

তিনি আমাদিগের সহিত কখনই মন্দ ব্যবহার করেন নাই; বরং আমরা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করি না।

আমি যেই বুঝিব যে আমি অনেক পাপ ও কুচিন্তা করিয়াছি ও সম্ভবতঃ করিব, অমনিই কি মনে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হইবে না? তাহা যদি না হয় তবে আপনাদের নিকট, ভদ্রসমাজের নিকট, নিজের নিজের আত্মার মলিনতা ও দুর্ব্বলতা লুক্কায়িত রাখিতে এত প্রয়াস পাই কেন? নিশ্চয়ই পাপ বোধ অনুতাপ আনিয়া দিবে, অনুতাপ বিনয় আনিয়া দিবে, বিনয় স্বর্গের দ্বারে প্রবেশ সহজ করিবে। সেই জন্যই সাধনশীল দীনাত্মাদিগকে ঈশা আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। সেইজন্যই রজেতে লুণ্ঠিত আত্মাকে বৈষ্ণব-সাধকগণ এতই গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সেই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব "তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সুধীর, অমানী মানদ" হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং ভাগবত "অমানী মানদ" বলিয় ভক্তের ও সাধকের বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইতেছি কি না, জানিতে হইলে দেখিব যে মনে অহঙ্কার আসিতেছে কি না, অহঙ্কার বাড়িতেছে কি না।

বিনয় ধর্ম্মের কোষ্ঠীপাথর। আত্মাকে উহাতে ঘর্ষণ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, সাধনে উন্নত ব্যক্তির আত্মাতে বিনয়ের বর্ণ ফুটিয়াছে এবং যিনি আত্মার অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছেন, তিনি আপনাকে অবতার ভাবিয়া অহঙ্কারে আত্মারূপ শূন্যটাকে বাড়াইয়া তুলিতেছেন। কোন বন্ধু সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর আমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করায়, তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম,— যে 'তুমি যদি রোগে বা বিপদে পড়িয়া উত্তর দিতে না পার, তো, তজ্জন্য দুঃখ করি না। কিন্তু তুমি শিষ্য-শাখা-বেষ্টিত মহাযোগী হইয়াছ ভাবিয়া পত্র লেখা ছাড়িয়া থাকিলে বড়ই দুঃখিত হইব। কারণ তাহাহইলে নিশ্চয় জানিব যে আমার পুরাতন বন্ধু একটী উৎসন্ন গেল,—নরকে গেল। লুসিফার সর্ব্বোত্তম দেবতা ছিলেন। অহঙ্কারেই তাঁহার পতন হইয়া, তিনি সয়তানত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তুমি কদাচ অহঙ্কাররূপ লুসিফারের হস্তগত হইও না।"

মানবের মনে অহঙ্কারের ছায়া স্বাভাবিক। উহা মানবের অজ্ঞানের ছায়া বই আর কিছুই নহে। জ্ঞানের শিবনেত্রটী যেমন খুলিয়া যায়, অমনি মানব সক্রেটীসের মত বুঝিতে পারে যে, সে অত্যন্তই অজ্ঞান ও সামান্য। আত্মজ্ঞান স্বতই বিনয় জন্মাইয়া দেয়। তাই সক্রেটীষ 'আপনাকে জান," "Know thy-

self" এই মন্ত্রটী নিজের দ্বারের উপরে লিখিয়া রাখিতেন। তাই সক্রেটীস্ "আমি কিছুই জানি না।" এইরূপ জানিয়াই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বিকৃত মানবের পক্ষে অহঙ্কার স্বাভাবিক। তাই মানুষ ধর্ম্ম ও সাধনক্ষেত্রেও অহঙ্কারকে টানিয়া লইয়া যায়। উহাকে সহজে ভুলিয়া বা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তাই, সাধনে সিদ্ধির এত বিলম্ব হয়। তাই ধর্ম্মজগতে এত মারামারী, কাটাকাটী।

দিন দিন ধর্ম্মের হিসাব নিকাস করিলে, ধর্ম্মের খাতার হিসাবটা ভাল করিয়া বুঝিলে, মানব ধর্ম্মক্ষেত্রে অহঙ্কারের সাঁজোয়া পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিত না। ধর্ম্মক্ষেত্রে বিনয়ের বর্ম্মই আত্মরক্ষার সহায়। অহঙ্কার ধর্ম্মপথের এত শত্রু যে, যখন আত্মার মধ্যে সুবসন্তের পুষ্পনিশ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন যদি ইসারাতেও মনে হয়, এইবার বুঝি আমার অধ্যাত্ম অবস্থা ভাল হইতেছে, অমনিই দেখি যেন হঠাৎ এক ঝড় উঠিয়া, মেঘ গর্জ্জন করিয়া শিলাবৃষ্টি হইয়া, আমার হৃদয় কাননের শোভাময় কুসুমকলিকাগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া, আত্মাকে গভীর শোক ও তাপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। হঠাৎ যদি অনিচ্ছাস্বত্বেও একখানা অহঙ্কারের কালো মেঘ হৃদয়-আকাশে দেখা দেয় তো বুঝিতে পারি, অচিরে সে আমার চিদাকাশের সবিতার জ্যোতিকে কখন ঢাকিয়া দিবে। তাই, মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে কেন সর্ব্বদাই মেঘ আসিয়া, হৃদয়াকাশে হৃদয়নাথকে দেখিতে দেয় না। তাহার কারণ তল্লাস করিতে হয় না। কারণ আমাদের হৃদয়েই রহিয়াছে,—আমাদের হৃদয়ের পরম শত্রু,—প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। সে পরম খপু, বড় ছদ্মবেশী, এবং বহুরূপী। আত্মমর্য্যাদা, আত্মসন্তোষ, প্রতিষ্ঠা-লোভ, ধর্ম্মধ্বজিত্ব প্রভৃতি নানা মুখোশ পরিয়া সে আমাদিগকে ঠকায়।

গণিতে পড়িয়াছ যে, এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে অনন্ত ফল হয়। সাধন বিষয়েও ইহা বড়ই সত্য। এক অর্থাৎ আত্মার নীচে যদি শূন্য ভাব রাখা যায় তো অনন্ত ফল লাভ হয় বা তবেই ধর্ম্ম লাভ হয় বা ব্রহ্মকে লাভ হয়। পারশীক কবি জামির একটী সুন্দর প্রেম-সঙ্গীত বা গজলে আছে যে,—"আমি রজনীর অন্ধকার ও সংসারের ভয়ে পান্থনিবাসের দ্বারে আঘাত করিয়া প্রাণের দায়ে উচ্চৈশ্বরে ডাকিলাম, "ভাই! দ্বার খোল।" ভিতরের মানুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে হে?" আমি উত্তর করিলাম—"আমি জামি।" ভিতরের মানুষ বলিলেন,—ভিতরে আছি আমি। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।" পুনরায়

আমি সংসারের তাপে তাপিত ও ভীত হইয়া মোসাফের খানার দ্বারে আঘাত করিলে পুনর্ব্বার আওয়াজ আসিল, 'কে হে?' এবার ভিতরের মানুষের কথার উত্তরে বলিলাম—"আমি নাই তুমিই।" তখন দ্বার খুলিল ও ভিতরের মানুষকে পাইয়া আত্মা কৃতার্থ হইল।

ইহা কবির কল্পনা, কিন্তু সুন্দর ভাবে ইহা একটী আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। "হাম্! হাম্! ঘুচিয়া "তু তু" যতক্ষণ আত্মা হইতে বাহির না হয়, ততক্ষণ মানব সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছে, মনে করিবার পার্থিব বা অপার্থিব কোনই কারণ নাই।

আমি মনে মনে জাঁক করিয়া, ঢেঙ্গাইয়া বড় হইতে প্রয়াস পাইলেই তো প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হওয়া হইল না। ধর্ম্মরাজ্যে যে ছোট হইতে পারে, সেই বড় হয়, আর যে বড় হয়, সে ছোট হয়। তাই আমাদের রাঢ় দেশে বলে "বড় হবি তো ছোট হ।"

ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়; কিন্তু আমাদের এত বলিবার প্রয়োজন নাই। যত কম বলা যায় ততই ভাল। "যে চায়, সে পায়।" মন্ত্র ও সাধন বিষয়ে বাণী রজতময়ী। নীরবতা হিরণ্ময়ী। তন্ত্রাদিতে উহাকে বিশেষ গোপনীয় বলিয়া "মাতৃজারবৎ গোপয়েৎ" উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যাদির উপদেশ এই :—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথাতথা,
আপনাকে হবে সাবধান।"

মোট কথা এই যে, একদিন দাড্রিদারা করিলেই সেতারে ও সুরবাহারে ধ্রুপদ খেয়াল আলাপ করা যায় না,—কাষ্ঠ ও লৌহের মধ্য হইতে অমৃতধারা শ্রাবিত করা যায় না। একদিন তবলায় চাটী মারিলেই আতাহোসেন হওয়া যায় না। কোন বিদ্যার *Specialist* বা বিশেষ বুৎপন্ন হইতে হইলে, যেমন সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদ হওয়া যায় না, এক বিষয়েই মন দিতে হয়, সমুদায় সময় ও শক্তি ও জীবন নিয়োজিত করিতে হয়, তেমনি ধর্ম্মবিষয়ে, অধ্যাত্মমার্গগামী হইতে হইলে দেহ-মন-প্রাণের সমুদায় শক্তি শক্তিসামর্থ্য আজীবন ঐ কার্য্যে নিক্ষেপ করিতে হয়, প্রয়োগ করিতে হয়। একটী বন্ধু সুরবাহারের ২।৪ টী পর্দ্দার মধ্যেই উদারা, মুদারা, তারা, ত্রিসপ্তক স্বরগ্রাম, মেড় গমক মূর্চ্ছনাদি এবং সকল রাগরাগিণীর অমৃত-উৎস খুলিয়া দিতে পারেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলাম, "আমাকে ইহা শিখাইয়া দিতে পারেন।" তিনি বলিলেন,—"হাঁ! পঞ্চাশ ষাট বৎসর এই লৌহ ও কাষ্ঠে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া অঙ্গুলী ঘর্ষণ করিতে পারেন ?" দেখুন! আজীবন অঙ্গুলী ঘর্ষণ করি,— তবে সুরবাহার বা বীণার অমৃত স্রাব হয়! তার ক্ষুরধারের মত দুর্গম পথে চলা কি অনায়াসেই হইবে,—প্রাণ-পণ, আজীবন সাধন চাহি না ? আমরা যেমন হাটে আলুবেগুণ কিনিতে যাইয়া দুইটা ফাও চাই, তেমনি সংসারে তব্‌লার চাটী দিয়া বেড়াইয়া, অর্থের ও অস-র্থের সাধন করিয়া, ধর্ম্মের ফলটা ফাও স্বরূপ লাভ করিতে চাহি। তাই আমা-দের সাধন বিফল হয়। আমাদের নাম করা বিফল হয়। আমরা যদি প্রকৃত-রূপে ধর্ম্মকেই চাই, তবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই লাভ হয়। তাই যীশু বলিয়াছেন যে, কি খাব, কি পরিব ইত্যাদি ভাব কেন? স্বর্গরাজ্য ও ধর্ম্ম প্রথমে চাও, পরে এই সব জিনিষ তোমাকে ফাও স্বরূপ দেওয়া হইবে।" কথাটার সত্য কি মাঝে মাঝে আমরা এই মলিন জীবনেই প্রত্যক্ষ করি নাই? কিন্তু আমাদের স্মৃতিশক্তি দোষযুক্ত, আমাদের বিশ্বাস অল্প ও চিত্তবিক্ষেপ অত্যন্ত অধিক, তাই আমরা সুখ সুখ করিয়া বিনষ্ট হইলাম, প্রবঞ্চিত হইলাম। হায়! হায়! আমাদের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! আমার সংসারে, টাকাকড়ি, বাড়িগাড়ি, বেঙ্কের হিসাবকে বড়ই বিশ্বাস করি। ব্রহ্ম ও ধর্ম্মকে ততটা বিশ্বাস করি না,—করিতে সাহসী হই না। ভয়, পাছে ঠকি!

একটী পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীতে আছে, "তুমি ভাজ্‌ছো ঝিঙ্গে, বল্‌ছো পটল, তাতে তো ভাই, সে ধন মিলে না ?" আমরা কেবল ধর্ম্মের কাহিনী ও উপকথা লইয়াই বুঝি জীবন সমাপণ করিব।

আমরা ধর্ম্মের প্রকৃত সাধন করিলাম না। কেবল চিন্তা, তর্ক, বক্তৃতা, ও গান লইয়াই থাকিলাম। লোক প্রতিষ্ঠালাভ করিলেই মনে মনে ভাবি যে, এইবার খুব সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, উত্তম গীত, বক্তৃতা ও উপাসনা হইয়াছে!

সাধনের সময়ে অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি ভাব ও বিষয় একত্রে সাধন না করাই ভাল। একটী লইয়াই থাকিতে হয়। একটী সুন্দররূপ সাধিত হইলে, অপরটীতে হাত দিতে হয়। যতদিনে না একটীর রং ফুটে, ততদিন সেইটীই সাধন করিতে হয়; এবং সাধনের অন্তরায় যাহা, যাহার দ্বারা বা জন্য অগ্রসর হইতে পারি না। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি, ইহা বলা যেমন সহজ, করা তেমন নহে। তথাপি বলিতেই

হইবে এবং করিতেই হইবে। সাধনের লক্ষ্য স্থির করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

আত্মা প্রকৃতরূপে ধর্ম্মের জন্য পিপাসিত হইলে, যে গুরু বা উত্তর সাধক, যে বন্ধু ও সঙ্গ ও যে যে অবস্থা প্রয়োজন, তাহা এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় আপনিই আসিয়া জুটিয়া যায়। যে পুস্তকাবলী ঠিক সেই সময়ে দরকার, অদ্ভুত উপায়ে তাহা আসিয়া যায়। যে স্থানে যাওয়া প্রয়োজন, অদ্ভুত উপায়ে সে খানে যাওয়া ঘটে। ঘূর্ণীবায়ুর মত বেগে চারিদিক হইতে সাধনের অনুকুল সব জিনিষ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রয়োজন একটী, হৃদয়ের চাহা। তাঁহাতে মন চাই।

'টুটুত টুটুত সব টুট্ গয়ি,
ন টুটল মন কি চাহা।"

সংসারের পিপাসা দুর না হইলে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সংসারের পিপাসা মিটে না। 'যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ।" তাই কঠিন আঘাতে ভগবান আমাদের মোহের বাঁধন ছিঁড়িয়া দেন। নীচের জলের কল বন্ধ না হইলে, যেমন উপরকার জলের কলে জল আইসে না, তেমনি সংসারের ও নীচ ইন্দ্রিয়সুখ-চেষ্টা ও লালসা কম না হইলে, ধর্ম্মের পিপাসা ও চেষ্টা বাড়ে না। পিপাসা যেই হয় অম্নি তৃপ্তি। নানক বলিয়াছেন,—"যিস্‌কো হর নামকো পিয়াসা-উস্‌কো মিলে তৃপ্তাসা।" বাহিরের দ্বার না রুদ্ধ হইলে, ভিতরের দ্বার খুলে না। বাহিরের কোলাহল না থামিলে, ভিতরের আওয়াজ মিলে না। সেইজন্যই মহাত্মাগণ একবাক্যে বৈষ্ণবসাধকের ন্যায় বলিয়াছেন, "আগে জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী হওরে মন, সব সাধনের মূল শাসন।" ব্রহ্মচর্য্যের অস্ত্র না লাগিলে, আত্মায় ধর্ম্মের রং ফুটিবে কেন। বৈষ্ণবসাধকগণ বলেন,—"মনেতে দিয়ে, ডোর কপিন হতে হবে দীনের অধীন।" ব্রহ্মচর্য্য না হইলে, ধর্ম্মসাধন মিথ্যা কথায় পরিণত হয়।

ক্রমশঃ

—— o:o:o ——

২৪শে বৈশাখ ১৩১৬।
কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে

মঙ্গল-গীতি।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

১

বসেছেন আজি পঞ্চম জর্জ্জ উজলি বৃটিশ-রাজসিংহাসন;
নেহার দেবতা ত্রিদিব হইতে আশীষ-পুষ্প করে বরিষণ,—
তপ্ত শুষ্ক ব্যথিত হৃদয়ে হয়েছে শান্তি-সুধা সিঞ্চন—
হাস্য ফুটেছে মলিন আস্যে থেমেছে ভারতমাতার রোদন!

কোরাস্ {
মাতি আনন্দে দেও হুলুধ্বনি বাজাও শঙ্খ যত নারীগণ—
এসো অপ্সরী কিন্নরী যত গীতিকাকণ্ঠে কর আবাহন,
আরতির তরে এসো দেবী যত মালা চন্দনে করহ বরণ—
গাও সবে জয় রাজ রাজেশ্বর, মুকুট, দণ্ড, ব্রিটিশ-কেতন!

২

মেদিনী ব্যাপিয়া শান্তি-সমীর হয় প্রবাহিত যেন আজীবন—
জীবনের বীজমন্ত্র হউক সে দেবপিতৃপদানুসরণ;
হৃষ্টচিত্তে এই ভূপৃষ্ঠে করুন সদাই সুখে বিচরণ—
প্রার্থনা এই, না হয় কদাচ কুশ-অঙ্কুরে ব্যথিত চরণ!

কোরাস্ { মাতি আনন্দে দেও হুলুধ্বনি ইত্যাদি—

৩

ভারতের দুখ-অমা অবসানে উদিত হউক সুখের তপন,
ভারতের ধূলি হউক স্বর্ণ, হোক্ দারিদ্র্য দীনতা মোচন—
ঝঞ্ঝাবাত্যা তিরোহিত হ'য়ে বহুক মলয় সুখ-সমীরণ,
দুঃখি-ত্যক্ত অশ্রুনিকর হউক মুক্তা চির সুশোভন!

কোরাস্ { মাতি আনন্দে দেও হুলুধ্বনি ইত্যাদি—

৪

বেষ্টিত হয়ে তনয়তনয়া পাত্রমিত্র আর রাজগণ,
ধর্ম্ম-বর্ম্ম পরি চিরজীবী হইয়ে করুন প্রজার পালন—
ঋদ্ধি সিদ্ধি মণ্ডিত হ'য়ে চিরশোভে যেন স্বাধীন ব্রিটন—
সে শিব সত্য সুন্দর পদে এ রাজভক্ত করে নিবেদন!

কোরাস্ { মাতি আনন্দে দেও হুলুধ্বনি ইত্যাদি—

মরিলে কি হয় ?

অনন্ত কালাবধি এই প্রশ্ন লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে—মীমাংসা হইতেছে না ; হইবেও কখন, এমন আশাও করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মাত্মারা স্বর্গে যান, পাপাত্মারা নরকে যায়, কোন কোন আত্মা ক্ষুদ্র বপুধারণ করিয়া শূন্যমার্গে ইথার নামক বায়ুগর্ভে বিচরণ করে। কোন কোন মতে মৃত্যুকালীন তিথিযোগ নক্ষত্র অবিশুদ্ধ থাকিলে মানুষেরা ভূত হয় ; ভূতেরা ভাল মন্দ উভয়প্রকার কার্য্য সাধন করিয়া বেড়ায় ; হিন্দুমতে গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে তাহারা মুক্তি পায়।

বৌদ্ধমতে অনন্তনির্ব্বাণ ; মানুষ মরিলে কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না। মুসলমান ও খৃষ্টানের মতে মৃত্যুই মুক্তি ; একবার দেহধারণ করিয়া কালপ্রাপ্ত হইলে মানুষের আর জন্ম হয় না। ইহার উপর আরও একটি কথা আছে। যাঁহারা প্রভু যিশুখৃষ্টের সুসমাচার ঘোষণা করেন, তাঁহারা বলেন, "জর্ড্ডান নদীর জলে অভিষিক্ত হইয়া যাঁহারা প্রভু যিশুখৃষ্টের পদাশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রভু তাহাদের সর্ব্বপাপ মোচন করিয়া দেন।" হেরদ রাজা বিদ্বেষপরবশ হইয়া যিশুখৃষ্টকে শূলে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, যিশুখৃষ্ট আপনার দেহের রক্তদান করিয়া বিশ্বাসী-ভক্তগণের পাপ ধৌত করিয়াছেন। এই প্রমাণে বুঝিতে হয়, খৃষ্টভক্তগণের পাপ থাকে না, জীবনান্ত হইলে তাহারা স্বর্গবাসী হইয়া থাকে।

কিসে যে কি হয়, নিঃসন্দেহে তাহার মীমাংসা পাওয়া যায় না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার লিখিয়াছিলেন :—

"মরে যদি ফিরে আসি মনে যদি রয়।
তবে ত বলিতে পারি মরিলে কি হয়॥"

এই পদটি আপাততঃ রহস্যমূলক বোধ হইলেও বাস্তবিক ইহা রহস্য নহে, বিচারস্থলে উহা অখণ্ডনীয় সত্য কথা। আমরা এখন আনুসঙ্গিক গল্পকথা উত্থাপন করিব। খৃষ্টানের কথাই অগ্রে আলোচনা করা যাউক ; কারণ পাশ্চাত্য খণ্ডের খৃষ্টান মহাশয়েরা অধুনা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনাতেও তাহারা অগ্রগণ্য। মানুষ মরিলে ভূত হয়, ভারতবাসীর এই সংস্কারকে ইংরাজ পণ্ডিতেরা কিছুদিন পূর্ব্বে হাস্যকর কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতেন ; কিন্তু আজকাল দেখা যায়, ইয়োরোপ হইতে রাশি রাশি ভৌতিক পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, সাধারণ লোকে আগ্রহ সহকারে সেই

সকল পুস্তক গ্রহণ করিতেছেন; চলিত কথায় অসাধারণ কাট্‌তি। সেই সকল পুস্তকের গর্ভে তৎদেশীয় ভূতগণের অদ্ভূত অদ্ভূত কীর্ত্তি স্থানপ্রাপ্ত হয়। প্রেতাত্মা সময়ে সময়ে দেহ পরিগ্রহ করিয়া দলে দলে পৃথিবীতে বিচরণ করে, মশাল জ্বালিয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া গীত গাহিয়া বেড়ায়; কতক কতক ভূত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষেত্রে শত শত বর্ষকাল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধাঙ্গ হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে। তবে যে প্রভু যিশুখৃষ্ট আপনার রক্ত দিয়া ভক্তগণের পাপ-ধৌত করিয়া লইয়াছেন সে কথাটি কোথায় থাকে? আজকাল ইউরোপে ভূতের গল্প বাহির হইতেছে; পূর্ব্বেও ছিল না, ইহাও বলা যায় না।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে মহাকবি সেক্সপীয়ার প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত বিশ্বপ্রসিদ্ধ "হ্যাম্‌লেট" তৎবিষয়ে প্রধান সাক্ষী।

ইয়োরোপে ভূতের গল্প সত্য কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা প্রসূত রহস্য, তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন হইতেছে না; মূল কথা এই যে শিক্ষিত সমাজে ভৌতিক পুস্তকের যখন অত্যধিক আদর দেখা যাইতেছে, তখন ভূতের গল্পে তাঁহারা কিছু না কিছু বিশ্বাস রাখেন, ইহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে, বলিতে হয়।

খৃষ্টানের কথা রাখিয়া এখন আমরা আমাদের নিজের কথার বিচার করি। আমরা ভারতবাসী হিন্দু;—হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রে পুনঃ জন্মের উল্লেখ আছে। আত্মা অবিনাশী, আত্মা নরদেহ হইতে বহির্গত হইয়াই দ্বিতীয় জননী জঠরে আশ্রয় লয়, শাস্ত্র এমন কথা বলে না। জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মারও পরলোকে ভোগ আছে। প্রেতাত্মারা কিছুদিন অলৌকিক ব্যবহারে অদৃশ্যরূপে থাকিয়া কর্ম্ম ফল ভোগ করে; সময়ে সময়ে জীবিত মনুষ্যগণকেও বিভীষিকা দেখায় ভাল কার্য্যও দেখায়, আমেরিকাখণ্ডের প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যোগবলে এক একটি আত্মা নামাইয়া তাহার মুখে কথা শুনিতেছেন, অপরকে শুনাইতেছেন, প্রেতের ছায়া মূর্ত্তি দেখাইতেছেন, অজ্ঞলোকের দ্বারা লিপি লিখাইয়া লইতেছেন, এ সকল অপ্রসিদ্ধ কথা নহে, অনেক ভাল ভাল লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তবেই স্বীকার করিতে হয়, মার্কিনযোগিগণের ক্ষমতার সহিত হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যোগগিণের বিশেষ ঐক্য আছে।

মানুষ মরিলে কি হয়, কেহ তাহা ঠিক জানে না বটে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রোক্ত

পুনর্জন্মের কথায় পূর্ণবিশ্বাস রাখিতে হয়। পৃথিবীতে অবতীর্ণ দেবগণেরও পুনঃজন্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণপ্রমাণে অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র বৈকুণ্ঠ-পতির অংশাবতার। ত্রেতাযুগে রামলীলা, দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা। দ্বাপরে রামচন্দ্র মথুরায় দেবকীগর্ভে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ। ত্রেতাযুগে লঙ্কাদ্বীপের সমুদ্রকূলে রামরাবণের সমর-সময় যে দিন রামলক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের নাগপাশ অস্ত্রে বন্দী হন, গরুড় আসিয়া মুক্ত করেন, গরুড় সেই দিন পাখার ঘর করিয়া তন্মধ্যে ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্রের বংশীধারী কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছিল। দূর হইতে হনুমান তাহা দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল :—

"প্রাণে প্রাণে সাধি মোরা শ্রীরামের হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত॥
ধনুর্ব্বাণ খসাইয়া বাঁশী দিল হাতে।
এত অহঙ্কার পাখী দেখালে লঙ্কাতে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃ শর করে
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে॥"

বাস্তবিক দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে হনুমান সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল। যে সময় সত্যভামা-ব্রতের জন্য গরুড়পক্ষী নীলপদ্ম আনিতে যায়, পদ্মবনরক্ষক হনুমান সেই সময় গরুড়কে কক্ষদেশে বন্দী করিয়া নীলপদ্ম গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকা-পুরীতে যাত্রা করে; রামপ্রাণ হনুমান কৃষ্ণরূপ দেখিবে না, রামরূপ দেখিবে, কৃষ্ণ তাহা অন্তরে বুঝিয়া, রুক্মিণীদেবীকে সীতা সাজাইয়া দ্বারকার রাজসিংহাসনে ধনুর্ব্বাণধারী রামরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সত্যভামা ও গরুড়ের দর্পচূর্ণপ্রসঙ্গে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। রামচন্দ্রের পুনর্জন্মের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

মনুষ্যের পুনর্জন্ম আছে, শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে তাহা অনেকবার ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতাবাক্যে তিনি যখন অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন, তখন এক স্থলে বলিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমিও অনেকবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমিও পৃথিবীতে অনেকবার জন্মগ্রহণ করিরাছি। তুমি সেই সকল পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়াছ, আমি কিছুই ভুলি নাই; সমস্তই আমার স্মরণ আছে।"

অতি সুন্দর কথা। মানুষের পুনঃ জন্ম আছে, মানুষ কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের কথা ভুলিয়া থাকে, কাজেই আপনাকে নূতন জন্মা বলিয়া মনে করে। সেটা কেবল ভ্রান্তির কার্য্য, মায়ার ছলনা। পক্ষান্তরে সকল মনুষ্যই যে, পূর্ব্বজন্মের কথা ভুলিয়া যায়, তাহাও ঠিক নহে। এক একজন সাধুপুরুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন, তাঁহাদের নাম জাতিস্মর। এখনও স্থানে স্থানে দু-একটি জাতিস্মরের বিদ্যমানতা শ্রুতিগোচর হয়। পুনর্জন্ম না থাকিলে জাতিস্মরের অস্তিত্ব থাকিত না। একটি জাতিস্মরা রমণীর কাহিনীও আমরা শুনিতে পাই। চাঁদ সওদাগরের পুত্রবধু, সায় সওদাগরের কন্যা বেহুলা জাতি-স্মরা ছিলেন। নখিন্দরের প্রাণদানের পূর্ব্বে, কলার মান্দাসে বসিয়া একরাত্রে সপ্তজন্মের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জন্মে বিবাহ-বাসরে যেমন তিনি পতিহারা হইয়াছিলেন, পূর্ব্বের সাত জন্মেও সেইরূপে তাহার বিবাহরাত্রে বৈধব্য ঘটিয়াছিল; সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া বণিক-কন্যা বেহুলাসুন্দরী শেষজন্মে মৃতপতিকে পরিত্যাগ করেন নাই; মরা পতি কোলে করিয়া ছয়মাস জলে ভাসিয়া দৈবানুগ্রহে সেই পতিকে বাঁচাইয়া আনিয়াছিলেন।

জাতিস্মর—জাতিস্মরার ইতিহাস যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন পুনর্জন্মে অবিশ্বাস করা স্বভাব-সঙ্গত হইতে পারে না। এই প্রমাণে হিন্দুশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে, অপরাপর জাতির অপরাপর শাস্ত্র ভ্রান্তিমূলক অথবা কল্পনামূলক বোধ করিলে কেহ আমাদিগকে অপরাধী বলিতে পারিবেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা নিত্য নিত্য নূতন নূতন আত্মা সৃজন করিতেছেন, জগতের উপর ত আত্মারা বায়ুপথে মিলাইয়া যাইতেছে, এরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থানদান করিতে অবশ্যই আমাদের সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। সেই জন্যই আমরা পুনর্জন্ম স্বীকার করি। এক্ষণে পাঠক মহাশয়গণকে মিনতি করিয়া আমরা অনুরোধ করিতেছি, নিশ্চিত মীমাংসা না পাইলেও, যুক্তিকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষভাবে তাঁহারা বিচার করুন, মরিলে কি হয়?

—— ০:০:০ ——

ভ্রমর।

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু, এম, এ,

(৩)

ভ্রমরের হৃদয় কঠোরতর হইতে কঠোরতম হইতে লাগিল। পতি-ভক্তি ত লুপ্ত হইয়াছে, স্নেহেরও বুঝিবা হ্রাস হইল। পতিত, ক্ষুধিত, ব্যথিত পতির পত্রোত্তরে ভ্রমর লিখিল, "আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। আপনার সঙ্গে আমার ইহ-জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনি যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।" কি ভয়ানক পত্র, কোমলতার লেশমাত্র নাই।

ভ্রমর! তুমি কি সেই ক্ষমাশীলা কোমলা রমণী, যাহার হৃদয় শত্রুমিত্র ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্যা হইয়া অপরের কল্যাণের জন্য ছুটিত, তুমি কি সেই আদর্শ পতিব্রতা সতী, যাহার দর্শনে হৃদয় জুড়াইত। আজ তোমার পতিত বুভুক্ষু পতি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, তোমার দর্শন প্রার্থী, তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুরের ন্যায় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে। তুমি কি জান না, তোমার এ নিদারুণ পত্র তাহার হৃদয়ে কিরূপ শেলাঘাত করিবে,—তুমি কি জান না, তোমার এ মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা তাহার মর্ম্মস্থল কিরূপ বিদ্ধ করিবে?

পাঠক-পাঠিকাগণ! কি নিমিত্ত ভ্রমরের এরূপ প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন হইল। সেই সরলা প্রেম-বিহ্বলা বালা পতি ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, তাহার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন কিরূপে সাধিত হইল? আমাদের কবি-কুল-তিলক, সাহিত্যাগ্রগণ্য, সুদক্ষ গ্রন্থকার চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। কিরূপে ধীরে ধীরে ভ্রমরের অধঃপতন হইল, তিনি তাহা আমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ভ্রমরের চরিত্রের ক্রমবিকাশ অতীব মনোরম, ভ্রমরের অতুল প্রেম, দৃঢ়, অটুট বিশ্বাস কিরূপে স্খলিত হইল, কি প্রকারে ভ্রমরের ধর্ম্মভাব দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তৎসহিত পতিভক্তি শিথিল হইল, তাহা উজ্জ্বলাক্ষরে বর্ণিত আছে। কিন্তু কি কারণে ভ্রমর স্বামীকে ভুলিল?

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্ম্ম ও পতি-প্রেম এই দুই উপকরণে ভ্রমরের জীবন গঠিত। তন্মধ্যে ধর্ম্মই তাহার নিকট শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদের

শাস্ত্রমতে পতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পতিই ইহ-কাল-পরকাল, পতির সেবাশুশ্রূষাই নারী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা অন্তরের সহিত পতিকে ভালবাসে, স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দতা পতির নিমিত্ত অক্লেশে বিসর্জ্জন করে। তাহারা স্বামীর ন্যায়ান্যায় বিচার করে না, তিনি পাপী হউক, পাষণ্ড হউক; পামর হউক, তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ দেবতা। এই প্রাচ্যশিক্ষাই আমাদের দেশের রমণীদিগকে এতাদৃশ মহৎ ও নিস্বার্থপর করিয়াছে। এই শিক্ষার নিমিত্ত আমাদের দেশের বিধবারা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন আমাদিগের মধ্যে প্রবলতর হইল, তখন এই প্রাচ্য আদর্শ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে লাগিল, পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে প্রাচ্যশিক্ষা ডুবিল। গোবিন্দলাল পাশ্চাত্য শিক্ষাভিজ্ঞ যুবক, তিনি তাঁহার ভার্য্যাকে পাশ্চাত্য শাস্ত্রানুসারে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম, পতি অপেক্ষা মহত্তর, উচ্চতর। ভ্রমর বাঙ্গালী-কন্যা, স্বামীকে প্রগাঢ় ভক্তি করিত, তাঁহার উপদেশ বেদবাক্যবৎ গ্রহণ করিত, সুতরাং গোবিন্দলালের এই শিক্ষাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল; সেইহেতু ভ্রমরের নিকট ধর্ম্মই মহৎ। তাঁহার হৃদয় সতীর হৃদয়, স্বামীর মঙ্গলের নিমিত্ত সে আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত ছিল না; কিন্তু তাহার শিক্ষা পাশ্চাত্য শাস্ত্রানুযায়ী, পাপ ও পাপীর উভয়কেই সে অত্যধিক ঘৃণা করিত। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহার সর্ব্বনাশের মূল,—এই শিক্ষাই তাহার গোবিন্দলালের প্রতি অবিশ্বাসের একমাত্র কারণ। তাহার প্রাচ্যহৃদয়ে ও প্রতীচ্যশিক্ষা অতি কুফল উৎপাদন করিল, ভ্রমর মরিল। ভ্রমরের জীবনী হইতে আমরা একটি মহৎ উপদেশ লাভ করিতে পারি। সামান্য কারণে স্বামীর প্রতি অভিমান করা, তুচ্ছ ঘটনায় স্বামীকে অবিশ্বাস করা, অতীব সাংঘাতিক। ইহা জীবনের সমুদায় সুখশান্তি হরণ করে, দাম্পত্যজীবন অল্পে অল্পে বিষময় হইয়া উঠে, সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে। দাম্পত্যজীবন, কত প্রীতির সংসার যে এরূপ অযথা অভিমান অন্যায় অবিশ্বাসে উচ্ছন্ন যায়, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ।

অধুনা আমরা ভ্রমরের সহিত বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীর তুলনা করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। উভয়েই হিন্দুকন্যা, উভয়েরই বিশাল হৃদয়, বর্ষাকালের স্ফীত স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রেম-পরিপূর্ণ, উভয়েরই প্রণয় গাঢ়, অনুরাগ আন্তরিক। উভয়েই স্বামীর সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, উভয়েরই অস্তিত্ব পতির হৃদয়েই লীন হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রমরের নিকট ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, পতি ধর্ম্মের নিম্নস্তরে,

সূর্য্যমুখীর নিকট স্বামীই প্রধান, ধর্ম্ম স্বামীর নিম্নে; ভ্রমরের নিকট পতির যশঃ, পতির সুনাম, পতির অকলঙ্ক-চরিত্র সমধিক আদরের জিনিষ, সূর্য্যমুখীর নিকট পতিই সারাৎসার,—অপযশঃ, কলঙ্ক নগণ্য সামগ্রীমাত্র; এক কথায় ভ্রমরের নিকট ধর্ম্ম বড়, সূর্য্যমুখীর নিকট পতি শ্রেষ্ঠ,—ভ্রমর প্রতীচ্যশিক্ষার আদর্শ, সূর্য্যমুখী প্রাচ্যশিক্ষার আদর্শ।

—:০:—

দেবী।

লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল।

প্রথম যৌবন-কালে, হৃদয়-মন্দিরে,
কোরেছিনু যে দেবীর মুরতি স্থাপন।
সুপ্ত স্মৃতি উঠি জাগি খুলি দেয় ধীরে,
মন্দিরের রুদ্ধদ্বার, করিনু দর্শন—

তপত কাঞ্চন সম বরণ উজ্জ্বল,
ফুল্ল দেহ বিভাসিত নবীন যৌবনে।
হাস্যপূর্ণ প্রেম-রসে মুখ ঢল ঢল,
লম্বিত চিকুর পৃষ্ঠে, সতৃষ্ণ-নয়নে—

চাহিয়া আমার পানে নবীনা সরলা,
অসীম প্রণয়-পূর্ণ, প্রশান্ত হৃদয়,
কণ্ব ঋষি তপোবনে যথা শকুন্তলা,
রাজা দুষ্মন্তের পাশে অধঃমুখী রয়।

দাঁড়াও সম্মুখে দেবি! করিব অর্চ্চন,
চরণ-কমল তব, প্রীতি পুষ্পহারে।
বহুদিন গেছ ত্যজি, এ মর্ত্ত ভুবন,
বহুদিন আছি আমি নিবিড় আঁধারে।

স্মৃতি মোর ধ্যানে ভাল করিতে চিন্তন,
মধুর মুরতি তব, বাক্য মধুময়।
ভালবাসা বিস্ফারিত নলিন-নয়ন,
বিম্বাধর, প্রেমভরা প্রসন্ন হৃদয়॥

পৌর্ণমাসী রজনীতে শশীর কিরণ,
যথায় পতিত তাহা হয় শোভাময়।
যখনি আমারে তুমি করিতে দর্শন,
তখনি আনন্দে পূর্ণ হইত হৃদয়।

জননীর স্নেহ, আর ভগিনীর স্নেহ,
প্রেমিকার ভালবাসা সব একাধারে,
নয়নে তোমার হেরি, প্রেমানন্দে দেহ,
ভাসিত আমার স্বর্গ-সুখ পারাবারে।

জননী ভগিনী দুই শৈশবে বিগত,
করেছিলে সেই দুই, স্থল অধিকার।
ইষ্ট-দেবী-স্বরূপিণী কল্যাণি! সতত,
বিরাজিতা ছিলে দেবি! হৃদক্ষে আমার।

প্রেমালোকে দীপ্ত সেই বদন-মণ্ডল,
সহাস্য শ্রীমুখে বাক্য পীযূষের ধার।
সে আলোক রসে তুষ্ট হ'ত হৃদিস্তল,
শান্তি জলে অভিষেক করিত সংসার।

কতদূরে দিনমণি বিরাজে গগণে,
দূরে থাকি কমলিনী, পঙ্কিল তড়াগে।
ভানু পানে চেয়ে চেয়ে সতৃষ্ণ নয়নে,
প্রেমামোদে হাস্য করে, প্রীতি অনুরাগে।

আমিও নলিনী সম, নীরবে তোমায়,
বাসিয়া ছিলাম ভাল, মনের মাঝারে।

চিত্ত প্রফুল্লিত হ'ত জ্যোতির ছটায়,
সে জ্যোতি বিলীন এবে নিরাশ-আঁধারে।

তুমি দেবি! জ্যোতির্ম্ময়ী প্রেমের ভাস্কর,
উদয় হইতে মোর নয়ন-আকাশে।
নিখিল অখিল হ'ত সুখের আকর,
বাঁধিতাম অবনীরে মধুপ্রেম-পাশে।

প্রফুল্ল কুসুম-কলি শুখাল অকালে,
বিধাতার ইচ্ছাধীন, মানব-নিয়তি।
রূপ গুণ হাসি খেলা, লয় পায় কালে,
ধরাধামে থাকে মাত্র রব আর স্মৃতি।

মৃত্যু-শয্যা-শায়ী হ'য়ে সাদরে আমায়,
কত আশীর্ব্বাদ তুমি করিলে কল্যাণি!
না জানি কপাল দোষে, কেন নাহি হায়,
ফলিল সে আশীর্ব্বাদ, এখনো না জানি।

যদি পরলোকে কভু মম দেহান্তরে,
স্বর্গধামে, আত্মা মম, তোমার সহিত।
পুণ্যফলে মিশি রয় ক্ষণকাল তরে,
মরতের ভালবাসা, হইবে বিদিত।

মহাকবি দাণ্ডে যথা, বিয়াত্রী সকাশে,
প্রকাশিল পৃথিবীর প্রেম-পারাবার।
আমিও তেমনি ভাবে মনের উল্লাসে,
দেখাব তোমারে মম প্রণয়-ভাণ্ডার।

—— ০:০:০——

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ সি, আই, ই,



পরলোকে।

পূর্ব্ববঙ্গের সারস্বতকুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল, খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যসেবী, বান্ধব-সম্পাদক-সুবক্তা রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর গত ১৩ই (১৩১৭ সাল) শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতঃকালে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহার পরিপূর্ণ হওয়া একরূপ অসম্ভব। তাঁহার বির-চিত নিশীথচিন্তা, নিভৃতচিন্তা, ভক্তির জয়, মা না মহাশক্তি, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা, প্রভৃতি বহু জ্ঞান গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক পুস্তকগুলি শিক্ষিত সমাজে

সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। জননী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি, বিশুদ্ধি, রক্ষণ ও ভাষার ওজস্বিতা সংরক্ষণ বিষয়ে ঘোষ মহাশয় আন্তরিক মনোযোগী ছিলেন; বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্যের ভাবোচ্ছ্বাস ঢালিয়া এক অপূর্ব্ব রসের বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গের এক সম্প্রদায় লেখক তাঁহার সুলিখিত, সুললিত ভাষা আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৫০ অব্দে ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় ভরাকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুর ৺শিবনাথ ঘোষ। মাতার নাম উমাতারা। মৃত্যুকালে কালীপ্রসন্নের বয়স হইয়াছিল সত্তর বৎসর। তিনি কেবলই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার ইংরাজী রচনাও অতি সুন্দর ছিল। তিনি সংস্কৃত গদ্য পদ্যে অনায়াসে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তিনি মেধাবী, সুপণ্ডিত, পরিশ্রমী, তত্ত্বদর্শী ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। প্রৌঢ়তার প্রথমে তিনি মুগ্ধবোধের কঠোরতা আয়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি একজন অদ্বিতীয় শাব্দিক হইয়াছিলেন, তাঁহার শব্দসম্পদ একরূপ অক্ষয় ছিল। ভাবপ্রবণ হৃদয় বলিয়া, তিনি অতি কঠোর অতি শুষ্ক তত্ত্বদর্শনের গভীর আলোচনায় ভাবের মধুর মাধুরী ফুটাইতে পারিতেন। তিনি অতি দুর্ব্বোধ জটিল বিষয়কেও সহজবোধ্য করিতে পারিতেন; তাই তাঁহার ভাষা অতুলনীয়। কালীপ্রসন্ন একাধারে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বাগ্মী। এতগুণ ছিল বলিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সদয় হইয়া, রাজপক্ষ হইতে তাঁহাকে অকপটচিত্তে রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন, সাহিত্যসেবীর মর্ম্মবেদনা বুঝিতেন; তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে চাহিয়াছিলেন, কোন কোন রাজোপম ধনাঢ্য জমীদার তাঁহাকে স্থানান্তরে বিষয়কর্ম্মের ম্যানেজার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম ঢাকায়, জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলে সাহিত্যসেবার ত্রুটি হইবে, মনে করিয়া, তিনি অন্যত্র গমন করিতে সম্মত হন নাই। ঢাকা জেলাস্থ ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহাকে তাঁহার বিপুল বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার করিয়াছিলেন। ম্যানেজারি কালে কালীপ্রসন্নের সাহিত্যসেবার ত্রুটি হয় নাই; পরন্তু তাঁহার পরামর্শে সাহিত্য-সুহৃদ রাজা সাহিত্য-সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং কালীপ্রসন্নের পরামর্শে রাজা এই সভা উপলক্ষে বিস্তর সাহিত্য-সেবীকে অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত

করিয়াছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর দায়িত্বপূর্ণ ম্যানেজারি কার্য্য করিয়া আজ কয়েক বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য—তিনি সাহিত্যসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। শেষ জীবনে রোগশয্যায় তিনি "ছায়াদর্শন" রচনা করেন। এই ছায়াদর্শনে পরলোকতত্ত্বের আলোচনা, এই আলোচনায় তাঁহার অতুল অধ্যায়নের পরিচয়। কালীপ্রসন্ন এক্ষণে পরলোকে, ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে শান্তি প্রদান করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

—:০:—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত

সাধারণ উপদেশ।

মধ্যলীলা।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

১। চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সে-ই মোর প্রাণ॥ ১পং ৭১ পৃষ্ঠা।*

২। পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার। ৭৫ পৃষ্ঠা।

৩। তীর্থযাত্রায় এত সঙ্ঘট্ট—ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটি॥ ৭৬ পৃষ্ঠা।

৪। গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে—পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥ ৬পং।৮৪পৃষ্ঠা।

৫। নিত্যানন্দ কহে—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে 'ঝুঠা' কহিলে তুমি—কৈলে অপরাধ॥ ঐ।৮৬পৃষ্ঠা।

৬। প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেম-সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥ ৪পং।৯৩পৃষ্ঠা।

* পৃষ্ঠাঙ্কগুলি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণের।

৭। ব্রাহ্মণসেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ বাঢ়য়॥　৫পং।৯৫পৃষ্ঠা।

৮। শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে?।
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে॥
শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ে ত যাহারে।
সে-ই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥　৬পং।১০১পৃষ্ঠা।

৯। পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥ ঐ

১০। ভাগবত ভারত দুই—শাস্ত্রের প্রধান।　ঐ।১০২পৃষ্ঠা।

১১। বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥　ঐ

১২। ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তিফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥　ঐ।১০৭পৃষ্ঠা

১৩। লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥　ঐ

১৪। মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥ ৭পং।১০৯ পৃষ্ঠা

১৫। মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই, তবু যান তার ঘর॥ ৮পং।১১৩পৃষ্ঠা

সাধ্য নিরূপণ।

১৬। প্রভু কহে, পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে, স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥ ঐ
প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো হয় আগে কহ আর॥
রায় কহে, দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥ ঐ।১১৪ পৃষ্ঠা

১৭। কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম॥ ঐ

১৮। পূর্ব্বপূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ ঐ
আকাশাদির গুণ যেন পর পর-ভূতে।
দুই তিন ক্রমে পঞ্চ বাঢ়ে পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে ॥ ঐ।১১৫পৃষ্ঠা

রাধা-প্রেম।

১৯। ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥

ক্রমশঃ

ভূত-বিজ্ঞানম্।

লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি· এ· এল. এম. এস·

(৪)

আপ্তেরা বলেন, গুপ্ত ও ভাবী বিষয়ের জ্ঞান, চিত্তের অনবস্থিতত্ব, অসহিষ্ণুতা অমানুষী ক্রিয়া, এইগুলি কোন ব্যক্তিতে সহসা দৃষ্ট হইলে তাহাতে গ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে, মনে করিতে পারা যায়।

গুহ্যানাগত বিজ্ঞান
মনবস্থাঽ সহিষ্ণুতা।
ক্রিয়া বাঽমানুষী যস্মিন্
সগ্রহঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ।

অমানুষী ক্রিয়ার অর্থ, ডল্লনের মতে,—

অমানুষী ক্রিয়া বরদানাদিনা
লঙ্ঘন প্লবনাদিকেন বা,
অন্যে অমানুষীত্যাদিনা মানুষঃ
কর্ত্তুং ন শকতে যস্যাং সা।

অর্থাৎ বরদানাদি, কিম্বা লঙ্ঘন প্লবনাদি, অথবা মানুষ যাহা করিতে সমর্থ নহে, এইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া সকলকে অমানুষী ক্রিয়া কহে। অসহিষ্ণুতা অর্থ ক্রোধক্রিয়া। লঙ্ঘন, প্লবন, অর্থ লাফ দিয়া কোন স্থান উল্লঙ্ঘন এবং প্লবন শব্দের অর্থ সন্তরণ দিয়া নদী প্রভৃতি দুরাগম্য জলাশয় উত্তীর্ণ হওয়া।

অমানুষিক লক্ষণ সকল যেমন একদিকে গ্রহাবির্ভাবে সমুৎপন্ন হয়, তেমনি নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিও গ্রহের আবির্ভাব জনিত। এই চিহ্নগুলি Autointoxication এর মত।

১। শূনাক্ষঃ ক্ষতজ সগন্ধক স্তন দ্বিড, বক্রাস্যঃ উদ্বিগ্ন স্খলিতচক্ষুঃ, অল্পরোদী গাঢ়মুষ্টিবচ্চাঃ হতচলিতেকপক্ষনেত্রঃ

২। নিঃসঙ্গোভবেৎপুনঃ সংজ্ঞঃ সংবদ্ধকরচরণৈশ্চ নৃত্যতীব বিন্মূত্রে সৃজতি বিন্দ্য নৃমমাণঃ ফেনঞ্চ প্রস্থনীত

৩। ত্রস্তাঙ্গঃ ভয়চকিতঃ বিহঙ্গগন্ধি সংস্রাবি ব্রণপীড়িত সমন্তাৎ স্ফোটশ্চ প্রততক্তনুঃ সদাহপাকঃ

৪। রক্তাস্যঃ হরিতমলঃ অতি পাণ্ডুদেহ শ্যাবো বা জ্বরমুখপাক বেদনার্ত্তঃ ব্যথিত তনুশ্চ কর্ণনাং মৃদনাতি

৫। শ্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি সুখং দিবান্ রাত্রৌ বিড়ভিন্নং সৃজতিচ কাক তুল্যগন্ধি দূর্যার্ত্তঃ হৃষিত তনুরুহঃ তৃষ্টালুঃ

৬। স্তনং দ্বেষ্টি অতিসার কাসহিকা ছর্দীভিজ্বর সহিতাভিরদ্ধমানঃ দূর্ব্বর্ণঃ সতত মধঃশয়ঃ অম্লগন্ধিঃ

৭। উদ্বিগ্ন ভৃশমতি বেপতে প্ররুত্যাৎ সংলীনঃ স্বাপতিচ অন্ত্রকুজঃ বিস্রাঙ্গঃ ভৃশমতি সার্য্যতে

৮। ম্লানাঙ্গঃ সুরুচিরপাণিপাদ বক্ত্রঃ বহ্বাশী কলুষ শিরাবৃতোদর সোদ্বেগঃ মূত্র তুল্যনঙ্গিঃ

৯। ফেনং বমতি বিনম্যতেচ মধ্যে সোদ্বেগং বিলপতি উর্দ্ধমীক্ষমাণঃ জর্য্যেত প্রততং বসাগন্ধিঃ নিঃ সজ্ঞঃ

গ্রহসম্পূর্ণলক্ষণঃ,—

প্রস্তব্ধঃ স্তনদ্বেষী মূর্হ্যতে মুহুঃ।

উক্ত লক্ষণ সকল শ্রেণীবিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে শরীরে একপ্রকার গন্ধ উৎপন্ন হয়।

গন্ধ যথা :—বসার মত গন্ধ, মূত্র তুল্য গন্ধ অম্ল গন্ধ, কাক তুল্য গন্ধ, বিহঙ্গ গন্ধ, রুধির গন্ধ। দুর্গন্ধ কতকগুলিতে রোগী শিশু হইলে স্তন্যদ্বেষী হইয়া থাকে; কতকগুলিতে রোগীর শরীরে ব্রণ, স্ফোট, প্রভৃতি জন্মে; কতকগুলি রোগীর মলভেদ, মলবদ্ধতা, অন্ত্রকূজন হইয়া থাকে; কতকগুলি রোগীকে জৃম্ভা, গাঢ়মুষ্টি হতচলিতৈকপক্ষনেত্রতা সংবদ্ধ করচরণ নৃত্যতা, উর্দ্ধদৃষ্টি, শূন্যদৃষ্টি, স্খলিত চক্ষু, বক্রাস্যতা সংজ্ঞা শূন্যতা, অতিশয় স্তব্ধতা, রোদনশীলতা কিম্বা অরোদন দেখা যায়; আবার কতকগুলি রোগীর উদ্বিগ্নতা, ভয়চকিততা মোহ পরিদৃষ্ট হয়; কতকগুলি রোগীর পাণ্ডু দেহ শ্যাববর্ণ, দুর্ব্বর্ণ, ম্লানাঙ্গা অথবা পাণিপাদ উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত হয়; কতকগুলি রোগীতে জ্বর, বমি, কাস, অতিসার, হিক্কা, দেখা যায়,; কোন কোন রোগী মুহুর্মুহু আক্ষেপযুক্ত হইয়া ফেন বমন এবং বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করে, এবং একবার অজ্ঞান হয়, আবার পরক্ষণে সজ্ঞানপ্রাপ্ত হয়; কাহারও কাহারও উদর শিরা জাল আবৃত হয়; কেহবা বহুভোজী, হয়; কেহবা দিবায় নিদ্রা পরায়ণ, এবং রাত্রিতে অনিদ্রাযুক্ত হয়, মনে হয়, যেন অতিশয় বেদনাযুক্ত, অনেকে আবার অধোমুখ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। ফলতঃ গ্রহজুষ্ট মানবশরীরে বিশেষতঃ শিশুদিগের শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, মনে হয়, যেন তাহার অধিকাংশই Autointoxication এর মত। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—ধাত্রী ও মাতার নির্দ্দিষ্ট আচরণ সমূহের অপচয় বশতঃ কুমারেরা শৌচভ্রষ্ট হইলে এই সকল অর্থ উৎপন্ন হয়,—

"ধাত্রী মাত্রোঃ প্রাক্‌প্রদিষ্টাপচয়ো
শৌচভ্রষ্টান্ মঙ্গলাচারহীনান্
হিংস্যুরেতে কুমারান্।"

অর্থাৎ ধাত্রী ও মাতা যদি অনাচার-পরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে শিশু শৌচভ্রষ্ট হয়, এবং শৌচভ্রষ্ট হইলে তাহারা গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে আমরা টীকায় এই কথাগুলি দেখিতে পাই; চল্লন লিখিতেছেন,—

কস্মাৎ গ্রহ বালান
আবিশান্তি ইত্যাহ ধাত্রীমাতাদি
ধাত্রী স্তন্য পায়িত্রী। মাতা প্রসবিত্রী।
প্রাক্ শারীর স্থান নির্দ্দিষ্টাঽপচারবিধিঃ।

মাংস সুরাদীনাং উন্মাদাচরণো বা
শৌচং মূত্র পুরীষাদি প্রক্ষালনং
মঙ্গলং স্বস্তিক শ্রক্ দাম দূর্ব্বা
সর্ষপাদিস্পর্শনং
আচার পাপবিরোধী
কুমারান্ ইত্যুপলক্ষণং
কুমারিকা:অতি হিংস্যুং।
এতে গ্রহা ইত্যর্থঃ

অর্থাৎ গ্রহ সকল শিশুদিগকে কেন হিংসা করে? ইহার উত্তর:—

(ক) স্তনপায়িত্রী এবং প্রসবিত্রীর শাস্ত্রোক্ত অপচয় বশতঃ।

(খ) কিম্বা মাংস সুরাদি সেবনজনিত বিষক্রিয়া হেতু।

(গ) মূত্র পুরীষ অপ্রক্ষালন আর একটি প্রধান কারণ।

(ঘ) পুষ্প, পুষ্পমাল্য, দূর্ব্বা সর্ষপ প্রভৃতি গ্রহ নিবারক পদার্থের অস্পর্শও অপর হেতু।

(ঘ)কেবল যে বালকদিগেরই এই সকল রোগ হয়, তাহা নহে, বালকবালিকা উভয়েই এই রোগে পীড়িত হইতে পারে।

শিশুদিগের গ্রহ দুষ্ট হওয়ায় যে সকল কারণ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা-দিগকে আমরা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি:—

প্রথম—অশুচি শরীর ও শুচি বিধায়ক বিশোধন পদার্থের অব্যবহার।

দ্বিতীয় এমন সকল অহিত পদার্থের সেবন যাহাতে ধাত্রী বা মাতার স্তন্য দূষিত হয়, এবং দূষিত হইয়া সন্তানের শরীরে বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। মাংস সুরাদি সেবন সেই সকল অহিতকর পদার্থোৎপন্ন বিষক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

সুশ্রুতের শরীরস্থানে আছে:—

ধাত্র্যাস্তু গুরুভি ভোজ্যৈর্বিষমৈর্দোষলিপ্তৈস্তথা
দোষদেহে প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদুষ্যতি
মিতাহার বিহারিণ্যা দুষ্ট বাতাদয়স্ত্রিয়াঃ
দুষয়ন্ত্যপরস্তন শারীরা ব্যাধয়ঃ শিশোঃ

অর্থাৎ গুরুভোজন, বিষম ভোজন, দোষলিপ্ত ভোজন দ্বারা ধাত্রীর বাতাদি কুপিত হইয়া স্তন্য দূষিত করে। স্তন্য দূষিত হইলে, সেই স্তন্য পান করিলে শিশুর

নানাবিধ রোগ জন্মে। সে রোগগুলি যেন উন্মাদের লক্ষণযুক্ত Autointox-cation বা উন্মাদাচরণ।

অথ কুমার উদ্বিজতে ত্রস্ততি রোদিতি, নষ্ট সংজ্ঞো চেতি, নখদশনৈ ধাত্রীমাত্মা ধনঞ্চ পরিমৃদ্নতি সন্তান খাদতি কূজতি জৃম্ভতে ভ্রুবৌ বিক্ষপ্যূর্দ্ধং নিরীক্ষতে, ফেন মুদ্বমতি সংদষ্টৌষ্টঃ ক্রূরো ভিন্নামবর্চ্চ দীনার্ত্তস্বরো নিশি জাগর্ত্তি দুর্ব্বলো ম্লানাঙ্গো মৎস্যচ্ছু ছুন্দ বসিৎ কুণগন্ধো যথাপুরা ধাত্র্যাঃ স্তন্যমভিলষতি তথা নাভিলষতীতি সামান্যেন গ্রহজুষ্ট লক্ষণমুক্তম্।

BERDOE বলিয়াছেন :—

The germ theory has thrown great light upon the suject of certain mysterious organic poisorning processes, which long parrted aualysts & Physicians. Diseased meat, fish, cheese & other articles of food frequenty cause symptoms hoisoning in those who have partaken of them. The analyst failed to detect the precise agent which cansed the mischie and it was not tile the Bacteria logists invest gated the subject that it was satisfactorih explained.

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বরোম পচা মাসের ভিতর হইতে এক প্রকার বিষ বাহির করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কর্ণার চাটনির ভিতর এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইতে দেখিত পান। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাংস হইতে পানাম এক প্রকার বিষ বাহির করেন। জুয়েলা এবং সনেনাস্কল মাংস হইতে এট্রোপিনের মত বিষক্রিয়া করে এমন এক পদার্থ বাহির করেন। ১৮৭১ সালে সেলমি সর্ব্বপ্রথম একপ্রকার বিষের কথা বলেন,—যাহা মৃত জন্তুর মাংসের ভিতর স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তিনি ইহার নাম দেন টোমেন্‌স (Ptomaines) পাষ্টুর এবং অন্যান্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান করিয়া মৃত্যুর কিঙ্কর স্বরূপ এই সূক্ষ্ম ভূত হইতে বিষোৎপত্তির বিষয় নিঃসন্দেহরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এখন এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূত হইতে সজীব বা মৃতদেহের ভিতর বৃক্ষ হইতে বিষ ক্ষরণের এক প্রকার ভয়ানক অনিষ্টকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ্ নাই। এই বিষ উৎপন্ন হইয়া মানুষের Nevousystesm বায়ুকে অত্যন্ত কুপিত করে; পনির হইতে উৎপন্ন বিষ আর একোনাইট নামক কাটবিষ তুল্যমূল্য।

—— ০:০:০ ——

সমালোচনা।

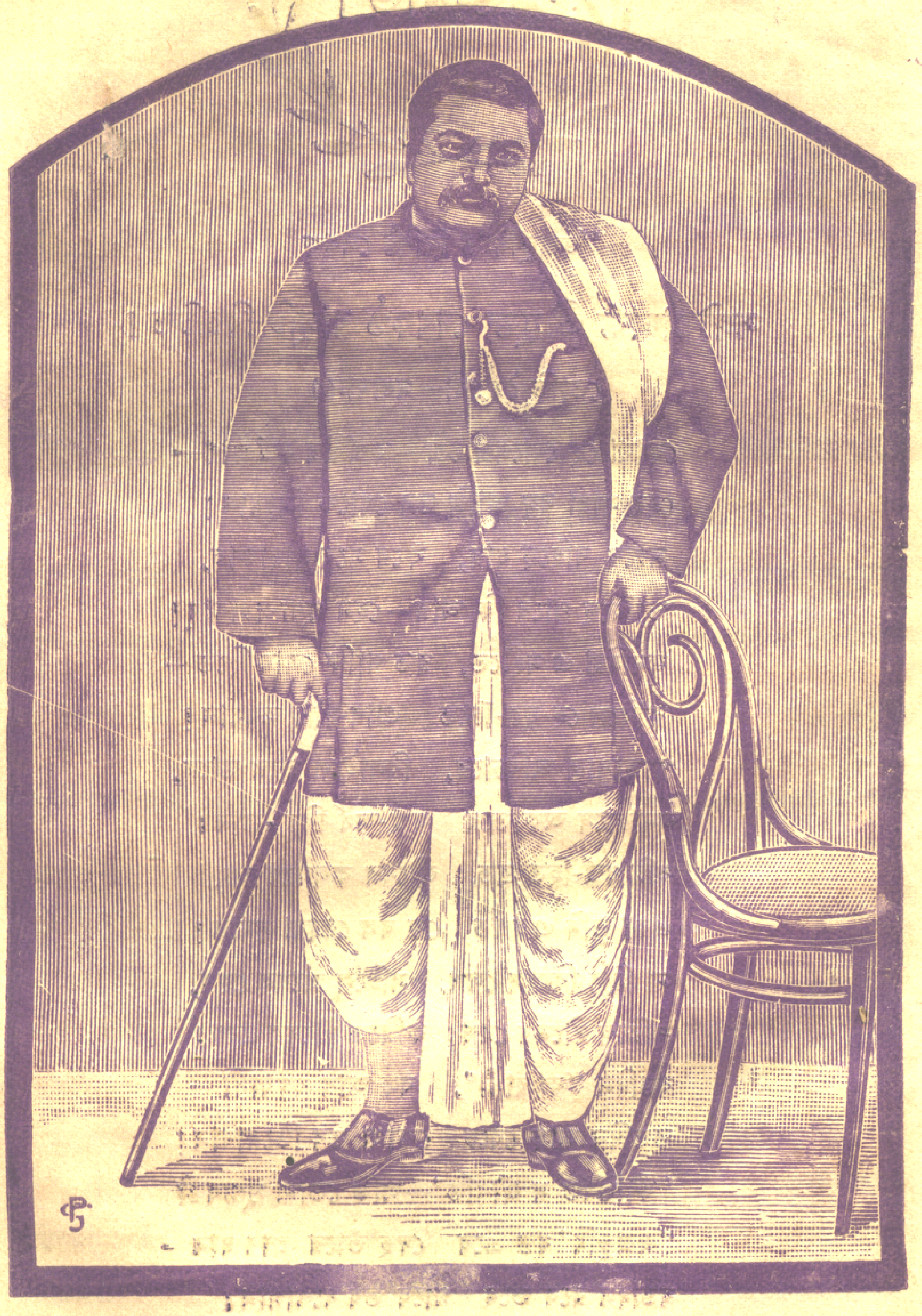
কামিনী ও কাঞ্চন। শ্রীযুক্ত রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য একটাকা মাত্র। জয়নগর, মজিলপুরে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

সংসার-বিরাগী যোগীগণের মুখে কামিনী কাঞ্চনের মোহিনীশক্তি পরিকীর্ত্তিত হইত, তাঁহারা সেই শক্তিকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেন. অধুনা শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব সেই কামিনী-কাঞ্চনের অপকারিতা বুঝাইয়া শিষ্য-গণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক উহা পরিহার করিতে পারেন, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় সাধু, লোভ রিপু তাঁহাদের নিকট পরাজিত। তাঁহারা জগ-তের সমস্ত মানবের নমস্য।

রায়-সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত, উপন্যাসের ন্যায়, ভাষাবিন্যাস করিয়া ঐ নাম দিয়া ঐ পুস্তক লিখিয়াছেন, লেখাগুলি সুখপাঠ্য ও সুশ্রাব্য হইয়াছে ; উপন্যাসের আদর্শ মর্ম্ম সাধারণকে বুঝাইবার জন্য, আমাদের নাট্য-প্রিয় বন্ধুগণ নগরের একটি নাট্যশালায় সাধারণ নেত্র সমীপে ইহার বিচিত্র ছবি ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাও ভাল হইয়াছে, কিন্তু যে পুস্তকগুলি সত্য সত্য উপন্যাস, সর্ব্বাগ্রে তাহার ভাষা লালিত্যাদির বিচার করিতে হয়, এ পুস্তকখানি সে প্রকৃতির নহে ; ইহার গুঢ় উদ্দেশ্য গুঢ়ভাব বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; এই নীতিটি সংসার-সাগরের পারে যাইবার পন্থা। যাঁহারা এই নীতি অনুসরণ করিতে পারেন, স্বর্গের দেবতারা যাহা পারেন নাই, মহাযোগী মহেশ্বরও যখন সতীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, সংসারের মায়াজড়িত মানবগণ তখন কি করিয়া এত উচ্চ পন্থায় বিচরণ করিতে যাইবেন, ভাবিতে গেলেও অন্ধকার দেখিতে হয়। "আমাদের রায়সাহেব খুব লিখিয়াছেন, ভাষাদেবী তাঁহার হস্তে খুব অলঙ্কার পরিয়াছেন, পুস্তকের রূপ দেখিয়া নরনারীগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন।" এইরূপে সমালোচনা করিলে এ পুস্তকের বিচার করা হইবে না। পুস্তকের অনেক গুণ আছে সত্য, কিন্তু সংসারি লোকেরা ইহার উপদেশ মত কামিনীকে জননী বলিয়া কাঞ্চনের জ্যোতিতে অন্ধ হইয়া থাকিবে এরূপ আশা কখনও করা যাইতে পারে না ; যদি যায়, তবে বিধাতার সৃষ্টি নিস্ফল হইয়া আসিবে। পুস্তকে সুনীতি আছে, কামিনী-কাঞ্চনের নিন্দা আছে, যেমন বিষয় তাহার উপযুক্ত নির্ঘণ্ট অগাধ জল-মধ্যে যে সকল মহারত্ন নিহিত আছে তাহা তুলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা কবি-গণ সেই সকল রত্নের গুণকীর্ত্তনে জগৎবাসীর চিত্তরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ দৃষ্টান্তে হারাণবাবু আমাদের সামাজিক লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। বেশ কথা। আমোদপ্রিয় লোকেরা তাঁহার "কামিনী-কাঞ্চন" লইয়া যেরূপ আমোদ করিতেছেন, তাহাই করুন, তাহাই থাকিয়া যাইবে, প্রগাঢ়ভাবে পৌঁছিবার এখনও অনেক বিলম্ব। গ্রন্থকার ভক্তিগদ্গদচিত্তে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা ব্যাখ্যা করিতে পারেন, সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। হারাণ বাবুর লেখনির উপর পুষ্পবৃষ্টি হউক।

স্মৃতি-উপহার।

ষষ্ঠবার্ষিক স্মৃতিসভায় জন্মভূমির স্বত্বাধিকারিগণ কর্ত্তৃক বিতরিত।



‘বঙ্গবাসী’র প্রতিষ্ঠাতা, বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচারক ও মাসিক-পত্রিকা ‘জন্মভূমি’র প্রবর্ত্তক

স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

জন্ম ১২৬১ সাল, ১৬ই পৌষ, রবিবার। মৃত্যু ১৩১২ সাল, ২রা ভাদ্র, শুক্রবার।

কলিকাতা ৩৯নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, জন্মভূমি প্রেসে মুদ্রিত।

স্মৃতি-গীতি।

"জন্মভূমি"র বিশিষ্ট লেখক

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি-বিরচিত।

তোড়ি-ভৈরবী—মধ্যমান।

কোথা হে যোগেন্দ্র চন্দ্র—কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রাণ—
হের সারা বঙ্গ আজি তব শোকে ম্রিয়মান!
নয়নে বহিছে ধার, করে সবে হাহাকার,
ভাবিছে পাবে কি আর—হেন পুণ্য-দয়াবান্!
জনমিয়া এ মহীতে, রত থাকি লোকহিতে—
করিলে হে ফুল্ল-চিতে প্রাণ-দীপ অবসান!
পাত্রাপাত্র অবিচারে, বিলাইলে যারে তারে,
অনায়াসে অকাতরে ধর্ম্ম-অর্থ-বিদ্যা-জ্ঞান।
ধরি ধর্ম্ম-হিত-ব্রত, জীবের কল্যাণে রত,
একা তুমি একশত কে বল তোমা সমান!
না ছিল বিলাস-লেশ, সহিলে অশেষ ক্লেশ,
ধরিলে দীনের বেশ করিতে দীনের ত্রাণ।
যতদিন "বঙ্গবাসী", বঙ্গ আর বঙ্গবাসী—
ততদিন আছ বেঁচে—কোথা তব তিরোধান!
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—লভি তোমা পুণ্যবতী
"জন্মভূমি" ধন্য এবে দেছ তাঁরে প্রাণ দান—
যতদিন রবে ভবে গাবে তব যশোগান।

৬ই ভাদ্র, সোমবার।
১৩১৭ সাল।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

ধর্ম্ম।

সাধন ও প্রচার।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ,

(২)

প্রশ্নোত্তরপনিষদে দেখা যায় যে, পাঁচ জন "ব্রহ্মান্বেষমানা" ঋষিকুমার মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন,—"হে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুগণ! তোমরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধার সহিত এক বৎসর অবস্থান কর, তৎপরে ব্রহ্ম-বিদ্যার কথা হইবে।" (১।১) মুণ্ডকোপনিষৎ,—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ

আত্মা। সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম।" (৩৷১৷৫৷) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে, মহর্ষি গৌতম এক ক্ষত্রিয় রাজার নিকট শিষ্যত্বলাভের আশায় উপনীত হইলে, তিনি বলেন,—"ব্রহ্ম সাধনের জন্য তুমি কি ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারিবে? ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা অপূর্ব্ব কার্য্য!" "পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস।" (বৃ আ।৬৷২৷৮৷) পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া ব্রহ্মসাধন করিলে যা হয়, আমাদের অনেকের তাহাই হইতেছে। তাই, ব্রহ্ম নামের বীজ, হরিনাম সতেজে অঙ্কুরিত হইতেছে না। নচেৎ, ব্রহ্ম-সাধনের ফলে আমাদের আত্মা হইতে আগ্নেয় গিরির মধ্যস্থিত, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক বহ্নির মত প্রভাব-প্রবাহ আমাদের আত্মা হইতে প্রবাহিত হইত। কেবল উহা প্রভাব-প্রবাহ হইত না, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় উহা আমাদের সকলকেই পবিত্র ও কৃতার্থ করিত।

কেনোপনিষদে আছে,—

প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মানা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥ ২।৪॥

তত্ত্বভূষণ ইহার অনুবাদ এইরূপে করিয়াছেন।—ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে জানিলেই প্রকৃত জানা হয়। এরূপ জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্মস্বরূপ জ্ঞানে শক্তি,—আত্ম বিষয়ক জ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয়।

ধর্ম্মসাধনের প্রধান অন্তরায় আমাদের রিপু। উহারা ছয় জন। মন একাকী এই ছয়টা চোরের সঙ্গে সংগ্রামে সর্ব্বদা পারিয়া উঠে না। তবে ডাকাতের দলপতির মত, ইহাদের দলপতি কামকে, পরাস্ত করিতে পারিলে বোধ হয় অন্য কয়জন পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়।

ধর্ম্মসাধন নানা সম্প্রদায়ে নানা রকম আকারে বর্ত্তমান। অসংখ্য উপায় হইলেও, উদ্দেশ্য এক। নদীসমূহ, নানা পথে আসিয়া, শেষে যেমন সমুদ্রতেই হৃদয়ের কোলাহল ডুবাইয়া দেয়, তেমনি নানা ধর্ম্ম ও সাধন প্রণালী ভগবানেতে আসিয়া সর্ব্বপার্থক্য ও কোলাহলকে নিমগ্ন করে। কেহ জ্ঞান, কেহ ভক্তি, কেহ বিশ্বাস, কেহ কর্ম্ম ও তাহার নানা প্রকার বিভাগ সাধন করেন, কিন্তু ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই পরম সাধন। ইহাই আমাদের সাধকগণের মত। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে গোস্বামীগণ বলিয়াছেন যে, "উত্তমাভক্তির লক্ষণ কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন।" যীশু প্রভৃতিরও এই মত। ব্রহ্মবিদ যিনি

হইবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মবৎ, ব্রহ্মবান্ হইতে হইবে। তৈত্তরীয়—"তদ্ ব্রহ্মত্যুপাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি।" (৩।১০।) ইহার প্রকৃত অর্থ ঈশার উপদেশে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—যদি ভগবানের ছেলের মত ছেলে হইতে চাও, তো তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য কর। অন্যত্রে বলিয়াছেন,—"তোমার স্বর্গীয় পিতার মত হইতে হইবে।" ধর্ম্মসাধন, ব্রহ্মবিৎ হওয়া, স্বর্গীয় পিতার মত হওয়া, প্রায় একই কথা। কাজে কাজেই, উহা হৃদয়ে, আমাদের মধ্যে, আমাদের বাহিরে, বা আমাদের হইতে দূরে নহে। আমাদের উপাস্য দেবতা ও তাঁহার ধর্ম্মসাধনের উপায় জ্ঞানময়। মুণ্ডকো "নযস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ।" ঈশার ভাষায় বলিতে গেলে, ইহাই আত্মাতে ভগবানের পূজা করা। শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসনাদির দ্বারা এই প্রকার সাধনের সুবিধা ও সুযোগ হয়। আমাদের সাধন প্রণালী সহজ, সরল ও উত্তম। আমাদিগের আসন প্রভৃতিও অতি সহজ ও বুজরুকিহীন।

ধর্ম্মটা একটা ভোজবাজির মত, বা আসমানে অদ্ভুত ডিগ্‌বাজির মত ব্যাপার নহে। অতএব নাক টিপিয়া, নাড়িভুঁড়ি ধুইয়া, অদ্ভুত ও কঠিন প্রক্রিয়ার দ্বারা না চলিলেও কেবল সরল ও সহজ ভাবে হরিনাম করিলেও চলে। তাই শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন :—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব গতিরন্যথা॥"

পাতঞ্জল যোগ সূত্রেও নানা ব্যাপার বর্ণনা করিয়া, ইহাও বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরপ্রণিধা নাদ্বা" অর্থাৎ কেবল ঈশ্বর চিন্তার দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। আমার প্রতি উপদেশ এই যে,"—ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং। পাশনাশঃ হেতুরেষঃ নতু বিচার বাগ্বলং।"

জীবনের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সাধনই ধর্ম্মসাধন। ইহা যেন কেহ মনে না করেন। জীবনের সামান্য কর্ত্তব্য যাহাকে বলা যায়, তাহার অবহেলা করিলে কদাচই ধর্ম্ম-সাধন সম্ভব হইতে পারে না। নীতি ও কর্ত্তব্য বর্জ্জিত ধর্ম্ম ও সাধন আমাদের লক্ষ্য কখনই নহে। কাহার জীবনে কিরূপ সাধন হওয়া উচিত, তাহার একটা সাধারণ বিধান হইতে পারে না। তবে সাধারণ কথা এই যে, সত্যবাদী, জিতে-ন্দ্রিয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়াই ধর্ম্মসাধন। উহাকে বর্জ্জন বা অতিক্রম করিয়া নহে। যাহাকে সামান্য কথা বলি তাহাই শক্ত। সাধু বৈষ্ণবগণ কেমন

হইতে বড় মনে ছিল সাধ। তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ।” ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকেই কটাক্ষ করিয়াই বুঝি জর্জ্জ হারবার্ট বোধ হয় বলিয়াছিলেন ;

“I slept and dreamt that life was Beauty,
I woke and found that life was Duty.”

আমি ঘুমের ঘোরে ভাবিয়া ছিলাম যে, জীবন কেবল সৌন্দর্য্য ; আমি জাগিয়া দেখিলাম যে জীবন কেবল কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবন, ধর্ম্ম, বক্তব্য নহে, কর্ত্তব্য।

আমাদের মধ্যে অনেকেই বলেন—“ভাল গুরু পাইলে সাধন করিতাম।” ইহার অর্থ বুঝা ভার। আমরা এতই অধিক উপদেশ পাইয়াছি, কিন্তু কিছুরই তো সাধন করি নাই। এক দণ্ডে এত উপদেশ দেওয়া যায় যে, একটা জীবনেও তাহার সাধন হয় না। শত বর্ষের সাধনও সম্পূর্ণ বোধ হয় না। একদিন বোধ হয় ১৮৮৯।১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাকে বলিলেন, “হেমেন্দ্র ! চল তোমাতে আমাতে বিদ্যাসাগরের কাছে যাই। তাঁকে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ও বোধদয়ের কয়েকটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করিব।” উভয়ে বাদুড় বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্নিকটে সন্ধ্যা বেলায় উপস্থিত হইলে, রামতনু বাবু বোধোদয়ের “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপের” অর্থ কি ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা মানেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—দেখ, ঈশ্বর ! তুমি দ্বিতীয় ভাগে যাহা উপদেশ দিয়াছ, আমি এ দীর্ঘ জীবনেও তাহা সাধন করিয়া উঠিতে পারিলাম না।” অর্থাৎ “সদা সত্য কথা কহিবে, কদাচ মিথ্যা কথা কহিবে না।” ইত্যাদি উপদেশ অনুসারে তিনি অশীতিপর দীর্ঘ জীবন কাটাইতে পারেন নাই এবং এই সুদীর্ঘ জীবনে ৭।৮ বার ৭।৮টি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন, বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। উহা তাঁহার একটী খাতায় সবিস্তারে লেখা থাকিত। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার নিকট ঐপ্রকার আক্ষেপ করিতেন। এবং প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিতেন। আমাকে বলিতেন,— তুমি সস্ত্রীক গান গাও। আমরা একদিন গাহিলাম—“মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ?” অমনি তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন,— “আর থাক্ ! আর থাক্ ! ঢের হয়েছে। ইহাতেই আমার ১০ দিনের খোরাক্ হবে।” কেমন সাধক বলুন দেখি ! আমরা সঙ্গতে ২৪ প্রহর হইলেও বলি “আরও গাও।” শিশুকাল হইতে কতই ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াছি

এখনও বলি গুরু চাই। কেবল ঔষধের পেঁতে লইয়া কি হবে? বৈদ্য কি আমাদের হইয়া ঔষধ খাইয়া দিবেন? আমরা খাইব ঔষধ, এবং পথ্য ও নিয়ম পালন করিব। তাহা না করিয়া কেবল নূতনত্বের অনুসরণ করিলে কি হইবে?

দুই চারিটা মোটামুটি কথা যাহা জীবনের ঊষাকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি, তাহাই সাধন করি না। করিলে দেখিতাম, যে পর্ব্বতমালার একটীর উপরে আরোহন করিলে, আপনাপনিই, যেমন আর একটী উচ্চতর শৈল নয়নগোচর হয়, তেমনি একটী ধর্ম্মনিয়ম সাধন ও পালন করিলে, তাহার পরও তাহা হইতেও উচ্চতর যে ধর্ম্ম বা সাধন আছে, তাহার তত্ত্ব আপনাপনিই আমাদের অধ্যাত্ম চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উদিত হয়। তাহার জন্য বেগ পাইতে হয় না। বৌদ্ধ সাধনের গ্রন্থে আছে, যে গুরু মিলে তো শিষ্য মিলে না। উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য আমরা যখন হইব, তখন অধ্যাত্মমার্গগামী উন্নত ব্যক্তির আত্মার সহিত সহজে ও বিনা চেষ্টায় যোগ সংঘটিত হইবে। উহার জন্য আটুপাটু করিতে হইবে না। মহতের সহবাসের যোগ্য হইলে আপনিই সেই সহবাস জুটিয়া যাইবে। চাই কি? না নিজেকে তাহার যোগ্য করা। কি করিয়া হয়? হৃদয়কে সরল, সহজ ও পবিত্র করা চাই, তবেই, সাধন, সিদ্ধি ও ব্রহ্মলাভ হইবে।

মুণ্ডক,—“এষোঽণুরাত্মাঃ চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা।” (৩।১।৯।)

এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা (এই শরীর মধ্যে জানিতে হইবে, যেখানে প্রাণবায়ু পঞ্চ প্রকারে প্রবিষ্ট।) প্রাণীদিগের সমগ্র চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যাপ্ত। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই এই আত্মা উদিত হয়।

সংসারে থাকিয়া, কয়লার খাদে কাজ করিয়া, কয়লার গুঁড়া দেহে না লাগাইয়া থাকিতে পারা একপ্রকার অসম্ভব। তাই ঈশা বলিয়াছেন—“তুমি এককালে ধর্ম্ম ও সংসার উভয়ের সাধন বা সেবা করিতে পার না।” সংসারে কৃতি হইতে হইলে মনের ভাব প্রকাশ করিলে চলিবে না, গোপন করিতে হয়, কপট হইতে হয়। ধর্ম্মরাজ্যে সেই বিরজঃ ব্রহ্মলোকের অধিকারী হয়, যাহাতে অসত্য নাই ও ঋজুতা আছে।’

“তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া ...

সংসারে থাকিয়া সাধন বড়ই কঠিন হইলেও, তাহাই করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা সুযোগ এবং সুবিধা খুঁজিলে চলিবে না। স্রষ্টা যাহা ইচ্ছা করেন, অবনত মস্তকে তাহাই করিতে হইবে। সেই পথেই আমাদিগের ধর্ম্ম, সাধন ও উন্নতি। যদি মনে কর, তাহার ব্যাঘাত হইবে তবে কাতর হৃদয়ে, সজল-নয়নে, ভাল ছেলের মত, পিতার পানে চাহিয়া বলিতে হইবে, 'পিতা! আমি সংসার-সংগ্রামে অভিভূত হইয়া আমার ক্লান্ত ও মলিন আত্মাকে তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। তুমিই ইহার সদ্গতি করিও।" তিনি অগতির গতি, আমাদিগের মত অধম সন্তানকেও তাঁহার অনন্ত চরণে স্থান দিবেন। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুক্তি ইচ্ছা করাও পাপ। তিনি যদি বন্ধন করিয়া রাখিতে চান, তবে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তি চাহি কেন?

সাধনে মোহ ও অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইবে। অনন্তকে মোহশূন্য হইয়া ক্ষুদ্র ও মলিন হৃদয়ে গ্রেপ্তার করিয়া, অবরুদ্ধ করা অসম্ভব। ইহা ভয়ঙ্কর ভ্রম। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, শিশুগণ যেমন চড়ুই পাখী ধরে, সেইরূপ কুম্ভকের দ্বারা, দম আট্‌কাইয়া ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ জব্দ করার চেষ্টা বৃথা। "অ-ধরা" ব্রহ্মকে ধরার প্রয়োজন নাই, বরং তাঁহার হাতে নিজে ধরা পড়াই শ্রেষ্ঠ সাধন-প্রণালী মনে হয়। হাফেজ গাহিয়াছেন,—"সেই ঘূর্ণিত কুণ্ডল হইতে হাফেজ যেন মুক্ত না হয়, কারণ তোমার জালে যাহারা বদ্ধ, তাহারাই মুক্ত।" আমরা তাঁহারই সংসার-জালে জড়িত বই তো নই!—হইলামই বা! কর্ম্ম-অন্তে তিনিই বিশ্রাম দিবেন। কঠিন আঘাতের দাগ নিজ হস্তে মুছাইয়া দিবেন। জন্মরাহিত্য না হইয়া, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমরা এমন পিতার স্নেহময় আদরে, আবদেরে ছেলে হইতে পারি। অন্য ইচ্ছা করিলে পিতার প্রতি অবমাননা, অপ্রেম, অভক্তির ভাব প্রকাশ করা হয়। সাবধান!

সকল প্রক্রিয়া ছাড়িয়া তাঁহাকে ভাবিলেই হইবে। পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই ভজনা কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি ভাবিও না।" তাঁহাকেই সকল অবস্থাতে আমরা ধরিব, তাঁহাকেই দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুর মধ্যে ভাবিব। দম্‌টা বন্ধ করিয়া, তাঁহাকে ভাবিবার দরকার নাই। দম্‌টা ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাকে বেদম্ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব হৃদয় বলিয়াছেন,—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ ... বিস্মর্ত্তব্যঃ কদাচন।" এই হরি-স্মরণেই চিত্ত সবল হইবে,—তিক্ত প্রাণ মধুচক্র

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ।
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ॥
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি।
চক্ষু শ্রোত্রং ক উ দেব যুনক্তি॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং স উ
প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুসশ্চক্ষুরতিমুচ্যধীরাঃ
প্রেত্যাস্মালোকাদমৃতা ভবন্তি॥" ১-২।

সকলেই যে সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করিবে, তাহা হইতেই পারে না। তাহা হইলে এই সংসারই যে স্বর্গ হইত। অধিকাংশই সংসার-সাধন করিবে। অল্লাংশই ধর্ম্মসাধন করিবে। কেহ কেহ সংসার ও তৎপর ধর্ম্ম, বা ধর্ম্ম এবং তৎপর সংসার সাধন করিবে। আমরা এই শ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা করিব।

সংসারের অন্য কাজ ছাড়িয়া কেবল বক্তৃতা-কার্য্য লইয়া যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা বাগ্মী। তেমনি কেবল ধর্ম্মসাধন লইয়া যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক। আবার সংসার-কার্য্য করিয়াও যাঁহারা বাগ্মিতা-কার্য্যে রত হয়েন, তাঁহারা যেমন সখের দল, সখের বাগ্মী, তেমনি আমরা সংসারের সাধন করিয়াও ধর্ম্মে মন দিতে চাই বলিয়া, সখের ধার্ম্মিক নামে অভিহিত হইতে পারি।

কিন্তু এমন অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন গৃহস্থ সাংসারিক লোক, বাগ্মী ও সখের বাগ্মী অপেক্ষা বাক্যে, সাহসে ও তর্কবিতর্কে শ্রেষ্ঠ। সাধন-ব্যাপারে কোন কোন গৃহীর নিকট সকল সন্ন্যাসী হারমানিয়া যায়,—যেমন জনক, মার্কাস্, অরেলিয়াস, জনক, লালাবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। আমাদের গৃহেও ইহার একটী ক্ষুদ্র নিদর্শন দেখিয়াছি। আমার স্বর্গীয় পিতামহ ভুবনমোহন সিংহ মহাশয় এমন গৃহী ও সাধক ছিলেন যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কতবার আমাকে বলিয়াছেন, যে, "হাজার বৎসর তপস্যা করিলেও আমরা তাঁহার কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য হইতে পারি না, ও বলিতে বলিতে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিয়াছেন—"আমার এ দীর্ঘ জীবনে এমন লোক আর নজরে ঠেকিল না।"

ইং ১৮৮৯ সালে ঠনঠনিয়ার লোহা পটীর সাম্‌নে বেড়াইতে বেড়াইতে একটী আমি বাণী শুনিয়াছিলাম—"এমন গৃহী সন্ন্যাসী হইতে হইবে, যে সব সন্ন্যাসী হার

এই সংসারটাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখি বলিয়াই, এত গোলযোগ। ইহাকে তাঁহারই মন্দির, ভগবানেরই লীলাক্ষেত্র ও আমরা সেই রসলীলার অন্তরঙ্গ, এই প্রকার ভাবনা করিলেই, ধর্ম্ম ও সংসারে বিবাদ অনেকটা মিটিয়া গেল।

কেবল মুখে হরি হরি করিলেই চলিবে না। মনটাকে তাঁহার চিন্তায় রসিয়া রাখিতে হইবে। কেবল ব্রহ্মকে চিন্তা করিলেই চলিবে না, সর্ব্বদা না হয়, তো, মাঝে মাঝে, ব্রহ্মকে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিতে হইবে, ব্রহ্ম নিশ্বাস লইতে হইবে। আমরা যে ব্রহ্মেতেই হইয়াছি, ব্রহ্মেতেই রহিয়াছি, চলিতেছি, ফিরিতেছি এবং ব্রহ্মতেই থাকিব. ইহা সময়ে সময়েও সর্ব্বদা অনুভব করিতে হইবে।

আজকাল ক্ষয়কাসের ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার একমাত্র উপায় মুক্ত বায়ুতে বাস করা। ইহার নাম **মুক্ত বায়ু চিকিৎসা,** Open air **Treatremnt** বা **Gardnieng Treatrement** করা। যখন বৈদ্যদের বিদ্যাহালে পানি পায় না, যখন ধর্ম্মরাজ্যের সারেঙ্ রা লাইন ফেলাইয়া 'মেলে না, বলিয়া, খেদোক্তি করেন, তখন দেখি, বৈদ্যনাথের চরণে ধন্না দিলেই. সহজে দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য হয়, দৈব ঔষধি মিলে। তাই, লোকে বলে, "বলং বলং দৈব বলং।" এই দৈববল লাভ করিয়া মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে হইলে, আমাদিগকে ব্রহ্ম-নিশ্বাসে, ব্রহ্ম-বাতাসে, খোলাভাবে, মুক্তভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে, দিন কাটাইতে হইবে। যখন আমাদের চরিত্রের নাড়ির বড়ই মন্দের দিকে গতি দেখিয়া ধর্ম্মপ্রচারক ও পুরোহিতেরা মাথা নাড়িয়া হতাশ ও চুপ হইয়াছেন, তখন দেখি ব্রহ্মকে নিশ্বাস লইয়া, মৃত নাড়িও সতেজ হইয়া উঠে, গা ছাড়িয়া দিয়া বায়ুর মধ্যে ওজোন্ (Ozone) নিশ্বাস লইলে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে Ozone প্রবেশ করাইয়া দিলে, যেমন মৃতপ্রায় জীবন পায়, তেমনি পাপে মগ্ন ও অন্ধ মলিন আত্মাও **হরিনামের গুণে** বিগত পাপ হইয়া নবজীবন পায়। ব্রহ্ম-নিশ্বাসের এমনই গুণ! মুক্ত খোলা ব্রহ্মবাতাসে থাকার এমনই প্রভাব। ভাল হইতে হইতে, মাঝে মাঝে মন্দের দিকে গতি হইলেও ভয় নাই,—উঠিতে উঠিতে মাঝে মাঝে পড়িয়া গেলেও ভয় নাই—"পড়্তে পড়্তে হাজার মেহন্নৎমে" পহেলোয়ান হওয়া যায়। ব্রহ্মের হাওয়া যার প্রাণে বহিতে থাকে, সে কি চিরদিন পাপে ডুবিয়া থাকিতে পারে ?

হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন. সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎকার্য্য, সৎচিন্তা

সর্ব্বদাই সুকণ্ঠে গাহিতেন—"পাবে না সে ধন সাধুসঙ্গ বিনে। সাধু-হৃদয় ধন সে অমূল্য-রতন। সাধু সঙ্গ কর সাধু বাক্য ধর, সহজে মিলিবে সে বিভু দরশন।" কেহ কেহ অসৎ সঙ্গে থাকিয়াও ভাল হন বটে, কিন্তু সেটা বিধির মধ্যে বিশেষ বিধি। সাধারণ বিধি এই যে, সৎ সঙ্গেই সদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি পায়। পাপের মধ্যে পুণ্য, পতনের ভিতর দিয়া উত্থান, কোন কোন জীবনে দেখা যায়। তাহা প্রশংসনীয় হইলেও উহা অনুকরনীয় নহে। হয় তো অনেকে ইহা শুনিলে ভয় পাইবেন। কিন্তু আমিও অনুভব করি যে, ধর্ম্মসাধনে পাপেরও যেন স্থান আছে। পাপ কি করে? না মানুষের অসাড় প্রাণে অনুতাপের অনল জ্বালিয়া দিয়া, আমাদিগের মলিন জীবনকে শুদ্ধ নির্ম্মল, যেন দগ্ধ হেমবৎ সুন্দর করে। একটা রবারের বলকে উপর হইতে নীচে ফেলাইয়া দিলে, সে যেমন ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়মে অমনিই তৎক্ষণাৎ পতনের পরেই, খুব উচ্চে উঠিয়া যায়। তেমনি, আত্মার পতনের মধ্যেও উত্থানের গতি দেখা যায়। তা বলিয়া, যে কেহ পাপে লিপ্ত হইবেন, এমন বলিতেছি না। এ সব কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের ক্ষোভের কোনই কারণ নাই। আমরা অভয় লাভ করিয়া সাধন-কার্য্যে প্রবিষ্ট হইব,—"দেখি মা হারে, কি পুত্র হারে!" অজ্ঞান অন্ধকার ঘনীভূত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঘন ঘটার সহিত বজ্র-নাদ জড়িত, চিকুর অন্ধকারকে দেখাইয়া দিতেছে ও বাড়াইয়া দিতেছে, বলিয়া আমাদের পিতৃক্রোড়ে ও পিতৃচরিত্র বিস্মৃত হইবার কারণ নাই। আমাদের মা অভয়া, ভয়হারিণী। তিনি অভয়া, সর্ব্বদা লালন পালন করেন, তাঁহার অভয় ক্রোড়ে রহিয়াছি, তাঁহার অমৃত-স্তনে প্রাণ লাগিয়া রহিয়াছে, জানিয়া আমরা সকল অবিদ্যা, মায়া, সকল পাপতাপ, সকল দুঃখভয়, সকল জরামৃত্যুকে যেন উপহাস করিতে অগ্রাহ্য করিতে সক্ষম হই। আমাদের কিসের অধর্ম্ম। কিসের দুঃখ, কিসের অভাব? যাহাদের এমন মা, এমন বাপ! তাঁহাকে যে ভুলিয়া থাকেন, তাহাকেও ক্রোড়ে করিয়া, দয়াময়ী মা আমার অমৃত-স্তন্য দেন। আর, যে তাঁহাকে ডাকিবে ও ভাবিবে তাহাকে কি তিনি বিস্মৃত হইবেন, গরল দিবেন, পাপে ডুবিয়া মরিতে দিবেন? আমাদের মা, আমাদের ব্রহ্ম, হরি এত ভয়ঙ্কর নহেন তিনি কৃপাময়ি!

আমরা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, সামর্থ্য, সংস্কার, সমাজ অনুসারে নানা-ভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হই বটে, কিন্তু ভগবানকে জীবন রথের করিতে সহজে সুযোগ

দিব না। তিনি যখন হৃদয়দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন, তখন হয় তো কামিনী-কাঞ্চন লইয়া, সুরা ও এয়ার লইয়া, সংসারের জঘন্য ও অশ্লীল বিষয়ে ও আমোদে মগ্ন থাকি! পিতামাতা কি তখন সে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন? তিনি পর্দ্দা টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ান! দেখেন, কখন সুযোগ পাইবেন। যখন সংসারের বৃথা আড়ম্বর ও অনিত্য সুখ-চেষ্টায় নিরস্ত হইয়া, একাকী নির্জ্জন হৃদয় মন্দিরে পিতামাতার চরণ দর্শনের অপেক্ষায় আমরা চুপ করিয়া থাকি,—যখন প্রাণের ভিতর সংসারের কোলাহল থামিয়া যায়, তখনই আমরা তাঁহার নিঃশব্দ চরণ শব্দ ও বাণী শ্রবণ করিতে পাই। আমরা সদাই অন্যমনে থাকি। তাঁহার বাণী শুনি ও শুনিয়া না। সংসারের কোলাহলে টাকাকড়ির ডাকহাঁকে শ্রবণ-বিবর আমাদিগের সদাসর্ব্বদাই পরিপূরিত।

আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়। এখানে আমিই পূর্ণ করিয়া রহিয়াছি। অহঙ্কারে আমি, ও আমার কার্য্য, আমার কথা ও আমার স্বার্থ ও আমার মহিমাকে এতই বাড়াইয়াছি, যে হৃদয়টুকু তাহাতেই ভর্ত্তি। তাহাতে আর কাহারও বা কিছুরই স্থান হওয়া সুকঠিন। এতই সে স্থানটুকু সঙ্কীর্ণ! এতই হৃদয়টীকে ছোট করিয়া ফেলাইয়াছি।

এই হৃদয় হইতে, যখন আমি ও আমার স্বার্থ, আমার সংসার ও আমার মহিমাকে সরাইয়া ফেলিতে সমর্থ হই,—যেই আমার হৃদয়কে, শূন্য Vacoum করিতে পারি—যেই বদ্ হাওয়াটা বাহির হইয়া যায়,—অমনিই স্বর্গের হাওয়া আসিয়া আমাকে পূর্ণ করে; কারণ প্রকৃতি শূন্যতার বিরোধী। যেই, আমি ও আমার সংসার ও সংসারের ছোট ছোট কথা ও বিষয়গুলি সরিয়া আসে, অমনি ব্রহ্ম সে হৃদয়ে প্রকাশ পান, সে হৃদয়কে পূর্ণ করেন, সে জীবনকে সিদ্ধ করেন। এই প্রকার মধ্যে মধ্যে Vacoum সাধন বা হৃদয়ের শূন্যতা সাধন করিতে হয়। সুখ সুখ করিলে হৃদয়ে দুঃখ পাইতে হয়। "শুধু সুখ পাওয়া যায়, সুখ না চাহিলে।" আমরা সুখ, সুখ, সংসার, সংসার, করিয়া দেখিয়াছি,—মাঝে মাঝে সকল 'চাহা' ছাড়িয়া দিয়া দেখিলে হয় না কি, ব্রহ্ম শ্রীহরি হৃদয়কে কিরূপে পূর্ণ করেন,—সুখের দ্বারা, না দুখের দ্বারা;—পাপের দ্বারা, না পুণ্যের দ্বারা? নিজের পুরুষকারের সাধন ছাড়িয়া দিয়া, কিছুদিন ব্রহ্মকৃপার উপরে গা ঢালিয়া দিয়া নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা সাধন করিয়া দেখিলেও হয় না কি? ব্রহ্মগোল তো

জীবনের তারে কিরূপ রাগরাগিনীর ঝঙ্কার দেন। হে হৃদয়! তোমার কোলাহল, প্রলাপ থামাও! চুপ করিয়া শোন, জীবন বীণায় পিতার অঙ্গুলীর আঘাত কি প্রকার প্রাণ-মোহন ধ্বনি উৎপাদন করে!

ব্যক্তিগত সাধনের মত, পারিবারিক ও সামাজিক সাধনও অবশ্য কর্ত্তব্য !!!

উপাসনা যখন এই প্রকারে করিতে পারিবে,—তখনই ধর্ম্মসাধন সত্য সত্য হইতে থাকিবে,—তখনই আমরা জীবনে শান্তি পাইব ও ঈশার মত, প্রচার করিতে ও বলিতে পারিব,—"ভাই! এসো, তোমাকে এমন জলপান করাইব যে, আর কখন কোন পিপাসা থাকিবে না। এসো ভাই! এসো! তোমরা কে হৃদয়ভারে ক্লান্ত ও অবনত! আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" এই প্রকার না বলিতে পারিলে, ধর্ম্মপ্রচার বৃথা।

ধর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্ম প্রচার হয়। টাকার দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হয়, ইহা যিনি মনে করেন আমার মতে তিনি ভ্রান্ত। হিন্দুগণ ধর্ম্মকে প্রথম স্থান দিয়াছেন, তৎপরে অর্থ। ঈশা প্রথমেই স্বর্গরাজ্য ও তাহার ধর্ম্মের সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আর যাহা কিছু, পরে আপনাপনিই আসিবে। ব্রহ্মকে সাধন করিলে ব্রাহ্মীলক্ষ্মী লাভ হইবে। যিনি নিজেকে ব্রাহ্ম নামে গৌরবান্বিত করিতে চাহেন, তিনি যেন ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করেন; উপাসনা এবং ও ব্রহ্মসাধনকেই, ধর্ম্ম প্রচারের উপায় মনে করেন।

ধর্ম্মেরই দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হয়। বোম্বাই লেঙ্‌ড়া, নিজের রস-সিন্ধুর গুণেই নিজেকে প্রচার করিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য নিজের জ্যোতিতেই নিজেকে প্রচার করিয়াছে। বুল্‌বুল্ নিজের কণ্ঠকৌমুদী ও প্রেমসাধন দ্বারাই নিজের জীবনের মাধুর্য্য প্রচার করিয়াছে।

অন্য প্রকারে ধর্ম্মপ্রচারের যাহারা চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে আমি ধর্ম্মবিজ্ঞান পণ্ডিত বিবেচনা করি না। অহঙ্কারের দ্বারা বিনয় প্রচার হয় না। অপ্রেমের দ্বারা প্রেম প্রচার হয় না। টাবা লেবুর বীজে, কোমলা প্রচার হয় না। টাবার ফলে টাবাই উৎপন্ন হয়। কোমলার ফলে কোমলাই উৎপন্ন করে।

কবিতা দ্বারা, ধ্রুপদ খেয়ালের দ্বারা, ভাষা ও বক্তৃতার দ্বারা, খোল পাখোয়াজ ও করতালির দ্বারা, আমরা আমাদিগের খেয়াল প্রচার করি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাণে যতটুকু ধর্ম্ম লুক্কায়িত থাকে, ততটুকু ধর্ম্মই প্রচার করি।

হইতেছে ভাবা ভুল। তবে হরিগোলও সংসার কোলাহল, আমোদ কৌতুক অপেক্ষা ভাল। যাহারা জীবনে অর্থের সাধন লইয়াই থাকেন, তাঁহারাই বলেন, "টাকা না হইলে, প্রচার হয় না।" মস্তিষ্ক যেমন অর্থ উৎপন্ন করে, তেমনি ধর্ম্ম-সাধন প্রচারের টাকা ও সুবিধা আনিয়া দেয়।

মধুকর মধুচক্র রচনা দ্বারা যেমন মধু প্রচার করে, গুঞ্জন দ্বারা তত নহে। সে যতক্ষণ মধু না পায়, ততক্ষণই গুণ গুণ করে। মধুকণা পাইলেই চুপ্।

ধর্ম্ম-সাধকই ধর্ম্মপ্রচার করেন। গভীর হইতে গভীরতম সাধন-সলিলে যাহার আত্মা নিমগ্ন, তিনি সফরীর মত ফর্ ফর্ করেন না,—তিমির মত অগাধ জলে ডুবিয়া রসরঙ্গে রসক্রীড়া করেন।

ভারতবর্ষে গভীর সাধনে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে চিরদিন মুনি বা মৌনী বলিয়া আসিতেছে। নীরব জীবন দ্বারা যে প্রচার তাহাই প্রচার। আলোই আলোককে প্রচার করে। জীবনই জীবনকে প্রচার করে। ধর্ম্মই ধর্ম্মকে প্রচার করে। নীরবতার প্রচার, বাক্যের প্রচার অপেক্ষা মূল্যবান। একটী দৃষ্টান্ত এক পৃথিবী উপদেশ অপেক্ষা ভাল।

"মোল্লা হোকে বাও ফুকারে।" প্রচারক হইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করে। ইহা মুসলমানদের উক্তি। সাদি একস্থানে বলিয়াছেন—মৌনীই অপার জ্ঞানী।'

ধর্ম্মটা "নাভিকা-সুগন্ধ" সমান জিনিষ। উহার সঞ্চার নাভির ভিতর হইলে, আপনিই বনভূমি আমোদে আমোদিত হইয়া উঠে।

প্রকৃত ধর্ম্ম কস্তুরীর মত। প্রকৃত ধর্ম্ম কোন আত্মার অঙ্কুরিত হইলে, দুই একটা কথার,—চক্ষের ইসারায় যাহা হয়,—হাজার আড়ম্বরে তাহা হয় না।

কেবল মত প্রচারকে, সংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রচার বলি না। জীবন প্রচারকেই প্রচার বলা যায়। যার ধর্ম্ম নাই, জীবন নাই, সে আর কি প্রচার করিবে? নিজেকে। আমরা অনেক সময়ে, ধর্ম্ম প্রচার হরিনাম ব্রহ্ম নাম প্রচারের ছলে নিজেকে প্রচার, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি, মহিমা ও গৌরবকে প্রচার করি। জীবনই জীবন সাগরের লহরী-লীলা উঠাইয়া দিতে সক্ষম হয়।'

প্রচার করিতে হইলে প্রচারের বিষয়টীকে উত্তমরূপ সাধন ও আয়ত্ত করিতে হয়। তৎপরে, বিদ্যা বুদ্ধি, টাকা কড়ি, গান বাজনা, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইলে, সোণায় সোহাগা হয়। নচেৎ সকল হীরার দ্বারা কহিনুরের স্থান পূরণ করা

আমরা ধর্ম্ম মতের নূতনত্বে, বিদ্যা ও মেধার স্ফূর্ত্তিতে, হৃদয়ের আবেগ ও জন সমাজের করতালীতে উত্তেজিত হইয়া, অনেক সময়ে প্রচারে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু ইহা অনিষ্টজনক প্রণালী। প্রকৃত ও আদর্শ প্রচারক হইতে, হইলে তজ্জন্য সাধক প্রয়োজন। প্রকৃত প্রচারক হইতে হইলে, ব্রহ্মের শ্রীহরির প্রেরণা অনুভব করা আবশ্যক। মনে উৎসাহ হইলেও, তাহাকে চাপিয়া রাখা প্রয়োজন। চুপের ভিতর একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। নির্জ্জনতার সুযোগে সেটিকে ফুটিতে দেওয়া আবশ্যক।

জনক শাক্যসিংহ, সক্রেটীস যীশু, মহম্মদ. চৈতন্য, নানক, গোরখনাথ, তুকারাম, প্রভৃতির জীবনের,—সাধনের কথা আমাদের ইতিহাসের বিষয়। বনে, জঙ্গলে, নির্জ্জনে, তাঁহারা কতকাল, কোথায়, কি করিলেন, জনসমাজ তাহা দেখে নাই, জানে নাই। যখন তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখন তাঁহাদের প্রচারে, মোক্ষ লাভের পথ দুঃখী, পাপী, নরনারীর সম্মুখে মুক্ত হইল।

গণিতবিদ্যার অধ্যাপক হইতে হইলে, গোপনে বহুত অঙ্ক কসিয়া, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া, তবে বিদ্যালয়ে, শিক্ষাগারে, বোর্ডের নিকট যাইয়া, জগতের সম্মুখে খড়ি ধরা চলে। নচেৎ মনের উৎসাহ, প্রতিভার প্রবলতায়, কবিত্বের চোটে, ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে, উৎসাহিত হইয়া, গণিতেরঅধ্যাপক হইয়া বোর্ডের ধারে যাইয়া কঠিন সমস্যা সকল বুঝাইতে বুঝাইতেই, আমি বুঝিব মনে করিয়া গণিত প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক প্রকার উনপঞ্চাশ প্রকারের বায়ু পীড়ার মধ্যে একটী অন্যতম। অগ্রে আমি উত্তমরূপ প্রশ্নগুলি ও কঠিন সমস্যাগুলি বুঝি. কসি. আরম্ভ করি, তৎপরে জগতের সম্মুখে অধ্যাপক হইয়া দাঁড়াইলে, জগৎ স্তব্ধ হইয়া শুনিবে! যদিও নূতন প্রশ্ন ও সমস্যা কিছু উঠে, তবে অভিজ্ঞতার গুণে অনেকটা জানার বলে নূতন কথাটারও সমস্যা পূরণ করিতে পারিব। তবেই ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞার শেষে যেমন আছে "যাহা প্রমাণ করিবার করা হইল,—বা যাহা রচনা করিবার তাহা রচিত হইল।" তেমনি প্রচারক জীবনও প্রচারিত সত্যের ও প্রতিজ্ঞার প্রমাণ দেওয়া হইবে! তবেই লোকে মানিবে, গ্রহণ করিবে ও শিখিবে।

ধর্ম্মের বিষয়েও তাহাই। কেবল শোনা ও মুখস্থ কথা বলায় তত জোর হয় না। নিউটন পতনশীল আতার মধ্যে যে প্রকৃতির বিধি দেখিলেন, তাহা কি আমরা দেখিতে পারিব? ধর্ম্ম ও ব্রহ্মকে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উহার সাধন চাই, অনুশীলন চাই।

অবিনয়ের দ্বারা বিনয় প্রচার হয় না। অন্য কোন বস্তুই বিনয়ের স্থান অধিকার করিতে পারে না। প্রতিভা ও কবিত্ব দ্বারা অহঙ্কারী খাঁটী বিনয় প্রচার করিতে পারেনী, কেহ মানা করিবে না। কিন্তু মানব হৃদয় তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিবে না। বারবনিতা রঙ্গমঞ্চে সতীত্ব প্রচার করিলেও, নারী-হৃদয় উহা গ্রহণ করিবে না। অবর্ম্মী ভণ্ড ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে লক্ষ লক্ষ নরনারী তাহার কথায় মজিবে না। কেবল বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা প্রভৃতির মত লোক ধর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেই, লোকে অনায়াসে তাঁহাদের দেখা দেখি ধার্ম্মিক হইতে অগ্রসর হয়। সীতা সাবিত্রীর চরিত্র দেখিয়াই সতীত্ব শিক্ষা করা যায়।

প্রচার করিতে উদ্যত হইলেই, সংসার আমার কথার সঙ্গে আমার জীবনকে মিলাইয়া, আমার কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিবে। আমার জীবনই আমার অভিধান। অন্যত্রে তাহার প্রকৃত অর্থ, টীকা, টিপ্পনী মিলিবে না। আমার জীবনই আমার কথার মল্লিনাথ ও ভাষ্যকার।

ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিব ও নিজে নিতান্ত কামাসক্ত হইব—বৈরাগ্য প্রচার করিব ও নিতান্ত সংসারাসক্ত হইব,—সত্য প্রচার করিব ও মিথ্যা কথা বলিব, এ কেমন প্রচার? দয়া, প্রেম ও সহানুভূতি প্রচার করিব, অথচ সকলকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিব। মুখে গঙ্গাজল ও অন্তরে হলাহল লইয়া কি প্রচার হইবে?

প্রচারককে আদর্শ লিপির মত হইতে হইবে। তাহাতেই হাত বুলাইয়া যেমন অন্য লোকে উত্তম লিখিতে শিখে, তেমনি প্রচারকের জীবনের নকল করিয়াই লোকে সাধুজীবন লাভ করিবে।

প্রচারককে সুচিত্রকরের মত হইতে হইবে। চিত্রকর যাহা চিন্তা করেন ও ভাবেন, তাঁহাকে তুলিকা দ্বারা পটে প্রকটিত করেন,—তাঁহার অঙ্গুলী মনের ও হৃদয়ের ইসারাকে, বর্ণ, পরিমাণ ও ভাবের দ্বারা প্রকাশ করে। আমরা তাহা পারি না। আমরা চিন্তা করি, ভাবনা করি-অনুভব করি, কিন্তু আমাদের অঙ্গুলী তুলিকা ধারণ করিতে গিয়া, কি লিখিতে কি লিখিয়া বসে, স্বর্গের পক্ষী আঁকিতে গিয়া 'কাকের ঠেঙ্গ, বকের ঠেঙ্গ' আঁকিয়া বসে। এই খানেই চিত্রকরে ও আমাতে প্রভেদ,—আমাতে ও প্রচারকে প্রভেদ। আমরা যা চিন্তা করি, যা অনুভব করি, তাহার অনেক দূরে, অনেক নীচে আমাদের জীবন। উভয়ে মিলে না। প্রচারকের তাহা হইলে চলিবে না। বাক্য ও জীবনে মিল চাই, যেমন চিত্র-

আমার মনে হয় যে, অনেক সময়ে ব্রহ্ম-উপলব্ধিহীন ব্যক্তি নিরাকারবাদ প্রচার করিতে গিয়া, লোকে যা হউক একটা গাছ পাথর, কুকুর শেয়াল বা গরু যাহা দেখিয়া ভক্তি করিতেছিল, তাহাও ঘুচাইয়া দেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরং নিরাকার মূর্ত্তি দেখাইতে পারে না। নিরাকার মূর্ত্তি দেখাইতে পারিলাম না, অথচ সাকারকেও লোপ করিয়া দিলাম, ভাল করিলাম না, মন্দ করিলাম? পৌত্তলিক হয় তো তা সাপ বেঙ্গকে ভক্তি বা ভয় করিয়া কোন কার্য্য করিতেছিল বা কোন কুকার্য্য হইতে বিরত হইতেছিল। তাহার সে বিশ্বাস টলাইয়া দিয়া, তথায় সত্যং জ্ঞানং অনন্তংকে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতেই না পারিলাম, তবে কি তাহার মহৎ অনিষ্ট করা হইল না? ভয় বা ভক্তিটুকু লোপ পাইবামাত্র তাহার আর কোন কার্য্যই অকার্য্য হইবে না।

যদি ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরং রূপটী নিজেই সাধনের দ্বারা হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতেই না পারিলাম, তো পরের নিকট প্রচার করিব কি? অন্ধের অন্ধকে পথ প্রদর্শনের মত কাজ হইল যে! আমি যে তিমিরে, শিষ্যও সে তিমিরে! হিন্দুসমাজের গুরুগিরী যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই এই অবস্থা! আমরা যেন কদাচ এরূপ গুরুগিরিতে লিপ্ত না হই,—প্রচারক সাজিয়া সমাজকে ও নিজেকে প্রতারিত না করি। প্রচারক হওয়া ও গুরু সাজা একই কথা। প্রচারক সাধারণেরও গুরু, ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম শিক্ষক, এই মাত্র প্রভেদ!

ধর্ম্ম প্রচারক হওয়াটা বড় গুরুতর ও ভয়ানক দায়িত্বের কাজ মনে হয়।

আমার বোধ হয়, অনেকের প্রচার ব্যর্থ হইবার ইহাই কারণ, যে নিজে সিদ্ধ না হইয়াই প্রচার করা। অসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপ্রচার না করাই ভাল। বরং তদপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া Lay missionery হওয়াই ভাল। ইংরাজিতে যেমন বলে Under the name and style, তেমতি কোন ধর্ম্মের দোকান না খোলাকেই সাধারণ লোকের পক্ষে ভাল বিবেচনা করি।

তবে আমরা সিদ্ধ হইতে পারিলাম না বলিয়া কি, একেবারেই হৃদয়ের প্রেরনাকে অগ্রাহ্য করিব, হরিনাম প্রচার কার্য্য বন্ধ থাকিবে। তাহা নহে। আমাদের লক্ষ্য ঐ বিষয়ে রাখা চাই,—প্রথমে সাধন ও সিদ্ধি,—তৎপরে প্রচার। প্রথমেই প্রচার,—পরে ক্রমশঃ সাধন ও সিদ্ধি, ইহাতে আমার বড় বিশ্বাস নাই। ইহাতে বড়ই বিঘ্ন উপস্থিত হয় ও অনেক মন্দ ফল উৎপন্ন করে।

আত্মত্যাগ ইত্যাদি প্রচার করি, কিন্তু কেহ সংসার-তাপে তপ্ত হইয়া নিকটে

আসিলে ঈশার ন্যায় বলিতে পারি না, "সংসার তাপে তাপিত যাহারা, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" আমরা নিজের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থ লইয়াই মত্ত, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে স্থান নাই। যদি তাহাই হইল, তবে ধর্ম্ম-প্রচারকের মহিমান্বিত আসনে আমার আরোহন করা কেন? প্রচারক হইতে হইলে মস্তিষ্কের শক্তিই যথেষ্ট হইবে না, হৃদয়ের প্রতিভা চাই,—মিষ্টতা উদারতা চাই,—তবে মানুষের প্রাণটা না যাইবে। জগতে যতগুলি শক্ত ব্যবসায় আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারকের ব্যবসায় সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত।

বুদ্ধি আছে, শিক্ষা আছে, পড়াশুনা আছে, চিন্তা আছে, ভাবিতে পারি,—বেশ ভাব, চিন্তা কর। তোমার ভাবনা, চিন্তা নথীভুক্ত করিয়া জনসমাজকে তোমার ভাবনা ও চিন্তা উপহার দাও ও বলিয়া দাও, "যা পেলাম দিলাম। যা ইচ্ছা তাই কর। ইহাতে মরণ কাঠি জিয়ন কাঠি নাই, মৃতসঞ্জীবনী নাই, আলাউদিনের প্রদীপ নাই। যা ছিল, তাই, দিলাম।" ইহাতে তোমার চিন্তা ও ভাবের দ্বারা কাহারও কোন প্রকার উপকার বা সাহায্য হয় হউক। আর প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া কথা বলিতে গেলেই মুস্কিল! সমাজ কেবল কথা, ভাব ও চিন্তা লইয়াই সন্তুষ্ট হইবে না। বলিবে,—"তুমি খালি কবি নও, প্রবন্ধ লেখক নও, গ্রন্থকার নও। তুমি সত্য প্রচার করিতেছ। সত্য দেখাও। বুঝিয়াছ তো বোঝাও,—দেখিয়াছ,—তো দেখাও!" এ বড় শক্ত সমস্যা! আমি তো এ কথায় বড় ভীত। এরূপ বিষম ব্যাপারে হাত দেওয়া সহজ নহে। প্রেমের অভাব অনুভব করিতে, ভাবিতে ও লিখিতে পারি। প্রচার করিতে হইলে, নিজের প্রেম চাই। কোথায় আমি প্রেম পাইব? আমি নিজেই তার ভিখারী! আদর্শ প্রচারক না পাইলে, যে প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া, খাতাপত্র গুটাইয়া চুপ্ করিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। ভাল চেষ্টার যতটা হয়, তাহাই ভাল। ভালর ঝুটাও ভাল। তবে আসলটা কি, সর্ব্বদাই যেন তৎপ্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে!

আমি প্রচারক নহি,—হইতে কখন পারিবও না। আমি কোন ধর্ম্ম সমাজের একজন কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যেও নহি, অতএব এত কথা বলার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাদের সম্মুখে উচ্চৈস্বরে ধর্ম্মের কথা কহিবার অধিকার আমার নাই। অকপটে চিন্তা করিলাম।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

——:০:——

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

১

এই যুগে এ ধরাতে, একদিন সুপ্রভাতে,
বাজিল শ্যামের বাঁশী মধু-মাখা স্বরে—
বাজিল জাহ্নবী তীরে, শুনি তা জাহ্নবী নীরে,
তুলিয়া তরঙ্গ-তান লহরে লহরে,
বুঝি পরশিতে কায়, উজানে ছুটিয়া ধায়,
ফুলে ফুলে কুলে কুলে উল্লাস-অন্তরে—
মুগ্ধা তান-তরঙ্গিনী প্রেমে অভিসরে!

২

শুনি বাঁশী যত পাখী, চকিতে মেলিয়া আঁখি,
উড়িল সে সোণামাখা আকাশের গায়—
প্রেমে মাতুয়ারা প্রাণ, মিলাইয়ে তানে তান,
ঘুষিল বিশ্বের দ্বারে শুভ বারতায়!
জগতের যত প্রাণী, শুনিল সে শুভ বাণী,
সুধার সিঞ্চন হল, এ মরু-ধরায়—
মুগ্ধ-নেত্রে হেরিল তা, যত দেবতায়!

৩

ধেনুগণ সচকিতে, চেয়ে দেখে চারিভিতে—
দেখিয়া কি এক যেন মধুর স্বপন,—
আর কি সুস্থির রবে, উর্দ্ধ পুচ্ছে হম্বারবে,
ছুটে চলে ইতি উতি—উল্লাস মগন!
ভাবে বুঝি মনে মনে, পুন শূন্য বৃন্দাবনে,
উদিল সে কালশশী—বাঁশরী-বদন—
রহিল মুখের তৃণ মুখে—আন মন!

৪

সে তানে মিলা'য়ে কায়, আসিয়া মলয় বায়
আঁচল ধরিয়া ডাকে কুলবালাকুলে—
মরি সে মোহন স্বরে, কে রহিতে পারে ঘরে,
মত্ত অলি ধেয়ে যায়—ডাকে তারে ফুলে—
রহে কি না রহে শ্বাস, খসে বা অঙ্গের বাস,
আলু থালু যত নারী ত্যজি আজি কুলে,
ছুটিল যমুনা ভ্রমে জাহ্নবীর কুলে!

৫

আসিল জাহ্নবী তটে, নেহারিল বংশীবটে,
শ্যামাঙ্গ-সৌরভ যেন চারিধারে পায়—
শত শশী পরকাশি, কালশশী-রূপরাশি,

পায় শ্যাম পরশন, অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন—
ব্যাকুল পরাণ মন মিলন-তৃষায়—
"কালা কই" বলে ওই কাঁদে উভরায়!

৬

একি দৃশ্য মনোহর, নভে নাহি পয়োধর—
শিখী নাচে—শাখী গাহে সুস্বপন-গান;
ত্রিভুবন পুলকিত, অপরূপ আলোকিত,
বিশ্ব-বুকে বহে শত আনন্দ-তুফান!
গোপীভাবমগ্না নারী, নয়নে বহিছে বারি,
গোপভাব নরে—কাঁদে বালক সমান—
হাতে এঁটো ফল—"কোথা গোকুলের প্রাণ!"

৭

সে বাঁশী শুনিল যেই, তা'তে আর সে ত নেই,
মুমুর্ষু সে উঠে বসে পায় নব প্রাণ!
শুনি সে বাঁশীর গান, ভেঙ্গেছে যোগীর ধ্যান,
সম্মুখে নেহারে শোভে স্বর্গের সোপান!
অসি করে নরঘাতী, শুনি বাঁশী কান পাতি—
নীরব নিথর—কাষ্ঠ-পুত্তলি সমান—
কর হ'তে খসে, পড়ে চঞ্চল পরাণ!

৮

একি এ প্রেমের হাট, একি এ প্রেমের নাট,
কে বিলায় এত প্রেম—কে সে মহাজন!
যে শুনেছে সে এসেছে, যা চেয়েছে তা পেয়েছে,
হয় নাই কোথা এত প্রেম বিতরণ—
আয় আয় আয় তোরা, এসেছে সে মনোচোরা,
ভুলে-নাই ভুলিতে কি পারে তার মন—
ওই ব'সে আছে আলো ক'রে তপোবন!

৯

হবে না তা হ'লে মনোবাসনা পূরণ—
জাতির বিচার নাই, যে যা চাহে পায় তাই,
আচণ্ডাল পায়-কোল রাজীব চরণ!
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, এ আর কোথায় নয়,
চল ধন্য হই করি হরি দরশন—
দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী ভবন।

১০

উঠিয়াছে সু-বাতাস, ঘুচিয়াছে সব ত্রাস,
হয়েছে অনেক আশ হৃদয়ে সঞ্চার!
দিয়ে স্বীয় পদতরী, জীবে তরাবেন হরি—
পাপী তাপী আয় সবে ডাকে কর্ণধার—
আয় বেলা বহে যায়, নাচিতে নাচিতে আয়—
ও শ্রীপদে ঢেলে দিয়ে যার যত ভার—
হাসি মুখে হরি ব'লে হ'বে ভব পার!

১১

হরি হরি হরি বোল, মিটেছে সকল গোল,
ভেঙ্গেছে ভবের ভোল-আর কেবা পায়—
ওই দেখ কত তাপী, ওই দেখ কত পাপী,
দূর সিন্ধু-পার হ'তে মিলেছে হেথায়—
নাহি জন্ম মৃত্যু ভয়, ধরা ভূমানন্দময়—
উদ্ধার করিতে জীবে—হের করুণাময়—
ভগবান রামকৃষ্ণ উদিত ধরায়।

—:০:—

হৃদ্রোগ

(*HEART-DISEASE.*)

লেখক—কবিরাজ শ্রীগিরিজাভূষণ রায় (সেনগুপ্ত)

হৃদ্রোগ অতি কঠিন পীড়া, সময়ে সময়ে ইহার নিদারুন যাতনায় রোগী মুহ্যমান হইয়া ত পড়েই, অধিকন্তু এ রোগ থাকিলে কখন প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে

তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, কোন লোক দেখিতে বেশ সুস্থ, আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে গেল, কিন্তু প্রাতে শুনিলাম রাত্রেই সে মারা গিয়াছে,—কোন বন্ধু প্রফুল্ল বদনে, হাস্য—আলাপনে রাত্রে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন, কিন্তু নৈশ আহার করিতে বসিয়া বাটিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সে মোহ আর ভাঙ্গিল না ;—কেহ বা নদীতে স্নানে গেলেন, স্নানান্তে উঠিয়া আর বাটী ফিরিলেন না ; নদীতীরে বা রাস্তায় পড়িয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত এ সংবাদ পাওয়া গেল। এই দুরন্ত ব্যাধিতে এরূপ কতশত মূল্যবান জীবন ধ্বংশ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। সহসা লোকে এরূপ হঠাৎ মৃত্যুর কারণ অনেক সময়ে অনুমান করিতে পারে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য যে কোন কারণই থাকুক না—প্রচ্ছন্ন হৃদ্রোগই ইহার প্রকৃষ্ট কারণ ; গুপ্ত ব্যাধি অনেক দিন হইতে ভিতরে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতে-ছিল, তুষাচ্ছন্ন বহ্নিবৎ ভিতরে গুমে গুমে জ্বলিতে ছিল—হৃদয়-ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করিয়া পরিশেষে জীবন বায়ুকে বাহির করিয়া দিল। সংসারে যেমন প্রতারক অনৃতভাষী গুপ্ত শত্রুর করালজাল হইতে সাবধান হইবার সুযোগ বা অবসর পাওয়া যেমন সুকঠিন, তদ্রূপ গুপ্ত হৃদ্রোগ হইতে আত্মরক্ষা করা প্রায়ই অসম্ভব। সময়ে সময়ে প্রকৃত রোগ ধরা পড়ে বটে, কিন্তু তখন হয়ত রোগের শাণিত অস্ত্রে হৃৎপিণ্ড আমূল বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন আর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া দুরাশা মাত্র।

আবার সময়ে সময়ে দুর্ব্বলতা প্রভৃতি অপর কারণে হৃদযন্ত্রে অধিকতর বেগে ঘাত প্রতিঘাত হইলে (বুক ধড়ফড় করিলে) অথবা সোপানাদি অতিক্রম, দ্রুতগমন, যানারোহন প্রভৃতি—কালে হাঁপ ধরিলে হৃদ্রোগ হইয়াছে, বলিয়া ভ্রম হয়, এবং তন্নিবারনার্থে প্রকৃত রোগের ঔষধ ব্যবহার না করিয়া ভ্রান্ত অনু-মানের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে হৃদ্রোগের চিকিৎসা করাইয়া আরও বিপত্তি ঘটান! আজ আপনার বুক কাঁপিল, হাঁপ ধরিল, চক্ষে ধোঁয়া দেখিলেন,—ভয়ে ডাক্তারের বা কবিরাজের কাছে ছুটিলেন, ডাক্তার ষ্টিথেস্কোপ লাগাইয়া বক্ষ পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, আপনার Weak and dialated heart আপনার হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল ও আয়তনে বড় হইয়া পড়িয়াছে, হৃদ্রোগ হইয়াছে ; কবিরাজ নাড়ি পরীক্ষা করিলেন বলিলেন, নাড়ী যেরূপ দুর্ব্বল, ক্ষণে ক্ষণে গতির স্খলন এবং যখন হৃদয়ে ওরূপ যন্ত্রণা অনুভব করেন, তখন আপনার হৃদ্রোগই ; অচিরেই ডাক্তারি বা কবিরাজী ঔষধ চলিল, কিন্তু অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায়

রোগের প্রতিকার হইল না ; বরং উপদ্রব বাড়িল, আপনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। ধীরবিজ্ঞচিকিৎসকগণ, সুধী-সম্পাদক মহোদয় ও সহৃদয় গৃহস্থপাঠক নিজগুণে ক্ষমা করিবেন—সত্যকথা অপ্রিয় হইলে বলিতে নাই বটে, কিন্তু যেখানে জীবন মরণের কথা সেখানে সকল কথা খোলাখুলি বলাই ভাল—কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, সেরূপ রোগ নির্ণয়ে ভ্রম নিত্যাই কি আমাদের হয় না ? ভ্রমপ্রমাদ মানবের স্বভাব সিদ্ধ, আলোচ্য রোগ অতি দুরভিজ্ঞের, লক্ষণ গুলি বৈদ্যের মোহকর, সেজন্য প্রকৃত বা অপ্রাকৃত (Assumed and mislead ing)লক্ষণগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অতি সাবধানে হৃদ্রোগের নির্দ্ধারন diognosis এবং প্রতিকারের চেষ্টা করা চিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য ; একটু অসাবধান হইলেই রোগ নির্ণয়ে প্রায়ই ভ্রম হইয়া থাকে।

হৃদয় কাহাকে বলে ? হৃদ্রোগই বা কি ?—হৃদয় প্রাণের আধার, হৃদয় রক্তের শোধক ও বিস্তারক যন্ত্র। হৃদয়ের রোগই "হৃদ্রোগ" heart disease. বক্ষে বামদিকে স্তনের উপরিভাগে হস্ত রাখিলে যেখানে স্পন্দন অনুভূত হয়, সেই স্থানেই হৃদ্-যন্ত্র স্থাপিত, ইহা একটি মুদিত পদ্মের আকার, তদুপরি একটি আবরণ আছে। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পরিপক্ক হইয়া যে রস নিঃসৃত হয়, সেই রস যকৃত এবং প্লীহা যন্ত্র সাহায্যে রঞ্জিত হইয়া প্রথমে হৃদয়ে প্রবেশ করে ; তখন ঐ রঞ্জিত রস বা রক্ত অশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, হৃদয় ২ খণ্ডে বিভক্ত, একটি খণ্ডে অশুদ্ধ রক্ত আসিয়া পড়ে, ঐ রক্ত এই স্থান হইতে ফুস্ফুসে প্রেরিত হয়, তথায় শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা রক্ত পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া হৃদ্ যন্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে ফিরিয়া আসে ; তখন সেই শুদ্ধরক্ত ধমনীপথে নদীর ন্যায় সর্ব্বশরীরে হৃদযন্ত্র কর্তৃক চালিত হয়। এখন বুঝুন হৃদ্‌যন্ত্র জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন কেন—প্রাণ কোষও এই হৃদয়েই সংস্থিত, কাজেই একটু সামান্য মাত্র প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমেই (হৃদ্‌যন্ত্রে বা তাহার আবরণে কোন সামান্য ব্যাধি হইলেই) সর্ব্বশরীর ও মন বিচলিত না হইবে কেন ? হৃদয়ের কার্য্য বন্ধ হইলেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়। হৃদ্-যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চলাচল হেতু উহা স্পন্দিত হয় এবং সেই স্পন্দন হস্ত পাদ প্রভৃতি স্থুল নাড়ীতেও অনুভূত হয়।

এখন কি কারণে হৃদ্রোগ হয় তাহা বলিতেছি—

দূষিত বায়ু-পিত্ত-কফ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যখন হৃদয়স্থিত রসকে দূষিত করিয়া নানা ব্যাধি অর্থাৎ পীড়া উৎপন্ন করে, সেই যাতনা বা পীড়াকেই হৃদ্রোগ

"দূষয়িত্বা রসং দোষাঃ বিগুণা হৃদয়ংগতাঃ।
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে॥"

উহার বিশিষ্ট কারণ সম্বন্ধে মহামতি-মাধব বলিতেছেন—

অত্যুষ্ণ-গুর্ব্বন্ন-কষায়-তিক্ত-শ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ।
সংচিন্তনৈর্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃপঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ॥

অর্থাৎ অত্যন্ত উষ্ণ গুরু ভোজন, কষা ও তিক্ত দ্রব্যের অতি ভোজন, পরিশ্রম, আঘাত, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে পুনশ্চ আহার, নিরন্তর চিন্তা এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে পাঁচ প্রকার হৃদ্রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অপিচ চরক বলিতেছেন—

ব্যায়ামতীক্ষ্ণাতি-বিরেকবস্তি-চিন্তাভয়ত্রাস-যদাভিচারাঃ।
ছর্দ্দামসন্ধারণ-কর্ষণানি হৃদ্রোগ-কর্তৃনি তথাভিঘাতঃ॥

অধিক ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ বিরেচন, তীক্ষ্ণ বস্তিক্রিয়া (পিচকারি প্রয়োগ) চিন্তা, ভয়, মদ্যপান অভিচার, অধিক বমি অপক্ক রস ও মল মুত্রাদির বেগ ধারণ, কর্ষণ ও অভিঘাত দ্বারা হৃদ্রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাঁচ প্রকার হৃদ্রোগ—১ম বাতিক, ২য় পৈত্তিক, ২য় শ্লৈষ্মিক, ৪র্থ ত্রিদোষজ, এবং ৫ম ক্রিমিজ।.. তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি।

বাতিক হৃদ্রোগ—বায়ু কুপিত হৃদ্রোগে কর্ত্তন, দণ্ডাঘাত, কুঠরাঘাত অথবা সুচিবেধবৎ নিদারুন যাতনা, হৃদয় শূন্য বোধ, স্তব্ধতা ও মোহ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। যথা—

"আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ংতুদ্যতে তথা।
নির্ম্মথ্যাত দীর্য্যতেচ স্ফোট্যতে পরিপাট্যতে॥" মাধবঃ
হৃচ্ছূন্যভাব শোষ-ভেদ-স্তব্ধ সমোহঃ পবনাদ্বিশেষঃ। চরকঃ

পৈত্তিক হৃদ্রোগে—পিত্ত প্রকোপ জন্য শরীর পীতাভ, চক্ষে ধোঁয়া দেখা, তৃষ্ণা, গাত্র ও হৃদয়ের দাহ (জ্বালা), মুখ শোষ, উষ্ণতা (সন্তাপ) বক্ষে চোষণবৎ পীড়া, জ্বর ঘর্ম্ম, মুর্চ্ছা, ভয় প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। যথা—

তৃষ্ণোষ্ণাদাহ চোষাঃস্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়ক্লমঃ।
ধূমায়নঞ্চ মুর্চ্ছাচ স্বেদঃ শোষো মুখস্যচ॥ মাধবঃ
পিত্তাত্তমো দূষণ-দাহ-মোহ-সন্ত্রাসতাপ-জ্বরপীতভাবাঃ॥ চরকঃ

মুখের মিষ্টস্বাদ, দেহভার, কুপিত শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক হৃদয় ভার ও আচ্ছন্ন থাকে, কফস্রাব অরুচি অগ্নিমান্দ্য কাসি তন্দ্রা প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। যথা—

গৌরবং কফ সংস্রাবোঽ সুপ্তস্তা রুচিস্তমোঽগ্নি মার্দ্দবম্।

মাধুর্য্য মপি চাগুস্ত বলাসাবততে হৃদি ॥ মাধবঃ

স্তব্ধং গুরুস্যাস্তিমিতঞ্চ ঘর্ম্ম কফাৎপ্রসেক জ্বর-কাস-তন্দ্রাঃ ! চরকঃ

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে—

উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। গাবমি থুতু উটা বক্ষে অসহ্য যাতনা, শূল ব্যথা, ও অন্ধকার দর্শন এই সকল প্রধান লক্ষণ। যথা—

"বিদ্যাত্রিদোষত্বপি সর্ব্বলিঙ্গং ॥ চরকঃ

উৎক্লেদঃ ষ্ঠীবনং তোদঃ শূলং উল্লাসকস্তমঃ ॥" মাধবঃ

এই ৪ প্রকারের হৃদ্রোগই সাধারণতঃ লোকের হইয়া থাকে ; এক্ষণে বিরল ক্রিমিজ (কীট জন্য) হৃদ্রোগের কথা বলিতেছি—

যে মূঢ় ব্যক্তিরা ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ সত্ত্বেও তিল গুড় দুগ্ধ প্রভৃতি অহিতকর দ্রব্য ভোজন করে, তাহাদের হৃদয়ের কোন অংশে গন্থি জন্মায়, তজ্জন্য ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ ঠিক পরিশুদ্ধ ও পরপর রক্ত মাংসাদিতে পরিণত হইতে না পারায় উহার কতক অংশ পচিয়া ক্রিমি (কীট baceili) উৎপন্ন করে সেই কীট জন্য হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা ফুলা ও সড় সড় করে। যথা—

তীব্রার্ত্তিতোদং ক্রিমিজং স কণ্ডুং ॥ চরকঃ

অরুচিশ্যাবনেত্রত্বং শোথশ্চ ক্রিমিজে ভবেৎ ॥ মাধবঃ।

"ত্রিদোষজেতু হৃদ্রোগে যো দুরাত্মা নিষেবতে।

তিলক্ষীর গুড়াদীংশ্চ গ্রন্থিস্তস্যোপ জায়তে ॥

মর্ম্মৈকদেশে সংক্লেদঃ রসশ্চাপ্যুপগচ্ছতি।

সংক্লেসাৎ ক্রিময়শ্চাস্য ভবন্ত্যপহতাত্মনঃ ॥" ভাবমিশ্রঃ

এই শেষোক্ত ক্রিমিজ (কীট জন্য) হৃদ্রোগ অতি ভয়ঙ্কর জীবন নাশক ব্যাধি কিন্তু ইহা অতি বিরল। ডাক্তারি শাস্ত্রে হৃদ্রোগ মধ্যে ইহার উল্লেখ নাই; সম্ভবতঃ হৃদয়ে ঐরূপ কীট জন্মাইয়া ব্যাধি উৎপন্ন করিলে সম্ভবতঃ ডাক্তারেরা তখন উহাকে একটা স্থানীয় ব্যাধি (Local disease) বলিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন,—এটা আমার অনুমান মাত্র, এ বিষয়ে জন্মভূমির ডাক্তার পাঠকগণই আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্রিমিজ

এই হৃদ্রোগ অতি কঠিন পীড়া ; ইহা নির্ণয়ে সময়ে সময়ে সুচিকিৎসকেরও ভ্রম হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন আঁয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্যগণেরও এ বিষয়ে মত-পার্থক্য দেখা যায়। ভাবমিশ্র, মাধব ও চরকের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। জেজ্জড় বলিতেছেন বাতজন্য হৃদ্রোগে যন্ত্রণা ও শূল, পিত্তজন্য অন্ধকার দর্শন, কফজন্য বমনবেগ, কফ-পিত্ত জন্য মুখে জল উঠা ও থুতুফেলা এবং ক্রিমিজন্য (কীট জন্য) হৃদ্রোগে অরুচিই প্রধান লক্ষণ। অপরাপর আচার্য্যগণ পাঁচ প্রকার হৃদ্রোগ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সুশ্রুত ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু এ মত দ্বৈধে বিশেষ ক্ষতি-নাই কারণ ক্রিমিজ হৃদ্রোগ ও ত্রিদোষ প্রকুপিত না হইলে হয় না ; অপিচ নানা গ্রন্থকারের কারণ নির্দ্ধারণে মতভেদ থাকিলেও বিশিষ্ট লক্ষণ গুলির উল্লেখ করিতে কেহই ভুলেন নাই।

ক্লান্তিবোধ, দেহের শিথিলতা, মূর্চ্ছা ও মোহ প্রভৃতি উপদ্রব, সকল প্রকার হৃদ্রোগেই বর্ত্তমান থাকে। এই গেল প্রকৃত হৃদ্রোগের কথা।

তবেই এখন বুঝুন একটু বুক ধড়ফড় করিলে, বুকে ব্যাথা ধরিলে, চক্ষে অন্ধকার দেখিলে বা হাঁপ লাগিলেই হৃদ্রোগ হইল এমন কথা নহে। অপর নানা কারণে হৃদ্রোগের মত দুটী একটী লক্ষণ পাইলেই তাহাকে হৃদ্‌রোগ বলিয়া স্থির করা সমীচিন নহে।

প্রধানতঃ অজীর্ণ (Indigestson) ও অম্লপিত্ত (Dyspesia) এবং ক্রিমিরোগ (worms) থাকিলে হৃদ্রোগের অনুরূপ অনেক-ভ্রমপ্রদ কৃত্রিম লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এখন ঐ সকল রোগের সহিত হৃদ্রোগের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখাইতেছি।

পেটে ক্রিমি হইলে শূল, জ্বর, হৃদয়ে যাতনা শরীরের শিথিলতা অরুচি মোহ প্রভৃতি অনেকগুলি, হৃদ্রোগের অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে, ক্রিমিতে (worms) যেরূপ পেটব্যাথা অতিসার প্রভৃতি পেটের গ্লানি থাকে, হৃদ্রোগে সে সকল লক্ষণ দেখা যায় না ; কফজ ক্রিমিতে শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের অনুরূপ বমনবেগ, মুখদিয়া জল উঠা, অপাক, অরুচি মূর্চ্ছা জ্বর প্রভৃতি অনেক লক্ষণের মিল বা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ক্রিমি রোগের মত হৃদ্রোগে মলমূত্রের আবদ্ধতা ঘটে না এবং ক্রিমিরোগের মত হৃদ্রোগে ঘন ঘন হাঁচি হয় না। পেটে ক্রিমি থাকিলে নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণজন্য শব্দ হয়, কিন্তু হৃদ্রোগে তাহা হয় না। ক্রিমিতে ২।৩ দিন মাত্র ক্রিমিঘ্ন এবং রেচক ঔষধে

উপদ্রবের শান্তি হয় কিন্তু প্রকৃত হৃদ্রোগের লক্ষণ রেচক ঔষধ ব্যবহারে বর্দ্ধিত হয়। পেটে ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগের যত লক্ষণ এবং ক্রিমিজ (কীটজন্য) হৃদ্রোগের লক্ষণ অনেক প্রভেদ। "ক্রিমি" এই কথা উভয় স্থলে থাকায় যেন উহা এক কারণে উদ্ভূত ভাবিবেন না।

বায়ু প্রধান—বিষ্টব্ধাজীর্ণে Indigestion with retention of stool &ui ine and consiquently typanitis) শূল স্তব্ধতা ও মূর্চ্ছা অম্লপিত্তে এবং বিদগ্ধাজীর্ণে in Dispepsiaand in acidsty) তৃষ্ণা; মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম, জ্বালা (দাহ) প্রভৃতি হৃদ্রোগের অনুরূপ অনেক লক্ষণ দেখা যায় বটে, সময়ে সময়ে অজীর্ণ প্রবল হইলে বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, হৃদ্-যন্ত্রের দ্রুত স্পন্দন হয় বটে, কিন্তু দুই একটি উদ্গার উঠিলে অথবা দুই এক ঝলক অপাক অম্ল-পিত্ত বমি হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ সকল উপ দ্রবের শান্তি হয়, কিন্তু প্রকৃত হৃদ্রোগের উপদ্রব এরূপ উপায়ে সহসা শান্ত হয় না।

দুর্ব্বলতা সত্বে সোপানাদি অধিরোহন, দ্রুত যান বাহনাদি আরোহন বসতঃ দ্রুতহৃৎস্পন্দন ও হাঁপ হইয়া থাকে, কিন্তু মধুর রস ও শীতল পানীয় সেবনে দুর্ব্বলতা জন্য হাঁপ ও বুকের যন্ত্রণার উপশম হয়, কিন্তু প্রকৃত হৃদ্রোগের হাঁপে বা স্পন্দনে ঐরূপ শৈত্য ক্রিয়াদিতে বিপরীত ফলই পাওয়া যায়।

তাহা হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত হৃদয়ের ব্যাধিতে কি পার্থক্য পাইলাম।

অপ্রাকৃত হৃদ্রোগের লক্ষণ
ও
শান্তির উপায়াদি—

১। পেটে ক্রিমি হইলে অতিসার পেট-ব্যাথা হাচি, দাঁতে দাঁতে শব্দ করণ—লক্ষণ উপস্থিত থাকে—

২। ক্রিমির উপদ্রব রেচক ঔষধে নিবৃত্তি পায়।

৩। পুরীষজ ক্রিমি মলাশয়ে এবং কফজ ক্রিমি পক্কাশয়ে জন্মিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে যখন উর্দ্ধদিকে উঠে তখনই (ক্রিমি চাগান দিলে) হৃদ্রোগের

প্রকৃত হৃদ্রোগের লক্ষণ—
ও
তাহার শান্তির উপায়াদি—

১। প্রকৃত হৃদ্রোগে ঐ সকল লক্ষণ থাকে না।

২। হৃদ্রোগের উপদ্রব রেচক ঔষধে বর্দ্ধিত হয়।

৩। ক্রিমিজ হৃদ্রোগের কীট হৃৎপিণ্ডেই দুষিত রস (পুঁজ) হইতে উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া সতত যাতনা দেয়।

৪। অম্লপিত্ত অজীর্ণে হৃদ্‌রোগের অনুরূপ অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু উদ্গার উঠিলে, বায়ু-নিঃসরণ হইলে বা দাস্ত বমি হইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়।

৫। দুর্ব্বলতা বসতঃ হাঁপানি দ্রুত হৃৎ-স্পন্দন প্রভৃতি উপদ্রব শীতল পানীয় ও মধুর রসে উপশম পায়।

৪। প্রকৃত হৃদ্‌রোগের লক্ষণ উদ্গারাদি ক্রিয়া দ্বারাও উপশম প্রাপ্ত হয় না।

৫। প্রকৃত হৃদ্‌রোগের হাঁপ ও দ্রুত স্পন্দনাদি ইষদুষ্ণ পানীয় সেবনে নিবৃত্তি পায়, শীতল ও মধুর পানীয়ে বর্দ্ধিত হয়।

উপরোক্ত বিষয় ও লক্ষণ গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে প্রকৃত রোগ কিম্বা অপর রোগের ভ্রম প্রদ লক্ষণ, তাহা স্থির করিতে বিশেষ ভ্রম না এইবারই সম্ভাবনা।

ইহাই হৃদ্‌রোগের নিদান, রূপ ও সম্প্রাপ্তি লক্ষণ।

বকুল কুমারী।

লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্র।

সহর কলিকাতার উত্তর বিভাগে তরুরাজী শোভিত রাজবর্ত্মের পশ্চিমাংশে একখানি অট্টালিকা, অতি পরিপাটী মনোহর অট্টালিকা। সম্মুখ ভাগে পীতবর্ণ রঞ্জিত রেলিংযুক্ত জোড়া জোড়া থাম দোয়া টানা বারাণ্ডা, ফটকের রেলিঙে সবুজ রং দেওয়া গেরীমাটী রং মাখা,—দুই বড় বড় চতুস্কোন থাম্, থামের মাথার উপর দুইটী পূর্ণাঙ্গ কুম্ভ, তাহাতেও ঐ রং; বৃহৎ স্তম্ভের দুইধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ, মধ্যে মধ্যে ঢেউ খেলান প্রাচীর, চারিধারে নানাবিধ পুষ্পতরু, চমৎকার শোভা।

সেই অট্টালিকার সদর মহলে একটী সুসজ্জিত বৈটকখানায় মখমল মণ্ডিত আরম-চেয়ারে ঠেস্ দিয়া, সম্মুখস্থ টেবিলের উপর দুটী পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া, একটী পরম সুন্দর বাবু রজতনির্ম্মিত সূক্ষ্ম শলাকা দ্বারা কর্ণবিবর সংস্কার করিতে-

ছেন। টেবিলের দুইধারে একহাত ওসারের দীর্ঘ দীর্ঘ দুখানি বেঞ্চ পাতা; সেই দুই বেঞ্চের উপর বড় বড় রুদ্রাক্ষ মাল্যধারী একজন ভট্টাচার্য্য, সূক্ষ্মকায় কৃষ্ণবর্ণ একজন নবীন কবিরাজ, আর পাঁচ সাতটী রকমারী খোস পোসাকী মোসায়েব। বাবুর ওষ্ঠপুটে রৌপ্যময় ফর্শির সুদীর্ঘ নল সুশোভিত হইয়া পলকে পলকে মণ্ডলাকার ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। কেহই নিস্তব্ধ নহে, নানা রসের খোস গল্প চলিতেছে, বাবুও মধ্যে মধ্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া হু হাঁ দিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছেন, এবং গল্পের যে যে স্থলে নূতন নূতন রসের অধিক ছড়াছড়ি, সেই সকল স্থলে মধুর মধুর হাস্য করিতেছেন। ইত্যবসরে একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ লোক দর্শন দিলেন; তাঁহার পরিধান একখানি পাঁচি ধুতি, হস্তে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ, চরণে কাষ্ঠ পাদুকা; মস্তকের সম্মুখ ভাগে সুবিস্তৃত টাক, পশ্চাদ্ভাগে শ্বেতবর্ণ দুর্ব্বাঘাসের ন্যায় দুইতিন গুচ্ছকেশ গ্রীবা অতিক্রম করিয়া পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। পরিচয়ে প্রকাশ সেই বৃদ্ধটী সেই তরুণ বাবুটীর জন্মদাতা পিতা।

মজলিসে পিতা আসিলেন, বাবু কিন্তু আরম্—চেয়ার পরিত্যাগ করিলেন না, রজত শলাকাটীও কর্ণমূল হইতে স্থানচ্যুত হইল না, আলবোলার নলটীও স্থানভ্রষ্ট হইল না, চরণ দুখানিও টেবিল হইতে নামিল না।

দর্পণ হস্তে গজেন্দ্র গমনে পায়চারি করিতে করিতে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া মিহিসুরে বৃদ্ধ বলিলেন, "সুকুমার! তোমার এতো চক্ষুলজ্জা কেন? বিষয়কার্য্যে চক্ষুলজ্জা রাখিতে নাই; নিমাইচাঁদ মিশ্র যে এক হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, শুনিলাম, তুমি তার সমস্ত সুদ ছাড়িয়া দিয়া তাহার খত খালাস দিয়াছ। এই রকমে কি তুমি বিষয় রক্ষা করিবে? আমি আর কদিন?—কিছুদিন পরে তোমার উপরেই এই বিপুল সংসারের ভার পড়িবে, লোকে তোমার গালে চড় মারিয়া সমস্ত বিষয় কাড়িয়া লইবে। ছেলেমানুষ তুমি, কিছুই বুঝিতেছ না, শেষকালে তোমার দশা কি হইবে? সাবধান হও, বিষয় কর্ম্মের কথাবার্ত্তার সময় মাথা হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিতে শিক্ষা কর।"

কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে পাথর বাঁধা মেঝের উপর খটাখট্ শব্দে খড়মের শব্দ হইতে লাগিল। এক মণ্ডল ধূম উড়াইয়া সুকুমার বাবু উত্তর করিলেন, "খত খালাস দিয়াছি, তাতে হইয়াছে কি? নিমাই বলিল, সুদ দিবার তাহার সঙ্গতি নাই, সে কথার উপর আমি আর কি বলিব? ব্রাহ্মণকে জেলে দিব নাকি?"

মুখের মত জবাব পাইয়া বৃদ্ধ তখন সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিলেন, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে দেয়াল সংলগ্ন দশ মহাবিদ্যার ছবি দেখিতে লাগিলেন। পিতা নিস্তব্ধ পুত্র নিস্তব্ধ। ভট্টাচার্য্য কবিরাজ মোসাহেবেরা সকলেই নিস্তব্ধ. পিতা পুত্রের কথোপকথনে মোসাহেবেরা কোন্‌টী সঙ্গত, কোন্‌টী অসঙ্গত বুঝিলেন, তাঁহাদের মুখ দেখিয়া সে ভাবের কিছুই জানিতে পারা গেল না।

ক্ষণপরে মৌনভঙ্গ করিয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একজন ঘটক ডাকাইতে বলিয়াছিলাম, ডাকিতে পাঠাইয়াছ কি ?"

সট্‌কার ধূমের তেজ কমিয়া আসিয়াছিল, কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে সুকুমার বাবু হুঙ্কার করিলেন, "তামাক দে রে !"

হুঙ্কার করিয়াই ভট্টাচার্য্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া, পিতার প্রশ্নে সুকুমার উত্তর দিলেন, "এই শাস্ত্রী মশাই ঘট্‌কালী করেন, যাহা বলিতে হয়, ইহাঁকেই বল, ইনি তোমার কথার উত্তর দিবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবু ও ঘটক।

পুত্রের বৈটকখানায় পিতা আসিলেন, প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলেন, পুত্র একবারও বসিতে বলিলেন না। একজন চাকর আসিয়া আল্‌বোলার চিলম্ বদ্‌লাইয়া দিয়া গেল, নয়ন মুদ্রিত করিয়া সুকুমার আল্‌বোলা টানিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য যেদিকে বসিয়াছিলেন, সেই দিকের কোণে একখানা ভগ্নবাহু পুরাতন চেয়ার পড়িয়া ছিল, কর্ত্তা সেই চেয়ারের উপর আপন ইচ্ছায় উচু হইয়া বসিলেন। চেয়ারের পৃষ্ঠ-কাষ্ঠ অতিক্রম করিয়া কর্ত্তার মস্তক সম্বলিত দেহ প্রায় এক হস্ত উচু হইয়া রহিল। কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবশ্যক। সাধারণ মানব দেহের পরিমাণ অপেক্ষা কর্ত্তা অধিক দীর্ঘাকার; ইংরাজী পরিমাণে প্রায় ছয় ফুট; সেই কারণেই আসনে ও আসিনে ঐরূপ অসামঞ্জস্য। আর একটু বিশেষ বর্ণনা প্রয়োজন। কর্ত্তাটী দীর্ঘাঙ্গ, স্থূলাঙ্গ, শ্যামাঙ্গ; মুখখানি বাদামে, নাসিকা ঈষৎ খর্ব্ব, বামচক্ষু কিঞ্চিৎ টেরা, সম্মুখের দুটী দন্ত ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত, অবশিষ্ট দন্তগুলি অকালে বিদায় প্রাপ্ত, গ্রীবা খর্ব্ব; বক্ষঃস্থল, কর্ণবিবর ও নাসারন্ধ্র গুচ্ছ গুচ্ছ লোমে আচ্ছাদিত; বয়স অনুমান ৫০।৫২ বৎসর নাম গৌরীপ্রসাদ দত্ত। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পত্নী ঐ আরমচেয়ারোপবিষ্ট

ভট্টাচার্য্যের দিকে চাহিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেম, "শ্রীসঞ্জীবন শাস্ত্রী।"

কর্ত্তা। শাস্ত্রী? আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্রে পণ্ডিত?

ভট্টা। হাতীবাগানে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নের টোলে ১৮ মাস ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যায়ন করা হয়েছিল, তাহার পর ভরত শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ছয় মাস স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করি, তাহার পর বড় বড় বাবুদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ও বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে ব্রতী।

কর্ত্তা। আপনি কি বিবাহের ঘট্‌কালী করেন?

ভট্টা। আজ্ঞে হাঁ, মধ্যে মধ্যে সে কার্য্যটাও করা আছে।

কর্ত্তা। তবে আপনি একটী কুলীন কায়স্থের সুন্দরী কন্যা অন্বেষণ করুন। আমার এক্তারে একটী উপযুক্ত কুলীন কায়স্থের পুত্র আছে, অতি সুপাত্র, দেখিতে সুশ্রী, বয়স ২১ বৎসর, লেখাপড়াও বেশ জানে। উপাধি মিত্র।

ঘটক। আজ্ঞে, কুলীন কায়স্থের কন্যা আমার সন্ধানে অনেক আছে, তাহার মধ্যে একটী খুব ভাল। ২৩ পর্য্যায় দিব্য সুন্দরী, তাহার পিতার উপাধি বসু মল্লিক। কন্যাটী লেখাপড়াও জানে, তাহার নাম সুকুমারী দাসী।

সুকুমার বাবুর মোসাহেব দলে একজন কায়স্থ ছিলেন, কায়স্থ কন্যাদের উপাধির বিচারে তিনি সুপণ্ডিত, বক্তৃতা পেসায় সমাজ সংস্কারক। ঘটকের শেষ বাক্য শ্রবণে তিনি ভারি চটিয়া উঠিলেন, বুক বাঁকাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কি রকম ঘটক তুমি? দাসী বল কারে? আমাদের কন্যারা কাহাদের দাসী?"

ঘটক। চটো কেন ভায়া? আমি কাহারও কন্যাকে কাহারও কিঙ্করী বলিতেছি না। ব্রাহ্মণ কন্যারা দেবী, শূদ্র কন্যারা দাসী, আবহমান এইরূপ চলিয়া আসিতেছে।

মোস্তা। আবহমানের দিন আর এখন নাই; বিশেষতঃ কায়স্থরা এখন আর শূদ্র নামে বাচ্য নয়। দৃষ্টান্ত ধর, আমি একজন কায়স্থ, আমার উপাধি আছে দাস, আমার স্ত্রী দাসী হইতে পারে না, এখনকার পদ্ধতি অনুসারে, আমার স্ত্রী আপন নাম লিখিয়া আমারি উপাধি ব্যবহার করে, তাহার নাম আছে কুঞ্জলতা দাস।

ঘটক। (হাস্য করিয়া) স্ত্রীলোককে দাস না বোলে, দাসী বলাতে কি দোষ? উপাধিও রক্ষা হয়, ব্যাকরণেরও মান রক্ষা হয়।

মোসা। রাখ তোমার ব্যাকরণ। কায়স্থ কন্যারা দাসী হয়ে অন্য লোকের পদ সেবায় নিযুক্ত হবে, এই বুঝি তোমার বিবেচনা?

কর্ত্তা। আরে, বিবাদ কেন, বিবাদ কেন, ক্ষমা দাও; দাস হোক, দাসী হোক, সেটা আমি ধরি না' ফল কথা—আমার একটী কুলীন কায়স্থ কন্যা দরকার; সেইরূপ একটী কন্যা যাহাতে পাওয়া যায়, তাই আমি চাই।

মোসা। আপনি সে কালের লোক, আপনাদের সংস্কার অন্য প্রকার। যেখানে কায়স্থ কন্যাদের দাসী নামে পরিচয়, সেখানে আমি থাকৃতে চাই না।

কর্ত্তা। থাকবার দরকার নাই। কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে? কে তোমাকে থাকৃতে বলে?

বিরক্ত হইয়া, গর্জ্জন করিতে করিতে উঠিয়া, সুকুমার বাবুর সেই মোসাহেবটী চঞ্চল গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল, ওষ্ঠ হইতে সট্‌কার নল নামাইয়া সুকুমার বাবু অনিমেষ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না রাখিয়া ঘটককে সম্বোধন পূর্ব্বক কর্ত্তা বলিলেন, "আছে তবে কন্যা? বেশ কথা আপনি কথা বার্ত্তা স্থির করুন, শীঘ্রই বিবাহ হওয়া আবশ্যক।"

ঘটক। (সতৃষ্ণ নয়নে কর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া) আমার ঘটকালী?

কর্ত্তা। পাঁচ টাকা।

ঘটক। তবে হবে না বাবু। সুন্দরী কন্যা, কুলীন কন্যা, পাঁচ টাকার কর্ম্ম নয়। পঁচিশটী টাকা আমি লব।

কর্ত্তা। তা যদি কন্যাকর্ত্তা আপনাকে দেয়, আমার আপত্তি নাই। আমি কিন্তু পাঁচ টাকার অধিক দিব না।

ঘটক। আপনি দশ টাকা দিবেন, তার পর সেখানে আমি যত পারি দেখে নেবো।

কর্ত্তা। আমার কাছে পাঁচ টাকার উপর একটী পয়সাও নয়। সে আশা আপনি ত্যাগ করুন। পাঁচ টাকাতে যদি পারেন, চেষ্টা দেখুন।

ঘটক। (নত মস্তকে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) আচ্ছা, তবে তাই দিবেন, মেয়ে দেখাইয়া যদি আমি আপনাকে খুসী কোত্তে পারি, তখন বুঝা পড়া হবে।

কর্ত্তা। হাঁ সেই কথাই ভাল। আর দেখুন, মেয়েটীর বাপকে আপনি বোল্‌বেন, বরের পক্ষে তাঁর কিছুই খরচ হবে না, একজোড় কাপড়, আর একটি টাকা দক্ষিণা দিলেই কাজ হবে। আমি মৌলিক কায়স্থ, জানেন তো, আমার

পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হোলে স্বতন্ত্র কথা ছিল, যে পাত্রটী আমার হাতে আছে, সেটী কুলীনের ছেলে; কুলীনে কুলীনে কুটুম্বিতা, সোজাসুজি কাজ, তাতে আর বেশী কথা চোল্‌বে না।

ঘটক। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তবে এখন আমি চল্লেম।

কর্ত্তা। (কি চিন্তা করিয়া) বসুন বসুন, আর একটু বসুন. আমার আর একটী কথা আছে।

ঘটক। (বসিয়া) আজ্ঞে করুন।

কর্ত্তা। দেখুন, আজকাল এমন অনেকগুলি ঘটক হয়েছেন, তাঁরা বুজরুকি খেলেন। অঘরে ছেলে মেয়ের সম্বন্ধ কোরে দেন। বোধ হয় আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, কলিকাতার নিকটে কি একখানা গ্রামে একজন ঘটক ছিলেন, তিনি আচার্য্যের কন্যার সহিত একজন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিয়ে ছয় মাসের জন্য শ্রীঘরে বাস কোরেছিলেন; এ সম্বন্ধে যেন সে রকম জালসাজি কিছু না হয়।

ঘটক। আজ্ঞে, তেমন বেইমানি আমি জানি না।

কর্ত্তা। হাঁ, তাই যেন মনে থাকে। খাঁটী কুলীনের কন্যা আমি চাই। দৃষ্টান্তটা মনে কোরে দিলেম, তাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না,—সময় বিশেষ, কার্য্য বিশেষে, সাবধান কোরে দোয়া ভাল। এখন তবে আপনি আসুন। প্রণাম। আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘটক ঠাকুর বিদায় হইলেন, কর্ত্তাও চেয়ার হইতে উঠিয়া হস্ত-স্থিত দর্পণে আপন বদনের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে করিতে গম্ভীর বদনে পুত্রকে বলিলেন, "বুঝতে পেরেছ কথাটা? মাখনের বিবাহের সম্বন্ধের জোগাড়টা করা গেল।"

সুকুমার বাবু দুইবার মস্তক সঞ্চালন করিলেন, মুখে কিছু বলিবার অগ্রেই কর্ত্তা মহাশয় খট্‌খট্‌ শব্দে খড়ম ঠুকিতে ঠুকিতে কাষ্ঠের সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

—:০:—

পৌরোহিত্য-শিক্ষাসভা।

এই রাজধানীতে এক বৎসর হইল, উক্ত নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। মাননীয় ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিভূষণ, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দিনপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্তঅম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্তসর্ব্বে-শ্বর বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী এম্, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন, ও শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, প্রভৃতি এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্‌যোগী। প্রথমে ৩০নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেনে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে তিনবার অধিবেশন হইয়াছিল; তাহার পর মহাকালী পাঠশালায় দুইবার অধিবেশন হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য এই,—ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে যাজনক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহাতে হিন্দুধর্ম্মানুগত সদাচার ও ক্রিয়া কর্ম্মগুলি যথানিয়মে সম্পাদিত হইতে পারে, দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়েরা শিষ্যগণকে তাহার শিক্ষা প্রদান করিবেন। শিষ্যগণকে সমুদ্র তুল্য ব্যাকরণ শাস্ত্রে ও পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করিয়া তোলা এ সভার উদ্দেশ্য নহে; যাজন কার্য্য যাহাদের উপজীবিকা, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ প্রণালীতে দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিত প্রস্তুত করিয়া লওয়াই প্রকৃত উদ্দেশ্য; শাস্ত্র সম্মত দশকর্ম্ম ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ যাহাতে সুচারুরূপে সুসম্পাদিত হয়, তাহারই উপায়-বিধান করা উদ্‌যোগকর্ত্তা-দিগের সংকল্প। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও সৎশূদ্রগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সভাটি স্থায়ী হইলে এবং সংকল্পানুযায়ী ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান হইলে আমাদের আর্য্যসমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই।

দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার অল্পতা হওয়াতে অধুনা সর্ব্বত্র শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুরো-হিতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল সচরাচর যে সকল পুরোহিত দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে কাঁঠালের আমসত্ত্ব বলিলে, নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না, তাঁহারা যে, যজমানগণকে কি মন্ত্রপাঠ করান, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝা যায় না, না আছে উচ্চারণ, না আছে অর্থ, না আছে বাক্যশুদ্ধি, সমস্তই হ য-

ব-র ল-। দৃষ্টান্ত অসংখ্যা আছে, সামান্য দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই বোধ হয়, এস্থলে পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবে। একবার একজন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার একজন যজমানকে মন্ত্র পড়াইতে ছিলেন, তিনি বলিতে ছিলেন, "বল, অপবিত্রঃ পবিত্রবা সর্ব্বাবস্তা গতপিবা যৎসরেৎ কুণ্ডরী কাক্ষ স্বভার্যা ভস্তরে স্থচী।" দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুনঃ—সরস্বতী পূজার সময় কোন কোন পুরোহিত তাঁহাদের যজমানগণকে আশ্চর্য্য মন্ত্রপাঠ করান, পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্রের শেষভাগে শ্রুতিগোচর হয়, "বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ!"

এ প্রকার মন্ত্র যাঁহারা উচ্চারণ করেন, তাদৃশ পুরোহিতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, সহরে ও মফঃস্বলে একাকার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাদৃশ পুরোহিতগণের ক্ষিপ্রকারিতার ও যথেষ্ট পরিচয় আছে। এক একজন পুরোহিত চারিদণ্ডের মধ্যে চৌষট্টিখানি সরস্বতী পূজা করিতে পারেন! একজন পুরোহিত স্বয়ং শ্লাঘা করিয়া বলিয়াছিলেন, "অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে তিনি কলিকাতা সহরের ছোট বড় একশত ছাপ্পান্ন খানি বাড়ীতে একশত ছাপ্পান্নটি লক্ষীপূজা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান,—যাঁহারা নিত্য পূজারি। এক একজন গৃহস্থের বাটীতে শালগ্রাম শিলাপূজা করিবার জন্য বেতন পান, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ (অধিকাংশই) বেলা ১০।১১টার সময় জুতা পায়ে দিয়া চুল ফিরাইয়া আতপ-তণ্ডুলের গামছা হস্তে অতি দ্রুতবেগে যজমান বাড়ীতে হাজির হন, ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠন্ ঠন্ শব্দে দুইবার ঘণ্টা বাজাইয়া দুইতিন মিনিটের মধ্যে গামছায় নৈবেদ্য বাঁধিয়া লইয়া বাহির হইয়া যান।

এপ্রকার পূজাতে কি প্রকার কার্য্য সিদ্ধ হয়! সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন, অথচ ভুক্তভোগী হইয়াও উপযুক্ত পুরোহিতের অভাবে কেহ সেই দুঃক্রিয়ার দমন করিতে পারেন না। বেশীকথা কি মহাশক্তির পূজাতেও মহাবিভ্রাট! এক একজন পুরোহিত একরাত্রে বিশ পঁচিশ খানি বাড়ীতে এমন কি ততোধিক বাটীতেও কালীপূজা সমাধা করিয়া থাকেন!!! নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপন অধিকার মধ্যে তাদৃশ ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লইয়া সেইরূপ অশাস্ত্রীয় পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আর্য্য সমাজে তাঁহার তুল্য স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ তেজস্বী সমাজ পতি-অতি-বিরল।

এখন মূল কথা এই হইতেছে যে, শতকরা পাঁচজনের অধিক উপযুক্ত পুরোহিত

প্রমুখ পুরোহিত সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণ আমাদের সমাজের এই নিদারুণ অভাব বিমোচনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা যারপর নাই আনন্দের বিষয়, হিন্দু গৃহস্থগণের প্রায় সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হইয়া যাইতেছে, যাঁহারা এই মহাপাপ দূরীকরণে উদ্‌যোগী তাঁহারা হিন্দু সাধারণের অগোণ্য ধন্তবাদের পাত্র। অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য-গণকে পণ্ডিত করিয়া, এবং উপযুক্ত শিক্ষাদানে নব নব পুরোহিত প্রস্তুত করিয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, উদ্‌-যোগীরা সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, জগদীশ্বর তাঁহাদের সাধু উত্তম সফল করুন।

পৌরোহিত্য-শিক্ষাসভার কার্য্য বিবরণ।

উদ্দেশ্য।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কার ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের যথাযথ সম্পাদনাভি-প্রায়ে যাজনক্রিয়াশিক্ষার উৎকর্ষবিস্তার ও সুব্যবস্থা সম্পাদনই এই সভার উদ্দেশ্য।

যাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বিগণ অল্পায়াসে ও অল্পব্যয়ে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের যথাযথ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, যাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকগণ দেশ মধ্যে সদাচার ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্ব স্ব ছাত্রগণকে সনাতন ধর্ম্মানু-মোদিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানোপযোগী শিক্ষা প্রদান করেন ও যাহাতে ছাত্রগণ, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যজন কার্য্য সম্পাদন দ্বারা অনায়াসে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, যাহাতে দেশমধ্যে ধর্ম্মানুমোদিত আচার ও নীতির প্রতি সাধা-রণের অনুরাগবর্দ্ধিত হয়, তদভিপ্রায়ে বক্তৃতা প্রদান, পুস্তক প্রণয়ন, শাস্ত্রব্যাখ্যান প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বন এই সভার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শ্রীযুক্ত দিনপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহাশয় ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। ইহার ১ম অধিবেশন স্থান-৩০নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন কলিকাতা। তারিখ ১৩১৬ সাল, ১৩ই আষাঢ়। এই দিনস্থির হয় যে, যাজন কার্য্যের শিক্ষাও সুব্যবস্থার জন্ত একটী সভা-স্থাপন আবশ্তক। এবং উহার আবশ্তকতা ও উপযোগিতা বিবৃত করিয়া সাধারণের অবগতির জন্ত, একখানি বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত করা হউক ও বিজ্ঞাপন লিখিত দিবসে বিজ্ঞাপনোক্ত বিষয়ের আলোচনার জন্ত, হিন্দুসাধারণকে আহ্বান করা হউক।

২য় অধিবেশন হয়—২০শে আষাঢ় ১৩১৬ সাল। স্থান ৩০নং তারকচট্টোপাধ্যায়ের লেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার গোস্বামী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও সদাচারসম্মত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ যাহাতে শাস্ত্রসম্মত ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য একটী সভা স্থাপন করা হউক, এবং জনসাধারণকে এই সভার উপকারিতা আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া, ইহার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করা হউক।

৩য় অধিবেশন। স্থান—৬৯ সুকীয়া ষ্ট্রীট। সময়—সন ১৩১৬ সাল, ১৬ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা। এইদিনে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

এইদিনে ব্রাহ্মণ সভার বর্ত্তমানতা সত্ত্বেও পুরোহিত সভার উপযোগিতা, এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, ব্রাহ্মণ সভায় ব্রাহ্মণগণই যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু পৌরোহিত্য শিক্ষাসভায় ব্রাহ্মণ হইতে সৎশূদ্র পর্য্যন্ত হিন্দুসন্তানগণ,দীক্ষা গ্রহণের জন্য যোগদান করিবার অধিকারী।

৪র্থ অধিবেশন। স্থান ৬৯ সুকীয়া ষ্ট্রীট, ৫টার সময় ৩১শে ভাদ্র ১৩১৬ সাল। এই অধিবেশনের সভাপতি শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহাশয়। এই অধিবেশনে মুদ্রিত নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হয়। এবং নিয়মাবলীর বিধানানুসারে বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভায় অবৈতনিক কর্ম্মচারিরূপে নির্ব্বাচিত হয়েন।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

সহকারী সভাপতিগণঃ—

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন
" দিনপ্রকাশ ব্রহ্মচারী
" সর্ব্বেশ্বর বিদ্যানিধি
" দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ
" লালমোহন বিদ্যারত্ন
" শ্যামাচরণ কবিরত্ন।

সম্পাদক পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম এ, সহকারী সম্পাদক শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

এই সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বরবিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয়ের উপর কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচার সম্পন্ন পুরোহিত আছেন, তাঁহাদের নাম ধাম ও শ্রেণীবিভাগ করিবার ভার অর্পিত হইল ও তাঁহাদের দুইজনের উপর পৌরোহিত্য-শিক্ষোপযোগী পাঠ্যগ্রন্থের তালিকা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার ভার অর্পণ করা হয়। স্থির হইল যে, তিন মাস অন্তর সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপর সভ্যসংগ্রহের ভার অর্পিত হয়। মাসিক ॥০ আনা চাঁদা প্রদান করিলে সভ্যশ্রেণী (সাধারণ) ভুক্ত হইতে পারিবেন। অসাধারণ সভ্য বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

৫ম অধিবেশন। স্থান ৩০ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন। সময় ৬ই চৈত্র, হায়ণ ১৩১৬ সাল। সভাপতি শ্রীযুক্ত দিনপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। এইদিনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ধনরক্ষক রূপে নির্ব্বাচিত হয়েন। অতঃপর ইহাও স্থির হইল যে, পৌরোহিত্য শিক্ষাসভার কার্য্যালয়, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, জন্মভূমি কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হউক, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রস্তাব ক্রমে স্থির হয় যে, যদি কেহ ধর্ম্মার্থে এককালীন কিছু দান করেন তাহাও গৃহীত হইবে। মাসিক চারি আনা পর্য্যন্ত চাঁদা দিলেও সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা হইবে।

আর্ত্তের আশ্বাস।

লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ।

ভুবন ব্যাপিয়া, জগত ছাপিয়া,
দেখিনু তোমার হাসি।
হাসি দেখি মোর, পরাণ বিভোর,
বুঝিনু দিবে না ফাঁসি॥
নিবিড় তিমির, মাঝেতে মিহির,
হেরিনু কাঁপিল প্রাণ।
সুখের আশায়, মরি পিপাশায়,
কৈনু বিষজল পান॥

ঝিবেঁ মোর হিয়া, গেল জর্জ্জরিয়া,
আঁধারে ভরিল ধরা।
দেহ প্রাণ মোর, সব হল ঘোর,
অজ্ঞান তিমিরে ভরা॥
দেহ অবসাদে, মনের বিষাদে,
সকলি দেখিনু ফাঁকি।
তোমার যেরূপ, প্রচ্ছন্ন অরূপ,
দেখিতে রহিল বাকি॥
আঁধারে আঁধারে, ঘুরে চারি-ধারে,
পড়িনু অগাধ জলে।
হাবু ডুবু খাই, হেন দেখি নাই,
যে মোরে আসিয়া তোলে॥
বিজলীর আভা, মম মন লোভা,
পড়িল চকিতে আসি।
সেত' কিছু নয়, জেনেছি নিশ্চয়,
তোমার মধুর হাসি॥

মধুপুর। ২৭।৬।১৯১০।

—:০:—

সমালোচনা।

জীবন।—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত, মূল্য আট আনা। আত্মীয় বিয়োগে সংসারের লোকে শোকাভিভূত হয়, এটি নিষ্কারণ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, হেমেন্দ্রবাবু জীবনের অমরত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। নশ্বর দেহের বিনাশকেই লোকে মৃত্যু বলে; বিবিধ শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া হেমেন্দ্র বাবু তাহা খণ্ডন করিতেছেন; দেহের বিনাশকে তিনি মৃত্যু বলেন না; তিনি বলেন, জীবন অমর, সুতরাং মনুষ্য অমর, জীবনের মৃত্যু নাই, মানুষেরও মৃত্যু নাই। পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম, অলঙ্কার অংশের বিয়োগ করিয়া সার সার অংশ বাছিয়া লইলাম, বুঝিতে পারা-গেল, হেমেন্দ্র বাবু এতৎ প্রণয়নে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, দেহ তত্ত্বের মীমাংসা

যে যে শাস্ত্রে আছে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তাহার অনুশীলন করিয়াছেন বিশেষ প্রমাণ যোগ্য উদাহরণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ভোজনাবসানে মিশর বাসীরা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে নর কঙ্কাল প্রদর্শন করিয়া নর দেহের নশ্বরত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়, এই দৃষ্টান্তটি অতীব প্রশংসনীয়। দেহ নশ্বর, জীবন নশ্বর নহে, প্রবীণ গ্রন্থকারের এইটি সিদ্ধ সংস্কার এই সংস্কারটি দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস, অবশ্যই শ্লাঘনীয়, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা সিংহ মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। "জীবন"—পুস্তিকার পরিমাণ ৫১ পৃষ্ঠা মাত্র, এত ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এত সংক্ষেপে এই জটীল তত্ত্বের পরিস্কার ব্যাখ্যা করা, আরও অধিক প্রশংসার বিষয়; কিন্তু একটি মূল বিষয়ে আর্য্যমতের সহিত সিংহ মহাশয়ের মতের অনৈক্য পরিলক্ষিত হইল। আর্য্য ঋষিগণের মতে জীবন ও আত্মা এক বস্তু নহে, সিংহ মহাশয় বলিতেছেন, জীবন এবং আত্মা একই বস্তু। আত্মা অবিনশ্বর ইহা আর্য্য শাস্ত্রের চিরসিদ্ধান্ত, আত্মা অবিনাশী, আত্মার বিয়োগে মানবের মৃত্যু, ইহা স্বীকার করা যায় না; জীবনের বিচ্ছেদেই মৃত্যু বলা হয়। যাঁহারা মানব দেহের অন্তর নিহিত জীবাত্মা পরমাত্মার পার্থক্য স্বীকার করেন; সিংহ মহাশয়, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইবেন, তাহাই আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

মোটের উপর পুস্তিকাখানি পরম সুন্দর ও বাঙ্গালাভাষার গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র ব্যয় করিয়া বঙ্গবাসী পাঠকেরা বিস্তর উপকার পাইবেন সন্দেহ নাই।

খাদ্য।—কলিকাতা মেডিকেলকলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক, গবর্ণমেণ্ট রসায়ন পরীক্ষক, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনীলালবসু, রায় বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, এই পুস্তকখানির প্রণয়ন কর্ত্তা। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকে স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ, খাদ্য কাহাকে বলে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, পরিপাক প্রণালী, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ, খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ, খাদ্যের অন্যান্য উপকরণ, নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, খাদ্যের পরিপাকের সময় ও পরিপাচ্যতা, রন্ধন, বয়সভেদে আহারের পরিমাণ ও সময়, পরিমিত ভোজন ও দীর্ঘজীবন লাভ, আমিষ ও নিরামিষ ভোজন, খাদ্যে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায়, খাদ্যের ভেজাল নিবারণের উপায়

নির্ঘণ্ট পাঠ করিয়াই পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন, এই পুস্তকখানি সংসারে কতদূর উপকারে আসিবে। নির্ঘণ্ট দেখিয়াই উপকার বুঝিয়া লওয়া হইল, গ্রন্থ গৌরবে ইহা মনে করিতে হইবে না, যিনি ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি বহু তত্ত্বদর্শী এম, বি, উপাধি প্রাপ্ত, সুনাম লব্ধ সুবিজ্ঞ ডাক্তার গবর্ণমেণ্টের রসায়ন পরীক্ষক, ইহাতেই এ গ্রন্থের সমধিক গৌরব। ডাক্তার চুনীলাল বাবু এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে, শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে যে, বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, লিখিতে হয়, লিখিলাম, আলোচনা করিতে হয় করিলাম, এমন বিবেচনা করিয়া তৎ-তৎ বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন নাই; অজ্ঞবিজ্ঞ সকল লোকে যাহাতে পাঠ করিবামাত্র, অর্থ বোধ করিতে পারেন সেইদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন; যেখানে যে প্রসঙ্গ ধরিয়াছেন, সেইখানে তন্ন তন্ন করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। খাদ্যের নাম, খাদ্যের উপযোগী খাদ্য বস্তুর গুণ, বস্তু বিশেষের দোষ, পরিপাকের নিয়ম, কোন কোন বস্তু রোগের হেতু, এবং কোন কোন বস্তু একেবারে পরিত্যাজ্য অতি পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা তিনি অতি পরিপাটি রূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পুস্তক পাঠ করিয়া লোকে আমোদ করুন, রাসায়নিক, পণ্ডিত মহাশয়েরা রচনার প্রশংসা করুন, পাঠকগণকে আমরা এমন অনুরোধ করিতেছি না, সে উদ্দেশ্যেও এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। স্বাস্থ্য বস্তু বুঝিবার যদি বাসনা থাকে, মানুষের প্রকৃত খাদ্য কি কি, খাদ্যের পরিমাণ কতটুকু হওয়া উচিত, খাদ্য পরীক্ষায় কোন গুলি জীবন রক্ষার উপযোগী, তাহা জানিতে যদি একান্ত অভিলাষ হয়, খাদ্যের নিয়ম পালনে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার যদি ইচ্ছা থাকে, শিশুগণের শরীর পালন ও স্বাস্থ্য বিধান যদি কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে চুনীলাল বাবুর সদ্‌উপদেশ গুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিধান করুন, প্রকৃত বিচার পূর্ব্বক হিতকর উপদেশ পূর্ণ নিয়ম গুলি পালন করুন, সুখী হইতে পারিবেন, জীবনধারণ সফল জ্ঞান হইবে। এদেশের সংসারি লোক মাত্রেরই এই পুস্তকখানির আদর করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার চুনীলাল বাবু এই মহোপকারী পুস্তকখানি প্রচার করিয়া নানা ব্যাধিক্লিষ্ট বঙ্গবাসীগণের যে মহোপকার সাধন করিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত শত শত ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, আশ্বিন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সমাজ-সংস্কার।

লেখক—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সম্মতি আইন লইয়া আমাদের হিন্দু সমাজে নানা আন্দোলন হইয়াছিল; আইন প্রভাবে আমাদের ধর্ম্মের উপর আঘাত হইতেছে, এই আমাদের আন্দোলন। গর্ভাধান সংস্কারে ব্যাঘাত ঘটিবে, ইহাই আমাদের আপত্তির কারণ, কিন্তু উক্ত আন্দোলনে (অনেকে যাঁহাদের আচার ব্যবহার দর্শনে আমরা কখন অহিন্দু বলিতে পারি না।) যোগদান করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই আইনটি বিধিসঙ্গত ভাবিয়াছিলেন। দেশকাল প্রভেদ না হইলে সকল হিন্দুই একমত হইতেন নিশ্চয়।

শাস্ত্রে আছে, গর্ভাধান সংস্কার না হইলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলিতেন, এ স্মৃতির নিয়ম উপস্থিত সময়ের নিমিত্ত নহে; যে সময় ব্রহ্মচর্য্য প্রবল ছিল, এ নিয়ম সেই সময়ের নিমিত্ত। উপস্থিত সময়ে যখন ঘৃণিত বার-বিলাসিনীগণ এত প্রবল, আর যখন বিজ্ঞান গর্ভাধান সংস্কারের বিরোধী, তখন সম্মতি আইন প্রচার হওয়াই মঙ্গল। বৈজ্ঞানিকের মতে অপরিস্ফুট আধারে উত্তম সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, আর দেখা যায়, বালিকা অবস্থাতেই স্ত্রীধর্ম্ম হইতেছে, এ অপরিস্ফুট অবস্থায় সন্তান হইলে সন্তান হীনবল হইবে, সেই কারণে রজঃস্বলা হইলেই যে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া উচিত, ইহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এইরূপ বিরোধী আন্দোলনে প্রমাণ করে যে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে (শাস্ত্রেই বিধি আছে) শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; উপস্থিত অবস্থায় স্থূল দৃষ্টিতে অনুমান হয় যে, বুঝি বা কতক শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইলে ভাল হইত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিবেচনায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। উচিত বা অনুচিত, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি; কারণ উচিত অনুচিত স্থির করিতে হইলে বিস্তার বহুদর্শন প্রয়োজন। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের অতিশয় বিপক্ষ, বাল-বিধবা দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ও দ্রব হয়, কিন্তু যাঁহারা পক্ষ, তাঁহারা দয়ার পরবশ হইয়া একেবারে স্থির করেন, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া প্রয়োজন স্থির করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; এ বিষয় স্থির করিতে হইলে অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে কুমারী-বিবাহে কিছু হানি হইবে কি না? সে হানি সামান্য বা অধিক? বহুদিনের সংস্কার বশতঃ সকলেরই মনের ধারণা হওয়া সম্ভব যে, কুমারীর সহিত বিবাহ হইলেই ভাল হয়। যাহার একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া যেন একটা ঘৃণার কথা। যতগুলি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে, তাহার অনেকস্থলে বিবাহ হইবার প্রলোভন ছিল; কেহ বলিতে পারেন, কুমারীর বিবাহেরও ত প্রলোভন আছে, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেকেই ত পুত্রের বিবাহ দেন। সত্য, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া বরকর্ত্তা পাত্রী স্থির করেন বটে, কিন্তু প্রলোভন না থাকিলেও তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য।

বিধবা-বিবাহের প্রলোভন এ প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র। এ স্থলে বিচার

একদফা ধরিয়া লন, তারপর লাভালাভ বিবেচনা। সমাজ কিছু বলুক বা না বলুক, একজন একটা বিধবাকে যে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিবেন, তাহার দাম কি? অনেক স্থলে বিধবা-বিবাহ করিয়া বর যেন শ্বশুরের মাথা কিনিয়া বসেন; এরূপ বিধবা বিবাহ স্থলে অনেক বিড়ম্বনা সম্ভব। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষ, তাঁহারা দেখান, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকার ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতি অনেক দুক্রিয়া প্রবল হয়। বিধবা-বিবাহ পক্ষপাতি অনেকের মনে এইরূপ ধারণা, অনেক বিধবার দৈহিক নির্ম্মলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক নির্ম্মলতা অতি বিরল। সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা যে বিরল, ইহা অতি সত্য; ইহা পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়ের পক্ষেই। কেবল বিধবা কেন, সধবার পক্ষেও কলুষচ্ছায়া হৃদয়ে পড়ে না, এরূপ আদর্শ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু বলবান হৃদয় সে ছায়া দূর করিতে সক্ষম। বিধবার মনে কখন কখন শরতের মেঘের ন্যায় কুচিন্তা উদয় হয় বলিয়া যদি বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আমরা মানবী-দেহে অনেক দেবী দর্শনে বঞ্চিত হইতাম। এরূপ দেবীর অভাব সমাজের সাধারণ ক্ষতি নহে। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি অসহায় বাল্যকাল স্মরণ করেন, বেশ-ভূষা বর্জ্জিতা স্নেহময়ী দেবীমূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইবে। যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, নভেলে বর্ণিত বা বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ভিন্ন সে দেশে তাদৃশী দেবী-প্রতিমা দেখিতে পাইবে না; সে সকল প্রদেশেও দেখিবেন যে, যাঁহারা চির বৈধব্য অবলম্বন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সমাজ-পূজ্য। আমাদের দেশে পুরুষের দুইবার বিবাহ হইবার কোন বাধা নাই, তথাপি যিনি দুইবার বিবাহ করেন, তাঁহাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, বন্ধুবান্ধবেরও প্রচ্ছন্নশ্লেষ সহিতে হয়। আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ বা বিপক্ষ নহি, সমাজ যদি সঙ্গত বিবেচনা করেন, আমরাও সঙ্গত বিবেচনা করিব। যদিও আজকাল আমাদের সমাজবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছে, তথাপি সমাজের সামাজিক ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সমাজ সংস্কারক যদি কেবল দয়ার বশীভূত হইয়া এবং হেথায় হোথায় ভ্রূণহত্যা দেখাইয়া বিধবা-বিবাহ অতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, সেরূপ সমাজ-সংস্কারের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজ করুণায় অনেকে সমাজ বিরোধী কার্য্য করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবেন না ইহা ভাবিয়া যিনি সমাজকে উপেক্ষা করেন, তিনি যে আচার ভ্রষ্ট,

সমাজের নিয়ম রক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। সামাজিকতা মানুষের লক্ষণ; ইহার প্রতি উপেক্ষায় নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়। আমরা যদি আত্মসমাজ উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে সম্মান হারাইব। সভ্য দৃষ্টিতে যে যে সমাজ কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে সমাজকে উপেক্ষা করিতে নিরপেক্ষ ন্যায়বান রাজাও কুণ্ঠিত হন। সমাজের সামাজিক আবেদন সুসভ্য রাজাকেও শুনিতে হয়। আমরা অনেক স্থলে সমাজবন্ধন লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের রাজার চক্ষে সম্মানভাজন নহি, আমাদের সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও সমাজ-বন্ধনের শিথিলতা বশতঃ রাজদ্বারে সমাজের কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আপনাদের সমাজ-বন্ধন কোথায়? এ কথা বলিয়া অনেককে উপেক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। যে যে, স্থলে আমাদের সমাজ-বন্ধন দৃঢ়, সেই সেই স্থল স্পর্শ করিতে কেহই সাহস করেন না; অতি দীন-দরিদ্র কুলস্ত্রীর পাল্কী হাইকোর্টে উঠিতে দিতে হয়; উৎকলের এক দেব মন্দিরদ্বারে পাণ্ডারা একজন পদস্থ রাজপ্রতিনিধিকে জুতা খুলিতে বলে,সামাজিকতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কথা উঠিতে পারে, তবে উন্নতি কিরূপে হইবে? আমরা বলি, সংস্কার মন্দ হইলেও এক দিনে তাহা দূর হইতে পারে না। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে সংস্কারক মহাশয়েরা সকলের মত গ্রহণ করুন; কোন্ দিকে কিরূপ ক্ষতি হইবে, কোন্ দিকে ক্ষতি হইবে না,তাহা গভীর চিন্তা ও বহুদর্শীতায় স্থির করুন; যাঁহারা যে সংস্কারের বিরোধী, যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা সে বিরোধ ভঞ্জন করুন। আপত্তি করিতে পারেন, এরূপ নির্ব্বোধ ব্যক্তি আছেন, যিনি কোন রকমে বুঝিবেন না; অবশ্যই বুঝিবেন। যিনি বুঝিবেন না, শাস্ত্র তাঁহার বিরোধী হইবে। দেশ কাল পাত্র বোধ যাঁহার নাই, তিনি সমাজের যোগ্য নন্। শাস্ত্র দৃঢ় বাক্যে বলিয়াছেন, দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া সমাজ সংস্কার করা উচিত, এবং চিরদিনই সেইরূপ সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। দ্বাপরের নিয়ম কলিতে নাই। শাস্ত্রকার অবস্থা বুঝিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুচিত কার্য্যের বিরোধী, উচিত কার্য্যের বিরোধী নয়।

সীতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত

সময়ের প্রাধান্য এতই বেশী যে, কবিবর রাজকৃষ্ণরায় বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াও সীতার রূপ সম্বন্ধে বাল্মীকির উপর বাড়াইয়া দুকথা না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই ঃ—

ন্যাসভূতং তদাস্যন্তমস্মাকং পূর্ব্বজে-বিভৌ।
অথমে কৃষ্ণা ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা-ততঃ॥
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা-সা-তু ব্বর্দ্ধত মমাত্মজা॥

বালকাণ্ডং।

রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ,—

অনন্তর একদিন হল দিয়া আমি।
কর্ষণ করিতেছিনু নিজ-যজ্ঞভূমি॥
সহসা সম্মুখে মোর দেখি হেনকালে।
উঠিল একটী কন্যা লাঙ্গলের ফালে॥
হলের সীতায় কন্যা হইলা উত্থিতা।
এ হেতু উহার নাম রাখিলাম সীতা॥
অযোনি সম্ভবা এই তনয়া আমার।
রূপেতে দেখিতে স্বর্ণ কমল আকার॥
আমারই গৃহেতে কন্যা বাড়িতে লাগিল।
দেখিয়া আমার মনে আনন্দ হইল॥

বালকাণ্ড ৬৬ সর্গ।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অনুসারিণী বলিয়া বাঙ্গালার কবি কালিদাসাদি সংস্কৃত কবিগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে. তাই বাঙ্গালা কাব্যে নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনার এতটা ছড়াছড়ি, বাঙ্গালার কবি "মহাজন যেন গতঃ সপন্থা" এই মহাবাক্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহাদের রূপ বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। সীতাদেবী যখন লীলার জন্য ভূতলে অবতীর্ণা, তখন নারীজন্মের আকাঙ্ক্ষিত রূপের প্রয়োজন বটে, তাহার অভাবও ছিল না, কেনই বা থাকিবে ? তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বাল্মীকি এই কথাটীমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ঃ

তস্ত-ভূয়োবিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
দেবতাভিঃ সমারূপে সীতা শ্রীবর রূপিণী॥
বালকাণ্ড, ৬৬ সর্গ।

কিন্তু তিনি সীতাদেবীর আভ্যন্তরিক চিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, পাঠকের মন সীতা চরিত্রের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া আর কিছু দেখিতে পায় না, আর কিছু শুনিবার অপেক্ষা করে না, কেবল সীতা-চরিত্রের সৌন্দর্য্য সুধার জন্য লালায়িত হয়, তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য্যের চিন্তাও মনে স্থান পায় না। এরূপ চরিত্র চিত্র কাব্য জগতে সুদুর্লভ। অসাধারণ কৃতিত্ব না হইলে এরূপ হইতে পারে না। ইহা বাল্মীকির ন্যায় সিদ্ধহস্ত কবিতেই সম্ভব, অন্যে সম্ভাবিতে পারে না।

কৃত্তিবাস বঙ্গীয় কবিকুলের গুরুস্থানীয়; তিনি সীতার রূপ বর্ণনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট কবিতা পূর্ব্বে কখন বাঙ্গালা-ভাষায় প্রকটিত হয় নাই। দেখুন ঃ—

অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি।
এ সামান্য কন্যা নহে কমলা আপনি॥
কন্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে॥
হরিণী নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল।
তিলফুল বিনি তাঁর নাসিকা উজ্জ্বল॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পদের অঙ্গুলি॥
অরুণ বরণ তাঁর চরণ কমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।

জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে।
সীতা যোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে॥

কৃঃ রা—আদিকাণ্ড।

রাম রসায়ন প্রণেতা কৃত্তিবাসের অনুকারক হইলেও উৎকর্ষ প্রয়াসী। অনুকরণে উৎকর্ষ সাধন বড়ই বিরল, প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। গোস্বামী কবির রূপ বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মেনকা উর্ব্বসী শচি রম্ভা তিলোত্তমা।
তার কোটী অংশ তুল্য নহে মনোরমা॥
তাহার তনুর তুল্য না হয় তড়িৎ।
কুন্দক কনক বুঝি হয় বা কিঞ্চিৎ॥
কিবা কাল কুটিল কুটিল কেশ-ভার।
বিধু বিনা বদনে তুলনা নাহি আর॥
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি কিবা ভুরু তার।
নাসিকা অধরেতে তুলনা দিব কার॥
কম্বুকণ্ঠ মৃণাল জিনিয়া ভুজ-দ্বয়।
করতলে নিন্দে অশোকের কিশলয়॥
কিবা করিকুম্ভ জিনি ঘন পয়োধর।
অতি ক্ষীণ মাঝাখানি ত্রিবলী সুন্দর॥
নিবিড় নিতম্ব উরু রামরম্ভা মানি।
কমল পল্লব সম চরণ দুখানি॥
যেমত তাহার রূপ তাহে মানি হেন!
ইহার বিধাতা হবে পঞ্চবাণ যেন॥
সৌন্দর্য্য সাগর মথি তুলি নবনীত।
মনোসাধে কাম তারে করেছে গঠিত॥

রাম রসায়ন ৩২ পৃষ্ঠা।

গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণনা যেন একটু কষ্টকল্পনা সম্ভূত। এবং শেষাংশটুকুতে একটু কুরুচির গন্ধও পাওয়া যায়। সে কালের "কামিনী কুমার" "চন্দ্রকান্ত" প্রভৃতি নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর কাব্যে নায়িকার রূপ বর্ণনায় যেরূপ আদিরসের ছড়াছড়ি এখানেও তাহা অপেক্ষা কিছু কম দেখি না।

কৃত্তিবাস ঠাকুর সীতাদেবীর বয়োগণনায় এক বিষম প্রমাদ ঘটাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের যথাতথা অতিশয়োক্তির এত বাড়াবাড়ি যে, তাঁহার কাব্যখানি আরব্যোপন্যাসের গল্প গুলিকে লজ্জা দিয়াছে। তাঁহার মতে সীতাদেবী রামচন্দ্র অপেক্ষা সাত বৎসরের বয়ঃ কনিষ্ঠা। যথা আদিকাণ্ড,—

"সাত্ত বৎসরের রাম অযোধ্যা নগরে।
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে॥"

এদিকে বিশ্বামিত্র ঋষি যখন তাঁহার সিদ্ধাশ্রমের বিঘ্নবিনাশ জন্য রামলক্ষ্মণকে লইয়া যান, তখন তাঁহাদের অযোধ্যা প্রত্যাগমনে কাল বিলম্ব দেখিয়া রাজা দশরথ কৌশল্যা সুমিত্রাদি রাজমহিষী ও অযোধ্যার সাধারণ প্রজাগণ মহা উৎকণ্ঠিত। তদুপলক্ষে কবি বলিতেছেন,—

অষ্টবৎসরের রাম দশ নাহি পূরে।
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে॥ আদিকাণ্ড।

তখন রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীর পাণি-পীড়নের অধিকারী হইয়াছেন, মিথিলার রাজদূত সেই সংবাদ লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছেন, দশরথ ও বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাঁহারই সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহোৎসব উপলক্ষে মিথিলা যাত্রা করিবেন। এই সময় যদি রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম দশ বৎসরই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সীতাদেবীর বয়স কোনমতে তিন বৎসরের বেশী হইতে পারে না। এরূপ দুগ্ধপোষ্যা শিশু কন্যার বিবাহ দিবার জন্য জনক রাজা এত বিব্রত কেন? তিনি অনায়াসেই আরও পাঁচ সাত বৎসর অপেক্ষা করিয়া জানকীর বিবাহ দিতে পারিতেন। বস্তুগত্যা তাহা নহে, হরধনু ভঙ্গকালে রামচন্দ্রের বয়স প্রায় ষোল বৎসর।

যৎকালে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সিদ্ধাশ্রমে আনিবার জন্য অযোধ্যায় গিয়া দশরথকে তাহা জানাইলেন, তৎকালে দশরথ বলিলেন,—

"উনষোড়শ বর্ষ রাম রাজীবলোচনঃ।
যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥"

আমার রাজীবলোচন রাম ষোল বৎসরেরও অল্পবয়স্ক, আমি তাঁহাকে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধক্ষম বলিয়া মনে করি না।

ইহারই বর্ষেক কাল মধ্যে হরধনু ভঙ্গ এবং সীতার বিবাহ হয়। মহর্ষি বাল্মীকি যদিও তৎকালে সীতাদেবীর বয়ঃক্রম কত হইয়াছিল, খুলিয়া বলেন নাই, কিন্তু আনুষঙ্গিক বিষয় গুলি বিবেচনা করিলে কোনমতে দশের অধিক হইতে পারে না।

কেন না শাস্ত্রবাক্য এই যে,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষাতু রোহিনী।
দশবর্ষা ভবেৎকন্যা ততউর্দ্ধং রজস্বলা ॥
মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকংযান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং ॥
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽনবর্বর্ষয়াঃ কন্যায়ান্ত প্রশস্যতে ॥"

অষ্টম বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা গৌরী, নবম বর্ষ বয়স্কা রোহিনী এবং দশম বর্ষ বয়স্কা কন্যকা নামে খ্যাত, একাদশ বৎসর বয়স্কা রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। কন্যা রজস্বলা হইলে অর্থাৎ একাদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি বিবাহিতা না হয়, তাহা হইলে তাহার পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিন জনে নরকগামী হইয়া থাকে। তজ্জন্য যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয়, তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ প্রশস্ত জানিবে। সংবর্ত্ত সংহিতা ৬৬।৬৭।৬৮ শ্লোক।

রাজর্ষি জনক শাস্ত্রবিদ সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি কন্যার অষ্টম বর্ষ বয়স হইতেই তাঁহার জন্য যে পাত্রোন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তাহাতে বর্ষৈক কাল উত্তীর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। ধনুর্ভঙ্গ পণ ঘোষণা করিলে, নানা স্থান হইতে রাজপুত্রগণের সমাগম নরধনু দর্শন ইত্যাদিতে কোন্ না একবৎসর কাল অতীত হইয়াছিল. কারণ সকলেই যে কিছু একদিনে আসিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভব নহে। তাহার পর রাজা ও রাজপুত্রগণ হরধনু উত্তোলনে অসমর্থতা প্রযুক্ত মিথিলা অবরোধ করেন, তাহাতে যে একটী বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্ মিথিলা পুরীম্।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয় যাতানি সর্ব্বশঃ ॥"

ধনুর্ভঙ্গে অসমর্থ রাজপুত্রেরা অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মিথিলা পুরী আক্রমন করেন। একবৎসর মধ্যে যুদ্ধোপকরনাদি ফুরাইয়া যায়।

ভগবান রামচন্দ্রের বিবাহ যে রজস্বলা কন্যার সহিত হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায়, এই লীলাকারিণী দেবদম্পতির বিবাহ কালে রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম ষোল এবং সীতাদেবীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। শাস্ত্রানুসারে ইহাকে কোনমতে অনুপযুক্ত বলা যাইতে পারে না।



পূজার গল্প।

কৃষ্ণ-ভক্তিতে শক্তিপূজা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাত্যায়নী।

শ্রীধরপুরের জনার্দ্দন ঠাকুর এক বৎসর রাখী-পূর্ণিমার সময় সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ। একমাস বৃন্দাবন বাস হইল। গৃহিণী প্রতিদিন যমুনার বিশ্রামঘাটে স্নান করেন, বিগ্রহগুলি দর্শন করেন, কুঞ্জগুলি পরিভ্রমণ করেন, এক একদিন গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া আইসেন; ভক্তিভাবে এইগুলি তাঁহার কার্য্য। বন প্রদক্ষিণের পদ্ধতি আছে, তাহা তিনি ততটা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

জনার্দ্দন ঠাকুর সর্ব্বক্ষণ তিলক-মালা লইয়া ব্যস্ত, মুখে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। তাঁহার আন্তরিক ভক্তি কতদূর, কার্য্য দেখিয়া অন্যলোকে তাহা অনুমান করিতে পারিত না।

গৃহিণীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া। কৃষ্ণভক্তিতে তিনি প্রীতি অনুভব করিতেন। কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণবের ন্যায় শক্তি পূজায় অশ্রাদ্ধা দেখাইতেন না। একদিন তিনি একজন ব্রজবাসিনীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-লীলার গল্প শ্রবণ করেন। সিংহ-বাহিনী কাত্যায়নী একদা গোষ্ঠক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়া, রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া স্তন্যপান করাইয়াছিলেন, রাখাল বালকেরা এক একটি ক্ষুদ্র বৎস ক্রোড়ে লইয়া চারিদিকে নৃত্য করিয়াছিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া দিবাভাগে সেই গল্প শুনিয়া রাত্রিকালে চিন্তা করিলেন, তবে ত কাত্যায়নী আমাদের শ্রীকৃষ্ণের জননীরূপিণী; আমি কৃষ্ণপূজা করি, কাত্যায়নী পূজা করিতে ভুলিয়া থাকি কেন?

এই চিন্তা যখন তিনি করিলেন, জনার্দ্দন তখন গোপীনাথজীর বাড়ীতে ছিলেন। তিনি প্রত্যাগত হইলে কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এ বৎসর আমি দুর্গাপূজা করিব।"

জনার্দ্দন ঠাকুর কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া, কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ-স্বরে পত্নীকে বলিলেন, "ক্ষেপি! এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে? আমরা বৈষ্ণব, আমাদের দুর্গাপূজা করিতে নাই। বিশেষতঃ দুর্গোৎসবে অনেক খরচ। আমার অবস্থা সে রকম নয়; তুমি দুর্গাপূজার অভিলাষ পরিত্যাগ কর।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন,—"সৎকার্য্যের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে নাই। আমি শুনিয়াছি দুর্গা আমাদের কৃষ্ণচন্দ্রের মা; আমি দুর্গাপূজা করিব; পূজার আয়োজন করিব। পূজার আয়োজন করিবার জন্য কল্য আমি গৃহে যাইব। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাইতে না চাও, বৃন্দাবনে থাক।"

স্বামী অনেক নিষেধ করিলেন, কৃষ্ণপ্রিয়া তাহা শুনিলেন না; দুর্গাপূজায় দৃঢ় সংকল্প।

ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা, সেইরাত্রে ঐ সকল কথা। পরদিন কৃষ্ণপ্রতিপদ, অপরপক্ষের তিন তর্পন আরম্ভ। দুর্গাপূজার অল্পদিন মাত্র বিলম্ব। প্রতিপদের প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণজীকে প্রণাম করিয়া, কামনাসিদ্ধির বর চাহিয়া, পতিকে বৃন্দাবনে রাখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী স্বগৃহে যাত্রা করিলেন।

জনার্দ্দন ঠাকুরের পিতামহ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। একতলা বাড়ী, বাহির মহলে তিন খিলানের একখানি পূজার দালান। অবস্থাবৈগুণ্যে জনার্দ্দন ঠাকুর সেই দালানখানি মেরামত করিতে পারেন নাই, চূণবালী খসিয়া গিয়াছে, কড়ি,

কাষ্ঠের ফাঁক দিয়া বৃষ্টি পড়ে; দেওয়ালের গায়ে বসুধারার ন্যায় বৃষ্টির জলের কালো কালো দাগ; সেই দালানে এখন কলাবাদুড় আর চামচিকেরা বাসা লইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন ;—সংকল্প।

কৃষ্ণপ্রিয়া গৃহে আসিয়া অনেক রকম ভাবিলেন, রজনীযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কিম্বা মনের পটে স্বপ্ন আঁকিলেন, কাত্যায়নী যেন তাঁহার শিয়রে আসিয়া বসিয়া আছেন। দশভুজা মূর্ত্তি নয়, দু-খানি হাত; দুই হাতে দুইটি নব প্রস্ফুটিত পদ্মফুল।

কৃষ্ণপ্রিয়া চমকিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন, মনে মনে স্থির করিলেন, এই ঠিক। মা আমাকে যে মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন, সেই মূর্ত্তির পূজা আমি করিব; দশভুজা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইব না, দশহস্তে দশখানি অস্ত্র দিব না, দ্বিভুজা মহামায়া মূর্ত্তি আমি গড়াইব; লক্ষ্মীসরস্বতি আনিব না, কার্ত্তিকগণেশ আনিব না অসুর আনিব না, আনিব কেবল প্রসন্নমুখী পদ্মহস্তা দ্বিভুজা দুর্গা। সিংহ অবশ্য রাখিব, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির ন্যায় সিংহ পৃষ্ঠে পদ্মের উপর মা আমার বসিয়া থাকিবেন। কারিকরকে বলিয়া দিব, মায়ের কোলে যেন একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি গড়িয়া দেয়।

ভক্তিমতির এই ভক্তিপূর্ণ সংকল্প। আশ্চর্য্য! ভক্তের মহিমা অপেক্ষা ভক্তির মহিমা অধিক। একপক্ষ অতীত হইল; মহালয়া অমাবস্যা। কৃষ্ণপ্রিয়ার বড় উদ্বেগ। আজিও প্রতিমা হইল না, কবে হইবে? কারিকর আসিল না; তিনবার সংবাদ দিলাম, তবুও আসিল না। আজ যদি না আসে, কল্য আমি নিজে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিব।

দিন গেল, কারিকর আসিল না। রাত্রি হইল। শামার মা নামে একজন গয়লানী সেই বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করে, বেতন লয় না, খায়পরে, থাকে। কৃষ্ণপ্রিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া কত কথা বলিতেছেন, নিচের বিছানায় শুইয়া শামার মা এক একটি কথার জবাব করিতেছে, দুজনের মুখেই পূজার গল্প। কথা

ঘুমাইতে পারিলেন না। দুর্গা তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছেন, তিনিও জাগিতেছেন। রাত্রি যখন অনেক, সেই সময় বাহিরের দালানে যেন অনেক লোক কথা কহিতে লাগিল, বাঁশে বাঁশে শব্দ হইতে লাগিল। প্রায় একদণ্ডকাল কৃষ্ণপ্রিয়া কাণপাতিয়া সেই সকল শব্দ শুনিলেন; ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শামার মাকে জাগাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া একবার বাহির বাড়ী দেখিয়া আসিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিবামাত্র আবার সেইরূপ শব্দ; আবার আলো জ্বালিয়া তিনি দেখিয়া আসিলেন, কোথাও কিছুই নাই। তিনবার ঐরূপ যাওয়া আসা, ফল কিছুই নয়;—সব ফাঁকা; ভগ্ন দালানখানি অমাবস্যার অন্ধকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা।

সে রাত্রে কৃষ্ণপ্রিয়ার আর নিদ্রা হইল না, ভোরে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, দালানে একজোড়া মোমবাতি জ্বলিতেছে, দালানখানি নূতন হইয়াছে, কারিকর রামচরণ পাল দ্বিভুজা দুর্গা প্রতিমা চিত্র করিতেছে, দুর্গার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ।

দর্শন করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, অথচ তখনকার মানসানন্দ সেই বিস্ময়কে ছাপাইয়া উঠিল।

বিস্ময়ের আর একটি কারণ। চিত্রকরের দক্ষিণপার্শ্বে একটি সুন্দর ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণটি খর্ব্বাকার, গৌরবর্ণ, মাথার মাঝখানে টাক, গলদেশে যজ্ঞসূত্র, পরিধান ময়ূরকণ্ঠী চেলী, কটিদেশে সেই বর্ণের দোজা বাঁধা।

রামচরণের মুখে চুপি চুপি পরিচয় শুনিয়া, সেই ব্রাহ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার চরণে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়ার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। ব্রাহ্মণকে তিনি চিনিতেন না, প্রণাম করা দেখিয়া আপন মনে অস্পষ্টস্বরে কি গুটিকতক কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, হয়ত আশীর্ব্বাদ, না হয়ত পরিচয় জিজ্ঞাসা। শেষের ভাবনাটাই ঠিক বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন।

কি যে সে পরিচয়, একটু পরে তাহা আমরা ভাঙ্গিয়া দিব।

ব্রাহ্মণটি কৃষ্ণপ্রিয়ার আশীর্ব্বাদ পাইলেন, আদর পাইলেন, বাড়ীতেই রহিলেন।

পঞ্চমী আগত। ব্রাহ্মণটি আবশ্যক মত খরচপত্র দিতেছেন, পূজার আয়োজনের বন্দোবস্ত করিতেছেন, ফর্দ্দ করিতেছেন, সর্ব্বদাই ব্যস্ত। প্রতিমা চিত্র করা হইয়াছে, সাজান হইয়াছে, ভগবতীর যুগলহস্তে যুগল পদ্মফুল দেওয়া হইয়াছে, ক্রোড়স্থ গোপালের মস্তকে চূড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, কপালে অলকাতিলকা, নাসিকায় নোলক, গলে বনমালা, কটিদেশে বনফুলের কোমরপাটা, হস্তে বাঁশরী।

কারিকরকে অথবা সাজকরকে কৃষ্ণপ্রিয়া কোন কথা বলিয়া দেন নাই; অথচ তাঁহার মানস-সাগরের যে প্রকার ভক্তি-তরঙ্গ, প্রতিমাখানি ঠিক তদনুরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রিয়ার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, আনন্দের উপর আনন্দ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অর্চ্চনা।

পঞ্চমী-যামিনী প্রভাত হইল। ষষ্ঠিপ্রভাতে বাড়ী লোকারণ্য। ভারে ভারে জিনিষপত্র আসিতেছে, অগণিত মজুর নানাকার্য্যে ছুটাছুটি করিতেছে, পাঁজী পুঁথি লইয়া দুইজন ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন, পাচক ব্রাহ্মণ, মিঠাইকর, পরিচারিকা প্রায় বিংশতি। কোন কার্য্যে কোন লোকের অভাব রহিল না; বাদ্যকর সম্প্রদায় আগমনী তালে বাদ্যধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিল, সাঁনাই ওয়ালারা সুমধুর সুরে ললিত রাগিণীতে আগমনী গীত ধরিল। আনন্দে কৃষ্ণপ্রিয়ার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত।

নবাগত ব্রাহ্মণটি সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে শত শত ব্রাহ্মণ আহার করিতে লাগিলেন, দীন দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র-বিতরণ আরম্ভ হইল।

ষষ্ঠিতে অধিবাস। বোধন ও সংকল্প সম্পন্ন হইল। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিনদিন ষোড়শোপচারে মহামায়ার পূজা ও মহাসমারোহে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের

পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, করপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া গদগদচিত্তে মুক্তকণ্ঠে ভগবতী স্তব করিলেন :—

মা তুমি মা ব্রহ্মময়ি বিশ্বের জননী।
জগতজননী নাম বিখ্যাত অবনী॥
গিরিপুরে মা তোমার জন্ম হয়েছিল।
গিরিরাণী মা তোমার লোকে বলেছিল॥
মেনকা তোমার মাতা ছিল একদিন॥
সে দিন নাহিক এবে মম শুভদিন।
মেনকা বাঁচিয়া নাই, গিরিরাজা নাই।
আজি আমি মা তোমার মা হয়েছি তাই॥
লোকেরা কামনা করে, মা তোমার কাছে।
ধন, পুত্র, যশ, মান, এই সব যাচে॥
মা হয়ে বসেছি, আজি আমি মা তোমার।
সে সব কামনা আমি জ্ঞান করি ছার॥
কিছু নাহি চাই মাগো কিছু নাহি চাই।
কেবল কামনা মম তোর দেখা পাই॥
শান্তি মুক্তি যতকিছু আছে এ সংসারে।
মানা করি সে সকল দিওনা আমারে॥
মুক্তির পিপাসী আমি নহি কাত্যায়নি।
শান্তি যদি দিতে হয় দিওগো জননী॥
মা হই যা হই তবু এই আকিঞ্চন।
মাথায় তুলিয়া দিও মাতুল চরণ॥
তা বিনা অসার ধনে প্রয়োজন নাই।
চরণে রাখ মা যদি তবে শান্তি পাই॥
বৃন্দাবনে গোষ্ঠমাঝে কৃষ্ণ কোলে করি,
স্তন দিয়েছিলে মুখে তুমি শুভঙ্করী ;
কৃষ্ণ ভালবাস তুমি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে,

যিনি কৃষ্ণ তিনি তুমি বুঝিয়াছি মনে,
তবু আজি দুর্গা বলে এনেছি ভবনে।

যাও দুর্গা, ঘরে যাও, এসো মা আবার।
স্নেহভরে মা তোমারে করি নমস্কার ॥
জানিয়াছি ভিন্ন নও কৃষ্ণ আর তুমি।
তাই জেনে ত্যজিয়াছি বৃন্দাবন ভূমি ॥
যেই কৃষ্ণ সেই তুমি জানিয়াছি সার।
তাই আমি কৃষ্ণ কোলে দিয়াছি তোমার ॥
দুইরূপে এক হয়ে কর মোরে দয়া।
বুঝিয়াছি সব তুমি কাশী, গঙ্গা, গয়া ॥
সর্ব্বধন সার ধন তোমার চরণ।
মা হয়ে নিয়েছি তাই তোমার শরণ ॥
শিবের হৃদয় ধনে আমি অধিকারী।
সদা শিবে কব আমি ওপদ আমারি ॥
যাও মা কৈলাসধামে শান্তি নিকেতনে।
দাসী হয়ে ভক্তি মম যাবে তব সনে ॥
মা কর করুণাময়ী এই ভিক্ষা চাই।
অন্তকালে ওচরণে স্থান যেন পাই ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভৌতিক কাণ্ড। বংশীধারী।

স্তব সমাপ্ত হইল। অপরাহ্নে নদীজলে প্রতিমা-বিসর্জ্জন। পূজার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সুন্দর হইল, কেবল বলিদান হইল না।

প্রতিমা বিসর্জ্জন। সেই রাত্রে সব আবার খাঁ খাঁ। তত লোকজন আসিয়াছিল, তাহারা আর কেহই নাই। কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেমন করিয়া কোথায় গেল, কৃষ্ণপ্রিয়া তাহা জানিলেন না। সকলেই গেল, রহিলেন কেবল সেই ব্রাহ্মণটী। নিশাশেষে তিনিও অদৃশ্য। বাড়ীতে কেবল গৃহিণীর সঙ্গিনী

ব্রাহ্মণটির পরিচয় এইখানে যথাশ্রুত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক। অগ্রে আপনারা জানিয়া রাখুন, ব্রাহ্মণটির মুখখানি ঠিক জনার্দ্দন ঠাকুরের মুখের মতন। পাড়ার প্রাচীন লোকেরা সেই মুখখানি দেখিয়া একটি প্রাচীন গল্প তুলিয়াছিলেন। জনার্দ্দন ঠাকুরের একটি ছোট ভাই ছিল, তাহার নাম বংশীধারী। জনার্দ্দনের বিবাহের অগ্রে ষোড়শ বর্ষ বয়সে সেই ভাইটি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; কেহ বলে, যোগী হইয়াছে, কেহ বলে, সন্ন্যাসী হইয়াছে, কেহ বলে, মরিয়া গিয়াছে। গয়াধামের একজন যাত্রী একবার বলিয়াছিল, "জনার্দ্দনের ভাই বংশীধারীঠাকুর গয়াক্ষেত্রের এক বৃক্ষতলে মরিয়া রহিয়াছে, সন্ন্যাসীর বেশ; জনার্দ্দনের মতন মুখ দেখিয়া আমি তাহাকে চিনিয়াছিলাম।"

বংশীধারী নিজেও অমাবস্যার রজনীতে কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন, "আমি তোমার দেবর, আমার নাম বংশীধারী; লোকে বলে, আমি মরিয়াছি, কিন্তু আমি আসিয়াছি।"

বংশীধারী মরিয়াছে, গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকের এইরূপ বিশ্বাস, তাহাকে সজীব মূর্ত্তিমান দেখিয়া অনেক লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণপ্রিয়ার সে বিশ্বাস হয় নাই। বিজয়া দশমীর শেষরাত্রে তিনি যেন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, বংশীধারী চকিতমাত্র একবার দেখা দিয়া, হাসিয়া হাসিয়া করতালি দিতে দিতে বলিয়া গেল,—"দুর্গা আসিল, পূজা হইল, লোক আসিল, ঘটা হইল, সব হইল, সব কিন্তু ভৌতিক কাণ্ড! আমিও একটি ভূত!"

কৃষ্ণপ্রিয়া শিহরিলেন, তাঁহার দেবর ভূত হইয়া আসিয়াছিল, ইহা মনে করিয়া তিনি আগাগোড়া সকল ঘটনা ভাবিলেন, সকালবেলা শ্যামার মাকে বলিলেন,—"শ্যামার মা! ভোরে একজন ভূত বলিয়া গেল, সমস্তই ভৌতিক কাণ্ড! হয় হউক ভৌতিক কাণ্ড, দুর্গা ভক্তি কদাচ ভৌতিক কাণ্ড হইবে না। যতদিন বাঁচিব, দুর্গাভক্তির সহিত কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে পোষণ করিব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভক্তি-সমন্বয়।

শ্যামাপূজার সময় জনার্দ্দন ঠাকুর গৃহে আসিলেন, দালানের নব সংস্কার দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। কৃষ্ণপ্রিয়ার মুখে তিনি শুনিলেন, দালানে দুর্গাপূজা হইয়াছে। পাড়ার লোকের মুখে তিনি শুনিলেন, বড় বড় রাজাদের দুর্গা পূজায় যেরূপ ঘটা হয়, কৃষ্ণপ্রিয়ার পূজায় তার চেয়ে বেশী ঘটা হয়েছিল।

ব্যাপার কি, জনার্দ্দন ঠাকুর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিন দিন পরে কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"মা দুর্গা এসেছিলেন, আমি মা দুর্গার মা হয়েছি, দুর্গার কোলে একটি কৃষ্ণ দিয়েছিলেম, লক্ষ লক্ষ ভূত আমার দুর্গাপূজায় কাজ কোরে গিয়েছে—তোমার ভাই এসেছিল, বংশীধারী, সেটিও ভূত। ভূত ঠাকুরপো আমায় বলে গেছে, সমস্তই ভৌতিক কাণ্ড! ঠিক কথা। আমার মা দুর্গাই ভূত এনেছিলেন। মহেশ্বরের নাম ভূতনাথ কিনা, তাঁর সঙ্গে অনেক ভূত বেড়ায় কিনা, তাদেরই মধ্যে গোটাকতক ভূত মা দুর্গার সঙ্গে এসেছিল। পূজার সময় তুমি এখানে থাক্‌লে দুর্গা তোমাকে দুর্গা ভক্তি দিতেন।

স্ত্রীপুরুষে দুর্গাভক্তি লইয়া অনেক কথা হইল। কৃষ্ণপ্রিয়া দৃঢ়সংকল্পে দুর্গাভক্তির সহিত কৃষ্ণভক্তি মিশাইলেন, স্বামীকেও দুই ভক্তি শিক্ষা দিলেন। জনার্দ্দন ঠাকুরের চক্ষু ফুটিল; প্রেমের আবেশে তিনি গাহিয়া উঠিলেন :—

"হৃদয়রাস মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
হয়ে বাঁকা, দেমা দেখা, তোর শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীত ধড়া,
মাথায় পর মা মোহন-চূড়া, চরণে চরণ থুয়ে॥
নরশির মুণ্ডমালা, খুলে পর মা বনমালা,
কালী ঘুচে হ মা কালা, ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে॥
হৃদ্ মাঝারে কালশশী, দেখতে বড় ভালবাসি,
অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী, ওগো ও পাষাণের মেয়ে॥"

করতালি দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া প্রেমানন্দে কহিলেন,—"এই ভাবে মজিয়া থাকো। কালীকে কালা সাজাও, কালাকে কালী সাজাও, শান্তি পাইবে।"

হইতে লাগিল, কৃষ্ণপূজার পর্ব্বও বাদ থাকিল না, উৎসবে উৎসবে পর্ব্ব-মহোৎসব। দুর্গাপূজার সময় দ্বিতীয় বৎসরে জনার্দ্দন একবার কৃষ্ণপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মা দুর্গার এমন মূর্ত্তি কেন?" কৃষ্ণপ্রিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "দশভূজা, দশাস্ত্রধারিণী, দৈত্যদলনী বিরঙ্গনা মূর্ত্তিতে আমার কিছু ভয় হয়, সেই জন্য এই শান্ত মূর্ত্তি করিয়াছি, এবং শান্তিময় শিশু কৃষ্ণকে কোলে দিয়াছি।"

প্রণাম করিবার বাধা না থাকিলে জনার্দ্দন তখন নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রিয়াকে প্রণাম করিতেন। প্রণামটি বাদ গেল না, দুর্গার উদ্দেশ্যে সেই প্রণাম অর্পিত হইল।

একটি শেষ কথা।—প্রতি বৎসর মহাষ্টমীর রাত্রে একটি ভূত আইসে, কৃষ্ণপ্রিয়া দেখিতে পান, জনার্দ্দন দেখিতে পান না। ভূতটি সেই কৃষ্ণপ্রিয়ার ভূতঠাকুর পো বংশীধারী।

—:•:—

মা দুর্গার আমন্ত্রণ।

এসো মা!

আসিছ আনন্দময়ি! এসো মা ঈশানি!
ভক্তিভরে নেহারিব শ্রীপদ দু-খানি॥
যে পদ হৃদয়ে জাগে দিবা-বিভাবরী,
নিরখিব সেই পদ মনঃপ্রাণ ভরি॥
ইহ বঙ্গে মা তোমার শুভ আগমনে,
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ভকতের মনে।

অন্ধকার বঙ্গধাম, বরষ-ব্যাপিয়া,
থাকে মা, আঁধারে ঢাকা, নিরাশ হইয়া,
বৎসরান্তে তিন দিন সেই অন্ধকার—
দূরে যায়, পাদপদ্ম হেরিয়া তোমার।
আনন্দে নাচিয়া উঠে শরতের চাঁদ,
তিনদিন আমাদের মানসে আহ্লাদ;
আহ্লাদে আনন্দময়ি ডাকি মা তোমারে,

রোগে শোকে জরাজীর্ণ বঙ্গবাসীগণ—
আনন্দে নাচিবে, পেয়ে তব দরশন ;
চির অন্ধকার যথা, সবে ম্রিয়মান্,
তিনদিন আলো পেয়ে জুড়াইবে প্রাণ।
হাসিছে প্রকৃতি সতী সুখের শরতে,
শোভাময় এই ঋতু শরতে মরতে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ হাসিবে সবাই,
বর্ষকাল যাহাদের হাসি দেখি নাই,
তারাও হাসিবে সবে তব আগমনে,
বিরাজিবে পূর্ণানন্দ বঙ্গ-নিকেতনে।

এইত শরৎ ঋতু, সুখের আশ্বিন,
পরিষ্কার দশদিশি থাকে নিশিদিন ;
নির্ম্মল বরষা বায়ু, আকাশ নির্ম্মল,
অমল নির্ম্মল সব সরসীর জল,
গগণে শরৎচন্দ্র নির্ম্মল কিরণে—
জুড়াইছে ভাসাইয়া কুসুম কাননে ;
কেশে ফুল ফুটিয়াছে, আলো করি বন,
তোমারে করিছে যেন চামর বীজন ;
ফুটেছে কেতকী ফুল, বিতরিছে বাস,
ফুটেছে কামিনী বধু, মৃদু মৃদু হাস ;
ফুটিয়াছে শেফালিকা, হাসিয়া কৌতুকে,
তরুশিরে নব শোভা, হাসিফুলমুখে।
সকলি ত শোভাময়, স্বভাব সুন্দর,
এই ত মা আসিবার শুভ অবসর।
বর্ষে বর্ষে এসে থাকো, শারদ আশ্বিন,
তাই মোরা পথ চেয়ে গণিতেছি দিন !
এস মা আনন্দময়ি পূজিব তোমায়,
কি দিয়ে পূজিব মা-গো কি আছে ধরায় ?

যা আছে ধরণী মাঝে, সকলি তোমার,
তোর বস্তু তোরে কি মা দিব উপহার?
দিব না দিব না মাগো তা কভু দিব না,
(কল্পনাতে সে কথাটা কভু ভাবিব না।)
যা দিয়ে পূজিব তব অভয় চরণ,
যতনে সঞ্চয় করি রেখেছি সে ধন।
প্রক্ষালিব গঙ্গাজলে শ্রীপদ তোমার,
তোমার স্থাপিত আত্মা দিব উপহার;
ভকতি চন্দনে মাখি হ'য়ে কুতুহলী—
মানস-কুসুম-পদ্ম দিব পুষ্পাঞ্জলি।
এই মাত্র পূজা জানি রাখিয়াছি মনে,
চাহিও করুণাময়ি, করুণানয়নে॥
দিতে হয় ধনধান্য, দিও মহেশ্বরী,
আমি কিন্তু সে সকল কামনা না করি।
তব পদে ভক্তি যেন থাকে চিরদিন,
ভুলেও না হই যেন ভকতি বিহীন।
তাই ডাকি ভক্তিভরে, কর মা শ্রবণ,
কৃপা করি কৃপাময়ি দেহ দরশন।
প্রণমি শ্রীপাদপদ্মে শত শত বার,
এস মা আনন্দময়ী হৃদয়ে আমার॥

ঈশ্বর উদ্দেশে মনের উচ্ছ্বাস।

লেখিকা—শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ঘোষ।

ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা হইলে, গাছের গোড়ায় জল দিলে ফল পাওয়া যায়—গাছের পত্রে, কিম্বা শাখায় জল দিলে, কোনও ফল হয় না। সেইরূপ, মৃত মাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, মা বলিয়া ডাকিলে, মায়ের দেখা মিলিবে না। মাকে

দেখিতে হইলে ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, তাঁর চরণে নিজের প্রার্থনা জানাইতে হইবে। তাহা ভিন্ন অন্য উপায় আর কিছুই নাই। মানুষের যদি কোন দ্রব্য হারায় বা চুরি যায়, তাহাহইলে সে দ্রব্যের নাম ধরিয়া ডাকিলে, কখনও তাহা আপনা হইতে আইসে না, সে দ্রব্য যে চোরের অধীনে থাকে, সেই চোরের সন্ধান জানিয়া ধরিতে পারিলেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সেইরূপ, কষ্ট স্বীকার করিয়া চোরের উদ্দেশ করা চাই, চোর ধরিতে চেষ্টা করা চাই, যদি অনেক লোকের মধ্য হইতে কিছু চুরি যায়, তাহা হইলে চোর ধরা বড় কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু যদি একজন লোকের কাছে থাকিতে চুরি যায়, তাহা হইলে চোর জানিতে পারা খুব সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু, তাহাকে ধরিবার জন্য একজন ভাল গোয়েন্দার দরকার হয়। সেই জন্য "সৎ গুরু"রূপী গোয়েন্দা দ্বারা সেই মনচোরা, সকল সুখশান্তিময় সেই শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্মকে ধরিতে হয়। তাঁহাকে একবার ধরিতে পারিলে, তখন আপন হারাণ জিনিষ পাইতে বাকি থাকে না।

মানুষ সর্ব্বদা অনিত্য বিষয় লইয়া মত্ত থাকে, অনিত্য ধনই ভালবাসে, কিন্তু ভুলেও একবার সেই পরমাত্মরূপী ভগবান নিত্য ধনকে ভাল বাসে কি? সেই-জন্য, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে, সর্ব্বদা ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইয়া, নানা দুঃখ ভোগ করে। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা তাঁহার ভজনা করিতে হয় তাহা হইলেই ভগবানেরও ভালবাসা লাভ করিতে পারা যায়।

বিশুদ্ধ প্রেম কি রূপ? যাহাকে কখনও দেখি নাই, তাহাকে কি করিয়া ভালবাসিব? আমি যদি একজন অপরিচিত লোকের পত্র পাই ও সেই পত্রে তাহার পরিচয় সকল জানিতে পারি, তাহা হইলে সে অপরিচিত লোক হইলেও, তাহার বিষয় অনেক জানা হইল। সেইরূপ অপরিচিত শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিসৃত "গীতা"কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও তাঁহাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

একটা বাড়ীতে একজন খুব সুন্দর পুরুষ, কিম্বা খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে, কিন্তু তাহাকে চক্ষে দেখি নাই, নিশ্চয়ই আছে, এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, তাহাকে দেখিবার একান্ত ব্যাকুলিত হয় ও তাহাকে পাইবার জন্য সকল ত্যাগ করিয়া, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ করিয়া, কি করিয়া তাঁহাকে পাইব, এই রূপ প্রাণের টান হয়, এই আসক্তিকে প্রেম বলে, ইহাকে ঈশ্বরকে ভালবাসা বলে। এইরূপ সামান্য হৃদয়বান মনুষ্যকে ভালবাসিলে সেও ভাল না বাসিয়া থাকিতে

পারে না,—একটা পশুকে ভালবাসিলে, সেও তাহা বুঝিতে পারে ও বশীভূত হয়। তখন, সেই মহৎ প্রেমময়, মনোময়, সকল হৃদয়ের অধীশ্বর ও প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিলে, তিনি কি ভালবাসার প্রতিদান না দিয়া থাকিতে পারেন ? তাঁহার প্রেমলাভ করিলে, আর ত্রিলোকে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। তিনি স্নেহচক্ষে দেখিলে কিছুই অভাব জানিতে পারা যায় না, কিছুরই জন্য ভাবনা করিবার কারণ থাকে না।

সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের কাতর ভাব ও ব্যাকুলতাকে ভক্তি ও প্রেম বলে। সর্ব্বক্ষণ এইরূপ ইচ্ছা বলবতী রাখিতে হইবে, কদাচ মনের মধ্যে কোনও কামনাকে স্থান দিবে না, মনে কোনও আকাঙ্ক্ষাই রাখিবে না। তাঁহাকে সর্ব্বদা বলিবে যে, "হে প্রভু! ত্রিলোকের সৌন্দর্য্য চাহি না, সুখ-ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহি না, চাই কেবল তোমার শান্তিময়চরণে স্থান।" ইহা ভিন্ন আর কিছু কামনা করিবে না। এইরূপ সংযম দ্বারা, মনকে সর্ব্বক্ষণ আত্মবশে রাখিবে, সংসারের কোনও বিষয়ে আসক্তি রাখিবে না। অস্থায়ী বিষয়ে মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিবে না। সকলেই তোমাকে ফেলিয়া পলাইবে। যাহাকে প্রাণমন দিয়া, সংসারের সার জ্ঞান করিয়া, ভালবাসিয়া থাক, সেও একদিন তোমাকে ছাড়িয়া নিজ কর্ম্ম-পাশের অধীন হইয়া, কোথায় চলিয়া যাইবে, তুমি তাহা কিছুই জানিতে পারিবে না, তখন তোমার দুঃখে সে দুঃখী হইবে না, কিম্বা তোমার সুখও তাহার অনুভব হইবে না। তাহাকে ডাকিলেও আর দেখা পাইবে না, তখন সে আর অনিত্য বিষয়ে আবদ্ধ থাকিবে না। পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধব সকলেই অস্থায়ী। এ সব হইতে মনকে দূরে রাখিবে।

তবে কি সংসার ত্যাগ করিতে হইবে ? না, তাহা নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিতে পারিলে ভগবানকে অসন্তুষ্ট করা হয়। যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। সে জন্য তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মগুলি তাচ্ছল্য করিবে না।

যেমন সূর্য্য অস্ত না হইলে, চন্দ্রের উদয় হয় না, সেই রকম কর্ম্ম-সূর্য্য অস্ত না হইলে কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হয় না। আপন কর্ম্মবশে মানুষ সংসারে আসে ও কর্ম্ম অন্তে চলিয়া যায়। যেমন কর্ম্ম করিয়া যায়, আবার সেইমত ভোগ করিতে জন্ম লয়, কিন্তু ভগবানকে মনে মনে সকল কর্ম্ম সমর্পন করিয়া জীবন কাটাইতে পারিলে

অন্তিম সময় উপস্থিত হয়, তখনি কর্ম্ম-সূর্য্য অস্ত হইয়া যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হন। তখন ভক্তের আর আনন্দের সীমা থাকে না। যাঁহার নাম করিলে, সকল জ্বালা জুড়াইয়া হৃদয়ে অপার শান্তি লাভ হয়, তাঁহাকে সাক্ষাতে পাইলে, যে, সে সময় কি রকম আনন্দ প্রাণে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অনুভব করিলে ত্রিভুবনের সুখ ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয়। কর্ম্ম-সূর্য্য অস্ত হইলে পর যখন শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া, সোহাগ করেন ও তাঁহার অনন্ত হৃদয়ে লইয়া ভক্তের প্রাণ শীতল করেন, তখনি সকল কামনার নিবৃত্তি হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভগবান পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে, শালগ্রাম শিলাকে পূজা করেন, কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ পাইলে, আর সে পূজার কোনও দরকার হয় না। সেই রকম, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী নারায়ণস্বরূপ এবং নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীপূজাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু সেই নারায়ণকে সাক্ষাতে পাইলে, আর কিছুই অভাব বা প্রয়োজন থাকে না।

যাহাতে কোন উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ না করিয়া, তাঁহার উপর একাগ্র মন দিতে পারা যায়, সেইরূপ চেষ্টাই করা উচিত। স্বামীও চিরস্থায়ী নহেন, অনেক পতিব্রতা রমণী বিধবা হইয়া, স্বামীসেবা হইতে বঞ্চিত হন। তখন কেবল মধুসূদন বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, যখন সেই ভগবান নিত্য ধন ভিন্ন জীবের অন্য গতি আর কিছুই নাই, তখন আর অনিত্য বস্তু লইয়া, কেন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি? সর্ব্বদা মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে চিন্তা করাই মনুষ্য জীবনের উত্তম কার্য্য। হায়! অবোধ জীব! তাহা না করিয়া, সর্ব্বক্ষণ সংসারের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কখনও হাসিতেছ, কখনও কাঁদিতেছ, শোক, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, জরাপূর্ণ বসুন্ধরায় সর্ব্বদাই অশেষ রকম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছ, ভুলেও কি একবার তাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাক? তাহা তো দূরে থাক্‌, আবার এই অনিত্য জীবনে ধর্ম্মশূন্য হইয়া, কেবল পাপ কাজ লইয়াই মত্ত হও, পাপকর্ম্মে অতিশয় আনন্দ অনুভব কর, পরিণামে যে বিষময় ফল ভুগিতে হইবে, তাহা কি একবারও চিন্তা করিয়া থাক? সময় থাকিতে সাবধান হওয়া কি উচিত নহে? মনুষ্য-জীবন কয়দিনের জন্য? পদ্মপত্রের জলের ন্যায়, সর্ব্বদা চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ও সুখের আবার অহঙ্কার কি আছে? আমার আমার করিয়া, সর্ব্বদা কেন ব্যস্ত হও? যাহাতে সৎপথে থাকিয়া কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় তাহাই করা কি উচিত নহে? একথা সকলেই জানে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত খুব কম লোকেই করিয়া থাকে। যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অপারগ হও, তাহা হইলে

একান্ত অন্তরে তাঁহারাই স্মরণ লও, তিনি দয়াময়, ক্ষমাময়, নিশ্চয়ই তোমায় ক্ষমা করিয়া, মুক্তি দিবেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু হয়, সে পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, দমন করিয়া ভগবানকে প্রাণভরিয়া ভালবাস। যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার নাম ও প্রশংসা শুনিলে, যেমন মনে আনন্দ হয়, সেইরূপ, তাঁহার নাম কীর্ত্তন শুনিয়া মনে একান্ত আনন্দ অনুভব করিলে, দেখিবে, তোমার কোন অভাব থাকিবে না, সদা সর্ব্বদা অনির্ব্বচনীয় সুখে আত্ম বিভোর হইয়া থাকিবে,—সংসারের কোনও সুখ দুঃখে হৃদয় চঞ্চল হইবে না,—মনে কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। প্রাণ ভরিয়া মধুসূদন বলিয়া ডাকিবে। তাঁহাকেই জীবনের লক্ষ্য করিবে। দেখিবে, মনে অপার আনন্দ লাভ করিবে। তোমার পিতামাতা, স্বামীপুত্র ও ভ্রাতাভগ্নি, বন্ধুবান্ধব ধনরত্ন অতুল ঐশ্বর্য্য কিম্বা শরীরের স্বাস্থ্য এই সকল হইতেও যে শান্তি লাভ করিতে পার না, তাহাই স্থায়ীরূপে লাভ করিবে। সর্ব্বদা মনে মনে বলিবে, "হে গোবিন্দ! তোমারেই আমার এই অসার জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছি। এই সংসার রূপ মহাসমুদ্রে আর কভু পথহারা হব না।"

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব না কো পথহারা॥"

এক মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে চিন্তা করার নাম যোগ। অভ্যাসের দ্বারা এই যোগ লাভ করা যায়। তাহা হইলে সংসারের কোন সুখ দুঃখে চিত্ত বিচলিত হয় না,—মনে কোনও কামনার উদয় হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মন সহজে কামনা ছাড়িতে পারে না। সেই জন্ত, সকল কামনা তাঁহার উপর রাখিতে হইবে, তাঁহাকে এইরূপ প্রাণের ভাব জানাইতে হইবে,—"হে গোবিন্দ! আমি পিতামাতার স্নেহ, ভাইভগ্নির ভালবাসা ও পতিপ্রেম সকলই যেন তোমারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও স্বামী সকলই অস্থায়ী। তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসা চিরস্থায়ী নহে। দিন কতক সুখ, তার পর, চিরজীবন দুঃখ পাইতে হয়। সে রকম পদ্ম-পত্রের জলের স্তায় চঞ্চলসুখ প্রার্থনা করি না। তোমার অনন্ত প্রেমে যেন আমার সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, আমি যেন শান্তি প্রাপ্ত হই। বিষয়-ঐশ্বর্য্য ধনরত্নকে মানুষ সুখ বলিয়া থাকে। আমি বিষয়, ঐশ্বর্য্য, ধনরত্নকিছুই চাহি না। তোমার যে চরণে কাষ্ঠ-তরী স্বর্ণ হইয়াছিল, আমি সেই স্পর্শ রতন

চরণযুগল চাই। তাহা ভিন্ন অন্য ধনরত্নে আমার প্রয়োজন নাই। এই প্রকার হই-লেই ধন জন হইতে মন নিবৃত্ত হইবে, তখন এক মনে, এক প্রাণে, তাঁহার চিন্তা করিতে পারিবে। সে চিন্তায় যে সুখ-শান্তির উদয় হইবে, তাহাই ভগবানের কৃপা বলিয়া জানিবে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইরূপে মনস্থির করিয়া কাটাইতে পারিলে, আর কোন ভয় থাকিবে না,—দুরন্ত কৃতান্ত ভয় পর্য্যন্ত দূরে পলাইবে,—দেহান্তে আত্মা চির-সুখে, চির-শান্তিতে বিভোর হইবে। তাই বলি এমন সুখের পথ থাকিতে, কেন বিপথে পড়িয়া, ইহজীবনে কষ্ট ও দেহান্তে চির-নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে? মন! তাঁহাকে একদিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য, বিস্মৃত হইবে না। তাহা হইলে তোমার ভার তিনিই লইবেন,—তোমার নিজের জন্য তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না। যতক্ষণ মানুষ আপন ভাল মন্দ আপন চেষ্টায় করিতে যায়, ততক্ষণ তিনি কিছুই করেন না। মানুষ যখন সমস্ত ভার তাঁর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তখন তিনি আপনি তাহার শুভাশুভ দেখেন। কুরুসভায় দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার প্রয়াস পায়, দ্রৌপদী তখন শ্রীমধুসূদন রক্ষা কর, লজ্জা নিবারণ কর, বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, দুই হস্তে পরিহিত বস্ত্র চাপিয়া ধরিয়াছেলেন। ভগবান তখন কোনও সাহায্য করেন নাই। কিন্তু দ্রৌপদী যখন নিজবস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া, দুই হাত উপর দিকে তুলিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মধুসূদন রক্ষা কর, লজ্জা নিবারণ কর, বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখনি সকল ভার ভগবানের উপর দেওয়া হইল। আর নিজের চেষ্টা কিছুই করা হয় নাই, দেখিয়া ভগবান কৃপা করিলেন, ভগবান তখন নানাবর্ণের বস্ত্র দ্বারা, তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। ভগ-বানের দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমাদের উপর আছে। তিনি আমাদের নিকটেই রহিয়া-ছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা নাই বলিয়া, দেখিতে অক্ষম; মৃত্তিকাতে, শূন্যে, পথে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহা আমরা দেখিতে অক্ষম, আমাদের কাছে থাকিলেও, আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা, তাহা আমরা দেখিতে পাই,—তেমনি ভগবানকে দেখিতে হইলে, ভক্তিরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানমার্গ কঠিন সাধন। ভক্তিমার্গ সহজ, সরল পথ। কতকগুলি ছেলে তাহাদের বাপের সঙ্গে কোন একটা পিচ্ছিল স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, সে স্থানটি এত পিচ্ছিল যে, সেই সকল বালক পড়িয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোন কোন বালক নিজ ক্ষমতায় তাহার পিতার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে ছিল, কেহবা ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়া

কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মধ্যে যে চতুর ছেলে, সে দৌড়িয়া তাহার বাপের হাত ধরিল, কেহ কাতরভাবে তাহার পিতাকে ডাকিতে লাগিল। তিনি কাতর ক্রন্দনে অধীর হইয়া, সেই ছেলেটিকে ধরিলেন, সেটি শত পিছিলেও আর পড়িল না। কিন্তু যেটী নিজে তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহার আপন ক্ষমতা যতটুকু, ততটুকু চলিয়া, অবশেষে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পিতা তো তাহাকে ধরেন নাই, সে নিজ ক্ষমতায় ধরিয়াছিল, ক্ষমতা ফুরাইলেই পড়িয়া গেল। কাতর-ক্রন্দনে ডাকিলে ভগবান যখন দয়া করেন, তার চেয়ে আর কিছুই বেশী নহে। তাই বলি, জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ব্যক্তিরও ভ্রম হইয়া থাকে,—তাঁহাদেরও পতন হওয়া সম্ভব; কিন্তু ভক্তিমান ও প্রেমিক কখনও পতিত হয়েন না।

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ঘোষ।
৭১।১ সিম্‌লা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শেফালিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম।

হাসিছে প্রভাত রবি! বিগতা শর্ব্বরী
শেফালিকা! কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জিছে ভ্রমর!
দেখ প্রকৃতির মুখ! দেখ কি সুন্দর
কমল সরসে! তুমি কেন ভূপতিতা মরি!
বল কোন্ পাপে ওগো নিশি-সহচরী,
এ হেন অদৃষ্ট তব! ও স্নিগ্ধ-সুবাসে
হয় নি কি মোহমুগ্ধ সমীর উল্লাসে
রজনীর বাসর-শয়নে! চিত্ত হরি
শোভ তুমি! তব দেহ পড়ে তৃণাসনে
অযতনে; হের ওই অতসীর হাসি
মধুময়! নিরখিয়ে রক্তিম তপনে
ফুটিছে প্রসূনপুঞ্জ সুখসরে ভাসি।
তুমি শুধু বনসখি তিতি আঁখিজলে,
বাল-বিধবার বেশে লুটিছ ভূতলে!



আগমনী।

হিমালয়ে রাজারাণী।

কাতরে মেনকা রাণী কন্ গিরিবরে,
উমারে না হেরে প্রাণে ধৈরজ না ধরে ॥
ঘরের মাণিক মম তনয়া রতন,
না হেরিয়া দিবানিশি ঝরিছে নয়ন।
বর্ষাবধি না নিরখি সে বিধু বয়ান,
কাতরা হয়েছি বড়, কাঁদিতেছে প্রাণ ॥
এসেছে শরৎ ঋতু, প্রকৃতি নির্ম্মল।
মঙ্গলার আগমনে হইবে মঙ্গল ॥
তাই আমি ভাবি শুধু তুমি গিরিবর,
কিছুই ভাবনা ছি ছি! পাষাণ অন্তর!
জন্মদাতা পিতা হয়ে পাষাণ হইয়া—
ভিখারী হরের করে দিয়াছ সঁপিয়া!
ষাড়ে চোড়ে ফেরে শিব, শ্মশানে নিবাস,
বাঘছাল প'রে থাকে, নাম কৃত্তিবাস;
ছাইভস্ম মেখে রয়, গায় মর সাপ,
নাম শুনে ভয় করে, বাপ বাপ বাপ!
সেই শিবে উমাধনে করেছ অর্পণ,
ভ্রমেও ভাব না, বাছা রয়েছে কেমন!

ভুলে গেছে মা আমার হাস্য পরিহাস,
আমার উমার নাকি নিত্য উপবাস!
লোক মুখে কত শুনি, কি কব তোমারে,
সাপুড়ে ভূতুড়ে বরে দিয়াছ বাছারে!
নিঠুর পাষাণ তুমি, কি কব অধিক,
ভুলেও কর না নাম, ধিক্ ধিক্ ধিক্!
বর্ষ শেষ হয়ে গেছে, শরৎ এসেছে,
শরতের চাঁদ পেয়ে যামিনী হেসেছে।

আমি কবে কোলে পাব উমা পূর্ণচাঁদ?
কবে মেনকার প্রাণে ঘুচিবে বিষাদ?
তাই ভেবে গিরিরাজ, নিশি দিন যায়,
কবে এনে দিবে বল প্রাণের উমায়?
যাও গিরি, ত্বরা যাও, শিব নিকেতনে,
বাঁচাও আমার প্রাণ, আনি উমা ধনে।

গিরি।—শিব নিকতনে যেতে বলিতেছ রাণি,
গৌরী বিনে অন্ধকার আমি কি না জানি?
উমা তরে কাঁদে না কি আমার পরাণ?
সত্য কি হৃদয় মম এতই পাষাণ॥
তা নয়, তা নয়, রাণি তা নয়, তা নয়,
তোমার হৃদয় সম আমার হৃদয়।
কিন্তু কি করিব বল, স্বভাবে অচল,
চলিবার শক্তি নাই, ইন্দ্রিয় বিকল।
সকলি জানত রাণি, অশক্তি আমার,
তবু কেন করিতেছ বৃথা তিরস্কার?
বিধাতা করেছে মোরে অচল শিখর,
প্রকাণ্ড অচল গিরি মম কলেবর;
কেমনে যাইব বল প্রাণের ঈশ্বরি!
তোমারি নিকটে আমি এই প্রশ্ন করি।

মেনকা।—রাজা তুমি গিরিরাজ, রাজবুদ্ধি ধর,
অবলারে ভুলাইতে কত ছল কর।
মনে কি পড়ে না তব কে সে ত্রিনয়না ?
সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী তাও কি জাননা ?
দুর্গা নাম রাখিয়াছি দুর্গতি তারণে,
সেই নাম সার হয় জানে বিশ্ব জনে।
তুমি কি জান না গিরি, সে নামের ফল ?
তপ, জপ, হোম যজ্ঞ সব কি বিফল ?
দুর্গানামে যদি তব অচলত্ব থাকে,
দুর্গতিনাশিনী ব'লে কে ডাকিবে মাকে ?
নামে যদি অচলত্ব না ঘুচে তোমার,
ভবে তবে দুর্গানাম কেন রবে আর ?
গতি দিতে শক্তি যদি নাহি থাকে তার,
দুর্গা ব'লে ডাকিব না গৌরীকে আমার॥
ভুলিব না আমি তব মায়ার মায়ায়,
মহামায়া বিনে মম প্রাণ বাহিরায়!
যাও যাও গিরিবর কৈলাস ভবনে,
গিরিবালা আন গিয়ে গিরি নিকেতনে।
যাত্রা কর গিরিপতি, দুর্গা দুর্গা বোলে,
সূর্য্যের রথের বেগে শীঘ্র যাবে চ'লে।
স্বপনে হেরিয়ে কত ভাবি অমঙ্গল,
সর্ব্বমঙ্গলাকে আনি দেখাও মঙ্গল।
পায়ে ধরি গিরিবর, যাও ত্বরা করি,
দুর্গানাম তরী করি, আনগে শঙ্করী।

কর্ণিয়া রাণির বাণী, নগেন্দ্র অচল,
দুর্গা দুর্গা নাম স্মরি, লভিলেন বল।
দুর্গা দুর্গা নাম স্মরি চলিলা কৈলাসে,
অচল সচল এবে হৃদয় উল্লাসে।

গিরিরাজা গিরিরাণি, নটনটী বেশ!
আগমনী অভিনয় করিলেন বেশ!
নেপথ্য বিধানে আমি নট বেশ ধরি,
প্রেমানন্দে নেচে নেচে দুর্গা নাম করি।
দয়াময়ী মা আমার দয়া প্রকাশিয়া,—
তুষিবেন ভক্তবৃন্দে গৃহেতে আসিয়া।

আসিল আনন্দধামে ষষ্ঠির যামিনী,
আসিলেন বিল্বতলে ভবেশ ভামিনী।
গণপতি ষড়ানন, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
পুলকে আসিলা সবে জননী সংহতি,
আনন্দে মেনকা রাণী পাগলিনী প্রায়,
ধেয়ে গিয়া কোলে তুলে লইলা উমায়।
কাতরে কাঁদিয়া কন, তিতি অশ্রুধারে,
কেমনে মা ভুলে ছিলে এ দুঃখিনী মারে?
বর্ষাবধি হেরি নাই এ বিধু বদন,
কণ্ঠাগত হয়েছিল আমার জীবন।
মা বলে কি মনে তোর ছিল না ঈশানি?
পাষাণ নন্দিনী বলে হলি কি পাষাণী?

জননীর কাতরতা হেরিয়ে ভবানী,
ছলছল ত্রিনয়ন, গদ্‌গদ্ বাণী,
কহিলেন, কেন মাগো, লজ্জা দাও আর?
যত কিছু অপরাধ ক্ষম মা আমার।
তোমার জামাতা যিনি দেব ত্রিপুরারি,
তাঁর অনুমতি বিনা আসিতে না পারি।
পিতৃ দরশনে তথা সুখে ভাসিয়াছি,
যে সময় এসে থাকি, ঠিক আসিয়াছি।
স্বর্গসম জন্মভূমি ভুলিবার নয়,
বর্ষ অন্তে তিনদিন হইব উদয়।

আসিবার নিরূপিত রয়েছে সময়,
সময় এসেছে, তাই হয়েছি উদয়।

গিরিবাসী ভট্টাচার্য্য পুঁথি পাঁজী খুলে,
সমাপিলা অধিবাস বিল্বতরু মূলে।

পোহাল ষষ্ঠির নিশি সপ্তমী প্রভাত,
মা দুর্গার শ্রীচরণে করি প্রণিপাত।
শোভিল অরুণ ঝটা উষার ললাটে,
নিদ্রিতা বিশ্বের মাতা রত্নময় খাটে।
আতিবিতি গিরিরাণী নিকটে যাইয়া,
ডাকিলেন দুহিতারে সুস্বরে গাহিয়া :—

"উঠ মা উঠ মা উমা, প্রভাত হল রজনী।
সপ্তমীতে এত সুপ্তি কি হেতু শশীবদনী ?
কর্পূর বাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি,
কিছু খাও মা রাজকুমারী, হেরি নয়নে :—

লক্ষ্মী স্বরস্বতি সনে, ষড়াননে গজাননে
বসিয়ে মা একাসনে, ভোজন কর ত্রিনয়নী॥"

সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী বাসরে,
কি আনন্দ গিরিপুরে বৎসরেক পরে,
সে আনন্দ বর্ণিবারে কি সাধ্য আমার,
বর্ণহারে বর্ণ হারে, বর্ণ মেলা ভার।
আগত নবমী নিশি নবমীর শশী,—
বিরাজেন তারা সহ স্বর্গপটে বসি,
সেই অবকাশে রাণী নিশিরে সম্ভাষি,
নিরানন্দ ঘুচাবারে কহিলেন আসি।
"ও রে নবমী নিশি, পোহাইতে নাহি পাবে।
প্রভাত হইলে নিশি, উমাশশী চ'লে যাবে॥"
নিশিরে নিষেধ করি মিনতি বচনে,

বলি বিনয় কোরে, উদয় হয়োনারে,
ওরে নিদয় দিনমণি।
বক্ষের ধন বক্ষে রেখে, থাকিরে মনের সুখে,
যতক্ষণ থাকে সুখের রজনী॥"

বড় ভাগ্যবতী তুমি, মেনকা সুন্দরি,
সশরীরে গিরিপুরে পূজিলে শঙ্করী।
দীনহীন অভাজন আমরা এখন,
তেমন মুরতি নাহি মিলে দরশন,
তাই মোরা মা দুর্গারে পূজি প্রতিমায়,
ভক্তিভাবে রক্তজবা সঁপি রাঙা পায়॥
দুর্গা দুর্গা, মহাদুর্গা, ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরি!
দয়াকর দয়াময়ি প্রণিপাত করি।

বকুল-কুমারী।

লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমারের মজ্‌লিস্‌।

যে দিন অপরাহ্নে গৌরীপ্রসাদ দত্তের সহিত সঞ্জীবন ঘটকের সাক্ষাৎ হইল, সেইদিন রাত্রে সুকুমার বাবুর বৈটখানার পার্শ্বকক্ষে দস্তুর মত সখের মজ্‌লিস্‌। পাঁচজন মোসাহেবের অধিষ্ঠান, বোতল গ্লাসের আবির্ভাব, পুষ্পমাল্যের মঙ্গলাচরণ, ইংরাজি ধরণের সভা। বাবু সুকুমার দত্ত সভাপতি। সুধাপাত্রের সুবিচার চলিতেছে, রকমারী বক্তৃতা হইতেছে, হাস্য পরিহাসের তুফান উঠিতেছে। কায়স্থকন্যারা দাসী হইতে পারে না, সেই তর্ক তুলিয়া সুকুমারের যে মোসাহেবটি রুদ্রাক্ষধারী ঘটক ঠাকুরের সহিত কলহ পাকাইবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই মোসাহেবটি এই মজলিসে সেই তর্ক আবার তুলিল। হাস্য করিয়া সুকুমার বলিলেন, "তোমরা ভাই যা বল, যা কও, আমার কিন্তু ওটা বড় ভাল

লাগে না। সৌদামিনী ঘোষ, সুকেশী মিত্র, বনবালা রায় চৌধুরী, বিধুমুখী দত্ত, মনোমোহিনী দাস, ইত্যাদি মধুর কর্কশ নামগুলা আমার কর্ণে যেন কেমন কেমন শুনায়, উচ্চারণেও বাধো বাধো করে। ঘটকটা যে কথা বোলে গেল, সেটাও বড় তুচ্ছ কথা নয়; ব্যাকরণে বিলক্ষণ দোষ পড়ে।”

হো হো রবে হাস্য করিয়া মোসাহেবেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, দেশের প্রেজুডিস্ শীঘ্র দূর হবার নয়; তুমিও তবে আবার ঐ সব ওল্ড ফুলের দলে ভর্ত্তি হও! ভেবে দেখ দেখি, আমাদের মা যদি দাসী হয় আমরা হব দাসী-, পুত্র; আমাদের স্ত্রীরা যদি দাসী হয়, আমরা হব দাসীর স্বামী; আমাদের কন্যারা যদি দাসী হয়, আমরা হব দাসীর বাবা। এটা কি সামান্য অপমান?”

সুধাপান করিয়া সুকুমার বাবু বলিলেন, “অপমান বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতিকে ঘোষ, বসু, মিত্র করিয়া তোলা দুই এক দিনের কর্ম্ম নয়। ব্রাহ্মণের ঘরে কিরণশশী ভট্টাচার্য্য, সুশীলাবালা মুখোপাধ্যায়, নবরঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায়, ব্রজ-সুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও বেশী শ্রুতিকটু। ব্যাকরণ অমান্য করিলেও কর্ণের ও রসনার পরিতোষ জন্মায় না।”

মধ্যস্থ হইয়া একজন মোসাহেব বলিল, “ক্রমে ক্রমে পরিতোষ জন্মিবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? ক্রমে ক্রমে লঙ্ঘণ করা অভ্যাস করিতে হয়।”

হাস্য করিয়া সুকুমার বলিলেন,—‘ রামায়ণের পবন-নন্দন কিন্তু এক মুহূর্ত্তে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল।”

একজন পণ্ডিত মোসাহেব গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “পণ্ডিত দারবিনের থিওরি মতে মনুষ্যই সেই পবন-নন্দনের জ্ঞাতি গোত্র।”

নন্দনের বাহাদুরী ও গোষ্ঠিবৃদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া, পবনদেব সগর্জ্জনে সানন্দে সেই গৃহ মধ্যে সেই মহাবাক্যের ঘোষণা করিলেন।

সুধাপান চলিতেছে, রাত্রি অনুমান ১০ টা, সেই সময় রক্তবসনাবৃত ভোজ্য হস্তে লইয়া দুই জন কৃষ্ণবর্ণ ঋষি সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অবসর বুঝিয়া পবন আবার নিশ্বাসবায়ু সংযোগে সেই মজলিসে পলাণ্ডু-রসুনের সুমধুর বাস বিতরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঋষিগণ দীর্ঘ দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ করিতেন, সেই নজীরে এই ভোজ্যবাহীরা ঋষি পদ বাচ্য; শাদা কথায় বাবুর্চ্চি।

খানার সানক আসরে রাখিয়া, সেলাম ঠুকিয়া ঋষিরা বিদায় হইয়া গেল; বাবুগুলি পানাহারে আমোদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাবু গৌরীপ্রসাদের

প্রকারে যে কুলীন পুত্রটি আমানত ছিল, তাঁহার নাম মাখনলাল মিত্র; তিনিও সেই মজলিসে উপস্থিত। বাবুদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, ইয়ারকিও শিক্ষা হইতেছিল; বাবুরা যাহা করেন, অল্পে অল্পে তাহাও তিনি শিখিতে ছিলেন, বোতল গেলাসের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হইতেছিল সুতরাং সাত আট মাসের মধ্যে মাখনলালটী সুকুমার বাবুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পানাহার চলিতেছে, মজার মজার গল্প চলিতেছে, মধ্যে মধ্যে হাসির গর্‌রা উঠিতেছে, বৈঠকখানা সর্‌গরম্‌। দুইজন মোসাহেব যাত্রাওয়ালাদের জুড়ির ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া কোমর বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া মৃদু মৃদু তালে নৃত্যভঙ্গী দেখাইতে লাগিলেন। জুড়িদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিলেন, ফাঁকা মজলিস্‌ ভাল মানায় না, একটী মজাদারী গীত চলিলে ভাল হয়।

সকলে সেই প্রস্তাবে সায় দিলেন, হস্ত বিস্তার করিয়া প্রস্তাবকর্ত্তা বলিলেন, তবে তোম্‌রা একজন তব্‌লা ধর, আমরা প্রথমে আরম্ভ করি।

ঘরের একধারে তব্‌লা, পাখোয়াজ, বেহালা, হারমনিয়ম্‌ জমা করা ছিল, একটী বাবু তবলা বাজাইতে সুরু করিলেন, আর একটী বাবু হারমনিয়মে সুর দিতে লাগিলেন, জুড়িরা একবার সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া দুইজনে দুই পাত্র সুধা উদরস্থ করিলেন, সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

ঝিঁঝিট, আড়াখেম্‌টা।

"ওলো, রাজনন্দিনী, বিনোদিনী, দেখ্‌বি যদি আয়।
রথের পাশে, নাগর এসে, দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায়॥
অধর চাঁদকে——"

হঠাৎ বাজ্‌না থামিয়া গেল। যিনি হারমনিয়মে সুর দিতে ছিলেন, মুখ বাঁকাইয়া বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা! পচা—পচা—পচা! নূতন কিছু জান তো ধর।

জুড়ীদের মধ্যে একজন কবি ছিলেন, গম্ভীরবদনে তিনি বলিলেন, "নূতন গীত একটী আমার আছে, বকুলকুমারীর বিয়ের রাত্রে সেইটী আমি গাইব, সেই মতলবে রচনা কোরে রেখেছি, দিন স্থির হবার আগেই তোমরা রসভঙ্গ করিয়া দিলে, আমার প্রাণে একটু ব্যথা লাগ্‌লো। আচ্ছা, বন্ধুলোকের অনুরোধ রক্ষা কোত্তে হয়; ব্যাথাটা আমি ভুলে যাই। বাজাও।"

পুনরায় বাদ্যধ্বনি আরম্ভ। নূতন গীতের অবতারণা :—

রাগিনী ঐ, তাল ঐ।

ওহো! প্রজাপতির নূতন সৃষ্টি আস্তরসের বর।
প্রথম বিয়ের বৌমা যারা, পায়না তারা শ্বশুরঘর॥
নামে সধবা, কাজে বিধবা, দুঃখের চোটে, বক্ষ ফাটে; অশ্রু ঝরে ঝরঝর!
যদুকুলে জন্ম ধোরে, কৃষ্ণ যেমন ঘোষের ঘরে,
ননী খেয়ে রাখাল হয়ে, গরু চরায় পাঁচ বছর॥
অলকা তিলকা আঁকা, কদমতলায় দাঁড়িয়ে বাঁকা,
কুঞ্জবনে, রাধা সনে, কেলি করেন বংশীধর॥
(ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য)

শ্রোতারা হাস্য করিয়া করতালি দিয়া বার বার বাহবা দিতে লাগিলেন, গীত শ্রমে ক্লান্ত হইয়া গায়কেরা বসিয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর সুধা-পাত্রেরা পাঁচ ইয়ারের মুখে মুখে রঙ্গে রঙ্গে ক্রিড়া আরম্ভ করিল। পুনঃ পুনঃ অস্বাদন পুনঃ পুনঃ হাস্য।

ঋষিদত্ত সুস্বাদু মাংসে ইয়ারগুলির রসনা ও জঠর পরিতৃপ্ত হইল। আধঘণ্টা পরে মজলিস ভঙ্গ। ক্রমশঃ

পৌরোহিত্য-শিক্ষা সভা।

সনাতন ধর্ম্মের কল্যাণ সাধনে সমুৎসুক হইয়া পুরোহিত-শিক্ষার অভিলাষে যাঁহারা পুরোহিত-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শত শত সাধুবাদ দিয়া আমরা তাঁহাদের সিদ্ধিকামনা করিতেছি; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী, সে কথার পুনরুল্লেখ বাহুল্য। সকলেই জানিতেছেন, শিক্ষা বিরহে এতদ্দেশের পুরোহিতগণের মধ্যে অশিক্ষিত ও অশাস্ত্রজ্ঞ সূত্রধারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা ত্রিচতুর্থাংশ অপেক্ষাও অধিক। পরের হিতকামনা করেন বলিয়া যজ-মানের গৌরবে তাঁহারা পুরোহিত; অন্তরে হিত কামনা থাকিলেও অজ্ঞ পুরো-হিতেরা তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন না। কতকগুলির কামনা আবার অন্য রকম, আতপ তণ্ডুল, পক্ক রম্ভা, বিবিধ মিষ্টান্ন এবং মোটা মোটা দক্ষিণালাভ করাই তাঁহাদের কামনা। [illegible] ইহাদের দ্বারা সমাজের বিস্তর অপকার ঘটিতেছে।

অপকারের একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত এইস্থলে প্রদর্শিত হইল। গৃহস্থসংসারে কোন প্রকার আপদ বিপদ সংঘটিত হইলে গৃহস্থেরা শান্তিস্বস্ত্যয়ন দুর্গানাম জপ, নারায়ণের তুলসীদান এবং অন্য প্রকার মঙ্গলাচরণে কৃতসংকল্প হন ; নিজে নিজে সে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, অতএব পুরোহিতের উপরেই ভারার্পণ করেন। গৃহস্থের যতদূর সাধ্য, যতদূর ভক্তি, তাহা পরিচালনে ত্রুটি হয় না ; কিন্তু পুরোহিতগণের কর্ত্তব্য কার্য্যে বিস্তর ত্রুটি হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত যত কিছু শুভ পদ্ধতি, তৎসমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ, শিক্ষা বিরহে মূর্খ পুরোহিতেরা সে সকল মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণে ও ভাবার্থ পরিগ্রহে অসমর্থ ; এমন কি সকল শব্দের উচ্চারণ করিতেও তাঁহারা অপটু ; মন্ত্রের অঙ্গভঙ্গ ও ছন্দভঙ্গ পদে পদে ঘটে ; ইহার উপরেও আর এক অনর্থ। এ দেশে আজকাল সকল প্রকার লেখাপড়ার মধ্যে একটা "মূলকাটি" ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে ; মূল কাটি শব্দের অর্থ সংক্ষেপ করিয়া লওয়া। শাস্ত্রীয় মন্ত্রে মূলকাটিতে কত অনর্থ ঘটে, মূর্খ পুরোহিতেরা তাহা কল্পনাতেও ভাবিয়া আনিতে পারেন না।

ইহার ফল কি ? ফল বড় শক্ত। সংকল্পিত শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে শাস্ত্রসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয় না, পুনঃ পুনঃ ইহা দেখিয়া দেখিয়া আর্য্য শাস্ত্রের প্রতি (আর্য্য ধর্ম্মের প্রতিও) ভক্তিমান আর্য্য সন্তানগণের শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে ; বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যা গৃহিণীগণের উপরেই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা অধিক নির্ভর করে, শুভকর্ম্ম নিষ্ফল দেখিয়া সেই গৃহিণীগণও শাস্ত্রবাক্যের উপর বিশ্বাস হারাইতেছেন। ইহা কি সামান্য অনিষ্টকর বলিয়া গণনা করা উচিত ? কয়েক জন অজ্ঞান অযোগ্য লোকের দোষে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আঘাত প্রাপ্ত হয়, ইহা কদাচ উপেক্ষনীয় হইতে পারে না।

শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির ন্যায় নিত্যনৈমিত্তিক দেবদেবীর পূজা, পুত্রকন্যার বিবাহ এবং পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও অঙ্গহীন হইতেছে, ভাবিতে গেলে সে সকল ক্রিয়াকর্ম্মও নিষ্ফল করা হইতেছে। এ অনিষ্ট নিবারণের সদুপায় বিধানের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বিশুদ্ধ প্রণালীতে এতদ্দেশীয় পুরোহিতগণকে দশ কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই সেই সদুপায়। পুরোহিত সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণ দৃঢ় সংকল্পে সেই সদুপায় বিধানে যত্নবান হইয়াছেন, এই কারণেই তাঁহারা আমাদের সাধুবাদের পাত্র।

সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভাটি এখন শিশু, বয়স এক ...

বিষয়, এই এক বৎসরের মধ্যে এই শিশুসভার পাঁচটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে সংকল্পানুযায়ী কাজের কথায় আলোচনা হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। পুরোহিত সভার প্রতিপোষক আর্য্যসন্তান অনেক গুলি, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান সদস্য, গতমাসে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতি হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত দিনপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ও প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সাতজন সহকারী সভাপতি। রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, এই সভার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপালচরণ স্মৃতিভূষণ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত সহকারী সম্পাদক।

বর্ণাশ্রম রক্ষার বিশিষ্ট উপায় অবধারণের নিমিত্ত পুরোহিত প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচার সম্পন্ন পুরোহিত আছেন, তাঁহাদের নাম ধাম ও শ্রেণীবিভাগ করিবার এবং পৌরোহিত্য শিক্ষোপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবার ভার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বিদ্যানিধি মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে যোগ্যপাত্রেই যোগ্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হয়, যাহাতে যোগ্য যোগ্য ছাত্র সংগৃহিত হয়, সভা আশু তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন, ইহাই আমদের অনুরোধ।

৺অক্ষয়কুমার ঠাকুর

আবার আমাদিগকে এক নূতন শোকে মর্ম্মাহত হইতে হইল। দর্ম্মাহাটা নিবাসী বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুর গত ১৪ই ভাদ্র বুধবার অকালে ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সদ্গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমরা যৎপরনাস্তি পরিতপ্ত হইতেছি। তিনি প্রিয়ম্বদ, সদালাপী, বন্ধুবৎসল, নিরহঙ্কারী এবং নিঃস্বার্থ পুরুষ ছিলেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সগৌরব এম, এ. বি, এল, উপাধি লাভ করিয়া হাইকোর্টের এটর্ণী হইয়াছিলেন। কার্য্যেও তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল। কেবল ইহাই নহে, অপূর্ণ বয়সে পরমার্থ আলোচনায় তিনি সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। জন্মভূমি পত্রিকার ক্রোড়ে তৎবিরচিত গাঢ় ভাবার্থপূর্ণ

বিবিধ কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধে তৎবিষয়ের ভূরি ভূরি পরিচয় আছে। তাঁহার বিয়োগে পরিচিত বন্ধুবান্ধব মাত্রেই শোকাকুল হইয়াছেন। ৪২ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ যেরূপ প্রবল ছিল, তিনি দীর্ঘজীবী হইলে তাঁহার দ্বারা বিস্তর সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিত। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান, একটি সপ্তদশ বর্ষীয় পৌত্র তাঁহার এখন সাংসারিক সান্ত্বনার একমাত্র স্থল। বাবু অক্ষয়কুমারের সেই পুত্রটি দীর্ঘজীবী হইয়া পিতৃগুণের অধিকারী হন, ঈশ্বরের নিকটে ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কায়মনবাক্যে আমরা অক্ষয়কুমার ঠাকুরের উপরত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

—:•:—

সমালোচনা।

সাবিত্রী-সত্যবান।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্য।

সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যান আমাদের ভারতের অমূল্য রত্ন। আদর্শ সতীত্ব এবং আদর্শ বিশুদ্ধ প্রেম এই আখ্যায়িকার জীবন। এমন পবিত্র আখ্যায়িকা এবং এমন আদর্শ সতী ইহ-জগতে আর নাই। বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় অতি সুললিত ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেই বিশেষতঃ আমাদের গৃহলক্ষ্মী মহিলাকুল এই ধর্ম্মানুগত পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করেন, ইহাই আমাদের বাসনা। বিষয়টি যেরূপ মহার্থপূর্ণ এবং এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ও চিত্রাবলী যেরূপ সুন্দর, তাহাতে দেড়টাকা মাত্র মূল্য যৎসামান্য বলিয়াই বোধ হয়। এই পুস্তকে বিবিধ বর্ণরঞ্জিত অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। হিন্দু ললনাগণকে "সাবিত্রীরূপিণী হও," বলিয়া গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করেন, আশীর্ব্বাদের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতেছি, আর্য্যকুল-মহিলাকুল সর্ব্বপ্রযত্নে সাবিত্রীদেবীর প্রেমানুকরণে যত্নবতী হইবেন।

রূপসনাতন।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস প্রণীত। মূল্য একটাকা।

এখানি ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক। সম্রাট আকবর সাহের অধীনে হোসেন সা যখন গৌড়রাজ্যের শাসনকর্ত্তা, সেই সময়ের ইতিহাসের একাংশ লইয়া আনুসঙ্গিক অলঙ্কারাদি সংযোগে এই নাটকখানি বিরচিত। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গচৈতন্যদেবের চরিতামৃত পান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে রূপসনাতনের

জীবনের পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহারা উভয়েই সহোদর, পরিচয়ে রূপগোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে অভিহিত। যে সময়ের ইতিহাস রূপ গোস্বামী তৎকালে গৌড়েশ্বর হোসেন সার মুন্সী ছিলেন, সনাতন ছিলেন পরমবৈষ্ণব সাধক। একদা মহাদুর্য্যোগ রজনীতে হোসেন সা কোন একটী বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে রূপ গোস্বামীকে ডাকিয়া পাঠান, রূপ তখন বাসায় ছিলেন, মুসলধারে বৃষ্টি, ভয়ানক ঝড়, রাত্রি গভীর, রাস্তায় একহাটু জল, রাজমন্ত্রী পদব্রজে সেই জল ভাঙ্গিয়া আসিতেছিলেন, এক দরিদ্রের কুটিরের সম্মুখ দিয়া আসিবার পথ। রাস্তায় জলের উপর ঝপ্ ঝপ্ চক্ চক্ শব্দ হইতেছিল, কুটীরবাসিনী রমণী সেই শব্দ শুনিয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রাত্রে এ দুর্যোগে কে যায়?' পতি বলিল, হয় ত কুকুর। পত্নী বলিল, "এ দুর্য্যোগে কুকুর কখন বাহির হয় না, নিশ্চয়ই কাহার চাকর মনিবের তলব।" রূপ গোস্বামীর কর্ণে সেই কথা গেল, দাসত্বের তাঁহার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিল, সে রাত্রের কার্য্য শেষ করিয়া তিনি চাকরী ত্যাগ করিবার অবসর খুজিতে লাগিলেন। সেই সময় চৈতন্যদেব গৌড়ের রাজধানীতে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার মুখে পবিত্র হরিনাম শ্রবণ করিয়া; তাঁহার রূপে গুণে রূপের মন মজিয়া গেল, তাঁহার ভ্রাতাও সেই অবসরে ধর্ম্মের নিত্যতা ও সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিলেন, রূপসনাতন উভয়েই চৈতন্যভক্ত হইলেন, হরিনামের মহিমা তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতে লাগিল। নাটকখানির স্তবকে স্তবকে ভক্তিরসের প্রবাহ ছুটিয়াছে, ভক্তিসাগরে হরিপ্রেমের তরঙ্গ খেলিয়াছে। আমরা এই সুন্দর নাটকখানি পাঠ করিয়া ভক্তিরসে বিমুগ্ধ হইয়াছি। উদারাশয় আকবর সাহ ঐ হরিভক্ত রূপ গোস্বামীর সহিত আলাপ করিয়া হরিভক্তির পক্ষপাতি হইয়াছিলেন, নাটকে এইরূপ লেখা আছে।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী উপাধিতে গোস্বামী। নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুপাদ গোস্বামী নহেন, তিনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত, উপাধি প্রাপ্ত ডাক্তার হইলেও তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে চিকিৎসা করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক এমন ভক্তিপূর্ণ নাটক রচনা করিয়াছেন,ইহা পরম শ্লাঘার বিষয়। পুস্তকের ভূমিকার একটি উপাদেয় অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"সাহিত্যের গঙ্গাজলে প্রেমভক্তি শতদলে,
পূজে যেই জননীর পবিত্র চরণ ;—
তারই কীর্ত্তি, তারই যশ, তাহারই কাব্যের রস—
মৃত প্রাণে ঢেলে দেয় অমৃতের প্রস্রবণ।"

অতি সুন্দর, নাটকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ; কিন্তু একটি স্থলে আমাদের একটু সংশয় জন্মিল। রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নাট্যকার এ বিষয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা করিয়াছেন, বুঝা গেল না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ষষ্টিবর্ষ পরে আকবর



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, কার্ত্তিক। | ৭ম সংখ্যা।

দুর্গাবিসর্জ্জন।

মা আসিয়াছিলেন, মা চলিয়া গিয়াছেন, তমোময়ী বঙ্গভূমি পুনরায় তমোময়ী হইয়া বঙ্গবাসীগণকে নিরানন্দনীরে ডুবাইয়াছে। মহামায়ার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনাশায় সম্বৎসরকাল ভক্তবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াছিল, মা আনন্দময়ী দর্শন দিয়া, তিনদিন আনন্দ বিলাইয়া, বঙ্গবাসীর বিশুষ্ক অধরে হাস্য আনাইয়া, নিরুৎসাহ হৃদয়ে নবীন উৎসাহ জাগাইয়া, ত্রিদিবস ত্রিযামিনী বঙ্গদেশ আলোকময় করিয়া, চতুর্থ দিবসের সায়ংকালের পূর্ব্বেই মা অদর্শন হইয়াছেন। ভক্তের প্রাণ আকুল হইয়াছিল, ভক্তের মনে কত আশা জাগিয়াছিল, সেই আশা পূর্ণাংশে পূর্ণ হইল না। যাহারা পিপাসী, তিনদিন শীতল বারি পান করিয়া তাঁহাদের পিপাসা শান্তি হয় নাই। প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গিয়ছে,

যে আনন্দটুকু আসিয়াছিল, সে টুকু নিরানন্দে পরিণত হইয়াছে, ভক্ত আবার শুষ্ককণ্ঠে আর এক বৎসর দুর্গানাম স্মরণ করিয়া ম্রিয়মান হইয়া রহিল; বৎসরান্তে মা আবার আসিবেন, আশায় আশায় ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিল।

বিজয়া।

দুর্গাবাড়ী দুর্গাপূজা, কত ছিল জাঁক,
তিনদিন অবসানে সব হল ফাঁক;
তিনদিন মাতৃপূজা করি ভক্তদলে,
ভাসাইয়া দিল মাকে ভাগীরথীজলে!
সেই সব ভক্ত মিলি আনন্দ হারায়ে,
বিজয়া করিল সাঙ্গ কাঁদিয়ে কাঁদায়ে।
দশমী বিকালে যত বাদ্যকরগণ,
তালে তালে বাজাইল দুর্গাবিসর্জ্জন;
বিসর্জ্জিয়ে মহামায়া ফিরিবার কালে,
শোকবাদ্য বাজাইল বিষাদের তালে।
ইহাই বিজয়া হেথা, নামেতে প্রচার,
কিন্তু আছে অন্য ব্যাখ্যা এই বিজয়ার।
ত্রেতাযুগে রঘুনাথ লঙ্কেশে নাশিতে,
অকালে বোধন করি পরিতপ্ত চিতে,
পূজে ছিলা অম্বিকারে নীলশতদলে,
তারপর বিসর্জ্জন সমুদ্রের জলে।
রামচন্দ্র নিরূপিত বিজয়া উৎসব,
নিরানন্দে মহোৎসব আমাদের সব।
বিজয়া বিধান করি ফিরে আসি ঘরে,
বিজয়া* করিয়ে পান প্রেমানন্দভরে,

---

*বিজয়া—সিদ্ধি।

বিল্বদলে দুর্গানাম করিয়া লিখন,
পুলকে পূর্ণিত সবে সহবন্ধুজন ;
আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ প্রেমানন্দমনে,
লঘুরা প্রণতি করে যত গুরুজনে ;
নমস্কার বিনিময় সমানে সমানে,
সে এক অপূর্ব্বভাব সবাকার প্রাণে।
শত্রুমিত্র, দ্বেষাদ্বেষ না থাকে বিচার,
পরস্পর কোলাকুলি আনন্দ অপার।
মা দুর্গে! নাশো মা দেবি, অজ্ঞান আঁধার,
আবাহন বিসর্জ্জন করি মা তোমার!
একি ভ্রান্তি শান্তিময়ি, তোমার সন্তান,
ষষ্ঠিযোগে বিল্বমূলে করে মা আহ্বান।
করে করে, দোষ নাই, করে আবাহন,
জানে না ত কারে তারা করে বিসর্জ্জন!
মা তোমার আবাহন বিসর্জ্জন নাই,
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম নেহারি সদাই।
গচ্ছ গচ্ছ, গৃহে গচ্ছ, দেবী শুভঙ্করি,
দুর্গা বলে মা তোমারে প্রণিপাত করি।
যাও মা কৈলাসধামে হর-বরাঙ্গনে,
সানন্দে বিরাজ কর সদানন্দ সনে ;
আনন্দে আনন্দময়ি করি মা স্মরণ,
বর্ষপরে দেখা দিও এই নিবেদন।



লক্ষ্মীপূজা।

শারদী পূর্ণিমা তিথি, আশ্বিনী পূর্ণিমা,
প্রদোষে পরমানন্দে, কমলার পূজা।
শতদল বিলাসিনী চরণ-কমলে—
শোভা পায় প্রস্ফুটিত নবীন কমল,
শোভিত যুগল পাণি যুগল কমলে ;
এইরূপে মা তোমারে পূজে ভক্তজন।
মা লক্ষ্মি! আমিও পূজি মানস-কমলে,
কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, এ পূজার নাম,
নারিকেলোদক পানে ভুঞ্জিচিপীটক,
লক্ষ্মীবৃদ্ধি শাস্ত্রবাক্য নিশাজাগরণে ;
নমি আমি জুড়ি পাণি ওরাঙ্গা চরণে,
কটাক্ষে করুণাময়ি কর কৃপাদান।

কালীপূজা।

চতুর্ভুজা মুক্তকেশী, মুণ্ডমালা গলে,
ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, পদতলে শিব,
দৈত্যমুণ্ড তীক্ষ্ণঅসি ধর বামকরে,
দক্ষিণ দ্বিভুজে কর বরাভয় দান।
শিব কেন পদতলে, শিব সীমন্তিনি ?
নাচিছ শিবের বুকে উলঙ্গিনী বেশে ;
কেন মা এ খেলা তব লজ্জাহীনা সতী ?
যে ভাবে যে ভেবে লয়, ভাবুক বরদে ?
নানা মুনি নানা মত, প্রসিদ্ধ এ বাণী।

পদতলে মহাকাল, শ্বেত বর্ণ বপু,
একাল অনন্তকাল ; সদাশিব নয়।
কালের উপরে তুমি নাচিছ প্রকৃতি,
প্রকৃতি উলঙ্গ সদা থাকে না বসন।
সাধকেরা ভিন্নভাবে নেহারে তোমারে।
রণবেশ ধরিয়াছ দৈত্যনাশ হেতু ;
রণক্ষেত্রে নিপতিত শব শত শত,
শাস্ত্রে আছে মা তোমার শ্রীপদ পরশে,
শবদেহ শিব হয় ; এমনি মহিমা ;
রণানন্দে মত্ত হয়ে নাচিতে নাচিতে,
মরা অসুরের বুকে সঁপেছিলে পদ,
সেই শব শিবরূপ করেছে ধারণ ;
সে শিব না হন মহাযোগী মহেশ্বর ;
শবশিবা নাম তাই জগতে প্রচার।
কে জানে মহিমা তব, কে বুঝিবে লীলা ?
রূপ দেখে লোকে বলে ভবেশভাবিনী,
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে আমি নিরখি ও রূপ,
ভাবেতে বিভোর হই, চিনিতে না পারি,
পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি করি সমর্পণ,
সহস্র প্রণাম করি অক্ষয় চরণে,
নমস্তে দক্ষিণাকালী, নমো পশুপতি !
মণি অমাবস্যা যোগে কর দোঁহে খেলা !

স্বর্গবাসিনী জননী। *

লেখক—
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার,
তোমারি প্রসাদে হেরি সৃষ্টি বিধাতার।
দশমাস দশদিন জঠরে ধরিয়া,
আনিয়াছ এ সংসারে প্রসব করিয়া।

দেহের শোণিত দিয়া করেছ পালন,
তোমারি স্তনের ক্ষীরে বেঁচেছে জীবন ;
অজ্ঞানেতে কত জ্বালা দিয়াছি তোমায়,
সব সহিয়াছ মা গো, স্নেহের মায়ায়।

সে সব শৈশব-কথা গাঁথা আছে মনে,
ভাবিলে প্রেমের ধারা ঝরে দু-নয়নে।
মা বলে ডাকিলে মাগো, জুড়াইত প্রাণ,
ছিলে তুমি পৃথিবীতে জুড়াবার স্থান।

চলে গেছ মা জননি ! নির্দয়া হইয়ে,
ততখানি স্নেহমায়া গিয়েছ ভুলিয়ে।
আমি হেথা কাঁদিতেছি, বিহনে তোমার,
জগত-সংসার সব হেরি অন্ধকার !

---

* বিগত ১৩১৪ সাল, ২৫ শে কার্ত্তিক সোমবার বেলা ১২ টা দশ মিনিটের সময়, আমাদের পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণী আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ৪র্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত, লেখক।

কার কাছে রহিয়াছি, ভাবি যবে মনে,
জ্ঞান হয় দিবানিশি ভ্রমিতেছি বনে।
এ কথা আমার নয়; শাস্ত্রের প্রমাণ,
মাতা বিনা গৃহস্থলী অরণ্য সমান।

চারিবর্ষ গত হল, তুলারাশি মাসে,
মা তুমি মা স্নেহময়ি, গেছ স্বর্গবাসে।
এই সে কার্ত্তিকমাস; ত্যজি মায়াদয়া,
সংসারে দেখায়ে গেছ বিষাদ-বিজয়া!

শূন্যময় হেরি সব, যে দিকেতে চাই,
স্নেহমাখা মুখখানি দেখিতে না পাই।
কভু কভু মনে হয়, হেরি নেত্রভরি,
বসিয়ে রয়েছ ঘরে, ঘর আলো করি;

দিব্যনেত্রে হেরি যেন তোমারে জননী,
উল্লাসে হাসিছ যেন গণেশ-জননী;
ছুটে যাই গৃহমাঝে, দেখিতে তোমায়,
না হেরিয়ে অক্ষিনীরে বক্ষ ভেসে যায়!

চারিবর্ষ গিয়েছ মা, আঁধারিয়া পুরী,
চারিযুগ জ্ঞান হয়; স্মরি আর ঝুরি।
রয়েছ অমরধামে, অমরাবতীতে,
কৃপা বরিষণ মাগো কর পৃথিবীতে;

স্বর্গে থাকি স্বর্গলক্ষ্মি আশীর্ব্বাদ কর,
আশীর্ব্বাদে সংসারের শোকতাপ হর।
পুণ্যধামে পশিয়াছ তুমি পুণ্যবতি!
মা তোমার পাদপদ্মে সহস্র প্রণতি।

জগদ্ধাত্রী পূজা।

মা তোমার নবরূপ, কাঞ্চন বরণ,
সিংহপৃষ্ঠে পদ্মাসন, বসি তদুপরি,
হাসিতেছ ভবরাণি, তুষিতে ভকতে।
শঙ্খচক্র, ধনুর্ব্বাণ শোভে চারি করে,
নাগযজ্ঞোপবীতিনী কুটিল কুন্তলা,
জগতজননী তাই, জগদ্ধাত্রী নাম,
এই রূপ ধরেছিলে দুর্দ্ধাসুর বধে,
গজরূপী দুর্দ্ধাসুর নিপতিত রণে,
কেশরী তাহার পৃষ্ঠে বিপুলবিক্রমে,
কুম্ভভেদ করিতেছে করিয়া দংশন।
একদিনে তিনপূজা কর মা গ্রহণ
ভক্তশিরে দিও মাগো অভয় চরণ।

——o·:•:-o-——

কার্ত্তিক পূজা।

তারকারি! আসিয়াছ ময়ুরবাহনে,
পূজা পাইবার তরে বঙ্গনিকেতনে,
বঙ্গীয় যুবার রূপে বাবু সাজিয়াছ,
ফিণফিণে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়াছ,
কটিদেশ বাঁধিয়াছ ঢাকাই রুমালে,
বাঁকা সিঁতি দিব্য কেশ কুঞ্চিত কপালে;
বাবু বটে; তবু তুমি দেব ষড়ানন,
বীরভাবে ধনুঃশর করিছ ধারণ।
বীর তুমি, মহাবীর, সুরসেনাপতি,
নাশিতে তারকাসুরে জনম তোমার।
তব আবির্ভাব অগ্রে, কৈলাসের পতি,
যোগে ছিলা নিমগন, নয়ন মুদিয়া।

দেবের দেবত্ব লয় দুরন্ত তারক,
শিবশক্তি বিনা নাহি ছিল পরিত্রাণ।
ভাঙ্গিতে শিবের যোগ মন্ত্রণা করিয়া,
পাঠাইলা দেবগণ তথা কামদেবে;
ক্রোধারুণ মহেশ্বর,—নয়ন অনলে—
হইল মদন ভস্ম চক্ষের নিমিষে।
সেই সূত্রে হয়েছিল তোমার জনম।
কৃত্তিকা পালিতা তাই, হয়েছ কার্ত্তিক।
করেছিলে ছটী কৃত্তিকার স্তন পান,
সেই হেতু ছয় মুখ, নাম ষড়ানন।
বাবু বেশ নহে তব, মহাযোদ্ধা তুমি,
তোমার প্রভাবে হয় তারক নিধন।
বীরপূজা তবপূজা জগতে প্রচার,
তোমারে প্রণাম করি শত শত বার।
আর এক কিম্বদন্তী চলে বঙ্গধামে,
পুত্রবতী হয় নারী তোমার পূজায়।
ব্রতপূজা অনুষ্ঠান সাত্ত্বিক বিধানে;
পুত্রদান কর তুমি বন্ধ্যা নারীগণে।
এইত করুণা তব, শুনি পূর্ব্বাপর;
এবে কি বিকার তার অকথ্য কথন।
নগরবাসিনী যত বিলাসিনী দল—
করিছে তোমার পূজা, অপূর্ব্ব তামাসা!
নিয়োনা তাদের পূজা, পার্ব্বতীকুমার!
এই ভিক্ষা মাগি আমি চরণে তোমার।
নিশাকালে পূজা ল'য়ে ভকতের বাসে,
চুপি চুপি চ'লে যাও কৈলাসের বাসে।
যাও দেব! বৎসরান্তে আসিও আবার,
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার।

রাসযাত্রা।

নিত্যনব রসধাম রসবৃন্দাবন,
বিহার করেন যথা শ্রীনন্দনন্দন।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা নিশি, মধু কুঞ্জবনে,
রাসলীলা প্রেমভাব উপজিল মনে।
বিচিত্র কুসুমদামে সজ্জিত করিয়া,
রাসেশ্বরী শ্রীরাধারে বামেতে লইয়া,
রাসমঞ্চে দাঁড়ালেন শ্যাম নটবর,
জলদে চপলা সম শোভিল সুন্দর।
কালোশশী জলধর, রাই সৌদামিনী,
চারিদিকে দাঁড়াইল রসিকা গোপিনী;
সুরূপসী অষ্টসখী প্রধানা সবার;
চাঁদে যেন তারা ঘেরা অতি চমৎকার।
গাঁথিয়া যতনে নব কুসুমের মালা,
রাধাকৃষ্ণ গলে দিল যত গোপবালা;
সাজায়ে যুগলরূপ মনোহর সাজে,
নৃত্য আরম্ভিল তারা পরিহরি লাজে;
নাচিয়া নাচিয়া তারা গাহিল সঙ্গীত,
সুস্বরে যমুনা নদী ভাবে পরিস্ফিত,
কুহরিল পিককুল, গুঞ্জরিল অলি,
ফুটিল কাননে সব নব ফুল কলি।
ফুলে ফুলে সঞ্চারিল মধু অনুপম,
সে মধু প্রেমের মধু অমৃতের সম।
মধুপান করিলেন শ্রীশ্যামসুন্দর,
রাধা সনে রাসলীলা, প্রেমের আদর।
দেখাইতে বিশ্বজনে বিশ্বময় হরি,
করিলেন রাসকেলি লইয়া কিশোরী।
ভাবে ঢল ঢল দোঁহে, মুখে মৃদুহাস,
তদবধি প্রচারিল পূর্ণিমার রাস।

রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে করিয়ে প্রণতি,
রচিলা নরেন্দ্রনাথ প্রেমের ভারতী।

——০-:০:-০——

বকুলকুমারী।

লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ স্থির,—শুভ বিবাহ।

সপ্তাহ অতীত। ঘটক সঞ্জীবন শাস্ত্রী উচ্চকণ্ঠে দুর্গানাম করিতে করিতে গৌরীপ্রসাদ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। ঘটকের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া গৌরীবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া পূজার দালানে ঢালা বিছানায় বসিলেন, সমাদর করিয়া ঘটকঠাকুরকে নিকটে বসাইলেন, দস্তুরমত প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ বিনিময়।

ঘটকের হস্তে রুদ্রাক্ষ জপমালা, গৌরীবাবুর হস্তে সেই ক্ষুদ্র দর্পণ। দুই তিন বার দর্পণে মুখ দেখিয়া, দন্তহীনবদনে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুর! সমাচার কি? কার্য্যসিদ্ধি তো?"

মালাজপ করিতে করিতে ঘটক উত্তর করিলেন, "সিদ্ধিরস্তু। ওঁ নমো প্রজাপতয়ে নমঃ।"

বাবু।—কোথায় স্থির করা হলো?

ঘটক।—বেশী দূর নয়,—কোন্নগরে।

বাবু।—কন্যাকর্ত্তার পরিচয় কি?

ঘটক।—নাম ত্রিলোচন বসু মল্লিক, পর্য্যায় ২২, অবস্থায় দরিদ্র।

বাবু।—উত্তম। দরিদ্রই আমার দরকার; কন্যাটী কেমন?

ঘটক।—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা। বয়স দ্বাদশের উপর।

বাবু।—পাত্রদর্শনের দিনস্থির কবে?

ঘটক।—আমার উপরেই সব ভার। কন্যাকর্ত্তা আস্‌বেন না। মেয়েটী ডাগর হয়েছে, শীঘ্র শীঘ্র দুই হাত এক হলেই তিনি এড়ান পান। ঘরবর ঠিক হয়, এই পর্য্যন্ত তাঁর কথা।

বাবু।—খরচপত্র বেশী লাগ্‌বে না, সে কথা বলেছেন তো?

ঘটক।—তা না বোল্লে কি তিনি রাজী হোতেন? সব কথা আমি বোলেছি।

বাবু।—তবে পঞ্জিকা দেখুন, দিনস্থির করুন। বিলম্বে অনেক বিঘ্ন, শুভস্য শীঘ্রম্।

ঘটক।—(মালা জপিতে জপিতে) কন্যাটী আমি দেখে এসেছি, পাত্রটী একবার আমার দেখা চাই।

পুনর্ব্বার দর্পণে মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া, নিকটস্থ একজন চাকরকে বাবু হুকুম করিলেন, "ও রে! মাখনলালকে একবার ডাক্‌তো।"

চাকর গিয়া মাখনলালকে ডাকিয়া আনিল, সুকুমার বাবুও সেইসঙ্গে আসিলেন, উভয়েই কর্ত্তার বামদিকে বসিলেন। মাখনলালের মুখের দিকে চাহিয়া গৌরীবাবু বলিলেন, "ঘটকঠাকুরকে প্রণাম কর বাবা।"

মাখনলাল ভূমিষ্ঠ হইয়া ঘটকের পদধূলি লইলেন, ঘটক আশীর্ব্বাদ করিলেন; মালা ঘূরাইতে ঘূরাইতে বলিলেন, "বাঃ! খাসা ছেলে! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, যেমন কোনে, তেমনি বর; উপযুক্ত মিলন; বিনা গণনায় রাজযোটক।"

কাহারও দিকে না চাহিয়া, সুকুমারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্বন্ধ স্থির হয়েছে নাকি?"

ঘটক উত্তর করিবার অগ্রেই কর্ত্তা বলিলেন, "সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, কেবল দিন স্থির বাকী। কন্যাকর্ত্তার নিবাস কোন্নগরে। শুন্‌লেম, মেয়েটী খুব সুন্দরী। পাঁজীখানা আন্‌তে বল, অদ্যই দিনস্থির করা যাক্।"

সুকুমারের আদেশে গুপ্তপ্রেসের একখানি পঞ্জিকা আনীত হইল। শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখিয়া, তারিখটি বাহির করিয়া, ঘটক মহাশয় বার কতক অঙ্গুলীর পর্ব্ব গণনা করিলেন, তাহার পর হাস্য করিয়া বলিলেন, "পাঁচদিন মাত্র বাকী। আজ হচ্চে ১৯ বৈশাখ, দিনটী পাওয়া যাচ্চে ২৪ বৈশাখ। অতি শুভ দিন; সেইদিনই কর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।"—মালা জপিতে জপিতে পঞ্জিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "অতি উত্তম দিন. রাত্রি ছয়দণ্ড ছয়পল সাঁইত্রিশ বিপল মধ্যে তুলা বৃশ্চিক লগ্নে সুতহিবুক যোগে বিবাহ। এই দিনটিই প্রশস্ত।"

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—"তবে ঐ দিনই অবধারিত রহিল। আপনি সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে এখানে আসিবেন, পাঁচ সাতটী বরযাত্রের সঙ্গে পাত্র লইয়া যাইবেন।"

আর দুটী পাঁচটী কথার পর আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘটকঠাকুর বিদায় হইলেন, সুকুমারের সহিত মাখনলাল বৈটকখানায় চলিয়া গেলেন, দুর্গা দুর্গা বলিয়া কর্ত্তা-বাবু গাত্রোত্থান করিলেন।

অতঃপর ২৪এ বৈশাখ সমাগত। অপরাহ্ণসময়ে ঘটক, বরযাত্র ও বর-বেশে মাখনলাল মিত্র কোন্নগরে গমন করিলেন। পঞ্জিকোক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ত্রিলোচন মল্লিকের কন্যা সুকুমারীর সহিত মাখনলাল মিত্রের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বকুলকুমারীর বিবাহ।

সুকুমারীর বিবাহের পর ছয়মাস অতিক্রান্ত। অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চম দিবসের রজনীতে গৌরীপ্রসাদ দত্তের কন্যা বকুলকুমারীর বিবাহ। পাত্র পূর্ব্ব-কথিত মাখনলাল মিত্র। আমাদের ব্রাহ্মণকায়স্থ সমাজে দ্বিতীয়পক্ষের বরকে কন্যা দান করিতে সহজে সকলে সম্মত হন না; পূর্ব্বে পূর্ব্বে বড় বড় কুলীনব্রাহ্মণেরা শতাধিক বিবাহ করিতেন, এইরূপ শোনা যায়; কিন্তু এখন আর ততটা নাই। এখন অকৃতদার পাত্রই প্রায় সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়া থাকে; তবে যে গৌরী-প্রসাদ দত্ত আগাগোড়া জানিয়া শুনিয়া কৃতদার পাত্র মাখনলালকে কন্যাদানে সম্মত হইলেন, ইহার কারণ কি? স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। দুই কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। এ দেশের বনিয়াদী ধনবান মৌলিক কায়স্থেরা কেহ কেহ আত্মরস বিবাহের আদর করেন; উহা তাঁহাদের বংশের পদ্ধতি ও সামাজিক গৌরব।

আত্মরস-বিবাহ কি, ইহা যাঁহারা না জানেন, তাঁহাদিগকে তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। একটী কুলীন কায়স্থপুত্র প্রথমে আপনাদের সঘরে

স্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরজামাই থাকেন, প্রথমা পত্নীকে লইয়া ঘর করেন না। ইহাকেই বলে আস্তরস-বিবাহ। বাবু গৌরীপ্রসাদ দত্ত সেই রীতি অনুসারে অবিবাহিত মাখনলালকে কিছুদিন আপন গৃহে রাখিয়া একটী কুলীন কায়স্থের কন্যার সহিত বিবাহ দেন, পাঠকমহাশয় পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা অবগত হইয়াছেন। এই মাখনলালকে জামাই করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মাখনলালকে কন্যাদান করিয়া আস্তরসের গৌরব রক্ষার্থ সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে তিনি অভিলাষী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিবাহের দিন স্থির ৫ই অগ্রহায়ণ। তিনদিন পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রা সমাধা হইয়াছে, ৫ই অগ্রহায়ণ রজনীতে বিবাহ।

গৌরীবাবু পুরুষানুক্রমে বড় মানুষ, কন্যার বিবাহে বড়মানুষী কেতায় দস্তরমত সমারোহ,বাটীঘর সুসজ্জিত, সন্ধ্যাকালে বাটীর ভিতর আলোকমালায় সুশোভিত, বাদ্যভাণ্ড নিনাদিত, আহূত অনাহূত লোকে বাটী পরিপূর্ণ। এ বিবাহে একটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বরযাত্র একটিও থাকে না, বরপক্ষের পুরোহিতও আইসেন না, কন্যাযাত্রেরাই উভয় পক্ষের দল পূরণ করেন, কন্যাকর্ত্তার পুরোহিতের দ্বারাই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, কন্যাকর্ত্তার নাপিত বরের নাপিতের কার্য্য করে; এ বিবাহেও তাহাই হইল।

পূজার দালানে বরাসনে বর, চতুর্দ্দিকে নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবেরা, আবাল বৃদ্ধ-যুবক মণ্ডলী।

প্রথমে বরার্চ্চনার পর অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার। সধবা কামিনীরা ছায়া-মণ্ডপতলে বরকে বরণ করিলেন, চারিজন পুরুষ একখানি অলিপনাযুক্ত পীড়ির উপর পাত্রীকে স্থাপন করিয়া সাতবার বরপ্রদক্ষিণ করাইলেন, শুভদৃষ্টি হইয়া গেল, বরকন্যা বহির্ব্বাটীতে আনীত হইল, ইহার পরেই সম্প্রদান। সম্প্রদানের পর বাসর ঘর। এ দেশের বিবাহবাসরে একপ্রকার রীতি আছে, সম্পর্ক বিচার না করিয়া নিজ বাটীর স্ত্রীলোকেরা ও প্রতিবেশিনী কামিনীরা সধবাবিধবা নির্ব্বিশেষে লজ্জাসম্ভ্রমের লেশমাত্র না রাখিয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে বাসরজাগরণ করেন রসিকা কামিনীগণ সহাস্যবদনে নর্ত্তকী-গায়িকার অভিনয় করেন, বরকেও গীত গাওয়াইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। আস্তরসের বর,—বিশেষতঃ এই বরটী পূর্ব্বাবধিই সর্ব্ব রঙ্গেই ধনুর্দ্ধর হইয়াছিলেন, কামিনীগণের সহিত রসিকতায় কোন অংশেই তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না, কবির ও পাঁচালীর দলের প্রথানুসারে উভয় ... জবাব, দরজবাব, বদজবাব, এবং জবা-

বলন্তুবাব বিলক্ষণ চলিল। উষাকালে বাসরের মজ্‌লিস্ ভঙ্গ। কোন কোন নিদ্রালু বাসরবিলাসিনী নিদ্রাদেবীর কৃপায় সুখশয্যাশায়িনী হইলেন, সূর্য্যদেবকে সে মুখ দেখাইতে পারিবেন না বলিয়া কেহ কেহ উষার আবরণ থাকিতে থাকিতে বাসর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বরকন্যা নিদ্রাভিভূত।

বেলা চারিদণ্ডের সময় শুষ্ক মাল্যধারী, শুষ্কবদন, বাসী চন্দনচর্চ্চিত মাখনলাল বাহির বাটীতে দর্শন দিলেন। পুরোহিত বিদায়. অধ্যাপক বিদায়, চাপরাসী জমাদার বিদায়, পাঠশালার গুরুমহাশয় বিদায়, বারোয়ারীর পাণ্ডা বিদায়, নাপিত বিদায় প্রভৃতি অপরাপর নৈমিত্তিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। বেলা প্রায় দুইপ্রহর। অতঃপর ভোজের আয়োজন।

ক্রিমি।

Worms.

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় (সেনগুপ্ত)

ক্রিমি শুনিতে সামান্য ব্যাধি হইলেও অনেক সময়ে ইহা হইতে জ্বর বিকারাদি উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। ক্রিমি যখন চাগান দেয় বা উর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া উঠে,] তখন বক্ষে নানারূপ যন্ত্রণা হইতে থাকে, সময়ে সময়ে শ্বাস-রোধ হইয়া বা হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটায়। আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্রিমি হইতে নানপ্রকার চর্ম্মরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্যাধি কোনটাই ভাল নয়, উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতে মহান অনর্থ ঘটাইবারই সম্ভাবনা। রোগ, ঋণ, অগ্নি এই তিনকে প্রথম হইতেই একেবারে নির্ম্মূল করিতে হয়। গৃহের ছাদের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ যথাসময়ে উৎপাটিত না হইলে, সে যেমন কালে সুবৃহৎ অট্টালিকাকেও ভূমিসাৎ করে, তদ্রূপ ক্রিমি সামান্য ব্যাধি হইলেও, ইহা নানা ব্যাধির উৎপাদক হইয়া ক্রমে মনুষ্যের দেহ ধ্বংশ করে।

ক্রিমি অর্থে পোকা, এই পোকা অসংখ্য ও নানাজাতীয়। যে সকল ক্রিমি

বা পোকা আমাদের দেহের অভ্যন্তরে গাত্রে উৎপন্ন হয়, তাহারাই কথা এবং কি কারণে তাহারা উৎপন্ন হয় তাহাই কহিব।

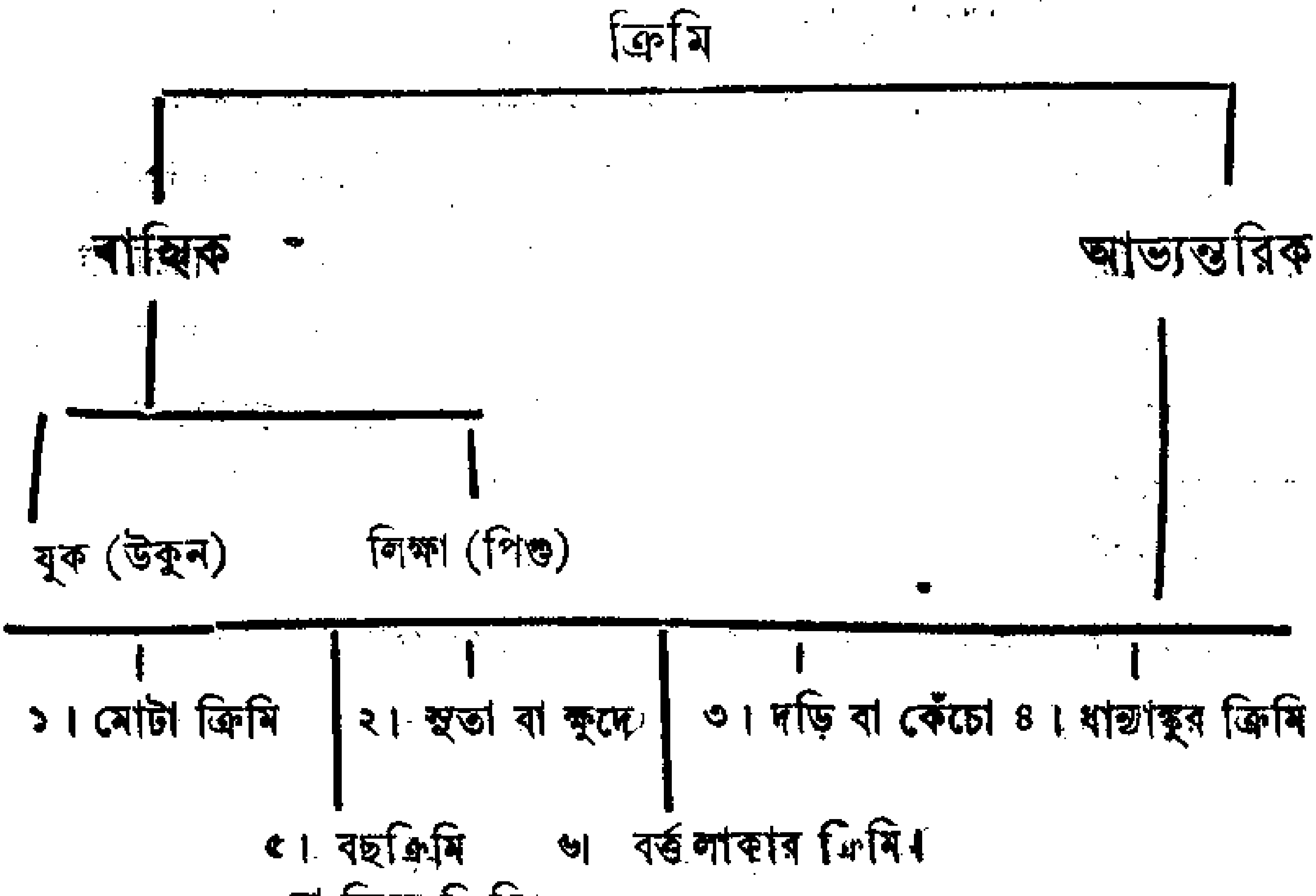
অজীর্ণের উপর ভোজন, গুড় ও পিষ্টকাদি ভক্ষণ, অধিক পরিমাণে নানা মিষ্ট দ্রব্য প্রত্যহ ভক্ষণ, অত্যধিক তরল দ্রব্য সেবন এবং অধিক অম্ল ভোজন জন্য দেহে ক্রিমি জন্মায় বা ক্রিমি রোগ হয়।

দেহের এই ক্রিমি বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। বহিঃ ক্রিমি আবার দুই প্রকার যূক ও লিক্ষা; এই দুই জাতীয় ক্রিমি যথাক্রমে কেশ বা বস্ত্র মধ্যে আশ্রয় লইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই যূক নামক ক্রিমিই চলিত কথায় উকুন, ইকুন বা নিঁকি নামে দেশভেদে আখ্যাত। লিক্ষা কীট যাহা মলিন বস্ত্র ও শরীরের ক্লেদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে চলিত কথায় পিশু বলে, ইহা প্রায়ই বাঙ্গালার জল হাওয়ায় জন্মে না। যাঁহারা নৈনীতাল প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা পিশুর কামড়ের কথা নিশ্চয়ই জানেন।

দ্বিতীয় বা অভ্যন্তরস্থ ক্রিমি আবার বহু প্রকারের হইয়া থাকে।—

১। কতকগুলি মোটা মোটা।
২। ,, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতার টুকরার মত।
৩। ,, দড়ির মত।
৪। ,, ধানের অঙ্কুরের মত।
৫। ,, ফিতার মত. গাঁট গাঁট কতকটা বৃশ্চিকের মত।
৬। ,, অতি সূক্ষ্ম পদহীন বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ।

ক্রিমি বিভাগ করিতে গিয়া আমরা অনেক প্রকার ক্রিমি পাইলাম।—



বাহ্য ক্রিমির দ্বারা অপর কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় না, তবে মস্তকের কেশ মধ্যে বা গাত্রে যে স্থানে উকুন ও পিশু লাগে, সে স্থানে সময়ে সময়ে চাপ্‌ড়া চাপ্‌ড়া ক্ষত হইয়া থাকে।

প্রথম পাঁচশ্রেণীর আভ্যন্তরিক ক্রিমি উৎপন্ন হইলে রোগীর অপাক, অরুচি, বমি, জ্বর, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ব্যথা, তরল ভেদ, সর্ব্বদা হাঁচি, নাক চুলকান দন্তে দন্তে ঘর্ষণ শব্দ এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে; অধিকন্তু রোগী কৃশ হইয়া পড়ে, সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা ও হৃদ্রোগের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পঞ্চম সংখ্যক বিহ্বা বা ফিতা ক্রিমি (Tape worm) জন্মিলে প্রায়ই রোগী অপস্মার রোগগ্রস্ত হয় (Epileptic)। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্রিমিগুলি প্রায়ই মলদ্বারে নামে এবং মলাশয়েই থাকে। অনেক ক্রিমি পক্বাশয়ে বর্দ্ধিত হয়; সেই গুলি অধিকাংশ সময়ে চাগান দেয়, উর্দ্ধে উঠিয়া নানা যন্ত্রণা দেয় এবং অত্যধিক সময় মুখ দিয়া নির্গত হয়। ফিতা ক্রিমি বা (Tape worm) ঔষধাদি সেবনেও প্রায়ই নির্গত হয় না। ইহার পশ্চাৎ ভাগের গাঁট ঔষধের দ্বারা এক একটী করিয়া খসিয়া মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়, সে গুলি দেখিতে ঠিক লাউ বীচির মত। সেই হেতু পশ্চিমে হিন্দুস্থানীরা এইরূপ ক্রিমিকে "কদ্দু-দানা" বলে। আমার কাশীতে অবস্থান কালে একটী খোট্টা লোকের এই জাতীয় ক্রিমি অনুমান করিয়া আমি চিকিৎসা করি। মাসাধিককাল ক্রিমির ঔষধ খাওয়ান এবং দুইবার জোলাপ দেওয়ার পর ঐ ক্রিমির পশ্চাদ্ভাগের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া মলের সহিত নিঃসৃত হইয়াছিল; তৎপরে তাহাকে বাটীর মধ্যে উঠানের একস্থানে মলত্যাগ করিতে ও জল ঢালিয়া মল পরীক্ষা করিতে উপদেশ দিই, ক্রমে একটি বা দুইটী লাউ-বীজের মত ক্রিমির গাঁট খসিয়া খসিয়া তিন মাসে লোকটী আরোগ্য হইয়াছিল। এই লোকটির মূর্চ্ছার ব্যারাম ছিল, ক্রিমি আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যারামও আরোগ্য হইয়া যায়।

প্রায় ৮বৎসর পূর্ব্বে আর একটী রোগী আমার হাতে আসে; লোকটি জীর্ণ শীর্ণ অজীর্ণ রোগগ্রস্ত এবং তাহার পেটে সর্ব্বদাই বেদনা ধরিত এবং মলাশয়ের ভিতর কি যেন একটা পদার্থ বায়ুগোলা মত ঠেলিয়া উঠিত, ক্ষুধা আদৌ ছিল না। প্রথমে তাহাকে অজীর্ণের ঔষধই দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল পাই নাই, কিছুদিন চিকিৎসার পর একদিন তাঁহার নিকট বসিয়া কথা কহিতে কহিতে

দেখিলাম সে নিজের অবস্থা বর্ণন করিতে করিতে ক্রমাগত নাসিকার মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া চুল্কাইতেছে। তখনই আমার তাহার ক্রিমি আছে, বলিয়া বোধ হইল, তাহাকে কিছু না বলিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম, পরদিন শুনিলাম, মলের সহিত অনেকগুলি ক্রিমি নির্গত হইয়াছে। ক্রমে আরও উগ্রতর ঔষধ দিতে লাগিলাম। প্রথমে মলের সহিত বহু ক্রিমি পরে গুলিসুতার মত একত্রে জড়ান বহু পরিমাণে শুদ্ধ সূক্ষ্ম ক্রিমি-বাহির হইতে লাগিল ; ৪।৫ দিনে অনুমান ॥• আধসেরের উপর ক্রিমি নির্গত হইয়া লোকটি নিরাময় হইয়াছিল। মোটা ক্রিমি গুলি প্রায় মেটে রঙ্গের, অনেকটা পাটকিলে রঙ্গের কেঁচোর মত এবং দড়ি ক্রিমি গুলি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু; কোনটির বর্ণ শ্বেত, কোনটির বর্ণ পীত। ৬ষ্ঠ সংখ্যক বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ অতি সূক্ষ্ম ক্রিমির কথা—যাহা উপরে কহিয়াছি, সে গুলি রক্তবাহিনী শিরার মধ্যে জন্মায় এবং উহারা কেশদদ্রু খালিত্য (চাক) এবং রক্ত বিকৃতি করিয়া দদ্রু (Ring worm) পামা (Eczema) বিচর্চ্চিকা (চুলকানি) ও কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত জন্মাইয়া দেয়।

তেলের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাখিলে, মস্তক গাত্রাদিতে ক্ষার সাবান প্রভৃতি মাখিলে বাহ্য-ক্রিমি নাশ হয়।

অভ্যন্তরের ক্রিমি নাশার্থে কতকগুলি মুষ্টিযোগ নিম্নে উল্লেখ করিলাম।—

১। চাঁপা ফুলের পাতার রস এক কাঁচ্চা ও চিনি ॥• আধ তোলা পরিমাণে উপর্য্যুপরি ৪।৫ দিন সেব্য।

২। আনারসের পাতার রস অথবা আনারসের রস চিনি সহ সেবনে ক্রিমি নির্গত হয়।

৩। খরসানি জোয়ান ॥• আধ তোলা হইতে ১ তোলা, ।• চারি আনা বিট্‌লবণের সহিত সেবন করিলে ছোট বড় সকল ক্রিমিই নির্গত হয়। খালিপেটে প্রাতঃকালে খাওয়াই উচিত। ৪।৫ দিন উপর্য্যুপরি খাওয়াইয়া একদিন জোলাপ লইলে আরও শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

৪। নারিকেল জলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া নিত্য সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৫। পলাশ পাপড়া, খরসানি জোয়ান, নাল্‌তে পাতা ও চিরতা প্রত্যেক ॥• আট আনা, একপোয়া গরম জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল সেব্য।

৬। বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৶• আনা, পলাশ পাপড়া চূর্ণ ৶• আনা, মিছরী চূর্ণ ॥• আনা,

একত্র করিয়া জল দিয়া খাইলে অথবা মধুসহ খাইলে বহুদিনের ক্রিমি নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্য।—খাদ্যের সহিত তিক্ত অথবা কটু (ঝাল) তরকারি, লোণতা খাদ্য, সজিনা ডাটা, ডুমুর, কচু, মানকচু, এই সকল খাদ্য উপকারী। ক্রিমি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে অন্ন বা রুটি, লুচি বন্ধ করিরা সাগু, বার্লি প্রভৃতি তরল ও লঘু খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

অধিক মিষ্ট দ্রব্য, শাক পাতাড়, পায়স, পুলিপিঠা পোয়া প্রভৃতি পিষ্টক ও তৈলে ভাজা জিনিষ, ভাজাপোড়া এবং কোষ্ঠবদ্ধকর খাদ্য নিষিদ্ধ।

লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মী।

নারীজাতি গৃহস্থসংসারের লক্ষ্মী, ইহা শাস্ত্রসম্মত এবং সর্ব্ববাদীসম্মত; কিন্তু এক এক স্থলে দু-একটি অলক্ষ্মীর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মীর আবির্ভাবে সংসারে যত সুখের সমাবেশ, অলক্ষ্মীর আবির্ভাবে ততই অসুখ, ততই উপদ্রব, ততই বিশৃঙ্খলা ততই পরিতাপ। বহু উদাহরণের মধ্যে নিম্নলিখিত গল্পটি এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

রঙ্গস্থল সহর কলিকাতা, বংশ কায়স্থ, পরিবারে শান্তি অশান্তির অভিনয়। দুই সহোদর; জ্যেষ্ঠ সদানন্দ, কনিষ্ঠ প্রেমানন্দ। সদানন্দ এক সওদাগরী আফিসে বেশী বেতনে চাকরী করেন, বেতনে ও উপরি রোজগারে মাসিক আয় প্রায় হাজার টাকা।

পরিবারের মধ্যে সদানন্দ নিজে তাঁহার স্ত্রী দুই পুত্র, এক কন্যা; এক জন দাসী, দুজন চাকর। বাবুগিরীর আসবাব, একখানি গাড়ী, দুটি ঘোড়া, একটি সহিস, একটি কোচম্যান।

প্রেমানন্দ চাকরী করেন না, কারবারে অনুরাগ। অধিক মূলধনের অভাবে বড় কারবার খুলিতে পারেন নাই, একখানি মুদীর দোকান করিয়াছেন, মাঝারি ধরণের দোকান। দোকানে তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই সংসার নির্ব্বাহ হয়। সংসারও ছোট নহে; আপনারা স্ত্রী-পুরুষ, একটি পুত্র, তিনটি কন্যা, একটি বিধবা পিসী, একটি বিধবা ভগ্নী, দুটি তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাগিনেয়, বাড়ীতে একজন চাকর, দোকানে একজন চাকর আর একজন সরকার। সরকারটি গস্ত করে, তাগদা করে, মুহুরিগিরীও করে।

জ্যেষ্ঠ সদানন্দ সহোদরের সহিত পৃথক, সদানন্দ কুপোষ্য পালনে নারাজ, সুতরাং বিধবা পিসী, বিধবা ভগ্নী ও ভগ্নীপুত্রেরা কনিষ্ঠের গলায় পড়িয়াছে। ভ্রাতার সহিত অন্ন পৃথক, কিন্তু বাটী পৃথক নহে; সদর দরজা পৃথক, ভদ্রাসনের মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ বাঁটোয়ারা-প্রাচীর।

সদানন্দের স্ত্রীর নাম মায়াবতী, প্রেমানন্দের স্ত্রীর নাম আশালতা। যে সংসারে যেমন আয়, সে সংসারে তদনুরূপ ব্যয় হওয়া সংসার-নীতি-সঙ্গত, কিন্তু এই দুই সংসারে সেই নীতির বিপর্যায় দৃষ্ট হয়। টাকার খাতিরে লোকের কাছে সদানন্দের উপাধি বড়বাবু, দোকানদার প্রেমানন্দের উপাধি মিত্তির মশাই। বড় বাবুর সংসারে শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক ছাড়া আত্মীয় কুটুম্ব আদর পায় না, কেহ প্রায় আইসেও না; অতিথি অভ্যাগতের নামগন্ধও নাই, পিতৃমাতৃ কার্য্যও নাই, পূজা-পার্ব্বণ অথবা ব্রতনিয়ম কিছুই নাই, এমন কি, ষষ্ঠিপূজা মনসাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা পর্য্যন্তও লোপাট; ভিকারীরা পর্য্যন্ত মুষ্টিভিক্ষা পায় না।

বড়বাবুর দ্বিতীয়পক্ষের সংসার; পুত্রকন্যা প্রথমপক্ষের; দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীটি রূপযৌবনসম্পন্না, বিশালকুলসম্ভবা, সর্ব্বলঙ্কার-ভূষিতা। আত্মসুখেই তিনি যেন রাজমহিষী। বাড়ীতে কোন জ্ঞাতিকুটুম্ব আইসে, ইহা তাঁহার মনোগত ইচ্ছা নয়। বড়বাবু তাঁহাকে ভয় করেন, দৈবাৎ কোন কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়ীতে আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে শীঘ্র তাড়াইবার চেষ্টা পান; কুটুম্বিনী হইলে মায়াবতী ঝমাঝম্ ঝগড়া বাধাইয়া দেন, একবেলা থাকিয়াই তাঁহারা ছুটিয়া পালান।

মায়াবতী অতিশয় প্রবলা, অতিশয় মুখরা, অতিশয় ব্যাপিকা, অতিশয় কর্কশ-ভাষিণী। তাঁহার মুখের তোড়ে অপরলোক একটি দিনও সে বাড়ীতে থাকিতে পারে না, দাসীচাকর তিষ্টিতে পারে না, প্রায় মাসে মাসে দাসীচাকর বদল হয়। অধিক কথা কি, মায়াবতী যখন মুখ ধরেন, তখন বাবুরও নিস্তার থাকে না। স্বামীকে নাকের জলে চোকের জলে করিয়াও সতী ক্ষান্ত হন না; সময় সময় শত মুখী পুরস্কারেরও ভয় দেখান। বড়বাবুর মহিষীটি এত বড় পতিব্রতা!

সপত্নীগর্ভের দুটি পুত্র, একটি কন্যা; গ্রাম্যকথায় মায়াবতীর সতীন্‌পো, সতীন্‌ঝি। তাহাদের প্রতি মায়াবতীর এত দূর স্নেহ যে, তাহারা সকল দিন দুইবেলা আহার পায় না; যে বেলা পায়, সে বেলাও উদর পূর্ণ হয় না। পাল-পার্ব্বণে তাহারা ভাল একখানি কাপড় পরিতেও পায় না; অথচ তাহাদের বাপের বার্ষিক আয় বারো হাজার টাকা।

পুত্রকন্যার যখন এত আদর, তখন আর দাসীচাকরের লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। স্বয়ং বাবুকেও মহিষীর নিকট গোলামের মত থাকিতে হয়। যাহারা কলহপ্রিয়া, বাড়ীতে শ্বাশুড়ী-ননদ অথবা দেবর-ভাশুরের পরিবারাদি থাকিলে তাহারা কলহ করিবার সূত্র পায়, উত্তম সূত্র না পাইলেও ঝগড়া বাঁধায়। সদানন্দের সংসারে সে সকল উৎপাত নাই, তথাপি একা মায়াবতীর দাপটে নিত্য কচ্‌কচি, খন্‌খন্‌, ঝন্‌ ঝন্‌, দিবানিশি ঝঙ্কার। ভয়ানক অলক্ষণ! বৎসরে বার হাজার টাকা ঘরে আসে, অথচ ঘরবাড়ী যেন অন্ধকার। লক্ষ্মী যেন পালাই পালাই ডাক ছাড়েন! সন্ধ্যাকালে মায়াবতীর ভয়ে প্রদীপের আলোটিও ভাল করিয়া জ্বলে না। এই প্রকৃতির গৃহিণীগুলির আখ্যা দিতে হয় অলক্ষ্মী।

প্রেমানন্দের স্ত্রী আশালতা, প্রকৃতই আশালতা। সেটি অতি সুশীলা, মধুরভাষিণী, লজ্জাশীলা, পতিপরায়ণা ও স্নেহবতী। তাঁহার অভ্যুদয়ে, আশালতা নামের ফলে সংসার ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইবার আশা হয়। দোকানে প্রেমানন্দের দৈনিক আয় উর্দ্ধ সংখ্যা দুটি টাকা; গৃহিণীর গুণে তাহাতেই কত লক্ষ্মী শ্রী। আহারের বন্দোবস্ত অতি পরিপাটি, ঘরগুলি দিব্য পরিষ্কার। বাবুর পিসী ও ভগ্নী ভাগ্নেগুলির যথেষ্ট আদর, চাকরদেরও সম্ভবমত আদরযত্ন। কর্ত্তাগৃহিণীর ব্যবহারে কেহই অসন্তুষ্ট নহে, সকলেই পরিতুষ্ট। মধ্যে মধ্যে কুটুম্বস্বজনের গতিবিধি আছে, তাঁহারাও পরমাদরে পাঁচসাতদিন থাকিয়া যান। সংসারের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারেন না যে, প্রেমানন্দের আয় তত অল্প।

সংসারে নিয়মিত নিত্যখরচ সুপ্রণালীতে নির্ব্বাহ হয়। তদ্ভিন্ন নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, ব্রতনিয়ম, লক্ষ্মীপূজা ও আগন্তুকসেবা যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভিকারীবৈষ্ণব ও সাধুসন্ন্যাসী আগমন করিলে যথাসম্ভব ভিক্ষা ও দান প্রাপ্ত হয়, কেহই বঞ্চিত হয় না। আশালতার মিষ্টবাক্যে সকলেই তুষ্ট হইয়া যায়।

আশালতা যখন সাংসারিক কার্য্যাবসানে একখানি ফর্শা কাপড় পরিয়া, দুএকখানি গহনা গায়ে দিয়া, সীমন্তে সিন্দুর পরিয়া, একগাল পান খাইয়া, সহাস্যবদনে বিশ্রামকক্ষে বসিয়া থাকেন, তখন তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, মূর্ত্তিমতি পদ্মালয়া কমলা পদ্মাসনে বসিয়া আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন।

বড়বাবুর পরিবারের লোকসংখ্যা করিবার সময় একটা ভুল হইয়াছে। তিনি বড় বাবু, তাঁহার মায়াবতী রাজরাণী, অতএব দাসীচাকর ব্যতীত তাঁহার বাটীতে এক

জন পাচিকা ব্রাহ্মণী আছে। বেশী টাকা আছে বলিয়া ব্রাহ্মণী রাখা হইয়াছে, ইহা কেহ মনে করিবেন না; রন্ধন করিতে গেলে মায়াবতীর বস্ত্রালঙ্কার ময়লা হয়, দেহের বর্ণ বিবর্ণ হয়, হারমোনিয়ম বাজাইবার সময় নষ্ট হয় নাটক নভেল পড়িবার সময়ও কুলায় না; কেবল ইহাই নহে, শরীরে ব্যাধি দেখা দেয়,—মাথা ধরে, গা ঘোরে, বমি হয়, একটু বেশী ধোঁয়া লাগিলে মূর্চ্ছা আইসে; সুখের শরীরে এত উপদ্রব! সেইজন্য মায়াবতী রন্ধনগৃহে প্রবেশ করেন না, কাজে-কাজেই পাচিকা আবশ্যক।

আশালতার সে সকল উপদ্রব নাই; লক্ষ্মীর সংসারে সে সকল উপদ্রব থাকিতেও পারে না, অতএব আশালতা স্বয়ং দুইবেলা রন্ধন করেন। বাড়ীতে তিনটি মাত্র বিধবা স্ত্রীলোক আছে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, তথাপি শরীর অসুস্থ না হইলে, আশালতা একদিনও তাহাদের একজনকেও রন্ধনকার্য্য করিতে দেন না। নিজেই যেন অন্নপূর্ণা; কটিতটে অঞ্চল-বন্ধনপূর্ব্বক স্বয়ং রন্ধন করেন, সহাস্যবদনে সকলকে পরিবেশন করেন, তাঁহার নিজের আনন্দ হয়, যাঁহারা আহার করেন, তাঁহারাও পরিতোষ প্রাপ্ত হন।

টাকায় শান্তি হয় না। টাকার মানুষ হইলেও সদানন্দের মনে শান্তি নাই। তিনি নিজে হয় ত শান্তি কামনা করেন, কিন্তু তাঁহার মায়াবতী সেই কামনাকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলেন! দুই সংসারের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবদর্শনে লোকে বুঝিতে পারে, সদানন্দের সংসারে অলক্ষ্মী, আর প্রেমানন্দের সংসারে যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী।

সদানন্দের সংসারে নিত্য অশান্তি। নিত্য অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইলে, মানুষ অধিক দিন বাঁচে না; সদানন্দ একদিন কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে আসিয়া অকস্মাৎ রক্তবমন করিলেন, তাঁহার অশান্তিময় জীবনবায়ু এক ঘণ্টার মধ্যেই বহির্গত হইয়া গেল। মায়াবতী শ্রাদ্ধশান্তি করিতে দিলেন না।

সংসারে আয়ের পথ বন্ধ হইল; নগদ যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, দুই তিন মাসে তাহা ফুরাইয়া গেল; মায়াবতীর অপব্যয়ে কুবেরের ধনও উড়িয়া যাইতে পারিত, অল্প সম্বল কতদিন টেকে? সংসারে বড়ই কষ্ট হইল, পুত্রদুটি নাবালক, চাকরি করিবার অযোগ্য। প্রেমানন্দ সেই অসহায় পরিবারকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন মায়াবতী মুখ বাঁকাইলেন, দোকানদারের ভাত খাইতে তাঁর রুচি হইল না;

মৃত সহোদরের সন্তানগুলিকে গৃহে রাখিয়া যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। তেজস্বিনী মায়াবতীর প্রাণে সে অপমান সহ্য হইল না; দেমাকের বিষানলে দগ্ধীভূত হইয়া তিনি একরাত্রে আপন শয়নগৃহে উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। অলক্ষ্মীর ক্রিড়া ফুরাইয়া গেল।

পুত্রের দ্বারা উপকার।

সুবোধ অবোধ উভয়প্রকার পুত্রবান পিতাই যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দেন, আশা থাকে, বৃদ্ধ অবস্থায় পুত্রগণের দ্বারা উপকার হইবে। আজ কাল সচরাচর যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সকল পিতার সে আশা পূর্ণ হয় না। ত্রেতাযুগে বিভীষণের শপথ ছিল, কলিযুগে শতপুত্রের পিতা হওয়া। তাৎপর্য্য এই যে, এক এক পুত্র এক এক প্রকার দুষ্কার্য্য করিয়া পিতার দুর্ণাম ও যন্ত্রণার কারণ হইবে, অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হইলেও পিতার অবাধ্য হইয়া বিবিধ প্রকারে পিতাকে কষ্ট দিবে। শতপুত্রের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র পুত্রও পিতার অবাধ্য হইয়া বিশেষ মনস্তাপের কারণ হয়। আধুনিক গৃহস্থসংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নহে, তবে ধনবান পিতার পুত্রেরা পিতৃবিয়োগে বিষয়াধিকারী হইবার আশায় বাহিরে কতকটা বাধ্যতা দেখায় বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের ভাব অন্য প্রকার। এক একজন পিতা পুত্রের দ্বারা উপকারের কিরূপ আশা রাখেন, তৎ-বিষয়ে একটি গল্প আছে; পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির বাসনায় সেই গল্পটি এ স্থানে গ্রহণ করা গেল :—

এক গ্রামে এক গৃহস্থ ছিল, তাহার অবস্থা ভাল ছিল না; গৃহস্থের নাম ছিল রামজীবন ঘোষ। গ্রামে একদল যাত্রাসম্প্রদায় ছিল, অধিকারী যথায় তথায় রাম-যাত্রা করিয়া বেড়াইত, রামজীবন সেই দলে হনুমান সাজিত। কালক্রমে সেই নরাত্মজ হনুমানের তিনটি পুত্র জন্মে; কষ্টস্বীকার করিয়াও রামজীবন সেই পুত্র তিনটিকে সময়োচিত লেখাপড়া শিখাইয়াছিল। জাতিতে অধম ছিল না, পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অর্থকরী বিদ্যাবলে ভাল ভাল কাজ করিতে আরম্ভ করে; এক জন উকীল, একজন ডাক্তার, আর একজন আড়তদার। ছয়সাত বৎসরের মধ্যে তাহারা বড়মানুষ হইয়া উঠে, সামান্য ঘরবাড়ী ছিল, কোটাবাড়ী বানায়

পূজার দালান প্রস্তুত করিতেও বাকী রাখে নাই, তিনজনেরই বিবাহ হইয়াছিল ; তিনটি বধূকে সাজাইতে তিনজনেরই বিলক্ষণ অনুরাগ। তাহাদের পিতা তখন আর স্বাধীন ছিল না, উপযুক্ত পুত্রগণের অধীন, সুতরাং বৃদ্ধ তখন আর যাত্রার দলে যাইতে পাইত না।

সংসার বেশ জলজলা। পাড়ার লোকেরা বৃদ্ধকে ধরিয়া বসিল, একজন বলিল "তোমার এখন সময় ভাল, ছেলেগুলি দশটাকা রোজগার করিতেছে, তুমি দুর্গা পূজা কর। উত্তম দালান হইয়াছে, শূন্য রাখা শোভা পায় না।"

পুত্রেরা প্রবাসে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিত, তাহাদিগকে পত্র লিখিয়া বৃদ্ধ সেই বৎসর নিজবাটীতে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিল। আশ্বিন মাস আসিল, প্রবাসী পুত্রেরা অবকাশ পাইয়া বাড়ী আসিল, ধুমধাম লাগিয়া গেল।

বৃদ্ধকে যাহারা দুর্গোৎসবে নামাইয়াছিল, তাহাদের বাড়ীর গৃহিণীরা আমোদ করিয়া সেই বাড়ীর গৃহিণীকে বলিল, "মহামায়ার পূজার অঙ্গ নাচগান; পূজার সময় তোমরা একদল যাত্রা রাখ।"

কর্ত্তাকে বলিয়া, পুত্রগণের মত করিয়া, গৃহিণী সেই প্রতিবেশিনীগণের অনুরোধ পালন করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেই গ্রামেই যাত্রার দল ; রামজীবনের বাড়ীতে নূতন দুর্গোৎসব, নূতন ঘটা, সেই পুরাতন যাত্রাদলের বায়না হইল। গৃহিণী তখন কর্ত্তাকে বলিল, তোমাদের সেই সাবেক দল যাত্রা করিবে, তুমি কিন্তু সে আসরে নামিও না। রামজীবন সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ষষ্ঠির নিশা অবসান, সপ্তমীর পূজা সমাপ্ত। দিবাভাগে অনেক লোকজন খাইল, রাত্রিকালে যাত্রা। প্রতিমার আরতি হইয়া গেল, গৃহিনী কর্ত্তাকে শয়নঘরের খাটের উপর শয়ন করাইয়া দ্বারের চৌকাঠের ধারে পাহারা রহিল।

রাত্রি এক প্রহর অতীত যাত্রা বসিল। আসরে সাজ বাজিল। আসরবন্দনা হইল, যাত্রা আরম্ভ।

রামযাত্রা। যোগীবেশে রাবণ আসিয়া সীতাদেবীকে হরণ করিল, রাম-লক্ষ্মণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে পঞ্চ বানরের সহিত মিলন করিলেন, সমুদ্রে সেতুবন্ধনের আয়োজন ; রাম ডাকিলেন, "বাবা হনুমান!"

আর কোথায় যায়! খাটের উপর হইতে কর্ত্তা লাফাইয়া পড়িল, দ্বারের দিকে

অগত্যার, দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়া গৃহিণী বলিল, "কি কর? কোথায় যাও? আসরে তোমার যাওয়া হইবে না, দশজন ভদ্রলোক বসিয়া আছে, উপযুক্ত ছেলেরা রহিয়াছে, আমোদ আহ্লাদ করিবে, তামাক টামাক খাইবে, সেখানে কি তোমার সং সাজা ভাল? ছেলেরা মানিবে কেন?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া কর্ত্তা বলিল, "মানিয়া ত রক্ষা রাখে না। রোজগার ক'রে বৌ সাজায়, বাবুগিরি করে, আমাকে গ্রাহ্যই করে না; ছেলেদের দ্বারায় উপকারের আশায় আমি জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি। এখনকার ছেলেরা বাপের কদাচিত উপকারে লাগে। এক এক জন এক একটা সামান্য উপকার করিতেও অবহেলা করে। এই দেখ না, তিন বৎসর হইল, আমার সখের লেজটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, গড়াইয়া দিতে পারিল কি? অল্প খরচে হয়, মেরামত করিয়া দিতে পারিল কি? ছেলেদের উপরোধ আমি রাখিব না; ঐ ভাঙ্গা লেজটি লইয়াই আমি আসরে নামিব, ভাঙ্গা লেজের জোরেই রামের কার্য্য সাধিব।"

গৃহিণী আটক করিয়া রাখিতে পারিল না, কর্ত্তা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ভগ্ন লাঙ্গুল দেওয়ালের গায়ে ঝুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া কটিদেশে জড়াইয়া রামজীবন লম্ফে লম্ফে আসরে গিয়া হাজির, আসরের রাম যখন আবার ডাকিলেন, "বাবা হনুমান!" রামজীবন তখন লাঙ্গুল উচু করিয়া লম্ফ দিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, হুম্‌কার দিয়া আস্ফালন করিয়া লম্ফে লম্ফে নাচিয়া অনেক খেলা খেলিল, তাহার পুত্রেরা লজ্জা পাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

পিতা হনুমান, তেমন দৃশ্য প্রায় অনেক ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রগণের স্বেচ্ছাচারে পিতা কাজেকাজে (লাঙ্গুলবিহীন হইলেও) ডারবিন পণ্ডিতের থিয়োরী সার্থক করিতে বাধ্য হয়। ঐ প্রকারের ভুক্তভোগী যে সকল হতভাগ্য পিতা এই কাহিনীটি পাঠ করিবে, তাঁহারা হয় ত মনের দুঃখে বনবাসী হইতে অভিলাষী হইবে। বর্ত্তমান কলিযুগে নারীপরায়ণ অবাধ্য পুত্রগণের পিতৃগণ যেন সত্য সত্যই হনুমানের অভিনয় করেন, এ কথা বলিলে কেহ আমাদের উপর রাগ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা অবাধ্য পুত্রের পিতা, তাঁহারা নিজে নিজেই এই কাহিনীর সত্যাসত্যতার বিচার করুন। এ বিচারের নমুনা বড় চমৎকার। যাঁহারা বিচারপতি, তাঁহারাই ভুক্তভোগী সাক্ষী।

আজকাল বঙ্গের অনেক উচ্ছৃঙ্খল পুত্র বৃদ্ধ পিতার অবাধ্য হইয়া নানাপ্রকার

(যাত্রার হনুমানের) ভগ্ন লাঙ্গুল মেরামত করিয়া দেয় নাই, তজ্জন্য তাহারা পিতার অবাধ্য, এবং তাহারা পিতার কোন উপকারে আসিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। মানহানিকর, ঘৃণাকর, লজ্জাকর কিম্বা অনিষ্টকর বিষয়ে পুত্র যদি পিতার মনোমত কার্য্যে অবহেলা করে, সে অবহেলায় তাহারা অপরাধী হয় না। যে সকল পুত্র পিতার আদিষ্ট সৎকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, সকল বিষয়ে কথার অবাধ্য হয়, পিতামাতাকে অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেয়, তাহারাই কুপুত্র ; এতৎ প্রবন্ধে যে দৃষ্টান্তটি প্রদর্শিত হইল, সে দৃষ্টান্তে রামজীবন ঘোষের পুত্রেরা কুপুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পিতাকে হনুমান সাজাইতে উৎসাহ প্রকাশ করে নাই বলিয়া তাহারা পিতার অবাধ্য হইতে পারে না ; পিতার পত্র প্রাপ্ত হইবা মাত্র প্রবাস হইতে গৃহে আসিয়া যাহারা ঘটা করিয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিল, অবশ্যই তাহারা সৎপুত্র। তাদৃশ পুত্রের দ্বারা পিতার কোন উপকার হয় না, এমন যাহারা মনে করেন, অবশ্যই তাঁহারা ভ্রান্ত।

রামজীবন ঘোষের দুঃখের অবস্থায় হনুমান সাজিবার খেয়াল ছিল, সং সাজিয়া আমোদ পাইত, বৃদ্ধাবস্থাতেও মনে মনে সেই খেয়াল জাগিতেছিল, পুত্রেরা সেই খেয়ালের আগুণে ঘৃতাহুতি দেয় নাই, সেজন্য তাহারা অপরাধী নহে, প্রশংসার পাত্র।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

১

পূর্ব্ব প্রেম-স্মৃতি হায় আত্মায় জড়িত
যদি না থাকিত, তবে কে কারে চাহিত ?
দেখ শত শত জনে
কেন নাহি ধরে মনে—
সেই সে যে ছিল আগে—তারে মন চায়—
আগে স্মৃতি চেনে—তবে মনেরে চেনায়!

২

পারাহীন-কাচ-মন—সে প্রিয় দরশে
নির্ম্মল দর্পণ হয়—যেন মন্ত্রবশে!
প্রিয়-প্রতিবিম্ব বুকে
লয়ে, সদা রহে সুখে
বাড়ব কি দাবানলে নাহি সে ডরায়—
শোভে শুচি শুভ্র তেজে নিজ গরিমায়।

৩

অচ্ছোদ-সরসিতীরে নবীনা যোগিনী—
শিলাতলে বসি বালা কেন বিষাদিনী?
অপ্সর-কুলের রত্ন, ভোগসুখে নাহি যত্ন,
অযত্নে রক্ষিত দেহ—তব রূপরাশি
শত শশী নিন্দে—রতি হয় আসি দাসী

৪

গলে হাত দিয়া দেবী তমালের তলে,
কার ধ্যানে আছে—মনে কিবা জ্বালা জ্বলে—
জ্ঞানাধার জড় মত, আঁখিবারি ঝরে শত,
কেবা ভাগ্যবান কারে চাহলো রূপসী,
কি দুঃখে মলিন তুমি পূরণিমা-শশি!

৫

কেবা ও ব্রাহ্মণ-যুবা—উন্মাদ যেমন,
আত্মহারা হয়ে করে কার অন্বেষণ?
কি যেন হারায়ে ছিল, বিধি পুন মিলাইল,
যোগিনী চেয়েছে বুঝি সেই হারাধন,
কাছে আসি দেখে যুবা এই সেই জন!

৬

বলে "কে সুন্দরি তুমি? নবীন যৌবন—
পরণে গৈরিক বাস—মলিন বদন!
তুমি যদি যোগ লয়ে, থাক এত দুঃখ সয়ে,
মনোসিজ, মলয়, অনিল কোথা যাবে?

৭

"দারুণ পিপাসা দেখ মরি ফাটে প্রাণ,
শীতল সলিল দেবি কর মোরে দান,
অনুমান হয় হেন, চির পরিচিত যেন,
নিজ জন পর হয় কে শুনেছে কবে ?
হয়োনা নিদয়া বালা ব্রহ্মহত্যা হবে।"

৮

হায় হায় পূর্ব্ব-স্মৃতি যাইবার নয়,
শম্ভু সম সে অমর নাহি তার লয়—
অলক্ষ্যে সে বিশ্বে ছুটে, সময়ে আপনি ফুটে,
যে যার সে পায় তারে—ধাতার লিখন—
কোন কালে এ বিধান না হবে খণ্ডন!

——o:•:o——

তত্ত্বমসি।

লেখক---শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

আরুণিতনয় শ্বেতকেতু বারবৎসর বয়সে গুরুগৃহে গমন করেন; তথায় বার বৎসরকাল অক্লান্ত পরিশ্রমে অদম্য অধ্যবসায়ে বেদপাঠ সমাপন করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে পিতার নিকটে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যাগত তনয়ের মুখে বিদ্যার বিমল জ্যোতির সহিত, ব্রহ্মচর্য্যের স্বাভাবিক পবিত্রতার সহিত, আত্মাভিমান মাখান দেখিয়া, শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু! সমস্ত বেদপাঠ সমাপন করিয়া যে অবিনয়, যে গর্ব্ব, যে অভিমান মনে মনে পোষণ করিয়াছ, আপনাকে সমস্ত বেদের বেদবেদাঙ্গাভিজ্ঞ মনে করিয়াও গর্ব্বিত হইয়াছ, ইহা কি তোমার গুরুর উপদেশ, ইহা কি তোমার বেদপাঠের ফল? এই শিক্ষার জন্য কি তুমি এতদিন গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে? যে বস্তু কেবল

করা যায় না? তাহা কি গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? গুরুদেব কি এ বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন? যাহা শ্রবণ করিলে কোন বিষয় অশ্রুত থাকে না, যাহার আলোচনা করিলে কোন বিষয় অনালোচিত থাকে না, যে বস্তুর জ্ঞান হইলে কোন বস্তুই অজ্ঞাত থাকে না, যাহা না জানিলে কোন বিষয়ও প্রকৃতরূপে জানা হয় না তাহা কি জানিয়াছ?"

শ্বেতকেতু।—পিতঃ! একবস্তুর জ্ঞান হইলেই সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, এ কথা ত শুনি নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?"

আরুণি।—যেমন এক মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে ঘট, শরাব, কলসী প্রভৃতি সকল মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, এক মৃত্তিকাই নামভেদে, রূপভেদে, অবস্থাভেদে নানা আকার ধারণ করে; কিন্তু সে ঘট, কলসী মৃত্তিকারই বিকার, মৃত্তিকারই স্বতন্ত্র বিকাশ, মৃত্তিকারই রূপান্তর জানিও। সে ঘট, কলসী কি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন? তাহা কি মৃত্তিকা নহে? যেমন একমাত্র সলিলের জ্ঞান হইলে, ফেন, বুদ্বুদাদি সলিলের বিকার, সকল বস্তুরই জ্ঞান হয়, সে ফেণাদি কি সলিল হইতে পৃথক; তাহা কি সলিল নহে।"

শ্বেত।—পিতঃ! এ কথা ত গুরুদেবের কাছে শুনি নাই; বোধ হয় তিনি এ কথা জানিতেন না। আমি তাঁহার অনুগত সেবাপরায়ণ-ভক্ত শিষ্য ছিলাম, আমাকে এ উপদেশ না দিবার ত কোন কারণ দেখি না, যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলেই সকল বস্তুরই জ্ঞান হয়; সে উপদেশ আমাকে প্রদান করুন।"

আরুণি।—"শোন বৎস! এই প্রকাশিত বিশ্ব যাঁহার পূর্ণতায় পূর্ণ, জগতের এ পূর্ণতা দেখিয়া যাঁহার পূর্ণতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যে পূর্ণতা না থাকিলে সকল বস্তুই অপূর্ণ; তিনিই পরম বস্তু। এই দৃশ্যমান জগত প্রপঞ্চ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে যিনি এক অদ্বিতীয় ছিলেন, এ জগত উৎপত্তির পূর্ব্বে যাঁহার মাত্র সত্ত্বা ছিল, তিনিই একমাত্র "সৎ"।

শ্বেতু।—"এক অদ্বিতীয় ছিলেন; এখন কি তবে তিনি এক অদ্বিতীয় নহেন? এখন কি তিনি সৎ নহেন; তবে কি তিনি অসৎ?"

আরুণি। "না। জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তিনি যেরূপ এক অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন। এখনও জগৎ উৎপত্তির পরেও সেই এক অদ্বিতীয় সৎ ই আছেন। তবে একটু পার্থক্য আছে।

এ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তাঁহার সত্বা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহার এ কার্য্য না থাকাতে তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য শুধু চৈতন্যময় ছিলেন; এখন তিনি এক হইয়া নাম, রূপ ও ক্রিয়াভেদে অনন্ত কোটী কোটী রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন; একমাত্র কারণ হইতে অসংখ্য কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। একটী মাত্র বটবীজ বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া লক্ষ লক্ষ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে; একমাত্র অগ্নির অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শ্বেত।—এক হইয়া বহু হইয়াছেন। তবে কি তাঁহার আকার আছে, অবয়ব আছে, যে কোটী কোটী হইবেন? অগ্নির আকার আছে, তাই স্ফুলিঙ্গ সম্ভব হয়; বটবীজের আকার, অবয়ব আছে তাই বটবৃক্ষ জন্মে। অংশ বা ভাগ না করিলে কি এক বহু হইতে পারে? আকার বা অবয়ব না থাকিলে অংশ বা ভাগ কি হইতে পারে? যদি অবয়ব ও আকার থাকিল, তবে তিনি একমাত্র সৎ ও অদ্বিতীয় হয়েন কিরূপে? এ সন্দেহ মিটাইয়া দিউন।

আরুণি।—এক হইয়া বহু হইয়াছেন, এ কথাটি দুই প্রকারে হইতে পারে,—একটী বিকার, অন্যটী বিবর্ত্ত।

যাহা নিজের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায়, তাহা বিকার; যেমন, দুগ্ধ হইতে দধি, নবনী ও ঘৃত জন্মিয়া থাকে, দুগ্ধ বিকৃত হইয়া ক্ষীর এবং দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এ ভাবে বহু হওয়া বুঝিলে অনেক দোষ হইয়া পড়ে, তোমার আপত্তিরও সম্ভব হয়। আর যাহা নিজের স্বরূপ ত্যাগ না করিয়া আপনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করে, তাহা বিবর্ত্ত। যেমন শুক্তিকায় রজত ভ্রম হইয়া থাকে, যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রম হইয়া থাকে। শুক্তিকা ও রজ্জু নিজ স্বরূপে (রজ্জু ও শুক্তিকা) থাকিয়াই রজত ও সর্প বিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন করিয়া দেয়—ইহা অজ্ঞানের ক্রীড়া, অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তিবশে এ ভ্রম জন্মিয়া থাকে। যখন রজ্জু ও শুক্তিকাকে রজ্জু ও শুক্তিকা বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন রজ্জু ও সর্প বিষয়ক ভ্রম আপনি কাটিয়া যাইবে, ইহাই বিবর্ত্ত। যখন স্বপ্নে অভিভূত থাক, তখন কি স্বপ্ন বলিয়া জানিতে পার? যখন সে স্বপ্ন ভাঙ্গিবে, তখন বুঝিতে পারিবে তাহা স্বপ্ন। যখন দিক্‌ভ্রমে পড়, পূর্ব্ব দিক্‌কে পশ্চিমদিক্ মনে ভাবিয়া থাক, তখন পূর্ব্ব-বুঝাইয়া দিলেও মনপ্রাণ ঐক্য করিয়া বুঝিতে পার না; যাহা ঠিক জানিতেছ

সমস্তই মায়া ; প্রপঞ্চ, স্বপনের মত পড়িয়া জগৎ রয়েছে অনাদি অনন্তকাল। তিনি ভিন্ন যাহা কিছু আছে, সে সকলের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সে সকলই স্বপ্ন মত ভ্রম, সকলি কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারের পরিণাম, ইহা বুঝাই সকল বুঝা জানিহ।

শ্বেত।—বুঝিলাম, এক অদ্বিতীয় আছেন, বুঝিলাম, তিনি বিকৃত হয়েন না, পূর্ব্বমত বিশুদ্ধ থাকেন কিরূপে? দুর্গন্ধ সংসর্গে স্বতঃ পবিত্র গন্ধবহও দুর্গন্ধ হয়েন, তবে কিরূপে নিত্য বিশুদ্ধ থাকেন এ কথা বুঝাইয়া দিউন।

আরুণি।—বায়ুর যে আকার আছে, সে জন্য দুর্গন্ধ বস্তুর সূক্ষ্ম কণিকা বহন করিয়া দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, এ দৃষ্টান্তটি ঠিক নহে। দেখ, আকাশ ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, পটের মধ্যে পটাকাশ, গৃহের মধ্যে গৃহাকাশ ইত্যাদি নানা রূপ নামধারণ করে। ঘট, পট, আকাশ ভাঙ্গিয়া ফেল, আকাশের সহিত ঘট, পটের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও, তাহাতে আকাশের কি? আরও দেখ, এক তপন সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শত সূর্য্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। সলিল চঞ্চল হইলে সলিল বিম্বিত সূর্য্য চঞ্চল হয়, তাহা বলিয়া কি সূর্য্য চঞ্চল হইল বলিবে, না সলিলের মালিন্য সে সূর্য্যে স্পর্শ করিল বলিবে? তবে তিনি নিত্য, শুদ্ধ, অবিকৃত অপরিনামী না হবেন কেন?

শ্বেত।—যখন তিনি দেহে থাকিয়া ফলভোগ করেন, সুখ দুঃখের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন, সে সংসর্গে তাঁহার কোন ইতর বিশেষ নাই, কিরূপে বুঝিব?

আরুণি।—ফল ভোগই বল আর সুখদুঃখ, স্বর্গনরক প্রাপ্তিই বল, অধ্যাস (আরোপ) ভিন্ন আর কিছুই নহে, মায়ার কার্য্য, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বাসনার বিকাশ, পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র।

শ্বেত।—অধ্যাস কাহাকে বলে, বুঝাইয়া দিউন।

আরুণি।—অগ্নির দাহিকা শক্তি লৌহে আরোপ করিয়া বলিয়া থাকি, "লৌহ দহতি"; লৌহ তাপ দিতেছে, আবার লৌহের গুরুত্ব গুণ অগ্নিতে আরোপ করিয়া বলিয়া থাকি, অগ্নিপিণ্ড ভারী, অগ্নিপিণ্ড গুরুত্ববান্; সেইরূপ মায়ার কার্য্য; অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া আরোপ করি। সেই আরোপের জন্য সেই মিথ্যা ভ্রমবশে আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি। প্রকৃত তিনি নির্ব্বিকার, নির্লেপ, সুখ দুঃখ বিমুক্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত।

শ্বেত।—যদি নির্লেপ তবে দেহত্যাগের পর আবার দেহ ধারণ করেন কেন?

সংস্কার বা পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য [illegible]

তবে তাহাতে বাসনা ও সংস্কারের মালিন্য স্পর্শ করিল না কই ?

আরুণি।—তুমি অন্ধকারে বৃক্ষশাখা নড়িতে দেখিয়া ভাবিলে প্রেতাত্মা;—ভয় জন্মিল, আবার দেখিলে দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া, তোমাকে ধরিতে আসিয়াছে; প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিলে; ভয় পাইলে বলিয়াই ত পলায়ন কার্য্য হইল; বৃক্ষশাখায় প্রেতভ্রম হইল বলিয়াই ত ভয় পাইলে। যদি বোঝ যে উহা বৃক্ষ-শাখা, তবে ভয়ও চলিয়া যাইবে; পলায়ন কার্য্যেরও নিবৃত্তি হইবে। আছে বলিয়াই কার্য্য, নাই ভাবিলে কার্য্য হইত না। জন্মকার্য্য সেইরূপ, সংস্কার থাকে, মনে করি, বলিয়াই থাকে; থাকে না বুঝিতে পারিলে কিছুই নহে। শূন্যের গাঁট, আকাশ কুসুম, মরুভূমি, মরীচিকা।

শ্বেত।—যাহা কিছুই নহে, যাহা আরোপ মাত্র, তাহা আছে ভাবা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ কেন? যাহা নাই, তাহা দ্বারা মানুষ বদ্ধ হয় কেন?

আরুণি।—মায়ার খেলা। অঘটন ঘটন, পটীয়সী, আবরণ বিক্ষেপ শক্তিমতী মায়ার খেলা।

শ্বেত।—আপনি বুঝাইলেন তবু আমি বুঝিতেছি না কেন?

আরুণি।—বলিয়াছি ত মায়া। মায়ায় আবদ্ধ থাকে বলিয়া বুঝা যায় না। সেই আরোপিত মিথ্যা সংস্কারের জন্য আপনাকে বদ্ধ ভাবা যায়। আর ঐ প্রকার ভাবাটাও মায়াবদ্ধ জীবের স্বভাব। মায়ামুগ্ধ মলিন অন্তঃকরণে সে জ্ঞান জন্মে না, মমন সলিলে কখনও প্রতিবিম্ব পড়ে না; যেখানে মায়া অথবা অজ্ঞানের রাজত্ব সেখানে এ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

শ্বেত।—সে মায়া কি?

আরুণি।—তাহা সিসৃক্ষা; সৃজন করিবার ইচ্ছামাত্র। যখন নিত্য বুদ্ধ, নিত্য জ্ঞান, চৈতন্যময় পরমব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন,—সেই ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া যখন এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশিত করিলেন; তখন তিনি এক হইয়াও মায়াবশে বহু হইলেন।* মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান একই কথা।

শ্বেত।—তবে ত ইচ্ছা বা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া সদ্বিতীয় হইলেন?

আরুণি।—প্রকৃত সদ্বিতীয় হয়েন না। তুমি কি তোমার ইচ্ছার সহিত মিলিত সদ্বিতীয় হইয়া হও? মায়া যখন তাঁহার ইচ্ছামাত্র—সে ইচ্ছা কি তাঁহা

*নদী যেমন খাল, বিল উপনদী সকলকে আপনার কুক্ষির ভিতর লইয়া অবশেষে, সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া আপনার সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, মায়াও তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ আপনাতে মিশাইয়া অবশেষে সেই পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া আপনার সত্তাটুকুও লোপ করিয়া ফেলে। সেই পরমব্রহ্ম বস্তুকে জান? তাহা তুমি। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!

গুরু-কৃপা।

লেখক—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

গান।

লুম্-ঝিঁঝিট কাওয়ালী।

আঁধার ঘরে আলো এলে, যায় কি আঁধার ধীরে ধীরে।
দপ্ কোরে কি হয় না আলো, হাসে না ঘর ফিরে ফিরে॥
হোক্ না কেন পাহাড় প্রমাণ, পাপের বোঝা যে পরিমাণ,
ফুঁয়ে উড়ে তুলোর সমান, গুরু-কৃপা হোলে পরে॥
হও রে মন ভক্ত-বীর, বিশ্বাসে অটল স্থির,
সঁপে দে সর্ব্বস্ব ওরে, গুরুপদে বুক চিরে॥

সত্যনিষ্ঠা।

লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে শকুন্তলার মত :—

দুর্ব্বাসা ঋষির শাপগ্রস্ত রাজা দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তখন শকুন্তলা কহিয়াছিলেন :—

মহারাজ! আপনি জানিয়া শুনিয়াও কেন সাধারণ লোকের মত এরূপ বলিতেছেন? যে আমি কিছুই জানি না, ইহাতে কি আপনার অনুমাত্রও শঙ্কা হইতেছে না? আপনাকে আমি সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিলাম, আপনি জানুন আর নাই জানুন, কিন্তু আপনার হৃদয় এবং মিথ্যা দুই জানে, অতএব যাহা আপনি ভাল বুঝেন, তাহাই বলুন, কিন্তু আমাকে অপমানিত করিবেন না।

যে ব্যক্তি একরূপে অবস্থিত নিজেকে অন্যরূপে প্রতিপাদন করে, তাঁহাকে আত্মাপহারী—চোর বলা যায়, তাঁহার দ্বারা এমন কোন্ পাপ আছে যে, অনুষ্ঠিত না হইতে পারে।

মহারাজ! আপনি মনে করিতেছেন যে, "আমি কেবল একক" বিধায়ে সর্ব্বদা জাগরুক, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্তর্য্যামী নারায়ণকে কি জানিতেছেন না? যিনি পাপ ও পুণ্যের সাক্ষী, তাঁহার নিকটে আপনি মিথ্যাকথারূপ পাপাচারণ করিতেছেন।

লোকে মনে করে, এই ত আমি একলাই ত পাপকর্ম্ম করিতেছি, কৈ? দ্বিতীয় আর কেহই ত আমাকে আর দেখিতেছে না, বা দেখিবে না? কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম, কেন না সেই পাপকার্য্য ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতারা এবং অন্তরাত্মাই জানেন; এবং আদিত্য, চন্দ্র, অনল, অনিল, আকাশ, ভূমি জল হৃদয় যম, দিবা রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও ধর্ম্মই লোকের সত্যাসত্যাদি জানিয়া চরিত্র থাকেন।

শকুন্তলার বাক্য শ্রবণান্তর রাজ্য দুষ্মন্ত বলিলেন;—

শকুন্তলে! কৈ? তোমাতে যে আমি পুত্রোৎপাদন করিয়াছি, তাহা ত আমার স্মরণ হইতেছে না, অতএব বোধ হইতেছে, প্রায় নারীজাতিই মিথ্যাবাদিনী; তখন তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে।

ইহা শুনিয়া শকুন্তলা কহিলেন :—রাজন্! সত্যধর্ম্ম হইতে প্রভ্রষ্ট পুরুষ এবং প্রকুপিত বিষধর দুই তুল্য, সুতরাং ইহাদের নিকট নাস্তিক আস্তিক উভয়েরই ভয়। রাজন! শাস্ত্রে আছে—একশত কূপ অপেক্ষায় বাপী শ্রেষ্ঠ, শতবাপী

হইতে "সত্য"ই শ্রেষ্ঠ, এক সময়ে ব্রহ্মা তুলাদণ্ডের একদিকে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ, অপর দিকে "সত্য" ধরিয়াছিলেন, তাহাতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হইয়াছিল।

মহারাজ! অধিক কি বলিব? সমগ্র বেদাধ্যয়ন এবং সমস্ত তীর্থ দর্শন, 'সত্যনিষ্ঠার" সমান হইতেও পারে, নাও পারে। দেব! সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্যের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ নাই এবং এ জগতে আর কষ্টকর কিছুই নাই। সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যই পরম বন্ধু, অতএব আপনি সত্যভ্রষ্ট হইবেন না। সত্যে মিথ্যার অপেক্ষায়ও আপনার রুচি হউক। আরও বলি, একান্তই যদি আপনার মিথ্যায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, আর আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে আমি আপন হইতেই চলিয়া যাইতেছি, কেন না, আপনার মত মিথ্যাবাদীর সহিত সংসর্গ কখনই কর্ত্তব্য নহে। (মহাভারত, আদি, ৭৪, ৯৬—১০৭)

সত্যনিষ্ঠায় ঔর্ব্বঋষির পিতৃ-লোকের মত।

এক সময়ে ঔর্ব্বঋষি ক্ষত্রিয়গণের ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের হত্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধানলে ত্রিলোক দগ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃ-পুরুষগণ সাক্ষাৎ হইয়া কহিয়াছিলেন হে বালক! ত্রিলোকের মঙ্গলার্থ তোমার এই ক্রোধানল জলে নিক্ষেপ কর, যে হেতু জলেই ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত আছে, জলই ত্রিলোকের কারণ এবং জীবন, সুতরাং তুমি সর্ব্বদা ক্রোধানলে জলকে উত্তপ্ত ও দ্রব রাখিলেই প্রকারান্তরে তোমার ত্রিলোক দগ্ধ করা হইল, তাহাতেই সত্যনিষ্ঠা অস্খলিত থাকিবে। মহাভারত আদি, ৮০।১৭

সত্যনিষ্ঠায় অর্জ্জুনের মত :—এক সময়ে বিশেষ কারণে পূর্ব্বকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দ্রৌপদী, সহকৃত যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, সত্যরক্ষার নিমিত্ত অর্জ্জুন বনবাসে প্রস্থানোদ্যত হইলে যুধিষ্ঠির দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—গুরুপভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রবেশেই অধর্ম্ম, জ্যেষ্ঠের গৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশ দোষাবহ নহে। ইহা শুনিয়া তখন অর্জ্জুন কহিলেন—মহারাজ! আমি আপনারই মুখে শুনিয়াছি, ধর্ম্মাচরণে ছল করা উচিত নহে। এখনও আমি এই অস্ত্র স্পর্শ-পূর্ব্বক সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতেছি—যে আমি কখনও সত্য হইতে স্খলিত হইতে পারিব না। মহাভারত, আদি ২১৩।২৪

আবার এক সময়ে অর্জ্জুন কহিয়াছিলেন :—

যদি আমার সত্যই বিচলিত হয়, তবে হিমালয় পর্ব্বতও বিচলিত হইবে, সূর্য্যও

প্রভাহীন হইবে, চন্দ্রও শৈত্যগুণ ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ আমার সত্যনিষ্ঠা কিছুতে নষ্ট হইবে না। সভা ৭৭।৩৫।

সত্যনিষ্ঠায় মার্কণ্ডেয় ঋষির মত :—

যুধিষ্ঠিরাদিকে বনবাসে ক্লিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিয়াছিলেন—হে তাত! নাভাগ এবং ভগীরথাদি নৃপতিগণ এই সাগরান্তা পৃথিবীকে শাসন করিয়াও কেবল সত্যের অনুরোধেই অভিভূত হইয়াছিলেন, "আমরা অতুল শক্তি-সম্পন্ন" ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন নাই। হে যুধিষ্ঠির! তুমি সত্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা এবং লজ্জাশীলতায় পৃথিবীস্থ সকলকেই অতিক্রম করিয়া, প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় তেজস্বিতা ও যশ উপার্জ্জন করিবে। মহাভারত, বন, ২৫।১২

সত্যনিষ্ঠায় দময়ন্তীর মত :—

যখন দময়ন্তীর কৃতনিশ্চয় হইল যে, ইন্দ্র, অগ্নি, যম বরুণকে পতি স্বীকার করিব না, কিন্তু নলকেই পতিত্বে বরণ করিব। তখন দেবগণ চক্রান্ত করিয়া নলরূপ ধারণ করিলে, দময়ন্তী তখন সভায় পঞ্চ নল দেখিয়া ভাবিতে লাগিল যে আমি কিরূপেই বা দেবগণকে চিনিব? আর কিরূপেই বা নলকে চিনিব? এই রূপে ব্যাকুলিতা ও অনন্য গতি হইয়া একমাত্র সত্যেরই শরণাপন্ন হইল, এবং কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল —আমি হংস মুখে নলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে যে সত্যতাপূর্ব্বক নলকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি, সেই সত্যের বলে দেবগণ নলকে আমায় চিনাইয়া দিউন।

আমি যদি সত্য সত্যই মনোবাক্যে নল ব্যতীত অন্যজনে পতি কামনা, করিয়া থাকি, সেই সত্যের বলে দেবগণ আমায় নলকে চিনাইয়া দিউন। যদি সত্যসত্যই দেবগণ নলকেই আমার পতিরূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যের বলে তাঁহারা আমায় নলকে চিনাইয়া দিন। যদি সত্যসত্যই আমি নলকেই পতিরূপে পাইবার জন্য এই স্বয়ম্বরব্রত আরম্ভ করিয়া থাকি, তবে সেই সত্যের বলে দেবগণ আমায় নলকে চিনাইয়া দিউন। মহাভারত, বন, ৫৭।১৭

—:•:—

ভক্তের জয়।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

"ভক্তের জয়" প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা—৪০ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সাল ১১ই চৈত্র। মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানি পরম সাহিত্যানুরাগী শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নামে উৎসর্গিত।

ভক্তের জয় গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ভক্ত কাহাকে বলে, তাহা বলিতে হয়,—(ভজ্+ক্ত) ভজ=সেবা করা; ভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

সচ্চিত্তামদগত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিতং তস্তুন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০ অং ৯ম শ্লোঃ।

যাঁহাদের চিত্ত কেবল আমাতেই রত, সেই সচ্চিত্তগণ এবং যাঁহাদের প্রাণাখ্য ইন্দ্রিয় সকল আমাকেই প্রাপ্ত অথবা যাঁহাদের জীবন আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এই প্রকার মদ্গত প্রাণ ঐ বিবেকী সকল পরস্পর আমাকে যুক্তিযুক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বোধ করান এবং আপনারা বোধ করিয়া ও মদীয় কীর্ত্তন বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সন্তোষপ্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ অনুমোদন দ্বারা তুষ্টিলাভ করেন এবং তদ্দ্বারা পূর্ণকামনা জন্য নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সংক্ষেপে এইরূপ ব্যক্তিই তাঁহার ভক্ত। ভক্তের আরও বহুবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহা বাহুল্য ভয়ে লিপিবদ্ধ হইল না। এবম্বিধ ভক্তেরই যে, সর্ব্বত্র জয় জয়কার প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় তদ্রূপ আটটী প্রবন্ধে সাতটী ভক্ত এবং একটী ভক্তিমতীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এই আটটী চিত্র শরৎকালীন নব মল্লিকার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। কৌমুদীস্নাত পবিত্র জাহ্নবী জলের লহরী-লীলা অবলোকন করিয়াছি, বসন্তের নবকিশলয়ে বালারুণ কিরণজালের খেলা দেখিয়াছি, কিন্তু প্রভুপাদের ভাষার ছটা সে সকলকে হারাইয়া দিয়াছে। বঙ্গবাসী পত্রের পাঠকগণ প্রতি সপ্তাহেই সেই পীযূষপানে ধন্য ধন্য হইতেছেন, তবে যাঁহারা তাহাতে বঞ্চিত, তাঁহাদের জন্য নিম্নে তাঁহার ভাষার তাঁহার লীলাময় ভাবের একটু নমুনা দিতেছি :—

"বিধাতারই লীলা। একটী বৃক্ষে দুইটী ফুল ফুটিতেছিল, আর অমনি কোথা হইতে দুরন্ত কীট আসিয়া তাহাদের বৃন্তে বাসা করিল। আহা! তাহাদের ভাল

করিয়া ফুটিতেও দিল না, তাহারা অল্প বিস্তর সুষমা ছড়াইয়া, সৌরভ বিলাইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। এইবার রঘুনাথ! তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে, তুমি ফোট। তুমি ভগবানের ভক্ত—পদ্মজাতীয় পুষ্প; দুঃখ দারিদ্রের প্রচণ্ড তপন তাপেই তোমার ফুটিতে হইবে। তুমি প্রস্ফুটিত হও! তোমার ঐ ছিন্ন মলিন বস্ত্রেই শৈবাল সংবৃত পঙ্কজেরই মত তোমার শোভা শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইবে। তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে। তুমি ফোট।”

ভক্ত না হইলে ভক্তিতত্ত্ব বুঝে না। প্রভুপাদ ভগবানের পরম ভক্ত, তাই রঘুনাথের ভক্তি বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-বারিধি উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে! “ভক্তের জয়” গ্রন্থে তাঁহাকে বেশ চিনিতে পারা গিয়াছে, তিনি সার্থক হইয়াছেন।

আটটী চিত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমটী গণপতি ভট্ট নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কর্ণাটের উত্তর খণ্ডবাসী, ; ভগবানে তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি আমাদের বাক্যমন ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, ইহাই গণপতির ধ্রুববিশ্বাস। তাঁহার কৃপা না হইলে জীবের মুক্তি লাভের উপায় নাই। ব্রাহ্মণ ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, নীলাচলে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সাক্ষাৎ করিতে পারিলে, পুনর্জন্ম নাই। একথাটি তিনি ব্রহ্মপুরাণ পাঠে অবগত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মদর্শনে অতি বড় ব্যাকুল হইয়া তিনি নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নীলাচল যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তিনি দেখিতে লাগিলেন—কত লোক জগবন্ধুকে দেখিয়া সানন্দচিত্তে ঘরে ফিরিতেছে, আবার কত লোক সোৎসুকচিত্তে তাঁহার দর্শনার্থ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দলে দলে নীলাচলাভিমুখে চলিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনে একটী বড় সন্দেহ জন্মিল, একজন প্রত্যাগতের সহিত তাঁহার বচসাও হইয়া গেল। ভগবান দৃষ্টিগোচর হইলে যখন পুনর্জ্জন্ম থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ ঘটে, তখন তাঁহারা সকলেই বিমুগ্ধ, ব্রাহ্মণের মন সন্দেহ-দোলায় বিষম দোদুল্যমান, ভাবনা চিন্তায় পথশ্রমে তিনি কাতর হইয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন—মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান ভক্তের মনের কথা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ব্রাহ্মণের প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়াই গণপতির মনে অনেকটা শান্তি জন্মিল। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তাঁহার নামধাম জিজ্ঞাসার পর তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন,—গণপতি ব্রহ্ম-পুরাণের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আপন মনের সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, আরও বলিলেন, ব্রহ্ম

নীলাচলে নাই, থাকিলে এত লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুক্তি পাইত, স্বশরীরে ফিরিত কেন ?

ভগবান্ ভক্তের কথা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ কল্পতরু, তাঁহার নিকট যে যাহা কামনা করে, সে তাহাই পায়। যাহারা পরব্রহ্ম হরিকে দেখিয়া ঘরে ফিরিতে চায়, তিনি তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া দেন, আর যদি কেহ কায়মনবাক্যে মুক্তি চায়, তিনি তাঁহাকে তাহাই দেন। ঠাকুর! তুমি আর দেরি করিও না, নীলগিরি গিয়া ব্রহ্ম দর্শনে চরিতার্থ হও।"

ভট্ট ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন,—সে দিন স্নানযাত্রা জগন্নাথদেব স্নানমণ্ডপে ছিলেন। ভক্তগণ নানাতীর্থ জলে তাঁহাকে স্নান করাইতেছিল। মহা আনন্দ কোলাহল। গণপতি ভট্ট মহাপ্রভুকে বারম্বার দর্শন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের তৃপ্তি জন্মিল না। তাঁহার বিশ্বাস গণেশেই ব্রহ্ম, যাঁহার গজবদন নাই তিনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া চলিয়া যাইতে ছিলেন, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পাশেই মুদিরথ (পাণ্ডা)নিদ্রা যাইতেছিল, তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন,—উত্তর দেশ হইতে আমার একজন ভক্ত পরমানন্দে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, তাহার ধারণা যাঁহার গজবদন নাই তিনি কখনও ব্রহ্ম নহেন। তুমি শীঘ্র গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আন। আর বল, যে "নিশ্চলনেত্রে দেখিলেই তিনি গজবদন দেখিতে পাইবেন।" মুদিরথ তাহাই করিলেন, কিন্তু ভট্ট তাঁহাকে নানা কথা শুনাইয়া দিলেন, তাঁহাকে মিথ্যুক প্রবঞ্চক ইত্যাদি নানাবিধ কটূক্তিও করিলেন, শেষে মুদিরথের নির্ব্বন্ধে ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন,—প্রভু জগন্নাথ গজানন হইয়াছেন, দেখিয়া প্রেমাশ্রুতে গণপতির গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে জগবন্ধুর স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন। জগন্নাথদেবে গণপতি মূর্ত্তি প্রদর্শনে গণপতি ভট্টকে দেখা দেওয়া অশাস্ত্রিক নহে। ভগবান্ গীতায় বলিয়া গিয়াছেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

যে যে প্রকারে ভজনা করে, আমি তাঁহাকে তদ্রূপ ফলপ্রদানদ্বারা অনুগ্রহ করি।

গণপতি ভট্ট, গণেশরূপে ভগবানকে ভক্তি করিতেন, ভগবান্ তাঁহাকে গণেশ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। [illegible]

নুযায়ী। প্রভুপাদ গোস্বামীমহাশয়ের চোস্ত চৌরষ ভাষার গুণে গণপতি ভট্টের চিত্র অতি স্পষ্ট ও সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। কি জানি তাঁহার ভাষার কি অপূর্ব্ব মনোহারিত্ব বৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখকের স্নায়বিকার গ্রস্ত (?) নয়নযুগল প্রবন্ধটী পাঠ করিতে করিতে প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। ধন্য প্রভুপাদ, ধন্য তাঁহার চরিত্রগঠন শক্তি। গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হইয়াছে। ভগবানের গণপতি মূর্ত্তি ধারণে ভক্ত গণপতি ভট্ট তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে। অতএব ভক্তেরই জয়—জয় জয়কার। শক্তিসাধক রজোগুণ সম্পন্ন— তিনি জগদম্বাকে জোর করিয়া বলিয়াছে

"দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ॥"

এখানে ভক্তের জয়ের কথা বই আর কোন কথাই নাই।

—o-:•:-o—

সমালোচনা।

মেঘদূত।—চুচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কৌতুহলে উল্লাসিত হইয়া আমরা এই পুস্তিকার কবিতাগুলি পাঠ করিলাম। বাবু নিতাইচাঁদ শীল নূতন কবি, ইঁহার নামটিও আমরা এই নূতন দেখিলাম। কালিদাসের মেঘদূত সংস্কৃত কাব্য ভাণ্ডারের একটি মহার্ঘরত্ন, বঙ্গীয় ভাষায় ইহার পদ্যানুবাদ সরল হইবে, এই আশা সহসা আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল, দুঃখেয় বিষয়, পূর্ণাংশে সে আশা পরিতৃপ্ত হইল না। মেঘদূতের আভা ইহাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কবিতাগুলি আশানুরূপ সরল হয় নাই। "হায়, মরি, বিরহ নবঘন জলধর যক্ষ, রামগিরি" পুনঃ পুনঃ কেবল এই কথাগুলি সাজাইতে পারিলেই কবিতা হয় না। নবীন কবি বোধ হয়, এই সার তত্ত্বটি ভাবিতে পারেন নাই; স্থানে স্থানে শোচনীয় যতি পতন হইয়াছে। আশা করি নবীন কবি ভবিষ্যতে এই বয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কাব্যের মাধুরী রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন। এক এক স্থলে কিছু কবিত্বের ছায়া পড়িয়াছে, সেই অংশ গুলি কিছু মধুর বোধ হইল। কবি এই কাব্য রচনায় কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। মূল্য আট আনা।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১শ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তির একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস।

লেখক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

চরকসংহিতার দীর্ঘ জীবিতীয় নামক প্রথম অধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহাতে লিখিত আছে,—কি অবস্থায়, কেন, কোন্ সময়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ভারতে উদিত হইয়াছিল। যাঁহারা চরক ও সুশ্রুত সংহিতাকে ব্যাকরণের "সূত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা না করিয়া, একটি প্রাচীন জাতির মহতী কীর্ত্তির ইতিহাস স্বরূপ অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, চরক সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার (অতি শোচনীয় হইলেও) একটি

যথাযথ চিত্র। মধ্য এশিয়া কিম্বা এশিয়ার অন্যান্য প্রদেশ বিশেষে যখন আয়ুর্ব্বেদ Therapeuntics of fancy হইতে বিযুক্ত হইয়া Rational therapeutics এর উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতেছিল সেইসময়ে ভারতবর্ষের লোক প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে, প্রকৃত চিকিৎসকের অভাবে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্থ যে, সে কথা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। শুভ হিমবতের প্রস্থদেশে বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত তৎকালীন ৫২ জন খ্যাতিনামা ব্যক্তি (৯২) কেহ যয, কেহ শালিন, কেহ দেবর্ষি,কেহ মহর্ষি, কেহ ঋষিকুমার (৯৩) একত্র সমবেত হইয়াছেন, উদ্দেশ্য—সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন, মানব-সমাজে, ঋষি-সমাজে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের বিঘ্নভূত যে সকল রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রজাপুঞ্জকে বিধ্বস্ত করিতেছে, তাহাদের শমোপায় কি ? (৯৪) ভারতবর্ষের মধ্যে তাহারা এমন একজন লোকও খুজিয়া পাইতেছেন না, যিনি ত্রিসূত্রীয় ত্রিস্কন্দ আয়ুর্ব্বেদ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে সক্ষম। নিরুপায় হইয়া শেষে তাঁহারা ধ্যানযোগে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এ অভাব দুর করিবার একমাত্র উপায় ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া সেখান হইতে যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ শিক্ষা করিয়া আসা। যুক্ত ব্যপাশ্রয় বলিতেছি, তাহার কারণ, দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসার অঙ্গ স্বরূপ—মন্ত্র, ঔষধি মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত, গমনাদির (৯৫) এ দেশে তখন অভাব ছিল না। ৫২ জন প্রধান প্রধান ঋষি হিমবৎ সমিতিতে যে কয়জন উপস্থিত ছিলেন, আমরা জানি তাহার মধ্যে অধিকাংশই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। অগস্ত্যের সুপ্রসিদ্ধ বিষনাশন "কঙ্কত, অকঙ্কত, সতীন কঙ্কত" মন্ত্র কে না জানে ? (৯৬) কেবল মন্ত্র নহে, "স্পর্শ"ও তখন কাশ্যপাদি ঋষিদিগের নিকট চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। ৯৭।

বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস স্বস্ত্যয়ন তখন দেশে অভাব ছিল না ৯৮। এত থাকিতেও দেশ হাহাকারপূর্ণ; সকলেই ভাবিয়া আকুল। এই মহান অনর্থের প্রতিবিধান কি ? ৯৯। ত্রিসূত্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কথা তখন সকলের মনে পড়িল। কিন্তু মনে পড়িলে কি হইবে,—দেশে এমন একটি লোক নাই, যিনি যুক্তব্যপাশ্রয় ভেষজের অঙ্গস্বরূপ' অন্ত পরিমার্জ্জন, বহিঃ পরিমার্জ্জন, শাস্ত্রপ্রণিধান (১০০) ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। একজন আছেন বটে, কিন্তু তিনি দূরে—অতি দূরে। অস্কৃতি লোকের অগম্য ঋষিদিগের পূর্ব্বনিবাস গঙ্গা প্রভবন স্থান এই মহাপুরুষের ত্রিপিষ্টক রাজ্যের সীমাভুক্ত হইলেও তাহার রাজ-

ধানী ঋষিবরা অনেক দূরের পথ।১০১। বদরিকাশ্রম পার হইয়া অলকনন্দার ধারে ধারে দেবযানের অন্যতম পথে যাত্রা করিলেও তাঁহার বাসভবন নন্দনকাননে উপনীত হইতে তিনটী পিষ্টপ, তিনটি উচ্চ, দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গ একে একে অতিক্রম করিয়া তবে সেখানে যাইতে হয়। প্রথমতঃ হিমবান্ ও কৈলাস পর্ব্বত পার হইয়া অলকনন্দার কূলে কূলে উত্তরাদে মানস সরোবরে যাইতে হয়, সেখান হইতে হেমকূট বা শৈলরাজ পার হইয়া, গন্ধমাদনের দক্ষিণে অমরাধিপতির নিবাস গৃহ। কিম্পুরুষবর্ষ এবং হরবর্ষের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষে মঙ্গোলিয়ায় গমন না করিলে আর এ স্থানে উপনীত হইতে পারা যায় না। এতদূরের পথ! তাই সমবেত ঋষি মণ্ডলী পরস্পরের মুখ চাওয়াচাহি করিতেছিলেন, কে সেখানে যাইবেন? এমন সময় ঋষিসমিতির একপ্রান্তে উপবিষ্ট একটি ব্রাহ্মণযুবক সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অসমসাহসিকতার সহিত বলিলেন, "আপনারা আজ্ঞা করুন, আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।" ১০২। জয় ভরদ্বাজের জয়! এই শুভ মুহূর্ত্তের! ব্রাহ্মণের ইহা বাস্তবিকই একটি গৌরবের দিন! দৈব ব্যপাশ্রয় চিকিৎসা স্থানে যুক্তি ব্যপাশ্রয় চিকিৎসার প্রাধান্য সংস্থাপন এই ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া এখনও দণ্ডায়মান। আসুন যেখানে যত চিকিৎসক আছেন, সকলে একত্রে আজ সানন্দে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলি, জয় ভরদ্বাজের জয়! নিজে দীর্ঘ জীবনের প্রার্থী হইলেও, ভরদ্বাজের এই স্বার্থ পরার্থের মধুময় অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে ইহাই ভরদ্বাজ-যুগ।

ভারতে Rational therapentics এর ইহাই উদয়কাল। ঋষিদিগের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া ভরদ্বাজ যথাসময়ে ইলাবৃতবর্ষে ইন্দ্রভবনে উপনীত হইয়া জনসাধারণের দুর্গতি এবং ঋষিদিগের অনুরোধ ইন্দ্রসমীপে নিবেদন করিলেন।

প্রজার দুঃখে চিরদুঃখী, প্রজাহিতব্রতে চিরব্রতী ইন্দ্র, (১০৩) তাই সহস্র দোষী হইলেও ভারতবাসী তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; তাই পুণ্য-প্রাচীন বেদের সূক্তের পর সূক্ত তাঁহারাই যশোগানে পরিপূর্ণ। ইন্দ্রও ভরদ্বাজের মুখে প্রজাপুঞ্জের দুর্গতি কথা শুনিয়া তদ্ দুঃখে দুঃখিত হইয়া, ঋষিদিগের প্রার্থনানুরূপ ভরদ্বাজকে ত্রিসূত্রীয় ত্রিস্কন্দ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। (১০৪) এবং সেই সঙ্গে হেতুসূত্র লিঙ্গসূত্র ঔষধ সকল "পদৈস্ত্র" (যেখানে যেটুকু আবশ্যক) একে একে তৎ সমুদায় ভরদ্বাজকে বুঝাইয়া দিলেন। ১০৫।

বিপুলমতি ভরদ্বাজের সূত্র সকল বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না; তিনি অল্প

কালের মধ্যে গুরুমুখোদগীরিত বাক্য সকল কণ্ঠস্থ করিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন। এতদিন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ত্রিদিবলোকে অমৃতের পার্শ্বে দ্বিতীয় অমৃতরূপে অধিষ্ঠিত ছিল, ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক ভৌম্য স্বর্গ মধ্যএসিয়া হইতে এই অমৃত সযত্নে আহৃত হইয়া সর্ব্বপ্রথম মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ ভারবর্ষে ইহা আনীত ও প্রচারিত হয়।১০৪। ভারতবর্ষে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অভ্যুত্থানের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ দেবযানের অন্যতম পথ —অলকনন্দার তটভূমি দিয়া ভরদ্বাজ যুগে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়, আর প্রথম সংস্করণ আয়ুর্ব্বেদের প্রবেশ পথ অলকনন্দার প্রবাহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান আমুদরিয়ার তটভূমি প্লাবিত করিয়া এই আদি বিজ্ঞানস্রোত যখন বামিয়ান গিরিবত্মোর অভিমুখে নামিয়া আসে, তখন অগস্ত্য অশ্বিনীদ্বয় প্রমুখ ভাস্কর শিষ্যমণ্ডলী ভগীরথের ভাগীরথীর ন্যায় ইহার অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শক হইয়া,বৈবস্বত মনুর রাজধানী প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ-সিংহাসনে পৌঁছিয়া দেন। ইহার পর মহান্ অনর্থকর দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। আমাদের মনে হয় এই যুদ্ধ কেবল মাত্র দেবাসুরের তপ্ত শোণিত পাতে পর্য্যবসিত হয় নাই, ইহার সঙ্গে ভাস্কর চতুষ্পাটির গৌরবসূর্য্যও, চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়া যায়। "দেব ইন্দ্র দেব নজ্যত্য দেব সৌরুকে, গ্রাম হইতে পল্লী হইতে, দেশ হইতে, সমগ্র পৃথিবী হইতে" বিদূরিত করিবার চেষ্টা, (১০৫) আর যুক্তি ব্যপাশ্রয় চিকিৎসার মূলে কুঠারাঘাত করা একই কথা। অন্তঃ পরিমার্জ্জন, বহিঃ পরিমার্জ্জন, শাস্ত্র প্রণিধান একদিকে, আর মন্ত্র, ঔষধি, মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত, গমন আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই একাদশ অধিকার আর একদিকে —বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে যুদ্ধ, লোকে না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, না জানিয়া দেবাসুরে যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছে। দেবাসুরের যুদ্ধ কেবল যে প্রাচীন মানব সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়ছিল, তাহা নহে, বিজ্ঞানও ইহাতে সমূলে বিধ্বস্ত হয়। এখনও এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে সংগ্রাম যে কোন পল্লীগ্রামে প্রবেশ কর, দেখিবে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। দুইটি বিপক্ষদল, দুইজন চিকিৎসককে মধ্যকেন্দ্রে বেষ্টন করিয়া পরস্পরের সহিত বিবাদমান। কেবল গ্রামে গ্রামে নহে, আপনার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেখানেও দেখিবে এই সমরানল প্রজ্জ্বলিত দেখিবে একই রোগী—একদিকে যুক্তি ব্যপাশ্রয় ভেষজে তাহার রোগ প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে, আর একদিকে বলি, উপহার ঔষধি মণিমঙ্গল হোম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, মন্ত্র, প্রণিপাত তাহারও

অভাব নাই। একদিকে পুরোহিত অন্যদিকে রসবিশারদ বৈদ্য। এখন পুরোহিত ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া রোগীর গৃহে পদব্রজে প্রবেশ করেন, বৈদ্য সম্মুখে সদর দরজায় অশ্বযান হইতে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থিত হয়েন। এখন পুরোহিত বৈদ্যের নিম্নে, পুরোহিত বৈদ্যের নিকট পরাস্ত। কিন্তু প্রাচীন আর্যসমাজে বৈদ্য, এবং পুরোহিত আপন আপন প্রভুত্ব সংরক্ষা করিবার জন্য পরস্পরে রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল, মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত আর রসবিশারদ বৈদ্য ইহাদের মধ্যে পুরোহিতই সমরবিজয়ী, বৈদ্যকে পল্লী হইতে গ্রাম হইতে, দেশ হইতে লাঞ্ছিত হইয়া নিভৃতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। রাজার সহস্র চেষ্টাও ইন্দ্রের মানস সরোবরে পলায়ন প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।১০৬। প্রাচীন ইরানী জাতির প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক অবস্তাগ্রন্থ খুলিয়া দেখুন, দেখিবেন

"If several healers offered themselves together, ospithaa qora thustra ! namely, one who heals with herbs, and one who heals with the holys words (ie, bey spells), it is this one who will best drive away sickness from the faithfull."

সেখানে উজ্জ্বল অক্ষরে এই কথাই লেখা আছে।

তাই বলিয়াছি দেবাসুরের যুদ্ধ কেবল যে উষ্ণ শোণিতপাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে, রাজার সহস্র চেষ্টা সত্বেও স্ববৈদ্যদিগের সঙ্গে বিজ্ঞানের রক্ষক Physics এর আশ্রয়, রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা, বিদ্যুত ও বজ্রের অধিপতি মহাপুরুষ ইন্দ্রকে পুরোহিতদিগের হস্তে লাঞ্ছিত, অপমানিত অপযশ শেষ পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। যখন বরণপ্রদেশে যজ্ঞ করিয়া বরুণের সাহায্যে পুরোহিত আপ্ত্য ত্রিত অহিদাহককে নিহত করেন। তখন যজ্ঞই জয়যুক্ত হইয়াছিল। ১০৭। জয়যুক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আপ্ত্যত্রিতের সেই সকল। Tavids (formauls of excrasm) ১০৮।

দেবাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্মার প্রথম সংস্করণ আয়ুর্ব্বেদ যাহা ভাস্কর সম্প্রদায়ের হস্তে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া মৃতসঞ্জিবনী শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, যাহার বলে বলীয়ান হইয়া প্রাচীন ঔপনিবেশিকেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন জলবায়ুর বিশক্তি একদিনও অনুভব করেন নাই; সেই আয়ুর্ব্বেদ তাঁহাদের ১৪শ উপনিবেশ বরুণপ্রদেশ হইতে, rational therapeutics হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র ডাক্তার লডার ব্রুণ্টাণ যাহাকে therapeu of fancy

বলিয়াছেন) সেই ঝাড়া ফুকা জলপড়া মাহুলী, মন্ত্র এবং প্রায়শ্চিত্তে পরিণত পৰ্য্যাবসিত হয়। তার পর যখন প্রাচীন উপনিবেশিকগণ বরণভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের ষোড়শ উপনিবেশগণ সিন্দুতে আগমন করেন, সেই সময়ে দুর্ভাগা ভারতের যে ইহাদের সঙ্গে এদেশে যে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রবেশ করে, তাহা যুক্তি ব্যপাশ্রয় বিহীন, কতকগুলি স্তুপার মন্ত্ররাশি।

ঋগবেদের প্রাচীনতম অংশে অশ্বিনীকুমার জয়যুক্ত, আর ইহার আধুনিক সুক্ত সকলে, আমরা দেখি কে যেন জোর করিয়া যুক্তির পরিবর্ত্তে দৈবচিকিৎসার মন্ত্রভাগ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন তমো অংশে ত্রিধাতুজ্বরযুক্ত আর আধুনিক অংশে পাপদেবতা নিঋতি কিম্বা পূর্ব্ব জন্মকৃত অপরাধ সর্ব্ববিধ রোগের হেতুরূপে দণ্ডায়মান।১০৯। কিন্তু এ সময়ে নূতন নূতন রোগের আবির্ভাবে, তাহাদের প্রতিকার দৈবব্যপাশ্রয় আর কুল পাইতেছিল না। ভরদ্বাজযুগে ৫২জন প্রধান প্রধান ঋষির চিন্তাকুল ম্রিয়মাণ মুখ, স্মরণ করিলে, কাহার মনে না হয়,তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাঁহাদের theory of rcmon djscare কিম্বা theory of di c.e as punishment for the sin commilled in past lifeএবং সেই অনুযায়ী মন্ত্র, মণি, প্রায়শ্চিত্তাদি দৈবপ্রতিকার সর্ব্বব্যাধি বিনাশক নহে। ফলতঃ এতদিনে যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা মনে করিয়া আসিতে ছিলেন, ভূতাবেশ কিম্বা পূর্ব্বজনমকৃত অপরাধ; সমস্ত ব্যাধির উৎপত্তির হেতু, এখন সে ভ্রম দূর হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন—দৈব ব্যপশ্রয়ের একটা ক্ষুদ্র সীমা আছে, যাহার পরপারে যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ ভিন্ন আর গতি নাই। ঋষিদিগের ম্রিয়মাণ চিন্তাকুল নয়ন, মন্ত্র, ঔষধি, মণি মঙ্গলের পরাজয় সংবাদ।

ফলতঃ গ্রাম হইতে পল্লী হইতে, দেশ হইতে দেব ইন্দ্র, দেব নভ্যতা, দেব সৌরুকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিস্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টা অবধি ভরদ্বাজ যুগের উদয় কাল পর্য্যন্ত ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তামসযুগ (dark age)।

আপ্ত্য ত্রিতনের তবিদ্ Tavids বাণিবিদ্ সকলকে মধ্যকেন্দ্র করিয়া এই তামস যুগের উদয় হয়।১০৯। আর এই যুগের অবসান, শুভ হিমবৎ পার্শ্বে ৫২ জন প্রধান প্রধান ঋষির সোৎকণ্ঠ সমাবেশে। ইহারই পর পুণ্য ত্রিসূত্রের ত্রিস্কন্দ আয়ুর্ব্বেদ যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজের অঙ্গস্বরূপ অন্তঃপরিমার্জন এবং শাস্ত্রপ্রণিধানকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া ভরদ্বাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভৌম্যস্বর্গ হইতে

অলকনন্দার তটভূমি দিয়া দেবযান বদ্‌রিকাশ্রম পথে (১১০) মর্ত্ত্যলোক ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়।

ভরদ্বাজের প্রত্যাগমনে অনেকানেক ঋষি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষালাভ করিয়া পরম সুখ ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছিলেন।

——০-:•:-০——

বকুল কুমারী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দম্পতি-জীবন।

লেখক——শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

বিবাহের পর দ্বিতীয় রাত্রিটি এ দেশে কালরাত্রি নামে অভিহিত; সে রাত্রিতে বরকন্যার পরস্পর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।

তৃতীয় রজনীতে ফুলশয্যা হইয়া গেল। বউভাত হইল না; ঘরের মেয়ে ঘরে রহিল, সুতরাং জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজনার্থ পাকস্পর্শের প্রয়োজনাভাব।

ইহার পর যৌতুকের ব্যবস্থা। ভদ্রাসনের অদূরে কন্যাজামাতার বাসের নিমিত্ত গৌরীবাবু কন্যাকে একখানি স্বতন্ত্র বাটী দান করিলেন; দাসীচাকর, পাচিকা ও দ্বারবান নিযুক্ত হইল। বকুলকুমারীর নামে বাঙ্গালব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা (কোম্পানির কাগজ) জমা রহিল; তাহার সুদ হইতে কন্যাজামাতার সমস্ত খরচপত্র নির্ব্বাহিত হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত। বাটী অথবা কোম্পানীর কাগজ দানবিক্রয়ের ক্ষমতা বকুলকুমারীর রহিল না, তাহার গর্ভে পুত্রসন্তান হইলে সেই পুত্রই প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইবে। জামাতা মাখনলাল উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এই মর্ম্মে দলিল লেখাপড়া হইল। মাখনলালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী সুকুমারী শ্বশুর ঘর দেখিতে পাইলেন না, বকুলকুমারীও পাইলেন না; সে উভয়ের ভাগ্যই সমান; বকুলকুমারী স্বামী পাইলেন, সুকুমারী সে সুখেও বঞ্চিতা। আফসসের পদ্ধতি ও মহিমা সর্ব্বত্রই এই প্রকার।

মাখনলাল ঘরজামাই হইয়া রহিলেন। দেশে তাহার পিতামাতা, সহোদর সহোদরা, কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না; সংসারে বকুলকুমারী তাঁহার সর্ব্বস্ব; বকুলকুমারীর অর্থে তাঁহার ভরণপোষণ ও বাবুগিরি বেশ চলিতে লাগিল; গাড়ী ঘোড়াও হইল।

বকুলকুমারী যে বাড়ীখানি পাইলেন, তাহা দুই মহল; সদর মহলে দুইটি বৈটকখানা, অন্দরে চকের মিলনে চারিটী কামরা; ভিতরদিকে বারাণ্ডা। বলা আবশ্যক, সদর-মফঃস্বল উভয় মহলই দোতালা।

দম্পতি-জীবনে মাখনলাল বাবু এক বৎসরকাল দিব্য সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করিলেন, দিনমানে বাহিরের বৈটকখানায় বিরাম, অপরাহ্ণে শকটারোহণে বায়ুসেবন, পরিভ্রমণ, রাত্রিকালে অন্দরমহলে প্রবেশ। দিবাভাগে বৈটকখানায় তাঁহাকে একাকী থাকিতে হয় না, দুটি তিনটি বন্ধুলোক নিয়মিত সময়ে দর্শন দেন, তাসপাশা চলে, খবরের কাগজ পাঠ হয়, নানাস্থানের নানা প্রসঙ্গের খোসগল্প হয়, বিলক্ষণ আমোদ। সুকুমার বাবু মধ্যে মধ্যে এক একদিন বৈকালে ভগিনীকে ও ভগিনীপতিকে দেখিতে আইসেন, তিনিও বৈটকখানায় আমোদে যোগ দেন, পূর্ব্বের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তিনিও এক একদিন মাখনলালের সহিত গাড়ী করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হন। এক একদিন সন্ধ্যার পর বৈটকখানায় গানবাজনা হয়, বকুলকুমারী তাহা জানিতে পারেন, কিন্তু কিছু বলেন না। যখন বিবাহ হয় নাই, মাখনলাল তখন সুকুমারের বৈটকখানায় ইয়ারবন্ধুগণের সহিত নিত্য রাত্রে মদ খাইতেন, এখন আর সেরূপ অভ্যাস নাই, হপ্তার মধ্যে একদিন একটু একদিন একটু একটু মধুপান চলে, তাহাতেই যাহা কিছু স্ফূর্ত্তি। যে রাত্রে মধুপান চলে সে রাত্রে অন্দরের প্রবেশের পূর্ব্বে একটু একটু সঙ্কোচ আইসে; সে সঙ্কোচ মনে মনেই মিলাইয়া যায় না, বকুলকুমারীর নিকটেও তজ্জন্য লাঞ্ছনা খাইতে হয়, লাঞ্ছনার সঙ্গে উপদেশ। বকুলকুমারী বলেন, "ও রকম দুর্গন্ধ আমি সইতে পারি না; যদি তুমি মদ খাও, তবে আমি তোমাকে ঘরে আসিতে দিব না; যদি বাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়, স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করিতে হইবে।"

স্ত্রীর লাঞ্ছনা ও উপদেশ মাখনলালের মাথার ভিতর তাদৃশ কার্য্যকারী হয় না, তিনি মনে করেন, বিবাহিতা পত্নী, ব্যবহারানুসারে স্বামীর আজ্ঞাকারিণী;

মনে করিয়াই তিনি আপন মনে সে সব কথা উড়াইয়া দেন। তিনি যে একজন বড়মানুষের ঘরজামাই, তিনি যে পত্নীর ভাগ্যোপজীবী, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যখন তাঁহার মনে আইসে, তখন তিনি সে তত্ত্বটা ভুলিয়া যান।

মদের অভিনয়ে কত সুখ, যারা মদ খায়, তাহারাই তাহা জানিতে পারে। মাখনলাল মদ খান, নিশাযোগে সোহাগিনীর লাঞ্ছনা খান, তাহা যেন তাহার অঙ্গের ভূষণ হইল।

বিবাহের পর প্রায় এক বৎসর গত হইয়া গেল। প্রথম প্রথম দুই একমাস অল্পে অল্পে কাটিয়া গিয়াছিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পাকাপাকি হইতে লাগিল। উপদেশ, লাঞ্ছনা, অভিমান, শাসনা এই সকল ঔষধে মাখনলালের বিশেষ উপকার কিছুই হইল না; বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি বকুলকুমারীর ব্যবস্থামত ঔষধ ধরিল না; শেষকালে আরম্ভ হইল তাড়না।

তাড়নাতেও কোন ফল হইল না। বকুলকুমারী এই সময়ে অতিশয় বিরক্ত হইলেন; মনে মনে কল্পনা করিয়া একটি ফন্দি স্থির করিলেন। এক রাত্রে অর্দ্ধ মত্তাবস্থায় মাখনলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে ক্রোধভরে বকুলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "গরীবের ছেলের এত আস্পর্দ্ধা কেন? কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ। ভদ্রতা করিয়া আমি কোম্পানির কাগজের সুদের সব টাকাগুলি তোমার হাতে দিই, নিজের পোষাকে, জুতাতে মদের বোতলে আর বাবুগিরিতে অনেক টাকা তুমি নষ্ট কর, সব আমি শুনি, সব আমি দেখি, কিছুই আমি বলি না; আরও শুনিতে পাই, আমার টাকা লইয়া তুমি জুয়া খেলো, এত বাড়াবাড়ি কেন? আমি স্থির করিয়াছি, এখন অবধি সাবধান হইব, মাসে মাসে তোমার নিজ খরচের জন্য কুড়ি টাকার বেশী তোমার হাতে আমি দিব না।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যখন বিবাহ হয়, বকুলকুমারী তখন চতুর্দ্দশী এখন দুইতিন মাস অধিক পঞ্চদশী।

মাখনলাল একটু সাবধান হইলেন; নিয়মের অধীন হইয়া রাত্রে শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলেন; রাত্রে মদ্যপান স্থগিত রহিল।

প্রায় দুইমাস এই ভাব। কুড়ি টাকা মাসহারা, ভয়ে ভয়ে শয্যাগৃহে প্রবেশ। তাহার পর আবার যে সেই। নিয়ম বাহাল রহিল, কিন্তু দুইমাস পরে একদিন অধিক রাত্রে বিলক্ষণ মাতাল হইয়া টিকিটধারী ঘরজামাই টলিতে

টলিতে বকুলকুমারীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন; সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, প্রবেশ করিয়াই খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন, গতিক দেখিয়া বকুলকুমারী ঘৃণায় ক্রোধে অস্থির। মাখনলাল হঠাৎ খট্টার উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন! মেজেতে কারপেট পাতা ছিল, অঙ্গে অধিক আঘাত লাগিল না, আঘাতের প্রতাপে নেশা ছুটিয়া গেল, তিনি আস্তেব্যস্তে উঠিয়া পত্নীর কর ধারণপূর্ব্বক মানভঞ্জন করিলেনে; ক্ষমা করিয়া (পতিব্রতা!) দত্ত-কুমারী আতর গোলাপে স্নান করাইয়া, পতিকে সে রাত্রে গৃহে স্থান দিলেন।

আরো এক বৎসর অতীত হইল। মাখনলাল কতক কতক সাবধান, অন্তঃপুরে সাবধান, বৈটকখানায় অসাবধান। রাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশের সময় মাখনলাল বাবু পত্নীর নিকট ভিজে বেড়ালের মত শান্ত হইয়া থাকেন, বুকের ভিতর বিষাদের তরঙ্গ উত্থিত হয়। সূর্য্যতাপে সিক্ত অঙ্গ শুষ্ক হইলে বিড়াল যেমন নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, মদিরাপ্রভাবে মাখনলাল সেইরূপে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাত্রে অন্তঃপুরে অভিমানিনীর সহিত দেখা করিতে যান, সে কাজের যেরূপ পুরস্কার, তাহা হাতে হাতেই লাভ হয়; তথাপি কিছুতেই চৈতন্য হয় না। তিন বৎসর পূর্ণ হইবার কিছুদিন বাকি থাকিতে বকুলকুমারী স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া মাখনলালকে অন্দরমহলে প্রবেশের নিষেধ করিয়া দিলেন; মাসাহারার কুড়িটি টাকাও বন্ধ হইল। পাচিকা ব্রাহ্মণী দুইবেলা বৈটকখানায় তাঁহার আহার্য্যসামগ্রী রাখিয়া আইসেন, যত্ন অযত্ন কোনদিকেই বকুলকুমারীর দৃক্‌পাত থাকে না; জামাইবাবু বিড়ালকুক্কুরের ন্যায় উদরপূর্ত্তি করিয়া কারাগার সদৃশ বৈটকখানাতেই বাস করেন; এক এক দিন এক একটি বন্ধুর সহিত বাহির হইয়া যান। চক্ষু যখন রক্তবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেই সময় তাঁহার মনে মনে ধ্যান—আস্তরসের এই পুরস্কার, আস্থরসের দম্পতি জীবনের এই পরিণাম!

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত

সাধারণ উপদেশ।

মধ্যলীলা।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

২০। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার সর্ব্বকারণপ্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহাসভার আধার॥
সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ।
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতে বিষয়র আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ ঐ ১১৬ পৃং
আপনে মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।
সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।ঐ ১১৭ পৃঃ

শ্রীরাধার স্বরূপ।

২১। এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি—তাতে তিন প্রধান।

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে ॥
সচ্চিৎআনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে'—তাতে নাম হ্লাদিনী ॥
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ—তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব চিন্তামণি—রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥ ঐ

২। রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়। ঐ।১১৮পৃঃ
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তারে যেই করে অনুগতি ॥

রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়। ১১৯ পৃঃ

২৩। রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥ ঐ

২৪। সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়াসাম্যে তায় কহি কাম নাম॥ ঐ
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥ঐ

২৫। সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সে কৃষ্ণে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥

* * *

বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঁই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ ঐ

২৫। প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥

সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার—সে-ই বড় ধনী ॥
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর ॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্তশিরোমণি ॥
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয় জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণনাম-গুণলীলা প্রধান স্মরণ ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান।
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস ॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণরসায়ন ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥
মুক্তি-ভুক্তি বাঞ্ছে যেই—কাঁহা দোঁহার গতি ?
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥ ঐ।১২০পৃঃ

২৬। অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে—বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥ ঐ

২৭। বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর ॥ ঐ।১২২পৃঃ

২৮। ভট্ট কহে— মহান্তের এই এক লীলা— ॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥
বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে, হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১০ পং।১৩৩পৃঃ
২৯। ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লজ্ঘিবে শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ১০ম।১৩৬পৃঃ
৩০। ভাল কহে—চর্ম্মাম্বর দম্ভলাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি ॥ ঐ।১৩৭পৃঃ
৩১। আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইহাঁর কৃপাতে হয় দরশন ইহার ॥ ঐ
৩২। রায় কহে—চরণ রথ, হৃদয় সারথী।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীবরথী। ১১পং।১৩৯পৃঃ
৩৩। ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্যবচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসঙ্কীর্ত্তন ॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন ॥ ঐ।১৪০পৃঃ
৩৪। ভট্ট কহে—তাঁর কৃপালেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে ॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে বলিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে। ঐ
৩৫। রায় কহে—উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন-পান ? ॥
ভট্ট কহে—তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মমর্ম্ম ॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর উপসন।

প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদভক্ষণ॥
তাহাঁ উপবাস—যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদ-ত্যাগা হয় অপরাধ॥ঐ।১৪১পৃঃ

৩৬। অদ্বৈত কহে—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপি ভক্ত সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস।ঐ

৩৭। ভক্ত-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥ ১২পং।১৪৮পৃঃ

—*—

শকুন্তলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কুমারবিক্রম মজুমদার।

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥ (কালিদাস)

পুরাকালে পুরুবংশীয় মহাপরাক্রান্ত ধর্ম্মপরায়ন সর্ব্বলোকসুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক দুষ্মন্ত নামক এক ভূপতি হস্তিনানগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি বিষ্ণুতুল্য বল-শালী, ভাস্করতুল্য তেজসম্পন্ন, সাগরতুল্য গম্ভীর, ধরার ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া পৃথিবীস্থ বিদ্যুৎ ভুবন্তোপরি রাজত্ব স্থাপন করিয়া ছিলেন। একদিন মহারাজ দুষ্মন্তহিংনাদ, শঙ্খদুন্দুভিধ্বনি, রথচক্রনির্ঘোষ, অশ্বকরিরবসহ মৃগ এবং বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। অচিরে মৃগ এবং অন্যান্য পশু-মণ্ডলীর মৃতশরীরে কাননভূমি পূর্ণ হইল। রাজা বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া এক শান্তরসাস্পদ আশ্রম অবলোকন করিলেন। আশ্রমটী নানাবিধ তরু-লতায় সুশোভিত এবং ইহার মধ্যস্থলে আহরনীয় অগ্নিপ্রজ্জলিত পার্শ্বদেশে পুণ্য-তোয়া নির্ম্মলসলিলা মালিনী নদী প্রবাহিত। তাহার পুলিনে চক্রবাকগণ ক্রীড়া-... সংস্পর্শে শান্তগুণাবলম্বী হিংস্র

ব্যাঘ্র শার্দ্দূলাদি প্রভৃতি জন্তুগণ অবিরত ভ্রমণশীল।

এ আশ্রম ভগবান্ কাশ্যপের পুণ্যাশ্রম। মহারাজ কাশ্যপাত্মজ মহর্ষি কণ্বকে দর্শনাভিলাসে সমস্ত রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া একাকী সেই কুসুমিত অলিকুল-ঝঙ্কারিত উদাও অনুদাওমুখরিত আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আশ্রমগৃহ শূন্য রহিয়াছে, মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন রাজার অনুসন্ধানে সেই কুটীরাভ্যন্তর হইতে এক তাপসীবেশধারিণী কন্যা বহির্গত হইয়া পাদ্যার্ঘ্যাদিদ্বারা রাজার অতিথ্যসৎকার করতঃ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই প্রকৃতির মনোরম আবাসে, মনোহর তরুলতাকুঞ্জে সুখস্পর্শ মালিনী সমীরণ সেবিত, সুরভিগন্ধে আমোদিত, কণ্বপরিত্যক্ত আশ্রমগৃহে রাজা একাকী সেই মধুরহাষিণী রূপ-যৌবনবতী রমণীর অপরূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় মন্মথশরে বিদ্ধ, সেই কন্যার নিকট তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সেই রমণী বলিলেন, "মহারাজ! আমি তপস্বী ধর্ম্মাত্মা কণ্বের কন্যা, আমার নাম শকুন্তলা।" তখন রাজা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষির ঔরসে কিরূপ করিয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিলে, এ বিষয়ে আমার কৌতুহল বৃদ্ধি হইতেছে; তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্তি কর।" শকুন্তলা কহিলেন, "একদা এক ঋষি পিতার নিকট আমার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আদ্যোপান্ত যাহা বলিয়াছিলেন, সমীপাবস্থিতা থাকায় আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, অধুনা তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রেরও মনে ত্রাস উৎপাদন করিলেন। তপস্যার দ্বারা পাছে তিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজ অপ্সরা মেনকাকে স্বীয় তপোবিঘ্নমানসে নিয়োজিত করিলেন। মেনকা দেবরাজ সহায়ে সুগন্ধ গন্ধবহ পবনদেব এবং মন্মথসহ তেজস্বী ঋষি সম্মুখে নানা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন,, এমন সময়ে পবনদেব তাঁর বস্ত্রহরণ করিলে যেমন তিনি বস্ত্রানয়ন নিমিত্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন, অমনি অগ্নিসম ঋষির নয়ন তৎপ্রতি পতিত হইল। মদনশরে জর্জ্জরিত ঋষির আজীবনের তপজপ সেই স্বর্গসুন্দরীর নয়নাভিরাম রূপলাবণ্যের তীব্রস্রোতে ভাসিয়া গেল মহর্ষি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সেই কামিনীর ক্রীড়াসুখে নিশিদিন যাপন করিতে লাগিলেন। অচিরে মুনিসংযোগে মেনকা যে কন্যা প্রসব করিলেন,

তাহা তিনি মালিনীতীরে নিক্ষেপ করিয়া নিজ কর্ম্ম সমাপণপূর্ব্বক ইন্দ্রসভায় গমন করিলেন। মহাত্মা কণ্ব মালিনীতে স্নান করিতে গিয়া সেই সদ্যোজাত কন্যাকে শকুন্ত পরিরক্ষিত নিরীক্ষণ করতঃ দয়ার্দ্রচিত্তে আশ্রমে আনয়ন করিয়া কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিলেন এবং শকুন্তপরিরক্ষিত কন্যার শকুন্তলা নাম রাখিলেন। তদবধি শকুন্তলা আশ্রয় ও প্রাণদাতা কণ্বকে পিতা বলিয়া জানিতেন। মহারাজ! আমার জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেইরূপ বর্ণনা করিলাম। আমিই সেই কন্যা শকুন্তলা। আমি শৈশবে মাতৃপরিত্যক্ত, আবার পিতাকে জানি না, আপনি আমাকে কণ্বদুহিতা বলিয়া অবগত হউন।

দুষ্মন্ত সেই লাবণ্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ অবগত হইয়া বুঝিলেন যে, তিনি রাজপুত্রী তখন তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া তাহাকে তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বলিলেন। বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার এই বাক্য শ্রবণ করতঃ তাহার স্বাভাবিক সরলপ্রাণে পিত্রনুপস্থিতি হেতু ইতস্তত করিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত তাহাকে শাস্ত্রসঙ্গত নানা সান্ত্বনাবাক্য প্রদান করিলে শকুন্তলা তখন নিজ ভবিতব্য চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রাজন্! যদি আপনার ঔরসে ও আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে সে যদি যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হয় ও আপনার অবিদ্যমানে সিংহাসনে আরোহণ করে, তাহা হইলে আপনার করে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। রাজা ইহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া সেই মরালগামিনী তাপসবালার প্রস্তুত গন্ধর্ব্ববিধানে পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার রমণসুখে কালাতিপাত করিলেন। তৎপর রাজা স্বনগরাভিমুখে গমনকালে শকুন্তলাকে নানা প্রবোধবাক্য দিয়া বলিয়া গেলেন যে, তাহাকে অচিরাৎ স্বীয় নগরে লইবার জন্য লোক পাঠাইবেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি কণ্ব বন হইতে ফলমূল আহরণ করতঃ স্বতপস্যার প্রভাবে শকুন্তলা বৃত্তান্ত আমূল অবগত হইয়া লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলার ভীতি দূর করিয়া কহিলেন, "তুমি যে আমার অনুপস্থিতে ধর্ম্মাত্মা দুষ্মন্তের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মসম্মত সংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। তোমার গর্ভে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া একমাত্র পৃথিবীশ্রেষ্ঠ হইবেন। এদিকে শকুন্তলা যথাকালে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন এবং কয়েক বৎসর গত হইলে মহর্ষি কণ্ব পুত্রের যৌবরাজ্যপ্রাপ্তি হইবার সময় অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া বরবর্ণিনী শকুন্তলার রূপযৌবন স্মরণ করিয়া সপুত্র শকুন্তলাকে শিষ্যসমভিব্যাহারে রাজা দুষ্মন্তের রাজধানী হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন।

দুষ্মন্ত রাজধানীতে আসিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করেন নাই। বহুদিন অতীত হইল কোন লোকই শকুন্তলা আনয়নার্থ প্রেরিত হয় নাই। এ দিকে শকুন্তলা রাজধানী সমীপে গমন করিয়া তাহাকে তাহার বিবাহ কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন ও তাহার ঔরসজাত পুত্রকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে যৌবরাজ্য প্রদান করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে একেবারে প্রত্যাখ্যান, করিয়া পরন্ত শকুন্তলাকে নানা ভৎর্সনা করিলেন। সাধ্বী শকুন্তলা আর সহ্য করিতে পারিলেন না; একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত, শোকে সন্তপ্ত, পাগলিনী রাজাকে অনেক ভৎর্সনা করিয়া অনেক উপদেশবাণী প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, "যে ব্যক্তি মাতৃসম অশেষ ধর্ম্মকার্য্যের সহায় ভার্য্যাকে ও স্বীয় নিস্কৃতির উপায়, জীবনমরুভূমে শান্তিবারি প্রদানকারী সুখস্পর্শ পুত্রকে বিনাপরাধে অতি নির্ম্মমের মতন পরিত্যাগ করেন, তাহার ন্যায় পাতকী অপরাধী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। রাজন্! স্বর্গবাসিনী মেনকা আমাকে জন্মদান দিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যাগ করেন, আজন্ম মহান্ পিতা ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখাবলোকন করি নাই, চিরকাল কুটিরবাসিনী, চিরধাড়িণী,—রাজাধিরাজ স্বামী প্রাপ্ত হইয়াও তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যক্তা, আমার মত দুঃখিনী রমণী বোধ হয় জগতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে আমি পিতা কণ্বের আশ্রমে গমন করিব, কিন্তু এই ঔরসজাত পুত্রকে পরিত্যাগ করা তোমার অতি অবিধেয় কার্য্য।"

পূর্ব্ব অনুরাগ, কুমারীকালে তাপসবালার সহিত প্রণয়, রাজা দুষ্মন্ত যে এক সময় শরাহত মৃগের ন্যায় মদনশরে ব্যথিত হইয়া শকুন্তলার পাণিগ্রহণার্থে তাঁহাকে বহু অনুনয় করিয়াছিলেন, এক সময় যে তিনি সমস্ত রাজ্য পর্য্যন্ত তাহার সেই মৃণাল হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, অবশেষে শকুন্তলার বাক্যানুসারে তাহার গর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্য প্রদান এবং পরিশেষে তাহাকে অধিরাজপদের প্রতিশ্রুতির পর সেই নির্জ্জন আবাসে তাপসকুমারীর সহিত বিহার এই সকল যেন বিস্মৃতির অনলগর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন। সম্মুখে তেজদীপ্ত সন্তনাকে দেখিয়া তাহার পাষাণহৃদয়ে মমতার লেশমাত্রও স্থান পাইল না। শকুন্তলা এইরূপ কহিলে রাজা কর্কশস্বরে বলিলেন. "আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত একেবারে স্মরণ হইতেছে না। কুলটা মেনকা তোমার জননী, আর কামাশক্ত নীচাশয় বিশ্বামিত্র তোমার পিতা, তুমিও তাঁহাদের মিথ্যাবাদী সন্তান। আমি তোমাকে চিনি না, তুমি

যাহা বলিলে তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি, তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর।"*

তখন মানিনী শকুন্তলা রাজার নিদারুণ নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "রাজন্! তুমি স্বীয় দোষ আচ্ছাদন করতঃ কেবল পরদোষ নিরীক্ষণে পটু। আমার মাতা মেনকা দেবগণের আদরণীয়া, আমার জন্ম যে তোমার জন্ম হইতে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে। ইহা অতি হাস্যকর ব্যাপার। তুমি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র পরিত্যাগরূপ অবিধেয় কর্ম্ম করতঃ অসংখ্য পাপের পথের পথিক হইও না। কপটতা ত্যাগ কর; সত্যা-বলম্বন কর। সর্ব্ববেদাধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থাবগাহন সত্যের সমান কিনা সন্দেহ। এ সন্তান তোমারই, ইহাকে গ্রহণ কর।"

অকস্মাৎ ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত রাজা শুনিলেন। আকাশবাণী হইল। মাতৃসম পত্নী ও পতৃস্বরূপ সন্তানকে পরিত্যাগ করিও না। শকুন্তলা সত্যবাদী। তুমি এই পুত্রের উৎপাদক। তোমার যখন আমাদের অনু-রোধ, এই পুত্রকে ভরণ করা আবশ্যক হইল, তখন ইনি ভরতনামে বিখ্যাত। রাজা এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া বলিলেন "আমিও এই পুত্রকে আমারই আত্মজ, বলিয়া জানি। লোকনিন্দাভয়ে আমি এতক্ষণ শকুন্তলার সহিত বাক্যবিতণ্ডা করিতেছিলাম। এক্ষণ যখন সেই সর্ব্বলোকাজানিতা বিবাহবার্ত্তা লোকসমাজে প্রচারিত হইল, তখন উহাদিগকে গ্রহণ করিবার কোনই আপত্তি নাই। তাপস বালা শকুন্তলা সাধ্বী, আমিই উহার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলাম, তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া যে সকল কর্কশবাক্য আমাকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। এই পুত্র আমার আত্মজ।

তৎপর রাজা মহিষী শকুন্তলাকে নানা প্রেমালাপনে সন্তুষ্ট করিলেন এবং স্বীয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া উহাকে ভরত নামে অভিহিত করিলেন। শকুন্তলাতনয় ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এবং ক্রমে ক্রমে রাজন্যসমাজে আদরণীয় হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাপরাক্রান্ত মহাত্মা শকুন্তলাতনয় ভরত যে সুখোন্তপরি রাজত্ব করিতেন, তাহা তাহার নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। সেইকাল হইতে তাহার নামের সহিত আমাদের পুণ্য জন্মভূমি ভারত-বর্ষের নাম চিরগ্রথিত হইয়াছে।

শুনিয়াছি রাজাধিরাজ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত জনকদুহিতা সীতাকে বনবাস প্রদান করিয়াছিলেন। যাহার অঙ্কে শয়ন করিয়া

জীবনের অনেক সুখযামিনী প্রভাত হইয়াছে, যাহার সহিত জীবনের অনেক সুখদুঃখ গ্রথিত, সেই নিষ্পাপ সাধ্বী সীতাকে সামান্য লোকাপবাদ ভয়ে একবার কঠোর অগ্নি পরীক্ষার পর পুনরায় বনবাস প্রদান ধীমান রামচন্দ্রের পক্ষে কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সেই বিশ্বনিয়ন্তাই অবগত আছেন। জগতে রামচন্দ্রের রাজ নীতিজ্ঞ প্রজারঞ্জক নাম ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু সীতার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুতে জগতের প্রত্যেক নরনারী অশ্রুত্যাগ করিতেছেন। সেইরূপ যদি আকাশবাণী না হইত, তাহাহইলে রামচন্দ্রের ন্যায় দুষ্মন্তও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে ত্যাগ করিতেন,— জগতের লোক নিষ্পাপ শকুন্তলার শোকে সন্তপ্ত হইতেন বটে, কিন্তু তিনি প্রজা রঞ্জক রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত হইতেন। জগদ্বিখ্যাত সম্রাট নেপোলিয়নও কোন কারণে প্রেমপ্রতিমা যৌবনসঙ্গিনী যোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই সকল মহাত্মাদের স্বীয় পরিণিতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা আমরা অবগত নহি। কেন, লোকে এ কথা বলিল, ও কথা বলিল, বলিয়া কি অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে? রামচন্দ্রাদির ন্যায় নৃপতিদের হৃদয়ে কি একটুও পবিত্রচিত্ততার স্থান পায় নাই। লোকের মুখের কথায় ভ্রুক্ষেপ করিয়া স্ত্রীকে নিজে নিরাপরাধিনী জ্ঞাত হইয়াও মরণান্তক ক্লেশ হইতে তাহাকে উদ্ধার করা কি স্নেহপ্রবণ পত্নীপ্রেমমুগ্ধ স্বামার কর্ত্তব্য নহে? একদিকে জীবনসঙ্গিনী স্ত্রী—অন্যদিকে সুনাম আর রাজার প্রজা, কোন্‌দিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে? এ এক বিষম সমস্যা। যাহা হউক, এইরূপ প্রসঙ্গে পতিত হইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা এ প্রবন্ধের কার্য্য নহে। পুরাতন ভারতীয় কবিদের লেখনীরহস্য উদ্‌ঘাটন করা বড় দুরূহ। দুষ্মন্ত যাহাই হউক না কেন, কিন্তু তাপস-বালা মানিনী অথচ প্রেমময়ী শকুন্তলার কৃষ্ণ মেঘমালা ক্রোড়ে কনকদামিনীর ন্যায় তীব্রমধুর চরিত্রে দেশকাল নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজাতীয় সাহিত্যে এক তীব্রমধুর কিরণ ছটা বিকীরণ করিবে এবং কাব্যকাননে সর্ব্বপ্রাণী তাহার চরিত্রে নিরবধি মকরন্দ পান করিবে।

প্রতিমাপূজা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

প্রতিমা পূজা কত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষকে স্পন্দিত করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর অবসাদক্লিষ্ট, জড়তানিষ্পন্দ হৃদয় ক্ষণকালের জন্য অভিনব স্পন্দনে স্পন্দিত হয়, সারাজীবনের নির্জীবতা, সজীবতার মৃদু মোহকর স্পর্শে সজীব হইয়া উঠে; মৌনমুগ্ধ গৃহ, বালকের হাস্যে, বিহঙ্গের কাকলী রবে মুখরিত হইয়া উঠে। তাহার কারণ প্রতিমা পূজা।

সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় যখন আমাদের মানস অস্ত্রে কলঙ্ক পড়িয়া যায়, তখন কোন শানযন্ত্রে তাহা সুশানিত হয়? কোন মন্ত্রে সুপ্তপ্রাণ আপনার স্বভাবপরিচিত অলসতার আবেশময় অলীক মোহস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া থাকে? কাহার বাজানার স্বরে শিশুবৃন্দ নববেশ সজ্জিত, যুবকদল নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত, বৃদ্ধগণ উৎসাহান্বিত হইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হয়? কোন্ সময়ে কিশোরীরা প্রীতিমুগ্ধ লজ্জানম্র হৃদয়ে কোন্ অজানা সুখের আশায় পথপানে অনিমিষ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে? তাহা জগজ্জননী চিন্মুক্তি মহামায়ার আগমনে, তাহা কি না প্রতিমা পূজা।

এই প্রতিমা পূজার অসাধারণ গুণ, অপার্থিব শক্তি আধ্যাত্মিকতার অতুলস্ফূর্ত্তি অবশ্যই আছে, নচেৎ এতদিন সমানভাবে কখন নিজের মর্য্যাদা রাখিতে পারিত না; মিথ্যা হইলে জলবিম্বের মত কবে বিলীন হইত, এত পুরাতন হইয়া কখনই এত নূতন থাকিত না।

যেমন কাব্যের সমালোচনা সমালোচকেরা করুন বা নাই করুন, তাহাতে কাব্যের কিছু আসে যায় না। যে কাব্যের গুণ থাকে, সহস্র সমালোচনার তীক্ষতম আঘাতে আপতিত বিধ্বস্ত ম্লান বোধ হইলেও সময়ে আপনার গুণ প্রকাশিত করিবেই করিবে। যত ধূমে আবরিত বহ্নি এক সময়ে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিবেই করিবে। যে কাব্যের গুণ নাই, অজস্র তোষামোদের অসংখ্য বিজ্ঞাপন স্তুপের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে স্থায়ীভাবে দাঁড় করাইতে পারিবে না। যাহার যতটুকু গুণ বা দোষ আছে, সমালোচনায় তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলেও ততটুকু গুণ বা দোষের পরিমাণ কালই:করিয়া দিবে। তোমরা যাহাই কর না কেন? কাল ঠিক তাহার বাস্তব্য স্থানে পৌছিয়া দিয়া যাইবে; কালের বিচারের নিকট

এই প্রতিমা পূজার গৌরবগীতি কালই গাহিয়া আসিতেছে, ইহার গুণ, ইহার সত্যতা, ইহার আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কালই সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। এ গীতি এমনভাবে হৃদয়ের সহিত তদাত্মভাবে মিশিয়া আছে, এ স্মৃতি এরূপভাবে অন্তঃকরণে গাঁথা আছে যে, দেহ হইতে হৃদয় পৃথক না করিলে ইহা লুপ্ত হইবে না। সমাজ উৎসব হইলে প্রকৃত গুণ না থাকিলে কাল আপনার বিশাল গর্ভে শুধু স্মৃতিটুকু মাত্র রাখিয়া বিলীন করিয়া লয়, সন্দেহ নাই। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহার স্মৃতি পর্য্যন্তও এখন বর্ত্তমান নাই।

প্রতিমা পূজা কি? মন পার্থিব পঞ্চ ভূতের পরিণাম স্বরূপ। (দধি মন্থন করিলে যেমন তাহার সূক্ষ্ম অংশ উপরে ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ ভুক্তঅন্ন উদরাগ্নি ও বায়ুদ্বারা মথিত হইলে পর যে সূক্ষ্মাংশ, তাহাই মন নামে উক্ত।) সেই মনের গতিপ্রসারিণী হইলেও অদৃষ্ট বস্তুর ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই সেই অদৃষ্ট বস্তুটিকে দৃষ্ট বস্তুর আকারে আনিতে হয়। নিরাকার সচ্চিদানন্দ ভাব জন্য বলিয়াই মন, বুদ্ধি বা কল্পনার অতীত ও সেই জন্য আমাদের মৃৎ স্তুপবৎ জড় অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় না; তাই একটি কমতাসাধ্য শান্তচিন্তা শক্তিগম্য একটি অবলম্বন স্থির করিতে হয়। শান্তচিন্তা শক্তি কখন অনর্থের ধারণা করিতে পারে না। পারিত যদি তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইত।

একটি কথা উঠিতে পারে, বেদ উপনিষৎ ইহারা স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছে? উত্তর পারে নাই। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে বেদ উপনিষৎ ব্রহ্মে যে সমস্ত অবাস্তব ধর্ম্ম কল্পিত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্ম নহে।" ইহাই বুঝাইয়াছে। "নেতি নেতি" ইহা ব্রহ্ম নহে, উহা ব্রহ্ম নহে, এইরূপে অবিদ্যা আরোপিত বস্তু ব্রহ্ম নহে। এইরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন প্রকৃত ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান নাই।

তবে সেই অনির্দ্ধারিত নির্গুন নিরাকার ব্রহ্ম ধারণা করা অবিদ্যা-কার্য্য মনের দ্বারা সম্ভব নহে, বলিয়াই একটি সহজ সাধ্য অবলম্বন স্থির করিতে হইবে, তাহাতে একাগ্রতা শিক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে সহজ ও মানসগ্রাহী।

মন যদি অনির্দ্দিষ্ট ধারণা কল্পনা অতীত অনর্থের পানে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্য বস্তুর সন্ধান না পাইয়া অবসন্ন হইয়া স্বস্থানেই ফিরিয়া আসিবে। শাকুনি হস্তে রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন ছুটিতে ছুটিতে রজ্জু আকর্ষণে শাকুনি হস্তেই ফিরিয়া আইসে, তদ্রূপ মন অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর সন্ধান না পাইয়া প্রাণকেই লক্ষ্য

বলিয়া ধরিয়া বসে; তাহাতে আরও বদ্ধ হয়। ইহাই সাধারণতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম। লক্ষ্যভেদ শিক্ষার্থি প্রথমে স্থূল অবলম্বন স্থির করিয়া তাহাতে লক্ষ্য অভ্যাস করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যভেদ শক্তি জন্মিয়া থাকে; আর এই অণু হইতে অণু মহৎ হইতেও মহৎ পরমসূক্ষ্ম অজ্ঞেয় কারণ,স্বরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য-বিষয়ীভূত করিতে হইলে অগ্রে স্থূল বাহ্যবস্তু অবলম্বন স্বরূপ স্থির করিতে হয়। একটি অত্যুচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে প্রথমে স্থূল সোপান ক্রমশঃ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

কার্য্যজ্ঞানে কারণের জ্ঞান, কার্য্যদৃষ্টে কারণের অনুমান, এইরূপে প্রথম কার্য্য দেখিতে হইবে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে, করিতে করিতে কারণে পৌছিতে হইবে; সমুদ্রে পৌছিতে হইলে অগ্রে নদীমুখ দিয়া যাইতে হইবে।

সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু. মেঘ, সলিল আর সশৈল বন কানন পৃথিবী সকলই সেই এক পরম কারণের কার্য্যমাত্র।

এই কার্য্যের ভিতর দিয়া তাহার নিকট যাইতে হইবে। এই কার্য্যের শক্তি দেখিয়া তাহার শক্তির অনুমান করিতে হইবে। এই কার্য্যের আপেক্ষিক পূর্ণতা দেখিয়া প্রকৃত পূর্ণতার মাহাত্ম্য ইয়ত্বা করিতে হইবে।

যাহা জানিলে কিছুই জানিবার বুঝিবার আবশ্যকতা নাই বা জানিবার বুঝিবার নাই, তাঁহাকে জানিলে অবশ্য এই কার্য্য জানিবার আবশ্যক নাই। সে উন্নত তত্ত্বর ধারণা সাধারণের অতীত বলিয়াই এইরূপ বলা হইতেছে।

"প্রকৃতির জ্ঞান না হ'লে কখন,
না হবে ধারণা ব্রহ্মই কেমন।
না বুঝিলে ধরা স্বরগ কেমন,
কেমনে বুঝিবে মানবচয়।" (প্রকৃতিশিক্ষা অবকাশগ্রন্থ)

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, প্রতিমা পূজা রূপ স্থূল লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতে করিতে কাহাকেও সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ করিতে দেখি না, এমন কি ইচ্ছাও দেখি না, বরং উত্তোরোত্তর আরও স্থূলেই জড়িত হইয়া পড়েন। সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদকারিকা শক্তি যে এক জন্মেই লাভ হইবে এমন কোন কথা নাই।

আমরা যে ভাবেই ভক্তির দৃঢ়তা করতঃ উপাসনা করি না কেন? তিনি ইচ্ছা করিলে আপনি আমাদের সে ভ্রম দূর করিয়া দিবেন; লবণ পুত্তলিকা সমুদ্রে যাইলেই সমুদ্রে মিশিয়া যায়,-আমরা "ভক্তিনাবং সমাদস্থে।" যদি

তাঁহার নিকট যাইতে পারি। আর যদি সেই ভগবানেই বিলীন হইবার আকাঙ্ক্ষা করি, তিনি আপনিই বুঝাইয়া দিবেন যে, যাহা করিতেছ, তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে "ওঁ দেব ব্রহ্ম ত্বং নেদং যদিদং উপাসতে।"

"যমেবৈষ বৃণুতে ত মৌব লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং"

তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্থানেই থাকেন, তিনিই যখন আদর্শে প্রতিবিম্বের জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, আমরা যদি সে উচ্চ ধারণা করিতে না পারি, বা তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তিনি মনে করিলে যে, আমাদের ধারণাযোগ্য বুদ্ধি-গম্য অনুভব বিষয়ভাবে আসিতে পারেন না বা আমাদের দৃষ্টিগোচরীভূত তাঁহারই সৃষ্টকার্য্যের কোন একটি বস্তুর আকার ধরিতে পারেন না বা কোন বস্তুর আকার ধারণ করিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার শক্তি রাখেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা হয় ও ঐশ্বরীয় শক্তির সঙ্কোচ করা হয়।

তবে এ কথা ত নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের ধারণা করিতে পারি না, বলিয়াই যে, কেহই পারেন না বা পারিতে সক্ষম নহে, এমন কথা বলিলে আমাদেরই অযোগ্যতা তাহাদের উপর আরোপ করা হয়। তবে দু'একজন তাহা পারিলেও তাহা কখন সাধারণ গ্রাহ্য হইতে পারে না, বা সাম্প্রদায়িক মধ্যে আবদ্ধও হইতে পারে না। ব্রহ্মোপাসনা কখনই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হয় নাই বা স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল না। ঐ উপাসনা লইয়া যাঁহারা সম্প্রদায় গঠন করেন, তাঁহারা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত যাবতীয় জনের সমূহ ক্ষতি করেন।

তবে সাধারণের পক্ষে নিরাকার, নিরিন্দ্রিয়, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মলক্ষ আশা পক্ষীর সমুদ্র জল শোধনেচ্ছার মত। এই কারণে সগুণ, সাকার, মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়। অঘটন ঘটন পটীয়সী শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা মায়ার সহযোগে যখন ব্রহ্ম সগুণ হয়েন। আবার "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামী যুগে যুগে" লীনদেহ ধারণ করেন, তাহা আরও সরল আরও মানসগ্রাহী।

প্রতিমা পূজা একাগ্রতা সংস্থাপনের সুন্দর উপায়, প্রতিমা খড়মৃত্তিকার সমষ্টি বলিয়া অনেকে উপহাস করেন। বাস্তবিক প্রতিমা আকাশ, সলিল বায়ু ও পার্থিব বস্তুর সমবায়ে গঠিত এবং ইহাও একটী কার্য্য। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু

আদি যেমন তাঁহার কার্য্য, আর এই সামান্য তৃণখণ্ড মাত্র তাঁহারই কার্য্য। তিনি যখন সর্ব্বভূতেই আছেন, তখন উপলখণ্ড তৃণখণ্ড ও সামান্য ধূলিকণাতেও আছেন, জগতই যাঁহার রূপ, তখন সামান্য তৃণখণ্ডাদিও ত জগদ্ভিন্ন নহে। তবে সেই সেই ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারই উপাসনা করা হউক না কেন, তাঁহারই উপাসনা হইবে। ঘটান্তবর্ত্তি আকাশ ও অখণ্ড আকাশ উভয়ই আকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। ঘটাকাশ বুঝিলে সম্পূর্ণ আকাশ বুঝা না হউক, কিন্তু আকাশ বুঝা ভিন্ন ত আর কিছু নহে। প্রতিমাদিতে যে ব্রহ্মবুদ্ধি করা যায়, তাঁহার সম্পূর্ণতা বুঝা না যাইলে তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহাকে বুঝা ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। তবে যদি উপলখণ্ড উপলখণ্ডই ভাবি বা উপাসনা করি, তাহা হইলে সত্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত কথা যে কোন হিন্দু সন্তান এরূপ ভাবে উপাসনা করেন না ; কে না জানে পরমেশ্বর এক ও সর্ব্বত্রই আছেন ; এমন কে অশিক্ষিতা জ্ঞানশূন্যা মহিলা আছে যে, প্রহ্লাদের কথা, হিরণ্যকশিপুর কথার উত্তরে প্রহ্লাদের সে উক্তি—"এই ভিত্তির ভিতরও হরি আছেন।" এ কথা কে না জানে ?

ভূতে ভূতে চৈতন্যাকারে অবস্থিত এমনভাবে কেহ বুঝে না বটে ; কিন্তু এইরূপ একটি বিশ্বাস করে। আমরা যে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ মানিয়া চলি ; যদি আত্মার স্বরূপ বুঝিতাম ; যদি বুঝিতাম আমি বলিয়া যাহাকে বুঝা যায় ; সে আমার সহিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রিত কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

তাহা হইলে কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অধিকারী হইতাম না। আর যদি দেহেই প্রকৃত আত্মবুদ্ধি থাকিল, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সংঘাত বস্তুকেই কর্ত্তা বলিয়া ভাবিতে হইল ; তবে ত দেহ নাশান্তে আত্মার স্থিতি বিষয়ে জ্ঞান নাই, তবে ত পরলোক জন্মান্তর মানা হয় না, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্তবিধিনিষেধের অনুসারে দেহাত্মবাদী চলিতে পারে না। তবে বিধি নিষেধের কর্ত্তার অসম্ভাব। আমরা ত দেহাত্মবাদী তবে (কার্য্য) শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অধিকারী কেন ? কেনই বা মানিয়া থাকি ?

আমাদের দেহে আত্মবুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাসবানও বটে, আত্মস্বরূপানাভিজ্ঞ হইয়াও পারলৌকিকাস্মসত্তায় বিশ্বাস আছে, বলিয়াই ও কর্ম্মফল জাততৃষ্ণ বলিয়াই শাস্ত্রোক্ত বিধি

সেইরূপই আমাদের প্রতিমা পূজা। সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এমন কথা বুঝি না, বা সকল পদার্থেই তিনি আছেন, এরূপ ধারণা করিতে পারি না, তথাপি এ সম্বন্ধে বিশ্বাসী, এখানেই আবির্ভূত হইতে পারেন, এরূপ ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান নাই।

যিনি সর্ব্বভূতেই আছেন, তবে আবার শিলাপ্রতিমাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠাদ্বারা ঈশ্বরত্বে পরিণত করিবার বৃথা আশা কেন? সে শক্তির অভিমানই বা কেন? মনুষ্যের শক্তি ঐরূপ হইতে পারে না।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার অর্থ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধর সূর্য্যরশ্মি এই বস্ত্রের উপর পড়িয়াছে, কিন্তু দগ্ধ করিতেছে না, কিন্তু একটী আতসী কাচদ্বারা সূর্য্যরশ্মি একীভুত করিয়া আকর্ষণ কর, তখন ঐ বস্ত্র দগ্ধ হইতে থাকিবে। বুঝিতে হইবে ঐ রশ্মির শক্তির বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইরূপ এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও চৈতন্য ছিল, কিন্তু আমরা সভক্তিক নির্ম্মল মনরূপ আতসী কাচ দ্বারা সেই সেই চৈতন্য (যাহা অনমুভূত ছিল।) আমাদের ধারণাযোগ্য চিন্তাশক্তিগম্য ভাবে অনুভূত করি। অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে চৈতন্য, তাহা আমাদের নিকট অনমুভূত ছিল; পরে আমাদের গুণে উদ্ভূত হইয়া থাকেন। এই মন ও চৈতন্য, এই উভয়ের মাঝখানে এমন একটি দূরত্ব জনিত ব্যবধান পড়িয়াছিল, যে ব্যবধান টুকু না সরাইতে পারিলে আমরা আমাদের ধ্যেয় বিষয়ে মন দিতে পারি না।

আবাহন অর্থে জাগরণ, যিনি সর্ব্বদা জাগ্রত, তাঁহার আবার জাগরণ কি? তিনি জাগ্রত বটে, কিন্তু আমরা মোহনিদ্রা সুপ্ত, অতএব আমাদের নিকট তিনি নিদ্রিতই বটেন; আমরা আমাদের স্বভাবজাত মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে চিন্তা করিতে সক্ষম হই, ইহাই হইল তাঁহার ও আমাদের জাগরণ। বিষয় বাসনা মুগ্ধ, অবিদ্যাবদ্ধ অন্তঃকরণকে কিছুক্ষণের জন্য বিষয়াভিমুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যবস্তুতে স্থির করিতে হইলে, যে প্রক্রিয়া তাহাই আবাহনাদি।

এই লক্ষ্যভেদে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ধনু, একাগ্রতা তাহার শর, ভক্তি তাহার সন্ধানের চেষ্টা। উপাসনার এমত উৎকৃষ্ট প্রণালী আর কিছুই নাই। যিনি দশভুজারূপে ব্রহ্মশক্তির আরাধনা স্থির করিয়াছেন, তিনি চিত্রকর কবি ও মহাপুরুষের কার্য্য একাই করিয়া গিয়াছেন। যে সকল প্রতিকূল যুক্তিসত্বেও আর্য্য-ঋষিগণ প্রতিমা পূজা ব্যবস্থিত করেন, যে সকল যুক্তি পূর্ব্ব পক্ষরূপে ব্যবহৃত

হইয়াছে; সেই সকল যুক্তিই আধুনিক প্রতিমা বিরোধীগণের দৃষ্টান্ত।

আধুনিক প্রতিমা বিরোধীদলের এ সম্বন্ধে যুক্তি যে, নিরবচ্ছিন্ন বস্তু সাবচ্ছিন্ন করা, আর ব্রহ্ম উপাসনার বিস্তীর্ণ উদারতাকে প্রতিমা পূজা-রূপ সঙ্কীর্ণতায় পরিণত করা একই কথা। এইটী তাহাদের ভ্রান্তি, নিরবচ্ছিন্ন বস্তুকে কখন সাবচ্ছিন্ন করা যায় না, বা ব্রহ্ম উপাসনার উদারতাকে সঙ্কীর্ণতায় পরিণত করা সম্ভব নহে। যে ব্রহ্ম অখণ্ড নিরাকার সচ্চিদানন্দই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার অবচ্ছিন্নতা কি? যাহার আকার নাই, তাহাকে আকারে পরি-বর্ত্তিত করা কি সম্ভব? আমরা এরূপ আকাশে কুসুম উৎপত্তির মত, অসম্ভব ব্যাপার সাধন করিবার শক্তি রাখি না; আকাশকে রবারের মত সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত করিয়া তাহার দ্বারা পৃথিবী বেষ্টন করার মত যাহা হয় না; অবান্তর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া নিজ মত পুষ্ট করা যুক্তিবাদিগণের কার্য্য নহে।

প্রতিমা পূজা যে ব্রহ্ম উপাসনা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয়, তাহা স্বীকার করি, কারণ, মন্দ, মধ্যম অধিকারীর পক্ষেই বিহিত, উত্তমের পক্ষে নহে। যাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি (যথা আমি স্থূল কৃশ, আমি সুন্দর, আমি কুৎসিত) অন্তঃকরণে আত্মভ্রম (যেমন আমি সুখী, আমি দুঃখী) ভাব প্রভৃতি, সেই ভেদ বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে প্রতিমা পূজা করা সহজ উপাসনায় বিহিত ও প্রশস্ত। যতক্ষণ না আমি কর্ত্তা, উহা করণ, ইহা কর্ম্ম, এইটি ক্রিয়া এইরূপ অভিমান না যাইবে। যতক্ষণ না দেহ, ইন্দ্রিয়ের ভোগ, আমার ভোগ জনিত যে ভ্রম দূরে না যাইবে, ততক্ষণ ব্রহ্ম উপাসনা প্রশস্ত ত নহেই বরং অবিহিত, ইহা সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত ও তাবৎ ব্রহ্মবাদীগণের স্বীকৃত।

উত্তমের পক্ষে ব্রহ্ম উপাসনা, মন্দ ও মধ্যমের পক্ষে প্রতিমা পূজাদি সনাতনশাস্ত্র-সম্মত সুপ্রণালীসিদ্ধ উপাসনা।

এ কথায় কাহারও আনন্দ বা দুঃখ করিবার নাই, আমরা যখন আপনাদিগকে মন্দ ও মধ্যম ভাবি, উত্তম ভাবি না, তখন ব্রহ্ম উপাসনা করিতে অধিকারী নহি, এই জন্যই আমাদের নিকট প্রতিমা পূজা শ্রেষ্ঠ, তবে যাঁহারা উত্তম ভাবেন, তাঁহারা ব্রহ্ম উপাসনা করিতে পারেন, তাহাতে তিনি অধিকতর উপযুক্ততা জন্য সকলের আদরণীয় হইবেন, সন্দেহ নাই। তবে ঐ উপযুক্ততা শুদ্ধ চিত্ততার উপর নির্ভর করে, তবে যিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বজন্ম সংস্কার মাতৃ-জঠরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, ভাবিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট প্রতিমা-

অবলম্বনীয় নহে। নদীমুখে তৃণখণ্ডও যেমন সমুদ্র যাইয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রতিমা পূজাদি সহজ উপাসনা দ্বারা ক্রমে সেই অনন্তের ধারণায় সিদ্ধকাম হইবেন। তবে যদি এমন কাহাকেও দেখা যায় যে, জ্ঞান সঞ্চারেই প্রহ্লাদের মত "ক" এই কথাটি শুনিয়াই কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন, বুঝিতে হইবে পূর্ব্বজন্মে তিনি ঐ সহজ উপাসনা দ্বারা (কৃতকার্য্যতা যোগ্যতা) লাভ করিয়াই দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ইহ-জন্মে তাহার পর হইতে আরম্ভ করিবেন, কারণ সৎ-কর্ম্মের বিনাশ নাই। তবে কেবলমাত্র নিজের অবিবেককে বিবেক মনে করিয়া মস্তিষ্কজাত ভাববিকাশকে ধর্ম্মবাণী স্বরূপে ভাবিয়া অজ্ঞানের কার্য্য, জ্ঞানস্ফুরণ অবধারণ করিয়া যিনি নিজ বুদ্ধি অনুসারেই চলেন, তিনি এই সকল ভ্রান্তজ্ঞানকেই যোগ্যতার কারণ স্থির করিয়া লয়েন।

প্রকৃত ব্রহ্মোপাসকেরা অভিজাতের গৌরব করেন না, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার করেন না, কোন বিষয়েই অভিমান করিতে পারেন না, কেবলমাত্র উপবীত ত্যাগ সকল জাতির সহিত ভোজনাদি অভিমান ত্যাগের পর্য্যাপ্ত নহে। অর্থ-বিদ্যা সম্মান গত অভিমান রহিল, নিজেরা উত্তম জ্ঞানী, শিক্ষিত এ অহং জ্ঞান অস্থি মজ্জায় জড়িত থাকিল, তবে দুই একটি ত্যাগ করায় সে সমতা করা হয় না, "ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।" এ মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া সহজ কথা নহে। "শ্রুতি বলেন, "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাও।" সমব্যক্তি-দিগকে বিষম শূদ্রবৎ মনে করিলে বিষমকে শূদ্রকে সম ব্রাহ্মণ তুল্য জ্ঞান করিলে, ইহ-পরকাল চ্যুত হইতে হয়। অথচ গীতাই বলেন :—

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

এই উভয়ের মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত মন শুদ্ধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববিধি অনুসারেই চলিতে হইবে, শুদ্ধচিত্ত সমজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারই সর্ব্বভূতেই তুল্যজ্ঞান স্বাভাবিক। যাঁহারা উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাধারণকে সমজ্ঞান করিতে পারেন না। বিষ্ঠাবাহী মেথর ও শ্মশান-বাহী মুদ্দফরাসকে নিজের আসনে শয্যায় বসিতে দিতে পারেন না, তাঁহারাই সাম্যজ্ঞানের পরিপোষক ও গীতার ঐ মহানহিমময় জ্ঞানের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন।

তবে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, উত্তমাভিমানী তাঁহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যের উপর কটাক্ষপাত করা মনুষ্যের স্বভাব বলিয়া আমরা করিয়া থাকি। যিনি ব্রহ্মোপাসনার অসীম অনন্ত সলিলরাশি সন্তরণ দিয়া পার হইবার আশা করেন, তাঁহার মহতী আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁহার গতির উপর স্পৃহনীয়লোচনে তাকাইয়া থাকি, দেখি, তিনি পার হইয়া উন্নত তত্ত্বের নিকট যাইতে পারেন, কি সলিল মধ্যে নিমজ্জিত হয়েন। তাঁহারা যদি আপনার শক্তি বা জ্ঞানের অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া বিফলমনা ও অধঃপতিত হয়েন, তাহাতে আমাদের ইষ্টানিষ্ট কি? তবে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে হইলে বন্ধচিত্ত অনিষ্টাশঙ্কী বলিয়া বারণ করি, পাছে তাঁহার ক্ষতি হয়। আর "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরংনৃনাং।" বলিয়া দুই একটি অনাবশ্যক বাক্‌মাত্র সার উপদেশ দিয়া থাকি। কারণ বিংশশতাব্দীর সভ্যতাযুগে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই উপদেষ্টা হইবার দাবী করিতে পারেন,

অনেকে প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু ও সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা পাছে ভ্রমে পড়েন. ইহা হিন্দুসন্তানের বাঞ্ছনীয় নহে। স্বমত অনুসারেই সকলেই চলিতে ভালবাসেন, অনেক সময় দেখা যায় যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার সত্বগুণের খেলাকে, বুদ্ধি মনের সমসদ্‌ভিসন্ধিতাকেই ভগবদনুগ্রহ বা জ্যোতি দর্শন হইল ভাবিয়া প্রতারিত হয়েন, এই ভ্রমাত্মক অবস্থায় মুমুক্ষুর পতন হইয়া থাকে. এই অবস্থায় জাগ্রদ্বাসনার স্মৃতি সকল, পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সংস্কারনিচয় আমাদিগকে অসত্যপথকে সত্য পথে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। অবিবেক বিবেক নাম ধারণ করিয়া, কুমতি সুমতিরূপে আপনাকে পরিবর্ত্তিত করাইয়া, অল্পজ্ঞানী ধর্ম্মপিপাসুর ক্ষতি করিয়া থাকে।

এই সমস্ত নানাবিধ কারণে, নানাদিক্ দেখিয়া এই সহজ প্রকৃষ্ট উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছিলেন, যে একেবারে পরিপূর্ণতার ইয়ত্তা করা বড়ই কঠিন, তাই খণ্ডশ বিভক্ত পরিপূর্ণতার অনুধাবন করিতে করিতে পরিশেষে পরিপূর্ণতার ইয়ত্তা হইয়া যাইবে। আমরা সমুদ্র সম্পূর্ণ ধারণায় আনিতে পারি না, এইজন্য সমুদ্রের একাংশ পরে অপরাংশ, এইরূপে সমস্ত সমুদ্র বুঝিতে পারি। কোন গোলাকার বস্তু ধারণা করিয়া থাকি, অথচ একসময়ে সমস্ত অবয়বটি ধারণা করি না, পর পরই করিয়া থাকি; তাহাতেই গোলাকার বস্তুর জ্ঞানের কোন ত্রুটি হয় না। এইরূপে ভগবানের মহিমা বা স্বরূপ একেবারে না করা হইলেও পরে সমস্ত মহিমা বা প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার ক্ষতি হইবে না।

বিরোধী অথচ কার্য্যে প্রকারান্তরে তাহার পরিপোষক। বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির বাহুল্য কি তাঁহাদের প্রতিমাভক্তির সূচনা করিয়া দেয় না? প্রভু যীশুর ক্রুশের ছবি বা প্রতিমূর্ত্তি ভক্তেরা কত স্পৃহনীয়লোচনে দর্শন করেন, তাঁহার চরণে কুসুম ঢালেন, প্রণাম করেন ও প্রার্থনা করেন। এ সমস্ত কি প্রতিমাপূজার নামান্তর নহে?—উভয়ের উদ্দেশ্য কি এক নহে? উভয়েরই উদ্দেশ্য একই প্রকার।

বেদান্তধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক মধুসূদন সরস্বতী আপনার মনের আকাঙ্ক্ষা আকুলতা কি অতুলনীয় আবেগের সহিত বর্ণন করিয়াছেন;—

"ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কেচন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তুতে।
অস্মাকং তু লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং তমো ধাবতি॥

ধ্যানাভ্যাস সুনির্ম্মল চিত্তে যোগী যদি—
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম পারেন ভাবিতে,
ভাবুন, তাঁহারা তবে, আমরা কখন,
কালিন্দীবিহারী শ্যাম পদ-কোকনদে—
ভুলিব না নিরবধি পূজিব হরষে॥"

—:*:—

ধূলি-কণা।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

সতীর একই পতি—অসতীর নানা;
সতীর সে ষোলআনা—অসতীর আনা।

নারী-রূপ কালফণী প্রাণবিনাশন—
আপনার অঙ্গে করে আপনি দংশন!

ঠেকে মজে বুঝে জানি পিরিতির গুণ—
কাঁচা প্রাণে ভালবাসা কাঁচা বাঁশে ঘুণ!

কতবার আসি যাই নাহিক নিশ্চয়—
এ ধরার এই মৃত্যু শেষ মৃত্যু নয়!

কামিনীকাঞ্চন কায়া,
এ জগতে মহামায়া—
সেই মায়াসূত্রে বদ্ধ মানবপুতলী;
অদৃষ্ট নেপথ্য হ'তে—
নাচাইতেছে নানা মতে,
কেবা কোন্ বাজীকর, দেও মোরে বলি!

সম্মুখে শীতল জল,
করিতেছে টল টল—
পাশে দাঁড়াইয়ে আছি বড় তৃষাতুর—
যেতেও পারি না কাছে—
কে যেন গো ধ'রে আছে,
হায় হায় কেবা সেই—কে হেন নিষ্ঠুর!

বৃদ্ধকালে যেই জন,
হারা হয় পত্নী ধন—,
তার মত ভাগ্যহীন নিস্ব কোন্ জন?
দুই মিলে এক-যোগে,
শূন্য হয় সে বিয়োগে,
আত্মহারা আত্মা খোঁজে ঘুরে ত্রিভুবন!
আত্মা পরিবর্ত্তে পায় মৃত্যু-দরশন।

সুখের পোড়েন সুতা—দুখের টানায়—
মানব-জীবন-বাস—মেলে ভব-হাটে—
সামান্য আঘাতে কাল রজকের পাটে,
কিন্তু ছিন্ন হয়ে যায় হায় শতধায়!

০-:-:-০

ভক্তের জয়।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(২)

ভক্তের জয়ের দ্বিতীয় চিত্র বলরাম দাসের রথযাত্রা—বলরাম দাসের নিবাস শ্রীক্ষেত্র, তিনিও পরম ভগবদ্ভক্ত ভগবচ্চিন্তায় সদাই বিভোর, ভগবান ভিন্ন তাঁহার আর কোন চিন্তা ছিল না। চিন্তামণির চরণচিন্তাই তাঁহার প্রধান চিন্তা। তিনি সর্ব্বদা হরিকথা শ্রবণে, শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে সততই নিবিষ্ট। সাধুসজ্জন সহবাস তাঁহার অতি প্রিয়। কি জানি পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে তাঁহার বেশ্যা ভবনে গতিবিধি ছিল। এইরূপে কিছুদিন যায়, মহাপ্রভুর রথযাত্রার দিন আগত, পুণ্যভূমি মহা আনন্দকোলাহল পূর্ণ--সকলেই রথে বামনদেবকে দর্শন করিয়া পুনর্জন্মের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ঔৎসক্যাকুল। বলরাম তখন বেশ্যালয়ে, বেশ্যাবসবাসে ভ্রান্ত। হঠাৎ রথযাত্রার শোরগোল তাঁহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, আত্মনিগ্রহ উপস্থিত হইল। আপামর সাধারণ সকলেই আনন্দোৎফুল্ল, জগবন্ধুর দর্শন লালসায় বিব্রত, আর তিনি বেশ্যাবসবাসে মত্ত। তাঁহার জীবনে ধিক্কার জন্মিল, আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে গাত্রোত্থান করিলেন, বারবিলাসিনীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া সেখান হইতে আকুল প্রাণে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভু রথে আরোহণ করিয়াছেন। বিলম্ব না করিয়া বলরাম এক লম্ফে নন্দিঘোষ রথে আরোহণ করিলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপূটে কাঁদিতে কাঁদিতে কতই কি বলিতে লাগিলেন। পাণ্ডাগণ চটিয়া লাল হইল, অস্নাতদেহে জগন্নাথকে বলরাম স্পর্শ করিল, এ ক্রোধ আর

বলরাম রথ হইতে পড়িয়া প্রথমে ক্রুদ্ধ, পরে বিনীতভাবে ভগবান্‌কে কতই বুলি লেন, শেষে অভিমানে গলিয়া আর সেখানে থাকিলেন না, মনের আবেগে সমুদ্র তীরবর্ত্তী চক্রতীর্থের সমীপে বাঁকা মোহনায় গিয়া তিনখানি বালুকার রথ নির্ম্মাণ করিলেন, কল্পনায় সেই তিনখানি রথে সুভদ্রা বলরাম ও শ্রীপতিকে সংস্থাপিত করিলেন, এবং দেখিলেন, তাঁহারা তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে বিরাজমান, তখন বলরাম দাসের হৃদয়ে আনন্দের প্রবল তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল, প্রাণবন্ধু ভক্তবৎসল দীন বন্ধুকে সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া যেন মনের আগুণ নিভাইতে পারিলেন। এদিকে শ্রীক্ষেত্রের রথ অচল, তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব নাই, তিনি বলরাম দাসের হৃৎক্ষেত্রে বিরাজমান। রথ অচল দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র হয়-হস্তী, লোকজন অনেক লাগাইলেন, আপনি রথের রজ্জু ধরিলেন, রথ কিছুতেই চলিল না। তখন রাজা হতাশ হইয়া ধূলিশয্যা অবলম্বন করিলেন—স্বপ্ন দেখিলেন, মহাপ্রভু চক্রতীর্থে বলরাম দাসের হৃদয়ে বাঁধা পড়িয়া সেইখানেই আছেন, তিনি বলিতেছেন—"দেখ, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, দিবাযামিনী আমার নাম গান করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সে কখন অশুচি হয় না, তাহার দেহ প্রাণ, আত্মা সমস্তই শুচি ও শুচি হইতে পরম শুচি ইত্যাদি। অনেক কথার পর বলরামের মান ভঞ্জন করিয়া তাহার সম্মান স্থাপনের উপদেশ দিলেন, রাজা নিদ্রোত্থিত হইয়া তাহাই করিলেন। বলরাম দাসকে রথে বসাইয়া টানিবামাত্র রথ চলিতে লাগিল।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতোহি সঃ

গীতা ৯ম অঃ ৩০ শ্লোঃ।

অত্যন্ত দুরাচারও যদি অন্যান্য দেবতাও বাসুদেব, এই জ্ঞানে পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকেই ভক্তি করে, তথাপি সেই ব্যক্তি সাধু।

বলরাম দাস বেশ্যাসক্ত হইলেও ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য হেতু তিনি সাধু। এই রূপ আরও ছয়টী চিত্র "ভক্তের জয়" গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট, বাহুল্যভয়ে তাহাদের আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিতে হইল। "রঘু অরক্ষিত" প্রবন্ধটী উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য অথচ সদুপদেশপূর্ণ। ইহাতে সতীর পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, পতিপ্রাণতার সুন্দর চিত্র ভাল ভাল উপন্যাসেও খুজিয়া মিলে না, রঘু অরক্ষিতের ভগবদ্ভক্তি, তাহাতে তাহার আত্মোৎসর্জ্জনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ অসাধারণ।

বঙ্গ মহান্তি চিত্রে দুর্ভিক্ষ বড়ই সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত। ভাষা মর্ম্মভেদিনী, পড়িতে পড়িতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারা যায় না।

আমরা এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে "ভক্তের জয়" পড়িবার জন্য অনুরোধ করি। ইহা সর্ব্বোতোভাবে নূতন। উৎকলবাসী ভক্তগণের পবিত্র চরিত্র কথা পূর্ব্বে কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় এতদ্দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিলেন, বলিয়াই বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই; প্রতি সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে অভিনব ভক্ত চরিত প্রকাশিত করিয়া বঙ্গবাসীর পাঠকগণকে গোস্বামী প্রভুপাদ মহাশয়, বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

ভোজের বাজী।

লেখক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

গান।

লুম্-ঝিঁঝিট—খেং।

(আগে) মা-নামে হওরে দড়, (ওমন) দেখ্‌বি তবে
ভোজের বাজী।
তোর বিশ্বাস আর নির্ভর দেখে, মা তবে রে হবেন রাজী॥
মুখে বাজী বোল্লে কি হয়, বোধে বোধ হোলে প্রত্যয়,
(তখন) দেখান্ তিনি, ব্রহ্মময়ী, এ দুনিয়ার সব কারসাজী॥
মেকি ফাঁকি, দৌলৎ চাকি, খুপ্‌ সুরৎ রে সব বুজ্‌রুকি,
মন তোর হোয়ে ঘরের ঢেঁকি, দেখাবে সব হিজিবিজি॥
আনন্দে ভোরপুর থাকো, আনন্দময়ীরে ডাকো,
ভাবের ঘরে ঠিক্‌রে থেকো, পাটোয়ার না সাজায় পাজী॥

গুরু নানক।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত।

শিখ-সম্প্রদায়ের পরমপূজ্য গুরু নানক ১৪৬৮ খৃঃঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মবৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য ঘটনামূলক। ইঁহার পিতৃদেব কাল্লুর কোন অপত্য না হওয়ায়, পুত্রকামনায় ফকিরি অবলম্বন করেন; একদিন কাল্লুর আবাসে একটি বৃদ্ধ ফকির অতিথি হন। কাল্লু ইঁহার সসম্ভ্রম সৎকারাকাঙ্ক্ষায় বহু যত্নপূর্ব্বক পবিত্রভাবে ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। উক্ত ফকির ভোজনাবসানে ভুক্তাবশিষ্ট একত্রিত করিয়া কাল্লুর হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও বৎস! তোমার পত্নীকে এইগুলি আহার করিতে দাও, ইহা ভোজনে তোমার স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইবে এবং অনুপম পুত্রসন্তান লাভ করিবে।" কাল্লু প্রফুল্লান্তঃকরণে ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বৃদ্ধ ফকিরের পদধূলি গ্রহণান্তর স্বকীয় ভার্য্যাকে পবিত্রহৃদয়ে প্রসাদ সেবন করাইলেন। কিছুকাল পরে জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনুকম্পায় কাল্লুপত্নীর গর্ভসঞ্চার হইলে তদীয় পিতা কন্যাকে কুটকুচুয়ার অন্তর্গত মারি নামক গ্রামে স্বীয় আবাসে লইয়া যান। এই স্থানেই মহাভাগ নানকের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই নানকের ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জন্মায়। চারি বৎসর বয়ঃক্রমে সন্নিকটস্থ পাঠাগারের গুরুমহাশয়কে ইনি জিজ্ঞাসা করেন, "ঈশ্বর কোথায়?" শিক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর ইহার জন্মবৃত্তান্ত আশ্চর্য্যতর ঘটনা শ্রবণান্তর ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া ফকিরি অবলম্বন করিলেন।

বালক নানক-হৃদয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর কি? ঈশ্বর কোথায়? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং যাহা কিছু পাইতেন, ফকিরদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন।

একদা নানকের পিতা ব্যবসার জন্য তাঁহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া উক্ত অর্থে লবণ ক্রয়পূর্ব্বক স্থানান্তরে বিক্রয় করিতে উপদেশ দিলেন। নানক অর্থ লইয়া বহির্গত হইলে পথিমধ্যে কতিপয় ফকির আসিয়া তাঁহার নিকট অভাব জানাইল, নানক তৎক্ষণাৎ ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত ফকিরগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ আমার পিতা আমাকে ব্যবসা করিয়া লাভের জন্য লবণ খরিদ করিতে কিছু অর্থ দিয়াছেন। ব্যবসার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করা আমার অভিপ্রেত

নহে। দরিদ্রের দুঃখমোচন করা, ইহা অপেক্ষা শতগুণে বাঞ্ছনীয়; অতএব আমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ আছে, নির্ব্বিকার হৃদয়ে গ্রহণ করুন।" তাঁহাদের মধ্যে বালাশবি নামে জনৈক পরিব্রাজক বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; শুভকার্য্যে বিলম্ব করিবেন না।" ইহা সম্প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার পিতা অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করিলেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পিতৃসমক্ষে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না; নানক যখনই সুযোগ পাইতেন, দরিদ্রের দুঃখমোচনে সহায়তা করিতেন।

নানকের পিতা স্থির করিলেন, বিবাহ ব্যতীত নানককে সাংসারী করা এক প্রকার অসম্ভব। অতএব অনতিকাল বিলম্বে নানকের উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন। নানক্ও অনতিকাল বিলম্বে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিলেন।

নানকের ধর্ম্ম একপ্রকার হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণ। তিনি হিন্দুকে বলিতেন, "মুসলমানকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিও না।" আবার মুসলমানকে বলিতেন, "কাফের বলিয়া হিন্দুকে ঘৃণা করিও না।" শান্তিস্থাপনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন, হিন্দু মুসলমান একই পিতার পুত্র হইয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব করিবে কেন? ভ্রাতৃবিরোধেই পিতৃকুল নষ্ট হয়।

নানক একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাঁহার মতে যতদিন না পৃথিবীতে কেবলমাত্র এক ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপিত না হয়, ততদিন পরস্পর বিদ্বেষ ও বিরোধ মিটিবেনা।

নানকের জীবনীপাঠে অনেক আশ্চর্য্যমূলক আখ্যান অবগত হওয়া যায়। একদা নানক অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী শুনিলেন, "নানক অগ্রসর হও।" নানক ভক্তিবিহ্বলহৃদয়ে বলিলেন, "জগদীশ্বর আমার কি ক্ষমতা যে, আমি আপনার পথে অগ্রসর হই।" দৈববাণী হইল, "নানক! আমি তোমাকে কলিযুগে আমার কার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছি।" নানক প্রত্যুত্তর করিল, "হে দয়াল প্রভু! যদি আমি অমর হই, এবং চন্দ্রসূর্য্য আমার চক্ষু হয়, তাহা হইলেও হে সর্ব্বশক্তিমান্! তোমার কার্য্য কিছুই করিতে পারি না।" দৈববাণী হইল "আমি তোমার গুরু, কিন্তু তুমি সমগ্র মানবজাতির গুরু হইবে।" তোমার শিষ্যগণকে গুরু নাম আরাধনা করিতে বলিবে; আমি তাহাদের উদ্ধার করিব। তুমি তোমার শিষ্যগণকে তিনটি উপদেশ দিবে, যথা:—"আমাতে ভক্তি, জীবে দয়া, এবং বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি" আর বলিবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম; কারণ যেখানে প্রাণী

সেখানে আমি, যেখানে জীবাত্মা সেখানে পরমাত্মা, যেখানে পরমাত্মা, সেইখানেই জীবাত্মা" এই বলিয়া পরমাত্মা অন্তর্হিত হইলেন, এবং নানক গুরুনাম উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্গত হইলেন।

নানক জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে একটির আখ্যান দেওয়া গেল। একদা নানক শিষ্যগণের সহিত তুঙ্গ নামে একটি গ্রামে যান। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বুদ্ধু নামে জনৈক শিষ্যকে জলান্বেষণ করিতে বলিলেন। বুদ্ধু বলিলেন, 'তথায় কোন পুষ্করিণী নাই!" এই কথায় নানক বলিলেন, "কেন এই সন্নিকটেই ত একটি পুষ্করিণী দেখিয়াছি।" বুদ্ধু উত্তর করিলেন, "তিনি প্রত্যূষে তথায় গিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন, সে পুষ্করিণী পঙ্কে পরিপূর্ণ; তাহাতে একবিন্দুও জল নাই।" নানক বলিলেন, "আর একবার যাও, এক ঘটিও কি পাইবে না? আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত।" ইহাতে বুদ্ধু যাইল এবং সবিস্ময়ে দেখিল, পুষ্করিণী নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। নানক এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বহু শিষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া ১৫৩৯ খৃঃঅব্দে ৭১ একাত্তর বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি প্রায় ৬১ বৎসর গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি মন্দির রাবী নদীর ধারে (কীর্ত্তিপুরে) এখনও বর্ত্তমান। বৎসরান্তর তাঁহার সমাধির দিবসে সেখানে উৎসব হয়।

———0-:০:-0———

মধ্যবর্ত্তী।

লেখক—শ্রীযুক্ত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন।

বেলা গেল বল বিভু দাঁড়াবো কোথায়।
জীবন সাগর পারে, যাইতে এসেছি ধারে,
সম্মুখে শায়িত সিন্ধু ল'য়ে যেতে চায়।
পিছে টানে উন্মাদিনী মাতা মমতায়॥

দু'দিকে সমান টান, মলিন আকুল প্রাণ,
দিনের সাঁজের মাঝে আমি যে গোধূলী।
শ্মশানের কাল কোলে, সোণার প্রতিমা জ্বলে,
শিখা হেরে খেলে শিশু আকুলিবিকুলি॥

উত্তাল তরঙ্গ বয়, আনে মাতা শিশুচয়,
চেয়ে দেখি মনোরম বিশাল সংসার।
অতীতের স্মৃতি আসে, ভগ্ন পোত পুন ভাসে,
আসে শুধু জল স্থলে প্রলয় আঁধার॥

সীমা হীন বারিরাশি, অনন্তে যাইছে ভাসি,
উদ্দামহৃদয়ে আমি বালুকার পরে।
আনন্দ কল্লোল সনে, গণিতেছি একমনে,
চিতাবহ্নি ধূ ধূ রব নিভৃত-অন্তরে॥

উজ্জ্বল ধরণী'পরে, যদি কেহ থাক ধ'রে,
এক ফোঁটা প্রেম-কণা কারণে আমার।
ধর তপ্ত অশ্রুধার, হৃদয়ের উপহার,
আমিত্বের নিদর্শন স্মৃতি অভাগার॥

সংসারের আবর্ত্তনে, যদি কারো জাগে মনে,
যত্নে গড়া ভাঙ্গা ঘর কেমন সুন্দর।
দেখাইয়ে দিও তারে, স্মৃতির অপর পারে,
বিভু পদে বৃথা কাঁদা কাতর অন্তর॥

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত।—শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মণ প্রণীত। শ্রীযুক্ত কালীনাথ সিংহ দ্বারা ১৩ নং নিকাসীপাড়া লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা।

এই পুস্তকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম, বাল্যলীলা, কলিকাতায় আগমন, রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামকুমারের পৌরহিত্য গ্রহণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীশ্রীরাধাকান্তবিগ্রহের পূজার ভারগ্রহণ, ব্রাহ্মণীর আগমন, তোতাপুরী, পরমহংস আখ্যা, অক্ষয়ের পীড়া, মথুরের পীড়া, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণপূজা, প্রচার ও ভক্তআহ্বান, তীর্থযাত্রা, দরিদ্র সেবা প্রচার, ভক্তসমাগম, কেশব, মনোমোহন, রামচন্দ্র, সুরেন্দ্র, বলরাম প্রভৃতি ভক্তগণের বিবরণ ইত্যাদি অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় গৃহীত হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের কয়েকখানি জীবনচরিত বিদ্যমান থাকিতেও এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কেন? শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মণ অগ্রেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন, যে, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সহজে বোধগম্য হওন উপযোগী সরল ভাষায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রথম খণ্ডের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বোধগম্য হইবার বাধা জন্মিবে না।

অভিনয়প্রণালী ও অধর।---শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত,এই বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তা। নাট্যাভিনয়ের নায়ক-নায়িকাগণ কি প্রকারে নাট্যাংশ আবৃত্তি করিলে শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, কৃষ্ণবিহারী বাবু কতক-দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সেই তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। নাটকের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাযথ আবৃত্তি করিতে না পারিলে অভিনয় সুন্দর হয় না, ইহার উপরেই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। রচনার ভাবের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জড়াইয়া মিশাইয়া আবৃত্তি করিলে মহা গোলযোগ ঘটে, ইহা অবশ্যই সার কথা। কৃষ্ণবিহারী বাবুর প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলির অতিরিক্ত একটি দৃষ্টান্ত আমরা জানি; একবার এক নাট্যশালায় একখানি নাটকের অভিনয়ে অভিনেতৃগণের মধ্যে পুরাতন বিদূষকের জ্বর হইয়াছিল, অভিনয়ের তিনদিন পূর্ব্বে ম্যানেজার মহাশয় একজন নূতন বিদূষক প্রস্তুত করিয়াছিলেন; নূতন বিদূষক দস্তুর মত সজ্জা করিয়া রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিল প্রথমেই ঢলাঢলি। নাটকে লেখা ছিল “বিদূ।--(হাস্য করিয়া স্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ নূতন বিদূষক এই সবটুকু আবৃত্তি করিয়াছিল। এইরূপ দোষের পরিহারার্থ কৃষ্ণবিহারী বাবুর এই পুস্তকের অবতারণা। অভিনেতা ও অভিনেতৃগণ এখানি



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮ বর্ষ। | ১৩১৭ সাল, পৌষ। | ৯ম সংখ্যা।

গুরু শিষ্য সংবাদ।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

শিষ্য।—মহাত্মন্‌! দেবার্চ্চনে পশুহিংসার উপদেশ বেদতন্ত্রাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে। দুর্গোৎসবাদিতে ছাগপশু বলিদান করা হয়, সেই হিংসাত্মিকা কর্ম্ম শ্রেয়স্কর কি?

গুরু।—উহা রাজসতামস লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর। যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াছেন, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগের অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মিগণের শ্রেণীভুক্ত নহেন। ঈদৃশ নিবৃত্তি মার্গাবলম্বীসাধুগণ আত্মতত্ত্বের অনুসরণক্রমে পরমোন্নতিলাভ করিয়াথাকেন,

আধ্যাত্মিক ক্রিয়াযোগসাধন তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন ; তাঁহারা অধর্মাধমকল্প—বাহ্যপূজা বা হিংসামিশ্রিত দেবার্চ্চনাদি করেন না ; মানসপূজা—অন্তর্যাগে তাঁহারা কামক্রোধরূপ ছাগমহিষ বলিদান করিয়া থাকেন।

সাত্ত্বিক গ্রন্থে পশুহিংসার কর্ত্তব্যতা উল্লিখিত হয় নাই। হিংসামিশ্রিত দেবার্চ্চনাদি রাজস ও তামস লোকের জন্য বিহিত হইয়াছে।

ভগবতী পার্ব্বতী বলিয়াছেন যে, হে শঙ্কর! যাহাতে প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির বিধান—সাত্ত্বিকক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, সে সত্যস্বরূপ সাত্বত গ্রন্থে পশুহিংসার বিধি নাই। ১। তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যে পশুহিংসাবিধি উক্ত হইয়াছে, তাহা রজস্তমঃপ্রকৃতি লোকের বা কেবল তামসিক লোকের স্বর্গ-নরক ভোগের নিমিত্ত। উহা সংসার প্রবর্ত্তক। ঐ হিংসামিশ্রিত কর্ম্মের ফলভোগ বশতঃ জীবগণ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। ফলকামনা পূর্ব্বক বেদোক্ত বিধানে যজ্ঞে যে পশুবধ করা হয়, কামনানুরূপ ফলভোগান্তে তদ্দ্বারা পুনরায় অধঃপতিত হইয়া থাকে। স্বর্গকামনা করিয়া যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; তিনি স্বর্গভোগান্তে পুনর্ব্বার ভবার্ণবে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ২। এই দেবী বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ সকল ক্রিয়ার ফল অস্থায়ী, একারণ তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ ঐ সকল হিংসামিশ্রিত কর্ম্মে আসক্ত হন না।

পার্ব্বত্যুবাচ ;—

১। সত্যেন সাত্বতগ্রন্থে সবিধির্নৈব শঙ্কর।
প্রবৃত্তিভ্যো নিবৃত্তিস্তু যত্রাপি সাত্ত্বিকী ক্রিয়া। পদ্মোত্তর খণ্ডে।

২। পশুহিংসাবিধির্যত্র পুরাণে নিগমে তথা।
উক্তো রজস্তমোভ্যাং স কেবলং তমসাপি বা॥
নরকস্বর্গসেবার্থং সংসারায় প্রবর্ত্তিতঃ।
ততস্তৎ কর্ম্মভোগেন গমনাগমনং ভবেৎ॥
ফলকামাস্তু বেদোক্তৈঃ পশোরালভনং মখে।
পুনস্তত্তৎ ফলং ভুক্ত্বা যে কুর্ব্বন্তি পতন্ত্যধঃ॥
স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যঃ করোতি নিগমাজ্ঞয়া।

মৎস্যমাংসাশী লোভপরতন্ত্র রাজস তামস মানবগণ অন্তর্যাগে অনধিকারী, তাহাদিগের সাত্ত্বিক কার্য্যেও প্রবৃত্তি হয় না, রুচির অনুরূপ রাজস তামস কাম্য-কর্ম্মেই তাহাদের আসক্তি হয়, একারণ হিংসামিশ্রিত কর্ম্ম তাহাদের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। কামক্রোধ বলিদানে অক্ষম ব্যক্তিগণ কামক্রোধের অনুকল্পব্যাজে ছাগ-মহিষ দেবতাকে বলিদান করিলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও কামক্রোধরূপ শত্রু বলিদানের ক্ষমতা হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী কর্ম্মিগণ প্রাকৃতিক গুণানুসারে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস-ভেদে ত্রিবিধ। কর্ম্মসকলও গুণাশ্রিত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা কর্ম্ম সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। অতএব যে মানব যে গুণাবলম্বী, তাহার তদনুরূপ কর্ম্মে আসক্তি হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি হিংসাহীন সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সহজাত হিংসামিশ্রিত কর্ম্ম করিলেও তাহাতে অনাসক্ত, যেহেতু সাত্ত্বিকগুণ প্রভাবে তাঁহারা কর্ম্মফলত্যাগী।

প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে জন্মের প্রারম্ভে প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কার মনুষ্যকে আশ্রয় করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বশ্যতাহেতু কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া যথোপযুক্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইহেতু প্রত্যেক বর্ণোচিত কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবজ বা জন্মসহজাত। যাহা জন্মের সহিত উৎপন্ন তাহাই সহজাত—সহজ; কর্ম্ম ত্রিগুণ বিশিষ্ট সদোষ; অনেক কর্ম্মই হিংসাদি দোষযুক্ত বা মোহাদি আবিলতাপূর্ণ, তথাপি সহজকর্ম্ম দূষণীয় জ্ঞানে ত্যাজ্য নহে।

আধ্যাত্মিক অর্থে সহজ কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম সকলেরই এক, (তাত্ত্বিক রহস্য ও যোগসত্তম দেখ।) তাহা ক্রিয়াবিশেষে বক্তব্য। ভগবদ্‌বাক্য লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অর্থে মণ্ডিত। যোগমার্গাবলম্বী জ্ঞানিগণ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অর্থ মুখ্যকল্প এবং সামাজিক কর্ম্মাসক্ত লোক সম্বন্ধীয় লৌকিক অর্থ গৌণকল্প। অতএব এই কর্ম্ম প্রসঙ্গে গীতোক্ত বচনের লৌকিক অর্থ বলিয়া বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান বলিয়াছেন যে, সহজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না, কেননা ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই দোষাবৃত। ৩। স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মানব সিদ্ধিলাভ করেন। ৪। যাহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি হয় এবং

৩। সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতঃ॥ গীতা ১৮অঃ ৪৮।

৪। স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। গীতা

যিনি এই সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ৫। অতএব যে ব্যক্তি যে গুণের আশ্রিত, তদনুরূপ কর্ম্মই তাহার পক্ষে বিধেয় বা যে বর্ণে জন্ম, সেই বর্ণোচিত কর্ম্মই তাহার অবশ্য করণীয়। কেবল তাহা কেন, দেশাচার, কুলাচার, স্ত্রী আচারাদি, পুরুষানুক্রমে যাহা শিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ম্মাধিকারিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সকলের নিমিত্ত একরূপ কর্ম্ম বিহিত হয় নাই। যাহার যে অবস্থা বা অধিকার, তদনুরূপ কর্ম্মই তাহার পক্ষে বিহিত। শাস্ত্রে ইহাও উক্ত আছে যে, অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ ভ্রষ্ট, সন্তুষ্টচিত্ত পার্থিব নষ্ট, শ্রেয় লাভ হয় না, লজ্জাশীলা বেশ্যা নষ্টা, উপাগত লোকের মনোরঞ্জনে অসমর্থা, এবং কুলবধূ লজ্জাহীনা হইলে নষ্টা—নিন্দনীয়া। ৬। আরও দেখ, যে কর্ম্মে এক দেশে এককালে এক নিমিত্তের বশে নিমিত্তান্তরে অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়, তাহাই আবার অন্যদেশে অন্যকালে নিমিত্তান্তরে ধর্ম্মরূপে পরিগৃহিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় শাস্ত্র ব্যতীত তাহা জানিবার উপায় নাই। শাস্ত্র দ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের প্রতি শাস্ত্রই একমাত্র কারণ, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, হিংসা অনুগ্রহাদিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম ধর্ম্মজনক। ছাগপশু বলিদানের বিধানও তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে। অতএব শাস্ত্রনির্ণীত ধর্ম্মক্রিয়াকে কিরূপে অসঙ্গত বলা যাইতে পারে?

মনে কর যিনি ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত, ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হেতু সেই মহাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রোচিত কার্য্য—মৃগবধ করিয়াছেন। মৃগহিংসারদ্বারা তিনি অধার্ম্মিক হন নাই। আরও দেখ, যে জাতিস্মর ঋষিবর ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধর্ম্ম-

---

৫। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিংবিন্দতি মানবঃ।

গীতা ১৮ অঃ ৪৬

৬। অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টাঃ পার্থিবাঃ সদা।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জা চ কুলাঙ্গনা॥

হিতোপদেশ, বিগ্রহ।

প্রভাবে ধর্ম্মব্যাধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা ব্যাধকুলোচিত কার্য্য, মাংস বিক্রয় করিয়াছেন। এক তপস্বীকর্ত্তৃক মাংস বিক্রয়ের হেতু জিজ্ঞাসিত হইয়া, তিনি বলিয়াছিলেন যে, মিথিলা নগর জনক রাজার রাজ্য, এখানে কোন প্রকার অধর্ম্ম হইবার সম্ভব নাই। ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকুলোচিত কার্য্য না করিলে অধর্ম্ম হইবে, এ কারণ মাংস বিক্রয় করিয়া থাকি (মহাভারত বনপর্ব্ব দেখ)। ইহাদ্বারাও সম্যক প্রমাণিত হয় যে, সহজাত বা স্বীয় বর্ণোচিত কর্ম্ম ধর্ম্মজনক, তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয়। যাহার যে ধর্ম্ম সহজাত, তদনুষ্ঠান হিংসাদি দোষমিশ্রিত—নিন্দনীয় বোধ হইলেও তাহার পক্ষে তৎসমস্ত অনিষ্টকর হয় না। এ সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য একটি উদাহরণ দিয়াছেন, বিষাক্ত পদার্থে কৃমিকীট জন্মগ্রহণ করে, সেই বিষক্ষেত্রেই তাহারা জীবনধারণ ও সন্তোষলাভ করে, ঐ বিষ তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর হয় না। তদ্রূপ সহোজাত বা বর্ণোচিত কর্ম্ম সদোষ বোধ হইলেও তাহা অনিষ্টকর হয় না।

যখন কর্ম্মাতীত যুক্তযোগী বা নির্ব্বিকার অবস্থা লাভ হইবে, তখন আর ঐ সকল বর্ণোচিত কর্ম্মের আবশ্যক নাই। কিন্তু যতকাল চঞ্চল মন বিষয়ব্যাপারে বিচরণ করিবে, ততকাল পর্য্যন্ত সহজাত কর্ম্ম অবশ্য করণীয়।

শিষ্য।—শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না। কোন স্থানে নিষেধ এবং কোন স্থানে বিধি, এই উভয় মতের সামঞ্জস্য কি?

গুরু।—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" এই বেদবাক্য—শাস্ত্রনিষেধ দ্বারা প্রাণিহিংসার অধর্ম্মকারিতা বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা সামান্য শাসন, যে বিষয় বিশেষ বিধির অন্তর্ভূত নহে, তাহাই সামান্য শাসন মধ্যে গণ্য। ন্যায়ানুসারে বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধি নিরাকৃত হয়। ঐ সামান্য বিধির অপবাদ স্বরূপে বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, "অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশু হনন করিবে।৭। এই বিশেষ বিধি দ্বারা ঐ সামান্য বিধি নিরাকৃত হইয়াছে। এক বেদেই বিষয় বিশেষে উভয়বিধ ব্যবস্থা হইয়াছে।

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" এই শ্রুতির সামান্য বাক্য অবৈধ হিংসার অধর্ম্মকারিতা জ্ঞাপক। যদি উহা সামান্য বাক্য না হইত, তাহা হইলে পশুহিংসা যজ্ঞীয় বলি বলিয়া উক্ত হইত না। "অগ্নিসোমীয় যজ্ঞে পশু হনন করিবে।" এই

৭। "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি শ্রুতিঃ

বেদোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা হিংসামূলক যজ্ঞকার্য্যের উপকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। পশুহনন হিংসাকার্য্য হইলেও যজ্ঞাদি বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ উপকার লাভার্থ হিংসার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মেও ব্রীহি পশ্বাদির হিংসা বিহিত হইয়াছে। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, বৈধ হিংসা ধর্ম্মজনক এবং অবৈধ হিংসা অধর্ম্মকারক।

পরানিষ্টের কামনায় বা বিশেষ কোনরূপ প্রবল বাসনার অধীন হইয়া যে স্থলে হিংসামূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তথায় তাহা দোষাবহরূপে পরিগণিত হয়। কেবল শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে তজ্জনিত ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মূলে হিংসা থাকিলেও, সে হিংসা দোষাবহরূপে পরিগণিত হয় না।

মীমাংসকগণ বলেন যে; যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যজ্য নহে। যজ্ঞের নিমিত্ত যথাবিহিত হিংসা করা কর্ত্তব্য। যদি যজ্ঞোদ্দেশ ব্যতীত অন্য কোনরূপ উদ্দেশে-রসনাতৃপ্তির জন্য বা লোক মনোরঞ্জনের জন্য কিম্বা সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান জন্য জীবহিংসা করা হয়। তাহা হইলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়।৮। যজ্ঞীয় পশু হনন শাস্ত্রীয় বিধি, বিধিসম্মত কার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত হওয়া অসঙ্গত নহে।

যে মহাত্মা পুণ্যবলে মুমুক্ষু হইয়াছেন, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁহার হিংসামিশ্রিত যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রয়োজন নাই,—কেননা তিনি ঐ সকল ক্রিয়ার অতীত উচ্চশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। যোগের অপরিসংখ্যেয় প্রভাব, (যোগসঙ্কেত তাত্ত্বিকরহস্যে দেখ) ভগবান বলিয়াছেন যে; "যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শব্দব্রহ্মকে অতিবর্ত্তন করেন।৯।

৮। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাব ; ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা, সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যাবায় হেতুরেব, তথাহি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে তাদর্থ্য লক্ষণ ত্বাত্তচ্ছেষস্য, নত্বেবং নিষেধোনিষেধ্যস্য তাদর্থ্যমপেক্ষ্যতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষ্যত্বাৎ, অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধা নাস্তি দোষবত্বং অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতে।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা।

৯। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে। গীতা।

বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কোন ধর্ম্মই অশুদ্ধ নহে, তজ্জন্যই শিষ্যগণ তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিশেষত কোন শাস্ত্রোক্ত বেদতন্ত্রাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসমূহের নিন্দা কথিত হয় নাই। বরং বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত আচরণকারী ভণ্ড পাষণ্ডগণ এবং তাহাদের কদাচারই নিন্দনীয়। যে ব্যবস্থা অপৌরুষেয়—বেদ তন্ত্র ও পুরাণাদি সম্মত, তাহার অযথাচারণ করিলে শ্রেয়োলাভ কথনই হইতে পারে না। কর্ম্মাধিকারিগণের কর্ম্মত্যাগের অধিকার নাই; অন্যায়রূপে ত্যাগ করা পাষণ্ডতা। সত্ত্বগুণাবলম্বিগণ সাত্বিক গুণপ্রভাবে কর্ম্মফল ত্যাগী, সাত্বিক ব্যক্তিরও কর্ম্মত্যাগের অধিকার নাই। পাষণ্ডতা প্রযুক্ত ত্যাগীকে রাজস তামসত্যাগী বলা যায়। নিত্যনৈমিত্তিক শাস্ত্র বিহিত পুণ্যজনক-কাম্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিষ্য। নিত্যনৈমিত্তিক পুণ্যজনক কাম্যকর্ম্ম কি?

গুরু।—মার্কণ্ডেয় পুরাণে গৃহস্থদিগের সম্বন্ধে ত্রিবিধ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্যনৈমিত্তিক। তন্মধ্যে সন্ধ্যাবন্দন, শিবপূজা ও পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ম্ম নিত্য, পুত্রজন্মাদি নিমিত্তিক কর্ম্ম নৈমিত্তিক এবং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় মিশ্রিত। ১০। সন্ধ্যাবন্দনাদি যে কর্ম্ম না করিলে পাপ-ভাগী হইতে হয় তাহাই নিত্য কর্ম্ম। ১১। পুত্রজন্মাদি নিমিত্তিক জাত কর্ম্মাদি সংস্কার পিতৃশ্রাদ্ধাদি এবং পাপশান্তির নিমিত্ত দানাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম।১২। এতদ্ভিন্ন স্বর্গলাভাদি ইষ্টসাধনের নিমিত্ত যে পুণ্যকর্ম্ম, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম বলে, যথা, দুর্গোৎ-সব ও জ্যোতিষ্টোমাদি।১৩।

১১। নিত্য নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্যনৈমিত্তিকস্তথা।
গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক॥
পঞ্চ যজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব।
নৈমিত্তিকং তথা পুণ্যং পুত্রজন্মক্রিয়াদিকং।
নিত্যনৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি পণ্ডিতৈ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

১১। নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায় সাধকানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি। বেদান্তসার।

১২। পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধিনি জাতেষ্টাদীনি। বেদান্তসার।

১৩। কাম্যানি স্বর্গাদিষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি।

যজ্ঞ দুর্গোৎসবাদি দেবার্চ্চন কর্ম্মসমূহও কাম্যকর্ম্মের অন্তর্ভূত, এই সকলকে নিত্য ও কাম্য উভয় মিশ্রিতও বলা যায়। যে যে কর্ম্ম যাহার পুরুষানুক্রমে শিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া চলিতেছে, সেই সেই কর্ম্ম তাহার পক্ষে নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত দেবার্চ্চনে পশু বলিদান করাও নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। তাহা না করিলেপূজার অঙ্গভঙ্গ হয়।

যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির একমাত্র পন্থা বলিয়া জানেন এবং বিহিত প্রযত্নে তদনুসরণক্রমে পরমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। নিত্যক্রিয়াকে অবৈধ বোধে পরিত্যাগ করিতে তাঁহারা কখনই সাহসী হন না। কেননা কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। শ্রুতিও কর্ম্মকে নৈষ্কর্ম্মলক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠার উপায়স্বরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন. যথা—ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার ইচ্ছা করিবেন।১৪। কারণাভাবে কার্য্য হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, অতএব জ্ঞানোৎপত্তির কারণ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য করণীয়।

জীবহিংসা যে পাপকর্ম্ম তৎপক্ষে সংশয় নাই, কিন্তু জীবহিংসা না করিয়াকেহই থাকিতে পারেন না। মনুষ্য অজ্ঞাতসারে অদৃষ্টরূপে অসংখ্য জীবকে নষ্ট করিতেছে, ভক্ষ্যদ্রব্য সঙ্গে ও শ্বাসপ্রশ্বাস সঙ্গে অনেক জীব অন্তঃপ্রবিষ্ট ও নষ্ট হইতেছে, গমনাগমনে জীব ঘাতিত হইয়া ধ্বংস হয়। এতদ্ভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, গৃহস্থের গৃহে প্রাণিহিংসার স্থান, পঞ্চসূনা বিদ্যমান আছে, যথা, উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ এবং সম্মার্জ্জনী, ইহা দ্বারা সর্ব্বদাই জীবহিংসা হইতেছে, এই হেতু গৃহস্থের স্বর্গলাভহয় না। এই পঞ্চসূনাকৃত পাপমোচনার্থ পঞ্চযজ্ঞের বিধান হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে যে পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চসূনাকৃত পাপের খণ্ডন হয়।১৫। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এবং নৃযজ্ঞ এই পাঁচ কর্ম্মকে পঞ্চযজ্ঞ বলে।১৬ তন্মধ্যে শিষ্যকে শাস্ত্রোপদেশ প্রদান ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, বলি, ভূত-

১৪। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন। শ্রুতিঃ।

১৫। কণ্ডনী.পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥ স্মৃতিঃ

যজ্ঞ এবং অতিথি সংকার নৃযজ্ঞ নামে অভিহিতহয়। ১৭।

যখন পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞই বলি, সুতরাং বলিও পাপনাশক পুণ্যকর্ম। এ অবস্থায় বলিও সাত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সাত্বিক বলি পায়সাদি, রাজস বলি ও তামস বলি, রুশরাও মাংসাদি। অতএব রাজস তামস উপাসনায় যথাবিধানে পশু বলিদান করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ অধিকারীর তাহাতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য হইতে পারে না। ক্রমশঃ

সীতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বাল্মীকি লিখিয়াছেন,—হরধনুভঙ্গের পর রাজর্ষি জনক রামচন্দ্রকে সীতা-সমর্পণে কৃতসংকল্প হইয়া রাজা দশরথকে আনিবার জন্য মন্ত্রীদিগকে অযোধ্যায় পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কৃত্তিবাস ঠাকুর হয় ত রামের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখাইবার জন্য জনককে একটু বেকুফ করিয়া ফেলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের জনক ধনুর্ভঙ্গের পর এতই অধীর হইয়া পড়িলেন যে, দশরথকে সংবাদ না দিয়াই রামচন্দ্রকে সীতাসমর্পণ জন্য যেন আজিকালিকার কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাসম্প্রদানে প্রস্তুত, তবে রাম-চন্দ্র যখন বলিলেন ;—

"শ্রীরাম কহেন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমা দোঁহে লয়ে চল অযোধ্যা নগরে॥
বহুদিন আসিয়াছি তাঁহার সহিত।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত॥
লইয়াছি চারি-ভাই জন্ম একদিনে।
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে॥

১৭। অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

রাম ছেলেটি রাজপুত্রের উপযুক্ত বুদ্ধিমানও বটে, আজিকালিকার গৃহস্থসন্তান হইলে জনক বলিবামাত্র কাহার অপেক্ষা করিত না। পিতা তাহাকে তাহার কার্য্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলে হয় ত বলিয়া বসিত, ভদ্রলোকের অনুরোধ কি রক্ষা না করিয়া থাকা যায়?

বিশ্বামিত্র যখন জনককে রামচন্দ্রের উক্ত প্রস্তাব জানাইলেন, তখন জনক প্রমাদ গণিলেন, তাঁহার দুটিমাত্র কন্যা, আর দুইটি কেমন করিয়া কোথায়ই বা পাইবেন। পুরোহিত শতানন্দ তাঁহার চিন্তাদূর করিলেন, তিনি বলিলেন,— "কুশধ্বজের দুইটি কন্যা আছে, তাহা হইলেই রামচন্দ্রের অভীষ্টসিদ্ধির কোনই বাধা ঘটিবে না, জনক সন্তুষ্ট হইলেন। রামচন্দ্রকে সে কথা অবগত করিলে তিনি বলিলেন ;—

"ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ অগোচর ।;

কৃত্তিবাস ঠাকুরের জনকের মুখে এইবার চুণকালি পড়িল না?—তিনি আর একটি দোষ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট বই বৃদ্ধি হয় নাই। বাল্মীকি লিখিয়াছেন, রাজর্ষি জনক দূতরূপে আপন মন্ত্রীগণকে অযোধ্যায় পাঠাইয়াছিলেন ; তাহারা পথিমধ্যে তিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়া অযোধ্যায় পৌঁছিয়া ছিলেন। কৃত্তিবাস ঠাকুরের জনক বিশ্বামিত্রকেই অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

"রাজা বলিলেন, মুনি করি নিবেদন।
তোমা বিনা কে যাইবে অযোধ্যা ভুবন ॥
এই যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরামলক্ষ্মণে ॥
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন।
সিদ্ধাশ্রমে প্রথমেতে দিলা দরশন ॥
সুধায় সকলে মুনি কি শুনি কৌতুক।
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে শিবের ধনুক ॥
মুনি কহে করিবারে সীতার কল্যাণ।
শিবধনু আপন্নি হইল দুই খান ॥"

শিষ্টশান্ত, বিনয়ান্বিত জনকের বিশ্বামিত্রের প্রতি এরূপ অবিনয় বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচায়ক, এবং একবারেই উপহাসজনক। বিশ্বামিত্র আজি-কালিকার নব্য শিক্ষিত যজমানবাড়ীর পুরোহিত ঠাকুর নহেন যে, পুরোহিত ঠাকুরকে যাহা বলা যাইবে, তিনি যজমানের মান রক্ষার নিমিত্ত তাহাই করিবেন। অপর কেহ নহে মহর্ষি বিশ্বামিত্র। যাঁহার তপঃপ্রভাবে দেবগণকে অস্থির হইতে হইয়াছিল, সেই বিশ্বামিত্র জনকের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতে প্রস্তুত হইবেন, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব আর কি হইতে পারে? রাম ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীর পাণিপীড়নে সমর্থ হইলেন, তাহাতে বিশ্বামিত্রের সেই বিবাহ ঘটনার কি কর্তৃত্ব ছিল যে, তিনি এই বিবাহদাতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণকে "সীতার কল্যাণ জন্য হরধনু আপনি ভাঙ্গিয়া গেল।" এ কথা বলায় রামচন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্যে কি আঘাত লাগে না? তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্যের লাঘব হয় না?

বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদক কবিবর রাজকৃষ্ণ এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি বাল্মীকির অনুসরণই করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভু রাম-রসায়ণে রামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ এবং সীতা-পরিণয় কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন; তাঁহার রচনা বড়ই আড়ম্বরময়ী। তিনি ব্যাপারটাকে বড়ই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলায় প্রবেশ করিলে, মিথিলাবাসীরা তাহাদিগকে দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল, রামচন্দ্রের রূপগুণ ব্যাখ্যার পরিচয়ে কবি রয়েল ৮ পেজী ফর্ম্মার সার্দ্ধ তিনটি স্তম্ভ পুরিয়া ফেলিয়াছেন; সীতার পতি-লাভ সূচনার্থ তাঁহার বামবাহু ও বামচক্ষুকে নাচাইয়াছেন, তাঁহাকে একটী বিবাহের স্বপ্ন দেখাইবারও ত্রুটী করেন নাই।—

"হেনকালে গৃহে বসি জনকনন্দিনী।
সখীগণে কহিলেন, মধুরকাহিনী॥
আজি কেন মোর বাম বাহু ঘনে ঘনে।
নাচিয়া উঠয়ে সখী কারণ বিহনে।
বাম আঁখি থাকি থাকি করয়ে নর্ত্তন।
না জানি যে কি কারণে আনন্দিত মন॥
আর এক আজিকার শুনহ স্বপন।
নিশা শেষে কাছে আইল বিপ্র একজন॥

বিনতি করিয়া তাঁরে করিনু প্রণতি।
আশীষ করিলা তিহঁ শীঘ্র পাও পতি॥
লোকে কহে সত্য হয়, প্রাতের স্বপন।
এত সখি অতি বড় অসাধ্য ঘটন॥
হেন বীর ত্রিজগতে কি আর আছয়ে।
কঠিন হরের ধনু নোয়াতে পারয়ে॥
শ্রীরঘুনন্দন কহে, না ভাব জননী।
আসি উপস্থিত হলো তোর রঘুমণি॥"

রামরসায়ন ৫২ পৃষ্ঠা।

বালিকা সীতা ঠাকুরাণী যেন বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আজিকালিকার একটা প্রাপ্ত-যৌবনা স্ত্রীলোকের ন্যায় তিনি পতিলাভার্থ বিষম উৎকণ্ঠিতা। তাঁহার একজন সখী রাজপথে রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন, তিনি জানকী সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "চল আমরা অট্টালিকাশিখরে আরোহণ করি, তাহা হইলে শারদচন্দ্রমার রূপরাশি দর্শনে চরিতার্থ হইতে পারিব।" সীতা-দেবী এতই ব্যস্ত যে অট্টালিকা চূড়ায় আরোহণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ;—

"কি দেখিয়া আলি সখি! নাম নাহি জান।
সখী বলে শুন সখি! কর অবধান॥
অযোধ্যায় আছে রাজা দশরথ নাম।
তাঁর পুত্র আসিয়াছে রাম তাঁর নাম॥
সখীর বচনে সীতা অধিক উল্লাসী।
তৃষিত চকোরী যেন পিয়ে সুধারাশি॥
শুষ্ক ঠাঞি পড়ি মীন পায় বড় দুঃখ।
আচম্বিতে বন্যা পাই যেন পায় সুখ॥"

রামরসায়ন ৫৪ পৃষ্ঠা।

তার পর সখীসহ সীতার অট্টালিকারোহণ, রাজপথে বিশ্বামিত্র ও লক্ষ্মণসহ উভয়ের রামরূপ দর্শন। একথা অবশ্য মানিতে হইবে, কবি রামচন্দ্রের রূপবর্ণনায় কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ;—

"কিবা রঘুপতি, মধুর মূরতি,
জগজন অভিরাম।
ইন্দ্র নীলমণি, জলধর জিনি,
অসিত চিকণ ধাম॥
অতি সুকোমল, চরণ কমল,
তাহাতে নূপুর বাজে।
করিকর জিনি, উরুর বলনী,
পীত পটে কটি সাজে॥
কিবা মাঝাখানি, মৃগপতি জিনি,
ত্রিবলী বলনী তায়।
কিবা রোমাবলী, মধুপ মণ্ডলী,
জিনিয়া উদরে ভায়॥
কবাট সুন্দর, বুকের উপর,
দুলিছে মুকুতা হার।
যেন নীলগিরি, তটের উপরি,
বহে সুরধুনী ধার॥
জিনিয়া কদলী, বাহু যার দুলি,
তাহে নানা আভরণ।
কর সরসিজে, শরধনু সাজে,
কাম করি মনে মন॥
মুখের মাধুরী, কহিতে কি পারি,
তাহার তুলনা তাথে।
যে দেখেছে তারে, সেই ঘৃণা করে,
সরোজ রজনী নাথে॥
তাহাতে নয়ন, নাচয়ে খঞ্জন,
কপোলে কুণ্ডল দোলে।
ললাটে চন্দন, ফোঁটা সুশোভন,
কে না দেখি আঁখি ভোলে॥

মুখের আমোদে, মাতি মাতি মদে,
অলি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রীরঘুনন্দন, করিয়া যতন,
"বারণ করেন তাকে ॥
দেখিয়া শ্রীরামরূপ জানকীর অপরূপ,
উথলিল প্রেমের তরঙ্গ।
ধৈরয ধরিতে নারে, নেত্রে জলধারা ঝরে,
কম্পিত হইল সব অঙ্গ ॥
রামরূপ নিরখিয়া, স্থির হত্যা পারিয়া,
সখীর অঙ্গেতে হেলা দিলা।
প্রেমেতে উন্মত্ত হিয়া, নরলীলা বিস্মরিয়া,
আধ আধ কহিতে লাগিলা ॥
শুন শুন প্রাণবন্ধু তুমি সে করুণাসিন্ধু,
কেমন কঠিন তব হিয়া।
এতদিন বিচ্ছেদেতে, স্থির করি রাখি চিতে,
কি করি রয়্যাছ বিস্মরিয়া ॥
আপনি কর‍্যাছ তুমি, তুমি ছাড়া নহি আমি,
এ কেমন কঠিন আচার।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, এইত প্রভুর হয়,
নরলোকে লীলার প্রচার ॥"

রামরসায়ন ৫৪।৫৫পৃঃ

সীতাঠাকুরাণীকে গোস্বামী প্রভু বড়ই প্রগল্‌ভা করিয়া তুলিয়াছেন। বাল্মীকির সময়ে কাব্যনাটক ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল না, সুতরাং তিনি সাদাসিদা সীতাচরিত চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা নায়ক-নায়িকার রূপ ও পূর্ব্বরাগ বর্ণনাদ্বারা পরস্পরের অনুরাগ আসক্তি দেখাইতে গিয়া এরূপ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই গোস্বামীপ্রভু তৎকাল প্রচলিত সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম না করিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার এই ভাবকে অলঙ্কারশাস্ত্রে পূর্ব্বরাগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গোস্বামী কবি পরম ভাগবৎ তাই তিনি রামচন্দ্রের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন জন্য অনেক কথা বলিয়া ভক্ত-

পাঠকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। হাস্য-রসপ্রিয় পাঠকের মনে হাস্যরসের প্রবলস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য জনক-রাজাকে দিয়া সীতা পরিণয়প্রার্থী এক বিরাট সভার সমাবেশ এবং সীতার চিত্তা-কর্ষণ জন্য তাঁহাদের বেশভূষাদির বর্ণন ও সীতালাভের জন্য তাঁহাদের অপূর্ব্ব কল্পনার চিত্র অঙ্কিত করিবার পক্ষে ত্রুটি করেন নাই।—

"এথা স্বয়ম্বর কথা শুনি রাজগণ।
নিজ নিজ অঙ্গেতে পরিছে আভরণ॥
কেহ মলা দূর করে গন্ধবস্তু দিয়া।
কেহ ক্ষৌর কর্ম্ম করে নাপিতে আনিয়া॥
কেহ স্নান করি করে তিলকবিধান।
পুন পুঁছে আরবার করয়ে নির্ম্মাণ॥
কেহ শিরে পুনঃ পুনঃ মনোহর ছন্দে।
বিচিত্র বসনে পাগ বাঁধয়ে আনন্দে॥
জরাতুর মহামূর্খ অনেক নৃপতি।
তাহারাও সাজাইছে আপন মূরতি॥
কেহ পক্ক শ্মশ্রু কেশে মাখিছে অঞ্জন।
কেহ ভগ্ন দন্তে করে কল্পিত দশন॥
কেহ ললাটের মাংস তুলিয়া উপরি।
কসি কসি বান্ধে পাগ মহাযত্ন করি।
কেহ বলি গোপন লাগিয়া কলেবরে।
নানামত জামাজোড়া পরিধান করে॥
কেহ কহে সখীজনে আজি নিশাশেষে।
দেখিয়াছি স্বপনে জানকী বামদেশে॥
অতএব অবশ্যই পাইব যেন তায়।
শীঘ্র আনি দাও দিব্য ভূষণ আমায়॥
কোন ভণ্ড আসি কহে কাহার আগেতে।
মহারাজ দেখিয়াছি আজি স্বপনেতে॥
সীতা যেন করিয়াছে তোমারে বরণ।

সবে তারা দেবতা নিকটে বর মাগে।
সীতা যেন মাল্য দেয় মোর কণ্ঠে আগে॥
এই মত মিথ্যা তারা করে আয়োজন।
সুধা লাগি কয়্যা ছিলা যেন দৈত্যগণ॥
একথাটী ভাবে নাহি কেহ একবার।
সিংহ ভোগ্যে শৃগালের কিবা অধিকার॥" রামরসায়ন ৫৯

সীতা যেমন অট্টালিকার শিরোদেশ হইতে রামরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, রামও তেমনি অট্টালিকাস্থিতা জানকীকে দেখিয়া চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিলেন ;—

"এ কি অট্টালিকা আগে কমল কানন।
তার মাঝে এক শশী হয় দরশন॥
তাহে পুন বিকশিত কমল-যুগল।
তিল পুষ্প রঙ্গণ কুসুম অবিকল॥
কিম্বা কোন রমণীর হইবে বদন।
তাহে শোভে ওষ্ঠ নাসা সুন্দর নয়ন॥
না বুঝিতে পারি নিজ মনের আশয়।
উহা দেখি কেন হেন উত্তরোল হয়॥" রামরসায়ন ৫৫ পৃঃ

কেবলমাত্র হরধনুভঙ্গের জন্য কবি আটপৃষ্ঠা লিখিতে বিরক্তি বোধ করেন নাই। তাহার মধ্যে নানা কথা আনিয়াছেন এবং হরধনু ভঙ্গের পর কবি সীতা-সহচরীগণকে দিয়া সীতার প্রতি রামচন্দ্রের অনুরাগ পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা তৎসকাশে উপস্থিত হইয়া সীতার চিত্রপট উপহার প্রদান করিলে রাম-চন্দ্র মনে করিতে লাগিলেন ;—

"কোথা হতে আল্যা এই অপূর্ব্ব রমণী।
কিবা কেশ কিবা বেশ সুন্দর নয়ন।
কিবা মুখ কিবা বুক ভুজের বলন॥
কিবা কটী পরিপাটি নাভি মনোহর।
কিবা উরু রম্ভাতরু সমান সুন্দর॥
বুঝি হইবেক এই দেবতার দার।
অনিমেষ দেখিতেছি নয়ন ইহার॥

কিন্তু কালি পথে এক প্রাসাদ উপর।
হেনই বদন এক দেখাছি সুন্দর ॥
সেই রমণীর যদি প্রতিমূর্ত্তি হয়।
তবে ত এমন শোভা অসম্ভব নয় ॥
এইরূপে শ্রীরাম করেন বিবেচন।
তাঁহারে ভাবিত দেখি কহে নারীগণ ॥" রামরসায়ন ৬৫পৃঃ

——০-:০:-০——

অমরতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,

কেন আসিতেছ কাছে তিল তিল করি'
ওহে মৃত্যু! একে একে দিনগুলি হরি'
মোর জীবনের,—এ পরাণ বধূ তব,
বাসর শয়ন রচি নিত্য অভিনব;
জেগে আছে নিশিদিন প্রেম-প্রতিক্ষায়,
এত শঙ্কা এত লজ্জা তবে কেন হায়?
যবে তব প্রিয়া রবে সুষুপ্তি শয়নে—
একদিন আসি সেথা অতি সঙ্গোপনে।
নিস্তব্ধ নিশীথ রাতে—বল মৃত্যু সে কি—
ভালবাসা? এস মূর্ত্তি ধরে বর-বেশ
পরি' ভালবাস যদি, সাথে লয়ে এস!
সহস্র বিপদ—তব প্রেমের বারতা,
তোমারে আলিঙ্গি দেব! পাব অমরতা।

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য ও ধর্ম্মসংসারের একটি উজ্জলরত্ন কাল-সাগরে ডুবিল। সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মদাতা কর্ম্মবীর শিশিরকুমার ঘোষ এই মাসের ষড়বিংশ-দিবসে মঙ্গলবাসরে ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! এই স্বনামপ্রসিদ্ধ কুলোজ্জল কর্ম্মবীরের দ্বারা দেশের অনেক বিষয়ে বহুবিধ উপকার সাধিত হইয়াছে। সমাচার পত্রে অধিকার গ্রহণ করিয়া তিনি প্রধানতঃ সামাজিক উন্নতি-

বিধানের চেষ্টা করেন, রাজায় প্রজায় সদ্ভাবস্থাপনের প্রয়াস পান, দেশীয় লোকের সুবিধাজনক কোন আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে, ন্যায়ানুগত যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া শিশিরকুমার তাহার দৃঢ়প্রতিবাদ করিতেন, এতদ্দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সূত্রধর রাজনীতিজ্ঞ শিশিরকুমার। যাহাতে দেশের লোকের হিত হয়, কায়মনোবাক্যে তিনি তদ্বিষয়ের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

১২৪২ বঙ্গাব্দে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি মাগুরা নামক ক্ষুদ্রগ্রামে শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (যশোহরে মাগুরা নামে যে সুবিস্তৃত মহকুমা আছে, সে স্থান নহে, শিশিরকুমারের জন্মস্থান অপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রগ্রাম মাগুরা।) সেই মাগুরায় একটি বাজার বসিয়াছিল, সভ্রাতৃক শিশিরকুমার সেই বাজারের নাম দিয়াছিলেন "অমৃতবাজার"। কেননা, তাঁহাদের পুণ্যবতী জননীর নাম ছিল, অমৃতময়ী, অতএব মাতৃনামেই বাজারের নামকরণ। ক্রমে ঐ স্থান এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করে যে, মাগুরা গ্রামের নাম বিলুপ্ত হইয়া সেই গ্রামের নাম হইয়াছে অমৃতবাজার।

শিশিরকুমারের পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ;—বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল এবং গোলাপলাল। প্রকাশ হইল, শিশিরকুমার তৃতীয়। বাল্যাবস্থায় বিদ্যালয়ে শিশিরকুমারের যথোচিত শিক্ষালাভ হয় নাই, স্বীয় প্রতিভাপ্রভায়, গাঢ় অধ্যবসায়বলে এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি স্বকীয় চেষ্টায় বিবিধ ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট ও মিরারপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশের উপকার সাধনকল্পে সংবাদপত্রই মূল যন্ত্র, এই ধারণায় তিনি স্বগ্রামে একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হন, একান্ত যত্নে ও বহু চেষ্টায় তিনি একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকা প্রকাশ করিয়া সেই সংকল্প সিদ্ধ করেন, পত্রিকার নাম হয়, "অমৃতবাজার পত্রিকা"। দূরস্থ পল্লীগ্রামে সংবাদপত্র পরিচালন বড়ই দুরূহ ব্যাপার., বিশেষতঃ তখন তাঁহার অর্থাভাব, সুতরাং একটি কাষ্ঠের প্রেস এবং এবং কতকগুলি পুরাতন অক্ষর সংগ্রহ করিয়া, প্রথমে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ; পল্লীগ্রামে কম্পোজিটার পাওয়া যায় না, প্রেসম্যান পাওয়া যায় না, বিভ্রাট। শিশিরকুমার একবার কলিকাতায় আসিয়া প্রেস পরিচালনের প্রণালী দেখিয়া শুনিয়া কতক কতক শিক্ষা করিয়া যান, ভ্রাতৃগণকেও শিক্ষা দেন, আপনারাই কম্পোজ করিতেন, আপনারাই ইম্পোজ করিতেন, আপনারাই প্রেসে

কালি দিতেন, আপনারাই ছাপিতেন। কালির অভাব হইলে আপনারাই কালি প্রস্তুত করিয়া লইতেন। প্রারম্ভেই শিশিরকুমারের এত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, কাপি না লিখিয়া, স্বহস্তে ইষ্টিক ধরিয়া নিজের মনের ভাবগুলি নিজেই অক্ষরে ২ সাজাইতেন, ফর্ম্মা প্রস্তুত হইলে তাহাই প্রেসে ঢালিয়া দিতেন, এক বৎসর ঐরূপ চলিয়াছিল, শতাধিক গ্রাহকও হইয়াছিল, অমৃতবাজার-পত্রিকা পাঠ করিয়া গ্রাহকেরা ধন্য ধন্য করিতেন, অল্পদিন মধ্যেই চতুর্দ্দিকে পত্রিকার প্রশংসা, প্রসার ও প্রতিপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার পর কলিকাতা আগমন। এখানেও পূর্ব্ব প্রণালিতে পত্রিকা প্রচার হইতে থাকে; ক্রমশঃই সুখ্যাতির বহুল প্রচার। বঙ্গের তদানীন্তন কোন কোন সম্প্রদায় অমৃতবাজার পত্রিকাকে সুনয়নে দেখিতেন না, জনকতক ব্যক্তি বিপক্ষও হইয়াছিলেন। ইহা সত্বেও দেশীয় সমাজে অমৃত-বাজার-পত্রিকার পসার প্রতিপত্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল; সেই সময় শিশিরকুমার একটি হেণ্ডপ্রেস এবং কতকগুলি নূতন অক্ষর ক্রয় করিয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিবার আইনেরএক পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করেন, বহু প্রতিবাদ্ স্বত্বেও ১৮৭৯ অব্দে সেই আইন বিধিবদ্ধ হয়। কর্ম্মবীর শিশিরকুমার সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে কিছু উদ্বিগ্ন হন; বাবু মতিলাল ঘোষ ব্যবস্থাপক সভা হইতে সত্যতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ম্লানবদনে ভ্রাতাকে আসিয়া বলেন, "দাদা! পত্রিকাখানি বুঝি যায়!"

পত্রিকাখানি গেল্ না। সেই সপ্তাহের বাঙ্গালা-পত্রিকা কম্পোজ হইয়া-ছিল,—প্রত্যুৎপন্নমতি শিশিরকুমার একরাত্রির মধ্যে সেই বাঙ্গালা ম্যাটার ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পর সপ্তাহেই ইংরাজী-পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তত শীঘ্র পত্রিকার রূপান্তর দেখিয়া সহরের সকল লোকেই চমৎকৃত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে অমৃতবাজার পত্রিকাদ্বারা দেশের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, সাধারণে তাহা অবগত আছেন; সদাশয় লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল পত্রিকাপাঠে প্রীত হইয়া শিশিরকুমারকে বেলভেডিয়ারে আমন্ত্রণ করেন। শিশির কুমার কয়েকবার বেলভেডিয়ারে গমন করিয়া সদালাপে ও বাক্যকৌশলে তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে সার রিচার্ড উদারভাবে তাঁহার অনুরোধ পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

তাহার পর অমৃতবাজার পত্রিকা দৈনিক হয়, দৈনিকের প্রচার হইলেও সাপ্তাহিক সংস্করণ বন্ধ হয় নাই। অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরাজী হইল, মহিমান্বিত লর্ড রিপণ আসিয়া লর্ড লিটনের পূর্ব্বোক্ত আইন রদ করিয়া দিলেন। শিশিরকুমার একখানি বাঙ্গালাপত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন বুঝিলেন, সেই প্রয়োজনে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার জন্ম। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যোগ হইয়াছে, আনন্দবাজার পত্রিকা। এই দুই পত্রিকার অতিরিক্ত শিশিরকুমারের একখানি ইংরাজী মাসিকপত্রিকা আছে, সেই পত্রিকার নাম Spiritual Magazine

এই সকল গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কর্ম্মবীর শিশিরকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, ১২৯৯সালে সেই কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর হইয়া দেখা দেন; মহাপ্রভু গৌরাঙ্গপ্রেমে তাহার মতি হয়। অনুজ মতিলাল ঘোষের প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকার ভার অর্পণ করিয়া তিনি বিষয়কর্ম্মে বিরত হন। বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিল—কিন্তু সাহিত্যসেবা পরিত্যক্ত হইল না। চৈতন্য ভক্তিতে জাগরিত হইয়া তিনি অমিয়নিমাই চরিত, কালাচাঁদগীতা, ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। "অমিয়" শব্দটি যদিও গদ্যে প্রযুক্ত হওয়া ঠিক নহে কিন্তু অমিয় নিমাই চরিত খানি উপাদেয় গ্রন্থ। চৈতন্যচরিত্রে যে কতকগুলি অলৌকিক রহস্য লিপিবদ্ধ আছে, এখনকার রুচি অনুসারে সেই অংশগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া রিফাইন করিবার ইচ্ছা এই নবীনভক্তের মনে উদয় হয় নাই, বৈষ্ণবকবি বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃতে, চৈতন্য-ভাগবতে ও চৈতন্যমঙ্গলে যেমন যেমন বর্ণনা আছে, নিমাই চরিতে শিশিরকুমার অবিকল তাহাই বজায় রাখিয়াছেন। নিমাই চরিত পাঠ করিয়া হরিপ্রেমপিপাসী ভক্তবৃন্দের চিত্ত বিগলিত হইয়াছে। সাধারণ বৈষ্ণবেরা মহাপ্রভু প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্মকে যেরূপে বিকারগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, ভক্তবীর শিশিরকুমার সেই বিকারের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; আমরা শুনিয়াছি, মৃদঙ্গ, এস্রাজ সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদনে ও কণ্ঠসংগীতে শিশিরকুমারের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল, কণ্ঠসঙ্গীতে নৈপুণ্যের পরিচয় তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়াছিল। নদীয়া জেলার চুর্ণী নদীর তীরস্থ হাঁসখালিগ্রামে গমন করিয়া তিনি গৌরাঙ্গ সাধনে ও হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে তৎপর হইয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহাকে প্রায়ই অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্রে তদ্‌গত চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন দেখা যাইত।

সেই রাজনীতিজ্ঞ বিষয়ী পুরুষ জীবনের শেষ অবস্থায় ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া

৭৫ বৎসর বয়সে যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি সহোদর, তিনটি পুত্র, দুইটি কন্যা ও কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান। বাবু মতিলাল ঘোষের প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালনে পূর্ণভার এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের উপর Spiritual Magazine সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছে। বাবু মতিলাল ঘোষ কয়েক বৎসরাবধি বিশেষ যোগ্যতার সহিত অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার দ্বারা শিশিরকুমারের সুনাম সুরক্ষিত হইতেছে ও হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীহরিচরণে শিশিরকুমারের আত্মার অক্ষয়শান্তি আমরা কামনা করিতেছি।

বৃন্দাবনের উড়ো পাখী।

লেখক—রায়গুণাকর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়।

বৃন্দাবন, বৃন্দাবন, মধুবৃন্দাবন,
বাল্য হ'তে এ তাবত করি যে শ্রবণ।
কথকের মুখে শুনি লীলাগুণগান,
ফুটিত হৃদয় যেন প্রেমের বাগান।
কালিয়-দমন যাত্রা দুতি অভিনয়,
যাহে জোগাইত মনে কানুর প্রণয়।
না জানি কি সংস্কারে অনুমানে মন,
দেখাইত বৃন্দাবন হয় যে কেমন।
বৃন্দাবন চিত্রখানি মনে মনে আঁকি,
বিরলেতে দেখি তোরে মানসের আঁখি।
অপ্রাকৃত তরুলতা স্বর্ণবর্ণময়,

কদম্ব তমাল শোভে যমুনার কূলে,
রাধাশ্যাম গুণগায় গোপ গোপীকুলে।
গাভীগণ বিচরিছে যমুনা কিনারে,
রাখাল পাঁচনী লয়ে ফিরাইতে নারে।
হেনকালে কানু মুখে বেণু যে বাজায়।
বেণু শুনি গাভীগণ ঊর্দ্ধমুখে যায়।
কি গুণ বাঁশরী ধরে নাহি আছে জানা,
যমুনা বাঁশরি রবে বহিছে উজানা।
সে রঙ্গে তরঙ্গ অঙ্গ উঠিছে কাঁপিয়া,
অনুরাগে কূল ভাঙ্গে ঝাঁপিয়া ঝাঁপিয়া।
যমুনার কূলভাঙ্গা দেখি মনে লয়,
কৃষ্ণপ্রেমে কুল মান সব হয় লয়।
যমুনার ঘাটে ঘাটে ফিরিতেছি যত,
মনে হয় বৃন্দাবনে সকলে সংযত।
প্রেম ছাড়া বৃন্দাবনে কিছু নাহি আর,
সকলের হৃদে বহে প্রেমের জোয়ার।
তমাল তরুর শাখে বসি সারি সারি,
রাধাশ্যাম লীলা গায় সুখে শুকসারি।
শুক আছে বৃন্দাবনে অসুখ তো নাই,
তাই শুক সুখে ডাকে কানাই কানাই!
কানাই সুখের মূল সংসারের সার,
শারী তাহে বাড়াইছে প্রেমের পসার।
শুক বলে শ্যাম জয় শারী বলে রাই,।
যুগলে যুগল হেরে বাসনা পুরাই
ময়ুর ময়ুরী নাচে শ্যাম দরশনে,
বহিছে মলয় শ্যাম-অঙ্গ-পরশনে।
কৃষ্ণপ্রেমে নাচে সব হরিণ হরিণী,

এইরূপ মনে হ'ত বৃন্দাবন ভাব,
দেখিতে বাসনা হ'ল ব্রজের স্বভাব।
কল্পনায় যে সুন্দর বৃন্দাবন রূপ,
না জানি কি ভাব হবে দেখিলে স্বরূপ।
দ্বাপরে হয়েছে লীলা, এবে ঘোর কলি,
আসল রয়েছে ঢাকা নকল সকলি।
নাম আছে বটে কিন্তু কই বৃন্দাবন,
বনশূন্য এবে দেখি বিলাস ভবন।
কোথা সেই মনোহর নিকুঞ্জকানন,
কবি করেছেন কাব্যে যাহার বর্ণন।
বর্ণনা শুনিলে হই মনপ্রাণ হারা,
কোথা সেই বন বল কোথায় তাঁহারা।
প্রেমে গড়া প্রেমে মাখা শুনি বৃন্দাবন,
এখন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সকল ভবন।
দেখিবারে আসিলাম যেই বৃন্দাবন,
যে বনের নাম শুনি জুড়াত জীবন।
এখন তথায় আসি শান্তি নাহি পাই,
ভরসা এখন মাত্র রাধার কৃপাই।
কোথা রাধা কৃপাময়ী শান্তি দেও মনে,
রাধার কৃপায় দেখি শ্রীরাধারমণে।
প্রেমহীন এ পাষণ্ড অর্থ-স্বার্থপর,
কেমনে দেখিবে ধামে হরি পরাৎপর।
এইরূপ চিন্তা লয়ে হারাইয়া জ্ঞানে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই শেঠের বাগানে।
দেখিলাম তথা বহু বৃক্ষলতা রয়,
সে শোভায় বিলাসীর মন যে হরয়।
অকালে ফুটেছে ফুল পল্লবিতা লতা,
জড়িতা তরুর সনে কি শোভা বল তা

বর্ণিব কেমনে বল হয় একানন,
নিকুঞ্জ সমান বটে দেখি এ কানন;
দেখিতে দেখিতে রবি যান অস্তাচল,
বাসায় ফিরিতে হবে হৃদয় চঞ্চল।
হেনকালে দিবাশেষে বিশ্রামের আশে,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীগুলি নীরে ফিরে আসে।
বাসার বাহিরে বসি করে কৃষ্ণনাম,
বৃন্দাবন নিবাসের এই পরিণাম।
পোষাপাখী নহে তারা পিঞ্জরেতে বাঁধা,
স্বেচ্ছায় উড়িয়ে যায় নাহি পায় বাধা।
রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, মুখে বুলি বলে,
উড়োপাখী বুলি বলে কার শিক্ষাবলে।
সব ধাঁধা দূরে গেল আঁধার হরিল,
বৃন্দাবন-প্রেমানন্দে হৃদয় ভরিল,
অবিরাম উড়ে উড়ে এই বৃন্দাবনে,
রাধাকৃষ্ণ নাম পাখী শুনিছে শ্রবণে!
শুনিয়া শিখেছে পাখী এই কৃষ্ণনাম,
উড়োপাখী তোরে আমি করি যে প্রণাম।
বৃন্দাবনে উড়োপাখী শিখাইলি মোরে,
সৎ সঙ্গে সাধুভাব পায় যে পামরে।
আছে সেই বৃন্দাবন আবরণে ঢাকা,
সাধন কেবল কৃষ্ণে প্রাণভরে ডাকা।
আবরণ দূরে যাবে হইবে প্রকাশ,
নীরদ বিলয়ে যেন নির্ম্মল আকাশ।
কৃষ্ণনাম শিখে পাখী বৃন্দাবন বাসে,
সাধে কিরে বৃন্দাবন সবে ভালবাসে।
উড়োপাখী উড়ে নাহি যায় অন্য স্থান,
কৃষ্ণ বলে বৃন্দাবনে করে অবস্থান।

বৃন্দাবনে স্থান দাও প্রেমময়ী রাধে,
প্রেমহীন ধর্ম্মদাস তোমায় আরাধে।

—— * ——

বকুল কুমারী।

লেখক——শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাখনলালের উমেদারী।

বকুলকুমারীর সহিত বিবাহের পর মাখনলাল মধ্যে মধ্যে এক একদিন অপরাহ্ণে পাড়ার দু'একজন ভদ্রলোকের বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন, কয়েকটী প্রতিবাসীর সহিত তাঁহার মিলনও হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরেও এক একদিন তিনি কাহারো কাহারো বাটীতে দু'এক ঘণ্টা বসিয়া, তাস খেলিতেন, গল্প করিতেন, বৈঠক বিশেষে তামাকও খাইতেন, সুবিধা হইলে নেশার উচ্চ অঙ্গটিও বাকী থাকিত না।

এক এক সময়ে অভাবনীয়রূপে এক একটী ঘটনার চমৎকার সম্মিলন হয়। যে পাড়ায় গৌরীপ্রসাদ দত্তের বাটী, রামজীবন ঘোষ নামে একজন উকীল সেই পাড়াতেই বাটী ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন; অতি নিকটে নয়, ১০।১২ খানি বাড়ী অন্তর। একটী বন্ধুর সহিত মাখনলাল একদিন সন্ধ্যার পর সেই বাড়ীতে উপস্থিত হন। সে দিন রবিবার ছিল, রামজীবন বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন, অন্যূন একঘণ্টাকাল তিনি তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন। মাখনলালের বন্ধুটী হাইকোর্টে চাকরী করিতেন। রামজীবনবাবু তাঁহাকে ভালরূপে চিনিতেন। কথায়২ রামজীবন বাবু তাঁহাকে মাখনলালের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সংক্ষেপে পরিচয় পাইলেন, গৌরীপ্রসাদ দত্তের জামাতা। গৌরীপ্রসাদ দত্তের নামও রামজীবন বাবুর জানা ছিল, তাঁহার জামাতা বলিয়া তিনি মাখনলালকে সম্ভবমত আদর যত্ন করিলেন। সেই পরিচয় ভিন্ন বিশেষ পরিচয় সে রাত্রে কিছুই হইল না;

পরে বাবুকে নমস্কার করিয়া উভয় বন্ধুতে উঠিয়া আসিলেন। মাখনলাল দেখিতে দিব্য সুশ্রী, ব্যবহারেও শিষ্ট শান্ত, বিদায়ের সময় রামজীবন বাবু তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, অবকাশ পাইলে আমার সহিত এক একবার দেখা করিও।

আমন্ত্রণটি মাখনলালের শ্লাঘনীয় বোধ হইল। তদবধি প্রতি রবিবারে বৈকালে তিনি একাকী রামজীবন বাবুর বাটীতে গতিবিধি আরম্ভ করিলেন, বেশ আদর যত্ন পান, বাবুর মিষ্টালাপে তুষ্ট হন, অনুরুদ্ধ হইয়া এক একদিন সেখানে জলযোগ করেন, সর্ব্বপ্রকারে আপ্যাইত হইয়া আসেন।

কয়েক রবিবারের পর একদিন অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে মাখনলালকে সম্বোধন করিয়া রামজীবনবাবু বলিলেন, "শুনিয়াছি, তুমি গৌরীপ্রসাদবাবুর জামাতা, সেই পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই আমি জানিতে পারি নাই, তোমার প্রকৃত পরিচয় কি? নিবাস কোথায়? তোমার পিতার নাম কি?"

মাখনলাল পিতা, পিতামহের নাম জানিতেন, পৈতৃক নিবাস কোথায়, তাহা তাঁহার জানা ছিল না, তিনি বারাসতে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রামজীবন বাবুর প্রশ্নে তিনি পিতার নাম বলিলেন, পিতামহের নাম বলিলেন, নিবাস বলিলেন বারাসত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মাখনলালের বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পাই নাই, মাখনলাল নিজের বিশেষ পরিচয় জানেন না, আমরা এইস্থলে তাঁহার পরিচয় দিয়া দিব।

বারাসতের নিকটস্থ একখানি গ্রামে মাখনলালের মাতামহাশ্রম। মাতামহের নাম ছিল, অম্বিকাচরণ ঘোষ, তাঁহার একটী কন্যা ছিল, নাম বিশ্বময়ী। কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যারা যেমন সচরাচর শ্বশুরালয় দেখিতে পান না, বিশ্বময়ীর ভাগ্যে সেইরূপ ঘটিয়াছিল, কুলীন কায়স্থের কন্যা কুলীন কায়স্থপাত্রেই সমর্পিত হইয়াছিল, পাত্রের নাম বংশীধর মিত্র। সেই বংশীধর এই, মাখনলালের জন্মদাতা পিতা। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহের নিকটবর্ত্তী একখানি গণ্ডগ্রামে। বিশ্বময়ীকে বিবাহ করিয়া অবধি বংশীধর শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পৈতৃক ভদ্রাসনে আপন পরিবার কেহই ছিল না, বংশীধর সুতরাং সেখানকার বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মাখনলালের জন্মের দুই বৎসর পরে তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন; কেহ কেহ বলে, সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ বলে, জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন। যাহাই হউক, তদবধি

বংশীধরের আর উদ্দেশ হয় নাই। দুই বৎসরের শিশু মাখনলাল পিতাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু মনে নাই। অম্বিকাচরণ ঘোষের দুইটী পুত্র ছিল, তাহারা ভগিনীকে ও ভাগিনেয়টিকে প্রতিপালন করিত, তাহাদের তেমন বিষয় আশয় ছিল না, সুতরাং মাখনলালকে রীতিমত লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। পিতা ঘরজামাই ছিলেন, পিতার নামে মাখনলালের পরিচয় হয় নাই। অমুকের দৌহিত্র, অমুকের ভাগিনেয়, এইমাত্র পরিচয়। মাতার নাম বিশ্বময়ী; অতএব ইতর ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা মাখনলালকে বিশীর বেটা, বিশীর বেটা বলিয়া পরিচয় দিত। মাতৃনামেই পরিচয়।

পাঠক মহাশয়েরা হয় তো এরূপ পরিচয় শুনিয়া হাস্য করিতে পারেন, কেহ কেহ হয়তো ক্ষুন্নও হইতে পারেন, কিন্তু এ প্রথাটা তাদৃশ দোষাবহ নহে। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থলে মাতৃপরিচয়ে পুত্রের পরিচয়ের উল্লেখ আছে। রামচন্দ্রকে কৌশল্যানন্দন, লক্ষ্মণকে সৌমিত্রী অথবা সুমিত্রানন্দন, যুধিষ্ঠিরাদি ত্রিপাণ্ডবকে কৌন্তেয় অথবা কুন্তীনন্দন, বলরামকে রোহিণীনন্দন, চৈতন্যদেবকে শচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দন ইত্যাদি সম্বোধনে গৌরব দান করা হইয়াছে; পশুপক্ষীর মধ্যেও ঐরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়; হনুমানকে অঞ্জনানন্দন ও গরুড়কে বিনতানন্দন বলে। দেবতারা অদিতিনন্দন ও দৈত্যেরা দিতিনন্দন নামে অভিহিত। এরূপ দৃষ্টান্ত স্থলে মাখনলালকে বিশীর বেটা বলাতে অগৌরব হয় না।

ম্যালেরিয়া বিষে বারাসত যখন ছারখার হয়, সেই সময় মাখনলালের মাতুলকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়। মাখনলাল নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় আইসেন, ঘটনাগতিকে গৌরীবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

সে সব কথা থাকুক, আর একটী কথা বলা আবশ্যক, পিতার নাম বংশীধর মিত্র। মাতামহের নাম অম্বিকাচরণ ঘোষ। হঠাৎ রামজীবনবাবুর একটী পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। বংশীধর মিত্র বারাসতের অম্বিকাচরণ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বংশীধরের নিবাস মাখনলাল বলিতে পারিলেন না, কিন্তু রামজীবন বাবু বুঝিয়া লইলেন, সম্বন্ধে বংশীধর মিত্র রামজীবন বাবুর মাতুলপুত্র তাঁহারই পুত্র এই মাখনলাল, অতএব সেই সম্পর্কে মাখনলাল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং শিষ্ট ব্যবহার দর্শনে মাখনলালের বয়স, রূপ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আপন বাটীতে স্থান দিয়া রাখেন, তাহার পর যাহা হইয়াছে, পাঠক মহাশয় জানেন।

রামজীবন বাবুর পরিচয় শুনিলেন। মাখনলালের প্রতি পূর্ব্বেই তাঁহার স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, সম্পর্ক নির্ণীত হওয়াতে সেইদিন অবধি সেই স্নেহ আরো বর্দ্ধিত হইল। সম্পর্কটি তিনি মাখনলালকে শুনাইয়া দিলেন, মাখনলাল তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন; আশীর্ব্বাদ করিয়া রামজীবনবাবু বলিলেন, "প্রতিদিন তুমি একবার করিয়া আমাকে দেখা দিও; যদি ইচ্ছা কর, আমার বাড়ীতেই তুমি থাকিতে—"বলিতে বলিতে একটু থামিয়া, সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় তুমি থাক কোথা?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া মাখনলাল উত্তর করিলেন, "গৌরীপ্রসাদ বাবুর কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছি, তাঁহারি বাটীতে আমি থাকি।"

একটু যেন শিহরিয়া রামজীবন বাবু বলিলেন, "শ্বশুর বাড়ীতেই বাস কর?"

মাখনলাল কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর। কথায় কথায় উঠিল, কোন্নগরে প্রথম বিবাহ, তাহার পরেই এই দ্বিতীয় বিবাহ। রামজীবন বাবু বুঝিলেন আস্তরস। ইতিপূর্ব্বে যে কথাটী তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল, চিন্তাযুক্ত হইয়া তাহা আর সমাপ্ত করিলেন না। বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, "আমার বাটীতে থাকিতে পার, কিন্তু আস্তরসের ভাব স্মরণ হওয়াতে সে কথাটি তিনি আর ফুটিলেন না।"

আর কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া মাখনলাল বিদায় হইলেন। যে সময়ের কথা, সে সময় বকুলকুমারীর দাম্ভিকতা ততদূর বাড়িয়া উঠে নাই। সংসারে মাখনলালের লাঞ্ছনাটা কিছু কম ছিল, ঘরজামাই থাকিয়া তিনি তখন বিশেষ কষ্ট অনুভব করেন নাই; রামজীবন বাবুর সস্নেহ অনুরোধে মাখনলাল নিত্য নিত্য সন্ধ্যার পর তাঁহার বৈঠকখানায় যান, নানাপ্রকার সদুপদেশ শ্রবণ করেন, বিদায়ের অগ্রে সেইখানে জলযোগ করাও হয়। বাবুর স্নেহ সমভাব, দিন দিন বরং বেশী।

ক্রমে ক্রমে বকুলকুমারীর উগ্রমূর্ত্তি। মাখনলালের অন্দরে নিত্য প্রবেশ নিষেধ, মাখনলাল বৈটকখানা বাসী। এই ভাবে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে ধিক্কার জন্মিল, স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া থাকা বিড়ম্বনা জ্ঞান হইল, বিরাগভাজন হইয়া হাততোলা যৎকিঞ্চিৎ মাসহারা গ্রহণ আর তাঁহার ভাল লাগিল না. সময়ে সময়ে তিনি চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইতে লাগিলেন। নানাস্থানে উমেদারী করেন, কোথাও আর চাকরী যোটে না। কিরূপেই বা জুটিবে? লেখাপড়া জানা অতি কম। মাতুলালয়ের নিকটস্থ একটি এণ্ট্রান্স স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত

কিছুই হয় নাই, হাতের ইংরাজী লেখাও কার্য্যালয়ে অচল, কাজেকাজেই যেখানে যেখানে চেষ্টা, সেই সেই স্থানে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। শেষ ভরসা রামজীবন বাবু। কি কথা বলিয়া তাঁহার কাছে উমেদারী করিবেন, মাখনলাল অহরহ ভাবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। মুস্কিলে আসান। মাখনলালকে সে কথা তুলিতে হইল না, রামজীবন বাবু নিজেই একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা বড়দোষ, নিষ্কর্ম্মা হইয়া নিত্য নিত্য শ্বশুরবাড়ীতে অন্নগ্রহণ করা বড়ই লজ্জার কথা ; তুমি কোন কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হও। লেখাপড়া কত দুর শিক্ষা হইয়াছে ?"

লজ্জাকে মাথায় রাখিয়া মাখনলাল মৃদুস্বরে নিজের বিদ্যাসাধ্যের পরিচয় দিলেন। গম্ভীরবদনে রামজীবন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতের লেখা কেমন ?"

একটা আফিসে কর্ম্ম পাইবার জন্য মাখনলাল একখানা দরখাস্ত লিখিয়াছিলেন, দরখাস্তখানা তাঁহার পকেটেই ছিল, বাহির করিয়া দেখাইলেন। "না, এ লেখা চলিবে না। তুমি এক কাজ কর, ঘরে বসিয়া হাত পাকাও,আমি তোমাকে একটা কাজ যোগাড় করিয়া দিব।"

ছয় মাসে মাখনলাল অধিক পরিশ্রম করিয়া এক রকম হস্তাক্ষর দাঁড় করাইলেন, একখানি লেখা কাগজ আনিয়া বাবুকে দেখাইলেন। সেই লেখা দেখিয়া বাবু বলিলেন, 'হাঁ, কতকটা দোরস্ত হইয়াছে. কল্য তুমি আমার সঙ্গে আদালতে যাইও, আমি তোমাকে একজন উকিলের কাছে বলিয়া দিব।"

তাহাই হইল। একজন এটর্ণির আফিসে মাখনলাল নকল নবিসী চাকরী পাইলেন। রামজীবন বাবুর অনুরোধে মাসিক বেতন ২০৲ কুড়িটাকা।

খেয়াল।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

সন্তান-সংহিতাকার জনক ঠাকুর।
কিন্তু তার টীকাকার গণক ঠাকুর॥

কে বলেরে ফুলশর কামের ধনুকে!
তার শরে তীব্রবিষ—
তাই হায় অহর্নিশ,
জ্ব'লে পুড়ে মরে সেই—বাজে যার বুকে!

রক্ষা নেই পাপী যেই তার হ'লে জয়।
ছিন্নছিলা ধনু সম দর্পে খাড়া হয়॥

যদি হ'য়ে থাকে তব প্রেম কামনাই।
হেন প্রেম কর যেই প্রেমে কাম নাই॥

সর্ব্বস্ব সঁপে যে তাঁর অনুকম্পায়।
সে কি কভু সে দয়ার অনু কম পায়॥

ভগবান! গড়িয়াছ কত মহিমায়,
করিতে মহিমান্বিতা এই মহী-মায়!

নিরাসনে নিরশনে আঁখিনীর সনে—
হে বিরহি! জাগ যানী যামিনীর সনে।

জ্ঞানী সে প্রস্তর সম—ক্ষুদ্র আয়তনে,
স্থির রহি ধরে তার গম্ভীর মহান্—
অজ্ঞানের তুলা তুলা—ফুৎকারের সনে
উড়ে—কিন্তু সেইভাবে পর্ব্বতপ্রমাণ।

তোমার কটাক্ষ শরে তীব্র হলাহল,
দহিতেছে কি ভীষণ মোরে অবিরল!
কোন্ দিন ত্যজিতাম হায় এ বসুধা,
বেঁচে আছি পিয়ে তব অধরের সুধা!

চেনো কি হে—সন্ন্যাসীর মন?
কণ্টক ভিতরে ফুল্ল কুসুম যেমন!

হে বিভু! করেছ যারে নীরস জীবনে—
প্রার্থনা—কোরো হে তারে সরস মরণে!

প্রবলপ্রতাপ পাপ রোধিতে কেবল—
জেনো তুমি এক মাত্র বল পুণ্যবল!
তটিনীর একটানা ভাটার সে টান,
কার সাধ্য রোধে বিনা জোয়ারের বাণ!

ফাঁকির ধরায় এসে সব দেখি ফাঁকি।
কি যে দেনা—যত শুধি তত পড়ে বাকী॥

ভুলের সংসারে এসে ভুল করি কত।
হায় দিন যায় যত—ভুল বাড়ে তত॥

তিলে তিলে পলে পলে কেবল মরণ।
তবু হায় লোকে কয় মজার জীবন॥

এ জগতে দেখ কিবা মৃত্যু-উৎসব!
কেবল অমর কাল—আর মরে সব॥

বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড় লোক মুখে রটে;

মিছার পুরুষকার—ভাগ্য বলবান।
বংশলোচনের বংশে কে করে সম্মান॥

সংসারী বিবাহ কোরে কাঁদে অনিবার।
বিবাহ না কোরে কাঁদে বৃদ্ধ ব্যাচিলার॥

অতীব বিচিত্র সেই অনঙ্গের ইষু—
এড়াইতে নারে কোন বৃদ্ধ যুবা শিশু!
তূণে এক—ত্যাগে শত—সহস্র পতনে—
জুড়ে আছে সর্ব্বস্থান এ তিন ভুবনে!

অনায়াসে ভবসিন্ধু যাবে যদি তরি—
প্রতি শ্বাসে বল 'হ' প্রশ্বাসেতে 'রি'।
যত বলা ফুরাইবে ততই মঙ্গল—
দেখার সময় দেখা দিবে সুমঙ্গল!

ছিদ্রের মতন ছিদ্র থাকিলে কি ভয়।
ছিদ্র আছে বোলে ছুঁচ গণ্য লোকময়॥

নিজ ধর্ম্ম ত্যজি পর ধর্ম্মাবলম্বন।
সুধা অনুপানে উষ্ণ গরল সেবন॥

অর্শ। (*Piles.*)

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় (সেনগুপ্ত)

মলত্যাগের জন্য মলদ্বার হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ৪॥ অঙ্গুলি লম্বা যে একটি মোটা নাড়ি আছে, তাহাকেই বলি কহা যায়। মলদ্বার এবং বলির মধ্যে যে মাংসের অঙ্কুর জন্মায়, তাহাকেই অর্শ রোগ বলা যায়। উক্ত বলি বা নাড়ী তিনখণ্ডে বিভক্ত, একটির উপর আর একটি শঙ্খাবর্ত্তবৎ বিন্যস্ত। ইহার মুখ অর্দ্ধ অঙ্গুলি, বাহির বলি একঅঙ্গুলি, মধ্যের বলি ১॥ অঙ্গুলি এবং অন্তর বলি দেড় অঙ্গুলি লম্বা।

বায়ু-পিত্ত-কফজ, ত্রিদোষজ, সহজ এবং রক্তজ এই ছয় প্রকারের অর্শ চিকিৎসকেরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আবার আমরা পাইতেছি ;—

পঞ্চাত্মা মারুতঃ পিত্তং কফোগুদ বলিত্রয়ে।
সর্ব্ব এব প্রকুর্ব্বন্তি গুদজানাং সমুদ্ভবে॥

অর্থাৎ মলমার্গের বলিতে অর্শ হইলে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ভ্রাজক এই পঞ্চ পিত্ত, এবং ঐরূপ সর্ব্বস্থানের কফও কুপিত হইয়া থাকে ; তবেই বুঝিতে হইবে যে ত্রিদোষ কুপিত না হইলে অর্শরোগ হয় না। সেই জন্যই অর্শরোগকে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা পাপজ রোগ বলিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ত্রিদোষ ভিন্ন অর্শ রোগ না জন্মে, তবে তাহাকে বাতার্শ, পিত্তার্শ শ্লৈষ্মিক অর্শ প্রভৃতি নামে চিকিৎসকগণ কিরূপে অভিহিত করিতে পারেন ? এ মীমাংসা চরক করিয়াছেন ;—

অর্শাংসি নাম জায়ন্তে না সন্নিপতিতৈস্ত্রিভিঃ।
দোষৈর্দোষ বিশেষাত্তু বিশেষঃ কথ্যতেঽর্শসাং॥

যদিও বায়ুপিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের সম্মিলন ভিন্ন অর্শ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে না, তথাপি বায়ু, পিত্ত অথবা শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা পৈত্তিক প্রভৃতি অর্শের পৃথক্ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইজন্যই আমরা বাতিক অর্শ পৈত্তিক অর্শ শ্লৈষ্মিক অর্শ ত্রিদোষজ অর্শ, রক্তজ অর্শ, এবং সহজ অর্শ এই ছয় প্রকার অর্শের নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

ভাবি ব্যাধিবোধক লক্ষণের নাম পূর্ব্বরূপ। এক্ষণে অর্শরোগের পূর্ব্বরূপের কথা বলিতেছি ;—

"বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ।
কার্শ্যমুদ্গার বাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্প বিট্‌কতা ॥
গ্রহণী রোগ পাণ্ডর্ত্তি প্রশঙ্কা চোদরস্য চ।"

ভুক্তান্নের অপরিপাক, শারীরিক দুর্ব্বলতা, কুক্ষিতে গড় গড় শব্দ, দেহের কৃশতা, অধিক উদ্গার উঠা, উরুদেশের (Thigh) অবসাদ, মলের অল্পতা, এই সকল লক্ষণ হয় অথবা রোগী "আমার পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী বা উদররোগ হইতেছে।" যদি আশঙ্কা করে, তাহা হইলে তাহার অর্শ রোগ হইবে। ভাবি অর্শ-রোগের ইহাই পূর্ব্বরূপ।

সকল রোগেরই দুটি করিয়া নিদান বা কারণ আছে; অর্শরোগেও তাহা আছে। একটি সন্নিকৃষ্ট নিদান, একটি বিপ্রকৃষ্ট নিদান। যে সকল কারণ অপর কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া ব্যাধির উৎপাদক হয়, তাহারা সন্নিকৃষ্ট নিদান বা আশুকারণ।(Immediate Cause)এবং যাহারা উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ বাতাদির প্রকোপ জন্মাইয়া রোগ উৎপাদনের কারণ হয়, তাহারা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ কারণ (Remote Cause) বায়ুপিত্তাদি রোগের আশু কারণ। এক্ষণে প্রত্যেক প্রকার অর্শের লক্ষণ বলিতেছি ;—

প্রত্যেক প্রকার অর্শের বিপ্রকৃষ্ট নিদান এবং লক্ষণ বলিতেছি ;—

কষায় কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ।
প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুন সেবনং।
লঙ্ঘনং দেশকালৌচ শীতো ব্যায়াম কর্ম্ম চ।
শোকোবাতাতপঃস্পর্শো হেতুর্ব্বাতার্শসাং মতঃ ॥

কষা, ঝাল, তিক্ত রসবিশিষ্ট দ্রব্য ও রুক্ষ, শীতল, লঘু দ্রব্যের ভুরি ভোজন, অল্প আহার, উপবাস, অপরিমিত আহার, উগ্রমদ্য, অত্যধিক ব্যায়াম বাতজ অর্শ রোগের হেতু।

গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিম চিমান্বিতাঃ।
ম্লানা শ্যাবারুণা স্তব্ধা বিশদা পরুষাখরাঃ ॥
মিথো বিসদৃশা বক্রা স্তীক্ষ্ণ বিস্ফুটিতাননাঃ।
বিম্বীকর্কন্ধু খর্জ্জুর কার্পাসী ফলসন্নিভাঃ ॥
কেচিৎ কদম্ব পুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ ॥

বাতিক অর্শে, অর্শের অঙ্কুরগুলি স্রাবরহিত (টন্ টন্ করে) বেদনাবিশিষ্ট কঠিন শুষ্ক কর্‌করে, অরুণ বা শাকের মত বর্ণের ছোট, বড়, সূক্ষ্ম নানা আকারের হইয়া থাকে। অতঃপর বাতার্শের উপদ্রবের কথা বলিতেছি ;—

শিরঃ পার্শ্বাংস কট্যূরুবঙ্ক্ষণাদধিকব্যথাঃ।
ক্ষবথুদ্গার বিষ্টম্ভ হৃদ্রোগারোচকপ্রদাঃ॥
কাস শ্বাসাগ্নি বৈষম্য কর্ণনাদ ভ্রমাবহাঃ
তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকং।
রুক্‌ফেন পিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে॥
কৃষ্ণত্বঙ্-মুখবিন্মূত্র নেত্র রক্তশ্চ জায়তে॥
গুল্ম প্লীহোদরাষ্ঠীলা সম্ভবস্তত এব চ॥

বাতার্শ হইলে রোগীর মস্তকে, পাঁজরায়, স্কন্ধে, কোমরে, উরুতে এবং কুঁচ্-কিতে বেদনা বা যন্ত্রণা, কামড়ানি হইয়া থাকে ; অধিক ঢেঁকুর উঠে ও হাঁচি হয় ; অরুচি হৃদয়ে যন্ত্রণা হয় (Assumed symtoms of Heart disease), অপাক, মন্দাগ্নি, কাশি হাঁপ এবং কানের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ মধ্যে মধ্যে হইতে থাকে। ইহাতে ফেণাবিশিষ্ট (আমমিশ্রিত) গুট্‌লে মল অল্প মাত্রায় অতি কষ্টে বেগ দিতে দিতে নির্গত হয় ; মলত্যাগের সময় মলদ্বার টন্ টন করে এবং প্রবাহিকার (আমাশার) মত কোঁথাইতে হয় ও যাতনা হয়। রোগী অধিক দিন বাতার্শে ভুগিলে তাহার গাত্রচর্ম্ম, নখ, বিষ্ঠা ও মূত্রের রঙ পর্য্যন্ত কাল্‌চে হইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত

সাধারণ উপদেশ।

মধ্যলীলা।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌম দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণহরি'॥
কাঁহা বহির্মুখ-তার্কিক শিষ্যগণসঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে॥ ঐ।১৪৯ পৃঃ

৩৯। ভক্তমহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে॥ ঐ

৪০। অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়।
"নান্ন দোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান॥ঐ
জন্ম-কুল-শীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্ক্তি—বড় অপচার॥ ঐ।১৫০পৃঃ

৪১। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তিকার্য্য॥ঐ

৪২। যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে। ১৩পং।১৫২ পৃঃ

৪৩। কভু এক মূর্ত্তি হয়—কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥ ঐ

৪৪। দামোদর কহে—কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর ॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধপ্রেমরসগুণে গোপিকা প্রবীণ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৪ পং ১৬১পৃঃ

৪৫। অনন্ত কৃষ্ণের লীলা—না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্র বদন ;। ১৬ পং ১৬৩ পৃঃ

৪৬। বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ তার একবিন্দু ॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী তাহাঁ বৃন্দাবনধাম ॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসীচরণভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাহাঁ সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥
অনন্ত কামধেনু যাহাঁ চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহো না মাগে অন্য ধনে ॥
সহজ লোকের কথা যাহাঁ দিব্যগীত।
সহজ গমন করে নিত্য পরতীত ॥
সর্ব্বত্র জল যাহাঁ অমৃত সমান।
চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহাঁ মূর্ত্তিমান্ ॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাহাঁ প্রিয়সখী কাজ ॥ ঐ ১৬৪ পৃঃ

৪৭। নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা ॥
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥
জগৎ তারিতে প্রভু! তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥

করিতে সমর্থ বুঝি প্রভু দয়াময়।
তুমি মনে কর যবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু! ঘুচাও ভবরোগ॥ ১৫ পঃ ১৬৯ পৃঃ

সমালোচনা।

জীবন-সংগ্রাম।—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য একটাকা চারি আনা মাত্র।

শতাব্দপূর্ব্বে বঙ্গদেশবাসীগণের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সংসার পালন এবং সুখ শান্তি রক্ষণ প্রভৃতি বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হইত, গ্রন্থকার মহাশয় পুরাতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কল্পনা মিশ্রণে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্রসন্তান কৃষ্ণমোহন এবং সাধক রামানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ চরিত্রে তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারের সুখ দুঃখের সহিত কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয়, পুস্তকের প্রধান প্রধান নায়কেরা প্রকৃষ্টরূপে তাহা দেখাইয়াছেন, জীবন-সংগ্রামে সংসারের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া বহুদর্শী রামপদ বাবু বর্ত্তমান বঙ্গসন্তানগণকে জীবন-সংগ্রামের উপদেশ দিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। পুরাতত্বদর্শী উপযুক্ত পণ্ডিতের হস্তে এইরূপ দুই চারি খানি পুস্তক প্রস্তুত হইলে বর্ত্তমান বঙ্গের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক।—পঞ্চম বৎসর পূর্ব্বে একজন অজ্ঞাত বঙ্গবাসী দ্বারা এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল। আট বৎসর পরে ঢাকা হইতে বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তৎপরে ৪৭ বৎসর-

শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে বাবু রাধামাধব কর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতের আংশিক গল্প অবলম্বনে ইহা বিরচিত; রচনা উত্তম। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক মহাশয় নাট্য সংসারে উৎসাহ পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রেমরাজ্য।—দৃশ্যকাব্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার প্রণীত; মূল্য পাঁচসিকা।

কাব্যখানি কবিতায় রচিত, ইহা বলা বাহুল্য। বাক্যান্তরে গীতি নাটক। গৌড়েশ্বর গণেশ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আনুসঙ্গিক ঘটনা সংযোগ করিয়া সেই বিষয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহাতে কাব্যকর্ত্তার ইচ্ছামত প্রেমের পরিচয় আছে। প্রস্তাবনায় দৃষ্ট হইল, কবির বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। এই বয়সে তিনি প্রেমরাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তারিফ দিতে হয়। কৌতূহলের উপদেশে নারী উক্তিতে অবতরনিকার কয়েক পুংক্তি উদ্ধৃত হইল:—

ওলো সই!—

"আমরা অধীন, পুরুষ স্বাধীন আর কত লো সই?
যারা ধরে পায, কথায় কথায়, ওলো সই!
তারা কেমনে, কয়বদনে, আমরা স্বাধীন হই? (ওলো সই!)
হুকুমে যারা, খেটে সারা, জানে না রমণী বই,
তারা কেমনে, কয় বদনে, আমরা স্বাধীন হই?

* * *

যারা বাপমায়, মোদের কথায়, পৃথক্ করে সই!
তারা কেমনে, কয় বদনে, আমরা স্বাধীন হই?

* * *

মণিব মোরা চাকর তারা চল্‌লো গেয়ে যাই।
ঝমাঝম্ বাজিয়ে মল, নফর মোদের পুরুষ সকল।"

আনন্দবিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত পরমহংস পরমানন্দ স্বামী সঙ্কলিত, বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত বঙ্গীয় কবিতায় বিরচন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসাগর মন্থন করিয়া আর্য্য-সংসারে যে অমৃতরাশি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভাষায় পরমানন্দ স্বামী সেই অমৃতমন্থনে নব গুরুভারগ্রহণ করিয়াছেন, ধর্ম্মজগতে অদ্বৈতবাদ মুখ্যগুরু, ইহাতে বিসম্বাদ

নাই। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব প্রকারান্তরে ভেদাভেদ পরিশূন্য, সাধারণ ধর্ম্মভাব সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন, পরমাত্মার বিশেষ কৃপা ব্যতীরেকে বেদান্তের অন্ত পরিজ্ঞাত হওয়া দুস্কর, বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রে যাঁহাদের বিশেষ অধিকার নাই, তাঁহারা বেদান্তসার ও বেদান্তসূত্রাদি মহামূল্য গ্রন্থসমূহের রসাস্বাদনে অক্ষম ; অতএব পরমানন্দ স্বামী সহজ বঙ্গভাষায় এই বেদান্তসার কাব্য রচনা করিয়াছেন ; বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সহজে ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কবিতাগুলি উত্তম হইয়াছে। সারাংশের স্থানে স্থানে কবিত্বেরও পরিচয় আছে ; বঙ্গবাসী পাঠকবৃন্দ এতৎ পাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন সন্দেহ নাই। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্তসাগর মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আশা করিয়াছেন, বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী এই গ্রন্থের আলোচনা করিয়া, প্রকৃত বিজ্ঞানপথে অগ্রসর করিতে শিক্ষা করিবেন, আমরাও এই আশার বাক্যের প্রতিধ্বনি করি। গ্রন্থের মূল্য একটাকা।

চারুচর্য্যাশতক।—এই পুস্তকে নীতিপূর্ণ উপদেশ গর্ভ এক শত সংস্কৃত শ্লোক আছে। প্রবন্ধ এইরূপ যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র নামক এক জন কবি কয়েকখানি ভাল ভাল গ্রন্থের সহিত "চারুচর্য্যাশতক" নামে ঐ একশত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন ; কবিবর ক্ষেমেন্দ্রের উপাধি হইয়াছিল ব্যাসদাস। কেননা তিনি বেদব্যাসের ন্যায় সরল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন। চারুচর্য্যাশতক এই দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল ; প্রায় নয় শত বৎসর পরে তিব্বতে হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, রায়বাহাদুর স্বকৃত বঙ্গানুবাদ সহ ঐ শ্লোক শতক মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সংসারে যাহা করিলে ভাল হয়, যাহা করিলে দোষ হয়, শ্লোকগুলিতে তাহাই বর্ণিত আছে। শরচ্চন্দ্র দাসের বঙ্গানুবাদ অপ্রাঞ্জল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতের ভৌগলিক কার্য্যকুশলতার পুরস্কারস্বরূপ সরকার হইতে রায় বাহাদুর উপাধি ও জাইগীর প্রাপ্ত হন ; এই পুস্তকের প্রারম্ভে তিনি যে প্রকার আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পিতৃ-পিতামহের মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম। চারুচর্য্যাশতক নামটিও সার্থক হইয়াছে।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। } ১৩১৭ সাল, মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

ভারতে ইংরাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দের ২৩ শে জুন পলাশীর সমরক্ষেত্রে ইংরাজের বিজয়বৈজয়ন্ত উড্ডীন হইলেই যে, ইংরাজ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান শাসনকর্তার হস্ত হইতে লর্ড কর্ণ

ওয়ালিশ এদেশের শাসনদণ্ড যে দিন হইতে গ্রহণ * করেন, সেই দিন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব গণনা করিতে হইবে। যদিও ওয়ারেণ-হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অপরাধ সম্পর্কীয় উচ্চ বিচারালয় এবং তাহার অধীন জেলায় জেলায় ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সকল আদালতে মুসলমান বিচারপতিগণ বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এজন্য ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ ধরিতে হইবে। সেই সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত ইংরাজ-রাজত্বে যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে প্রসঙ্গক্রমে অতীতের কথা না বলিলে, সকল বিষয় পরিস্ফুট হইবে না বলিয়া, তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। উপকার এক বিষয়ে নহে,— নানা বিষয়ে হইয়াছে। অতএব ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

অশনবসন। সর্ব্বাগ্রে অশনবসনাদির কথা বলা যাউক। এদেশে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষেরা দু-সন্ধ্যা দু-বেলা দুই মুষ্টি অন্ন এবং লজ্জানিবারণোপযোগী পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মোটা চাউলের ভাত এবং তাহার সহিত কচু, কাঁচাকলা, বেগুন পটোলের ব্যঞ্জন তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। তখন এ দেশে গোল আলু, কপি, শালগম প্রভৃতির চাস হইত না। দিবসের অষ্টম ভাগে শাকান্ন ভোজনে অঋণী অপ্রবাসী হইতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেন।॥ বড় বড় গৃহস্থগণ মুড়িগুড়, বাতাসাতেই প্রাতরাশ মিটাইতেন,—রাজারাজড়া, আমীরওমরায়েরাই কালিয়া পোলাও

* But in 1790 Lord Cornwallis attacked this last strong-hold of Mussalman misrule. He stripped the Nwab of his grossly abused judicial authority, contemptuously leaving his allowances as they then stood, established a Supreme criminal court in Calcutta, presided over by the Governor General and council and four courts of circuit with two experienced English officers at the head of each.

W. W. Hunter's Annals of Rural Bengal. Page 330.

॥ দিবস্যাষ্টমে ভাগে শাকম্পচতি যো নরঃ।

কোপ্তা কাবাব খাইতেন, সাধারণ গৃহস্থগৃহে সেই সকল উপাদেয় খাদ্যের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যাইত না। আজিকালি মুটে মজুরেও সাধ করিয়া তাহা খাইয়া থাকে। মিষ্টান্নের ত কথাই নাই, মিঠাই মণ্ডা অন্ত্যজেও খাইতে পায়।

কেহ হয় ত বলিতে পারেন,—"আজিকালি খাদ্যের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতেছে।" সে দোষ আমাদের আপনাদের, ইংরাজ-রাজ খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য আইন করিয়াছেন, আদালত রাখিয়াছেন, অপরাধীকে দণ্ড দিতেছেন। আমরা আপনাদের বেশী লাভের জন্য সর্ষপের সহিত রেড়ি, শোরগুজা, করঞ্জা প্রভৃতি কুদ্রব্য মিশাইয়া তৈল প্রস্তুত করিতেছি, ঘৃতে মিশাইবার জন্য চর্ব্বির কারখানা খুলিয়াছি। খাদ্যসুখ মানব জীবনের একটা প্রধান ভোগ। খাদ্যের জন্য সকলে বিব্রত। অতএব সেই খাদ্যের কষ্ট মিটাইতে পারিলে একটা মহৎ অভাব মিটিয়া যায়।

পূর্ব্বে এ দেশের ঘরে ঘরে চরকা চলিত, গৃহিণীরা সূতা কাটিয়া তন্তুবায়কে মজুরি দিয়া কাপড় বুনাইতেন. সেই কাপড়ই তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ করিত মাত্র, তদ্দ্বারা সভ্যতা রক্ষা পাইত না। সূক্ষ্ম সূতা সকলে কাটিতে পারিতেন না, মোটা সূতাই সচরাচর প্রস্তুত হইত। এজন্য সাধারণতঃ সকল কেই মোটা কাপড় পরিতে হইত। সূক্ষ্ম বস্ত্র যে তখন প্রস্তুত হইত না এমন নহে, দুর্মূল্যতা হেতু বড় মানুষেই তাহা পরিতে পারিতেন। সেই রূপ সূতার কাপড়েই শীত নিবারণ করিতে হইত। ধনবানেরাই শাল জামিয়ার গায়ে দিতেন, বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যে বনাতের চলন ছিল মাত্র। সাধারণ ব্যক্তিরা পশমী বস্ত্র শীত নিবারণের জন্য ব্যবহার করিতে পারিত না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কোট কামিজের নামও জানিতেন না। বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি না হইলে তাঁহার গায়ে অঙ্গরাখা বা বেনিয়ান উঠিত না। বনাত ও শাল জামিয়ারে ময়লা ধরিবে বলিয়া, অনেককে তাহার নীচে উড়ানি ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। এখন সকলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেছে, কামিজ কোর্ত্তায় চব্বিশ ঘণ্টা অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেছে, ইচ্ছা হইলেই হ্যাট, কোট, প্যাণ্টালুন পরিয়া চোখে চশমা লাগাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত ভাবিয়া সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছে। শীতকালে শাল জামিয়ার প্রভৃতি নানা রঙ্গের, নানা নামের শীতবস্ত্র দরিদ্র জনেও ব্যবহার করিতেছে, পরিচ্ছদে ভদ্রাভদ্র চিনিয়া লওয়া যায় না। পঞ্চাশ বৎসরের কথা বলিতেছি,—তখন আমাদের বাল্যাবস্থা, স্কুল পাঠশালায় লেখাপড়া করি, দেখিয়াছি, বাগদী হাড়ি প্রভৃতি নীচ জাতীয়েরা কৌপিন ধারণ করিত

ভদ্র লোকের বাড়ীতে ছিন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করিতে আসিত। আজি হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াও, কুত্রাপি কাহাকেও বস্ত্রাভাবে চীর পরিতে দেখিবে না; সকলেরই সূক্ষ্ম বস্ত্র। দরিদ্র লোকেরাও হাটে বাজারে মেলা মহোৎসবে কুটুম্বালয়ে যাইবার সময় কোট কামিজ গায়ে দেয়, সে কালে ভদ্র লোকের মধ্যে যে ছাতা জুতার সাধারণ প্রচলন ছিল না, আজি তাহারা সেই ছাতা, জুতা ব্যবহার করিতেছে। এ সকল সভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নাই; অর্থ না হইলে সভ্যতা রক্ষা পায় না, দরিদ্র লোকের হাতে অর্থ জুটিতেছে, তাই তাহারা সভ্যতার জন্য লালায়িত। যাহাদের ভাল না খাইলে, ভাল না পরিলে নিন্দা নাই, বরং ক্ষুধায় কাতর হইলে সহানুভূতি পায়, খাবার জোটে, এরূপস্থলে তাহারা ভাল খাবারটী খুঁজিয়া খায়, ভাল দেখিয়া পরিধেয় ক্রয় করে, তবে তাহাদের অর্থসাচ্ছল্য বই কি, বলিতে পারা যায়। বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি জেলার অরণ্যবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, বাউরী প্রভৃতি নরনারীরা কলিকাতা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে মজুরী করিতে আসিবার সময় চীর ধারণ করিয়া আইসে, আর সম্বৎসর কাল পরে দেশে ফিরিবার সময় সাতসিকা দুইটাকা মূল্যের কাপড় কিনিয়া লইয়া যায়।

ভূষণ। তখনকার ভদ্র মহিলাগণ রূপার বালা, রূপার পৈঁচা, রূপার তাবিজ, সোণার নথ, সোণার পাশা, সোণার কণ্ঠমালা পাইলেই আপনাদিগকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিতেন,ঘরবুনান কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন কলের সৌখিন কাপড়ের মধ্যে কেবল থানের আমদানি ছিল, তখন সেই থানের কাপড়ে পাড় দাগিয়া এ দেশের লোকে সাটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই তাঁহারা সূক্ষ্মবস্ত্রের আদর করিতে আরম্ভ করেন। এখন সোণার চুড়ি সোণার বালা সোণার তাড়, সোণার তাবিজ, সোণার ফুল, সোণার নেক্‌লেশ ও মুকুটে এবং বেনারসী, বোম্বাই, পার্শীশাড়ী, সেমিজ, বডি প্রভৃতি বসনভূষণে গৌরবান্বিত, ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যাহাদের পিত্তল কাঁসার গহনা ছিল, আর্থিক উন্নতিপ্রভাবে আজি তাহাদের বিবাহেও সোণার গহনার ফর্দ্দ হইতেছে।

বাসগৃহ। সে কালের সর্ব্বত্র দেবালয় ভিন্ন প্রায়ই ইষ্টকালয় দেখা যাইত না। বড় বড় জমিদারেরাও মাটীর ঘরে বাস করিতেন,—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথায় কাজ কি, দরিদ্র লোকেরা চালা বাঁধিয়া তাহাতে দিন কাটাইত। তাহাদের মধ্যে যাহাদের

কপাট জানালা থাকিত না। মজুরি ব্যতীত তাহাদের জীবিকান্তর ছিল না, মাসিক বেতন ছয় আনা হইতে আট আনা, আর খোরাকী বাবত যৎকিঞ্চিৎ মিলিত। এখন তাহা তাহাদের দৈনিক বেতন। জমিদার, ধনী মহাজনদিগের ত কথাই নাই, সাধারণ গৃহস্থের এখন মাটীর ঘরে বাস করিবার ইচ্ছা হয় না, কিছু সঙ্গতি হইলেই ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতেছে। দরিদ্রলোকের চালাঘর ঘুচিয়াছে, তাহারা দেওয়াল-দেওয়া ঘরে বাস করে, তাহাতে দরজা জানালা বসায়। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর এদেশের একতৃতীয়াংশ জমি পতিত হইয়া যায়, দশশালা বন্দোবস্তের সময় সকল মহলেই খামার গোচর অনেক অনাবাদী জমি ছিল। এখন দরিদ্র লোকেরা অনেকেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা পরের কাজ করে না বলিয়া মজুর কমিয়া গিয়াছে, এজন্য সকল গ্রামেই সাঁওতাল, কোল, বাউরী প্রভৃতির প্রয়োজন হইতেছে। অনাবাদী জমি এখন কোন গ্রামেই নাই। প্রজার অভাবে জমি পড়িয়া রহিল এমন কথা হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কদাচ শুনিতে পাওয়া যায়।

পানভোজন পাত্রাদি :—

তখন আমাদের ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি ছিল? খেজুর পাতার চেটার উপর মাদুর বিছাইয়াই সকলকে শয়ন করিতে হইত, শীত নিবারণের জন্য সকল বাড়ীতেই লেপ ছিল বটে, কিন্তু কন্থার আদর যায় নাই। কর্ম্মকাজ উপলক্ষে পরের বাড়ী হইতে সপ, মাদুর, শতরঞ্চ চাহিয়া আনিতে হইত, ভোজনপাত্র ছিল— বালেশ্বরের পাথর ও খোরা, পানপাত্র পিতলের ঘটী। কাঁসার থালা, গেলাস, বাটী সকল বাড়ীতে মিলিত না। সকল গৃহস্থের বাক্স, সিন্দুক ছিল না, বেতের পেঁড়াই সম্বল। কেহ দশ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলে, চোর ডাকাইতের ভয়ে মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিত। তখনকারকালে বড় বড় গৃহস্থগৃহে মাটীর প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিত। এখন দরিদ্রলোকের ঘরেও মাদুর শতরঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালে তাহারাও মশারি খাটাইয়া শয়ন করে,—তাহাদের গৃহেওপিত্তল-কাঁসার পান ও ভোজনপাত্র হইয়াছে। তাহারাও টীনের বাক্স, পেটরা ব্যবহার করে, সিন্দুক বাক্স মধ্যে টাকা পয়সা রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যায়;—কাহার কাহার বাড়ীতে ধানের মরাই বাঁধা। ধনীর গৃহে লোহার সিন্দুক। এখন অশনবসনে ভোজনে, শয়নে, উপবেশনে সকলেরই সুখ। সকলের ঘরেই চিমনীর ভিতর

আলোতে অন্ধকারময়ী নিশা দিবসের ন্যায় হইয়া থাকে।

ঘর সাজাইবার জন্য কত রকমের চিত্রপট হইয়াছে,—দেবদেবীর চিত্র, দেবালয়ের চিত্র, পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবনের চিত্র। কাজকর্ম্ম করিয়া সকলেই আপন গৃহে আসিয়া জ্বালা যন্ত্রণা জুড়ায়,—এখন তাহার কত উপায় হইয়াছে। সে কালে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা সহজে হইত না, দীর্ঘকাল পরে তাঁহার আকার অবয়ব কেমন ছিল, বহুকষ্টে তাহা স্মরণ করিতে হইত, এখন চারিটী আনা হইতে শত সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত খরচ করিয়া তাঁহার ফটো বা অয়েল পেন্টিং রাখিয়া দিলে কতকাল তাঁহাকে জীবিতের ন্যায় দেখিতে এবং ফনোগ্রাফের রেকর্ডে তুলিয়া দিলে, কতকাল তাঁহার কণ্ঠস্বর অবিকৃতভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের বলে কি সুখের দিনই আসিয়াছে! ইংরাজ তাহার মুল নয় কি? ইংরাজ রাজত্বেরই এই সকল ঐশ্বর্য্য। ইংরাজের কৃপায় তাহা আমাদের ভোগে আসিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবিকা। সেকালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্যকায়স্থ, কামারকুমার, তিলিতামলী প্রভৃতি অনেকেরই জাতীয় বৃত্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না, চাসের অনুষ্ঠান করিতে হইত, কেবলমাত্র জাতীয় বৃত্তি দ্বারা অতি অল্প লোকেরই সুখে সংসার চলিত। চাকরীর মধ্যে জমিদারের গমস্তাগিরি, নায়েবী, খাতাঞ্জীগিরি, আর কারবারের মুহুরী গিরি, তাহাতে কয়জন লোকেরই বা দিনপাত হইত? ঊর্দ্ধ সংখ্যা শতকরা চারি পাঁচজন মাত্র, ইহার অধিক কোনমতে নহে। বেকার লোকের সংখ্যা বেশী ছিল, পরিবার মধ্যে দুই একজন উপায়ক্ষম থাকিত, অপর সকলে—কেহ পুত্রের অন্নে, কেহ অগ্রজের বা অনুজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাস পাশা চালিতেন, শতরঞ্চের বল টিপিতেন, আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর বেশী ছিল। এখন জীবিকার পথ কেমন উন্মুক্ত, কত প্রশস্ত! শিক্ষিতের সংখ্যা যেমন বেশী হই-

সওদাগরদিগের হাউসে কত কেরাণী, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পুলিশে, পোষ্ট-আপিশে কত লোক কাজ করিতেছে; তদ্ব্যতীত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী, মুন্সেফী, সবজজিয়তি, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটী, জজিয়তি, হাইকোর্টের জজিয়তি প্রভৃতি বড় বড় রাজকার্য্যে, বাঙ্গালীর অধিকার জন্মিয়াছে। কোন বিভাগে দেশীয় লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই। কোন পদেই সুযোগ্য বঙ্গবাসীর বসিবার আপত্তি দেখা যায় না। ইংরাজ অনুগ্রহে বাঙ্গালী অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কলকারখানায় কত কুলির অন্ন সংস্থান হইয়াছে। সহরে মফস্বলে সাধারণ শ্রমিকের মাসিক বেতন আট টাকার নীচে নাই। যে কেহ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কাজ করিবে, তাহারই উপার্জ্জন হইবে। কাহাকেও আর বসিয়া থাকিতে হইবে না, এরূপ কাল আসিয়াছে। সকলেরই মনে রাজভক্তি জন্মিয়াছে, এবং অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী হইয়াছে। পিতা আর পুত্রের ধনে বসিয়া খাইতে প্রস্তুত নহেন। ষাটি বৎসরের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় খাটিতে প্রস্তুত। ভদ্রসন্তানেরা আর্থিক উন্নতি করিতে শিখিয়াছে, তাহারা মূর্খ হইলেও দুষ্ক্রিয়াসক্ত নহে, কলে নলি পাকাইয়া ১৫।২০ টাকা উপায় করে, তথাপি চুরি ডাকাতি করে না। অর্থ যেন অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাঁকুড়া মানভূম প্রভৃতি জেলা হইতে কুলি কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে। দেশের এই সমৃদ্ধি ইংরাজ রাজত্বের গুণে। যাঁহারা সে কালের সুলভতা স্মরণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার অভ্যাস ভুলিতে পারেন না, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সেকাল অপেক্ষা একালের সুখ স্বচ্ছন্দতা কত বেশী হইয়াছে। যেমন সুলভতা ঘুচিয়াছে, তেমনি দুর্মূল্যতার জন্য অভাব নাই। দেশে মুদ্রা সুলভ হইয়াছে। তখনকার কালে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেও টাকা পয়সা এতাধিক ছিল না, অর্থনৈতিকেরা আমাদের অপেক্ষা ইহা সুন্দররূপে বুঝাইতে পারিবেন। তবে আমরা মোটামুটি এই বুঝিতে পারি যে, বিগত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে সম্বৎসর টাকায় দশসের চাউল বিকাইয়াছিল, কেবল তিন চারিদিন ছয়সের বিকায় বলিয়া চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছিল, এখন ৬।৭ টাকা মন চাউল বিকাইতেছে, তাহার জন্য কাহাকেও উপবাসী থাকিতে দেখা যায় না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, টাকা শস্তা হইয়া দুর্মূল্যতার ত্রুটি মিটাইয়াছে; এখন যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে অলসেরই

তাহাই চায়। অন্ধ, খঞ্জ, ব্যক্তিরাই অসমর্থতা নিবন্ধন দয়ার পাত্র, তদ্ব্যতীত যাঁহারা কাজকর্ম্ম না করিয়া অন্যের গলগ্রহ হয়, তাঁহাদিগকে সমাজের কণ্টক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সুখশান্তি। অতিপ্রাচীনকালেও এদেশে সুখশান্তি বিরাজ করিত। মেগাস্থিনিশের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এদেশবাসীরা মামলা মোকর্দ্দমা প্রিয় ছিল না, দেনা পাওনার জন্য খতপত্র সাক্ষ্য সাবুদের প্রয়োজন হইত না। চুরি ডাকাতি ছিল না, বাড়ী ঘর খোলা পড়িয়া থাকিত।* কিন্তু যৎকালে ইংরাজ রাজ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তৎকালে শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। বড় বড় নগরেই কেবল নবাব সরকারের বেতনভুক এক এক জন ফৌজদার $ অপরাধ সম্পর্কীয় ছোট ছোট মোকর্দ্দমার বিচার এবং কোতোয়াল ফৌজদারের অধীনে শান্তিরক্ষার কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। মফস্বলস্থ পল্লীগ্রামগুলির শান্তিরক্ষার ভার জমিদারদিগের হাতে ছিল, তাঁহারা আপনাপন জমিদারীর মধ্যে প্রজা ও পথিকগণের ধনমানপ্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন।॥ নবাব সরকারের নিযুক্ত কাজী বিচার করিতেন।

---

* The Simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law. They have no suits about pledge and deposits or do they require either seals or witnesses, but make their deposits and confide in each other. Their houses and property they generally leave unguarded.

Ancient Inidia as described by Megasthenes A.W. Mc, Crindale.

$ The Faujdar or officer of Police and Judge of all crimes not capital.

Introduction to the Regulations of the Bengal Code by C. D. Field M. A; L. L. D.

॥ In villages again and throughout the country it is well known that each Zummeendar was held responsible for the police; that is, for the safety of person and property within his Zum

পূর্ব্বে জমিদারেরা আপনাদের বাসসন্নিধানে কতকগুলি করিয়া চুয়াড়কে বসাইতেন, চুয়াড় নীচ জাতীয় লোক। তাহাদের উপর এক এক জন উচ্চ জাতীয় লোক কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এইরূপ চুয়াড়সন্নিবিষ্ট স্থানগুলির নাম ছিল "থানা"। থানায় যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার নাম ছিল "থানাদার"। তাঁহার অধীন চুয়াড়দিগকে পাইক বলা হইত। কোন কোন জায়গায় থানাদার বেতন স্বরূপ চাকরাণ জমি পাইতেন। এরূপ স্থলে তাঁহার অধীন পাইকেরাও চাকরাণ জমি ভোগ করিত, আবার কোন জায়গায় থানাদার নগদ টাকায় বেতন পাইতেন। তাঁহাদের পাইকেরাও নগদ টাকায় বেতন পাইত; এই সকল থানা ব্যতীত থানাদারদের অধীনে বড় বড় গ্রামে ফাঁড়িদার থাকিত।

এই সকল লোক জমিদারের খাজানা আদায়ে সাহায্য করিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আপনারাও তাহা আদায় করিত, বাকীদার প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিত, এবং পলাইয়া যাইতে না পারে তাহাও দেখিত।* সৎ জমিদারের অধীনে থাকিয়া থানাদারেরা প্রধানতঃ রাজস্ব সংগ্রহের কাজই করিত, জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য ব্যতীত তাহাদের আর কোন কাজ ছিল না। যে সকল জমিদারের এলাকা দিয়া সরকারী খাজনা যাইত জমিদার তাহার জন্য দায়ী থাকিতেন, কাজেই থানাদারও সেই খাজানার জন্য জমিদারের নিকট দায়ী থাকিত বলিয়া তাহারা অংশতঃ পুলিশের কাজ করিত। তজ্জন্য অন্যান্য লোকে তাহাদিগকে সাধারণের সম্পত্তিরক্ষার জন্যও দায়ী বলিয়া জানিত। যখন এই সকল পুলিশের সৃষ্টি হয়, তখন তাহাদিগকে তাহাই করিতে হইত; কিন্তু পরিণামে কেবল

---

lands were granted to him subject to this burden · and there were besides allotments of land set apart for the maintenance of a regular police.

Galloways observations on the Law and Constitution of India page 434.

* Besides the establishment at the sectional head quarters one or more subordinates were stationed in each important village to assist in collecting the rents, to distrain the goods of defaulters, and to see that the Ryots did not desert their lands.

তাহারা সরকারীখাজনা ও জিনিষপত্র হেপাজাত ই করিত। খৃঃ ১৭৯০* অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবাবের উপরই শান্তিরক্ষার ও অপরাধসম্পর্কীয় বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল, কিন্তু সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য হইত না। কাজেই অনেক বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিয়াছিল। চৌকিদার, কাঁড়িদার, থানাদার প্রভৃতি শান্তিরক্ষক যে কেহ ছিল, তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল বলিয়া দস্যু তস্করগণের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিতে পারিত না; চুরি ডাকাতির সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছিল, তস্কর গণ সকলের উপর অত্যাচার করিত।

পূর্ব্বে প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। ঘরে চোর ডাকাতের ভয়, পথে ঘাটে ঠেঙ্গাড়ে ফাঁসুড়ের ভয়। নানাস্থানে চোর ডাকাইত, দস্যু ঠগ, লেঠেড়া ফাঁসুড়ে প্রভৃতি নানা রকমে পথে ঘাটে যে কত লোকের ধনপ্রাণ নষ্ট করিত তাহা বলা যায় না। সর্ব্বত্রই তাহাদের ভয়ে লোক সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। সেকালে এতাধিক হাট বাজার ছিল না। দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইলে পথিক দিগকে প্রায়ই পথে রাত্রি যাপন করিতে হইত। বিশেষ পরিচয় ব্যতীত কোন গৃহস্থের অতিথি হইলে পথিকদিগকে প্রায়ই প্রাণ হারাইতে হইত। ঠগেরা সায়ংকালে গ্রামপ্রান্তে উপবিষ্ট থাকিয়া পথিকের অপেক্ষা করিত। দৈবক্রমে কাহাকেও পাইলে তাহাকে আদর যত্নপূর্ব্বক আপন বাড়ীতে আনিয়া পরম আত্মীয়ের ন্যায় আহারাদি করাইয়া, সুখশয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করাইত, তাহার নিদ্রাবেশ হইলেই গলা চাপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত এবং রাত্রিমধ্যেই শবদেহ গ্রামান্তরে ফেলিয়া দিয়া আসিত। এই সব তো গেল পথে ধনপ্রাণ হারাইবার কথা। গৃহস্থ রাত্রিকালে গৃহমধ্যে স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় বাড়ীতে ডাকাত পড়িল—দ্বার জানালা ভাঙ্গিল, গৃহস্বামী ও গৃহিণীর উপর অত্যাচার

* Until 1790 the Nwab retained the style and the responsibility of Chief Magistrate, He left the duties wholly unperformed. Between 1765 and 1769, he did not even pretend to do what he had promised; the regular course of justice was at a stand; but every man exercised it who had the power of compelling others to submit to his decision.

আরম্ভ করিত, সে কালে সকলের ঘরে সিন্দুক,বাক্স ছিল না, গুপ্তধন মাটির নীচে পোঁতা থাকিত, যতক্ষণ তাহারা তাহা বাহির করিয়া না দিত, ততক্ষণ তাহাদের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন হইত।

এই সকল ভয়ানক ব্যাপার অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজের সুগোচর হয় নাই। ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের কেহ কেহ শুনিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই,পরে যখন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেন্যাণ্ট মন্‌সেল সাহেব ঠগির হাতে প্রাণ হারাইলেন; সরকার বাহাদুরের সৈনিক বিভাগের কতকগুলি সিপাহী ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবার ও কতকগুলি ছুটি হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দস্যু হস্তে প্রাণ হারাইল; ডাক্তার সেরউড সাহেব মান্দ্রাজের লিটারারী জর্নাল নামক সাময়িক পত্রে খৃঃ ১৮১৬ অব্দে ঠগিবিবরণ প্রকাশিত করিলে, তাহা বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়গণের সুগোচর হয়। তখন তাঁহারা এদেশে অশান্তির কথা বিশ্বাস করেন; অতঃপর অনুসন্ধানের অনুষ্ঠানও হইতে থাকে, বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী ঠগের অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হয়েন। কর্ণেল শ্লিমান, মেজর বার্থউড, কাপ্তেন রেনল্‌ডস ও হেন্‌লী প্রভৃতি সাহেবেরা ঠগি নিবারণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; শত শত ঠগ গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হইল। তজ্জন্য খৃঃ ১৮৩৬ অব্দে ৩০ আইন জারি হইল। ঠগদিগের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া গোয়েন্দা করা হইল। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের তাম্বুর নিকটে, ফকিরের আস্তানায়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে দেবালয় ও পান্থশালায়, নদীকূলে, বৃক্ষমূলে, পুষ্করিণীর জলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, যেখানে সেখানে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ বাহির করিয়া দিতে লাগিল, এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হইল। খৃঃ ১৮৩৭ অব্দে ঠগি নিবারণ জন্য ৮ আইন জারি করা হইল, শত শত ঠগ দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসন ও দীর্ঘ কালের জন্য কারাবাস দণ্ড পাইল। খৃঃ ১৮৬৪ অব্দে পুলিশ আইন ও তৎপর বৎসর ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন প্রচলিত হইল। খৃঃ ১৮৬৪ অব্দে কর্ণেল হার্ব্বি বঙ্গদেশের ঠগী ও ডাকাতি বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জে, এইচ, রাইলি সাহেব তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া দলে দলে ঠগ ও ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। দুষ্টলোকেরা দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডিত ও দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হওয়ায় দেশের ঠগ ও ডাকাতের সংখ্যা কমিয়া গেল, অশান্তি দূর হইল, এবং ইংরাজানুগ্রহে শান্তি সংস্থাপিত হইল।

হইতে গ্রামান্তরে যাইবার রাস্তা প্রস্তত হইয়াছে। আর কাহাকেও আইল পথে প্রায় চলিতে হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় চোর ডাকাতের ভয় নাই। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার, কনষ্টেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহারই উপর একটু সন্দেহ হইতেছে, যাহার জীবিকানির্ব্বাহের সন্তোষজনক উপায় নাই, সচ্চরিত্রে থাকিবার জন্য তাহারই নিকট জামিন লওয়া হইতেছে, জামিন দিতে না পারিলে তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইতেছে। বদমাসেরা সদা সন্ত্রস্ত,— পাপকার্য্য করিতে কেহই সাহসী নহে।

ইংরাজ আমলে সকল দুরাচার ঠগ, দস্যুর অত্যাচার, উৎপীড়ন দূর হইয়াছে। অতএব কাহার কল্যাণে সে সকল ভয় দূর হইয়াছে? কাহার চেষ্টা যত্নে, কাহার উৎসাহ উদ্যমে আজিকালি এ দেশের পথঘাট নিরাপদ ও নিরুপদ্রব হইয়াছে। আজি একজন বালকেও নির্ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে গৃহস্থ আপন গৃহে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে দস্যুগণ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী নহে। রাজদ্বারে একজন লক্ষপতিও যেমন, একজন কৌপিনধারীও তেমন। রাজার নিকট ধনীনির্ধন সকলেই সমান, তুলাদণ্ডে ন্যায়ের ওজন হইতেছে। জমিদার আপনার ন্যায্য খাজানা পাইবার জন্য প্রজার উপর জুলুম করিতে পারিতেছেন না। বাকী খাজানা আদায়ের জন্য তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। রাজা আপনার রাজধর্ম্ম পালন করিতেছেন, প্রজারাও রাজার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। উভয়পক্ষের কাহারও কোন ত্রুটী নাই। ইংরাজ-রাজত্বে যে প্রজার সুখসমৃদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা ইংরাজের সুশাসন গুণে। তজ্জন্য আমাদিগকে পুরুষানুক্রমে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। উপকারীর উপকার স্বীকার না করা মহাপাপ। হিন্দু কস্মিনকালে কৃতঘ্ন নহে, চিরদিন রাজভক্ত। প্রস্তাবান্তরে বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

আত্মজ্ঞান ও আত্ম সম্মান। আজি আমরা আত্মাভিমানে স্ফীত, আত্মগরিমায় গর্ব্বিত, জগদারাধ্য আর্য্যগণের বংশধর বলিয়া সদর্পে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের মুখে কেহ এরূপ কথা শুনিয়াছেন কি, আমাদের মধ্যে কয় জনই বা তাহা ভালরকম জানিতেন, বা বুঝিতেন. কয় জনেরই বা তাহা জানিবার ও বুঝিবার শক্তিসামর্থ্য ছিল। দশ বিশখানা গ্রামের মধ্যে দুই একজন অধ্যাপক সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন মাত্র, তাঁহারা শর্করাবাহী ছিলেন, শর্করার স্বাদ গ্রহণের ততটা চেষ্টাযত্ন করিতেন না। সাধারণ লোক ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিল, তাহাদের মনে সেই সকল বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা জ্ঞান ছিল না। আমাদের গোত্রপতি প্রাচীন ঋষিগণের অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানগবেষণার গৌরব করিতে এতদিন কয়জন শিক্ষা করিয়াছিল, কয় জনই বা তাহা চিন্তা করিবার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিত আমরা যে একটা উচ্চজাতি, জগতের জাতিতালিকায় আমাদেরযে একটা স্থান আছে, তাহাই বা কয়জন বুঝিত? সেইসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা একবারে ছিল না, সুতরাং কেমন করিয়াই বুঝিবে। কে আমাদের সেই অজ্ঞানাবৃত মানসকুটিরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া আমাদের আপনাদিগকে চিনাইয়া দিলেন। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে একটা সম্মানিত জাতির অন্তর্গত ছিলেন, আমরা যে সম্মানের পাত্র কে আমাদের মনে প্রস্তরাঙ্কের ন্যায় তাহা আঁকিয়া দিলেন? কেই বা আমাদের মনে উচ্চনৈতিক ভাব আনিয়া দিলেন, ইংরাজের কাব্যনাটকাদিতেই না আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে দাঁড় করাইল? অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আলস্যে আমরা অসাড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এতদিন ত আমরা কেবল আহার নিদ্রাদি জীবধর্ম্ম মাত্র পালন করিয়া ইহলোকে আসাযাওয়া করিতেছিলাম। কই,—এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেত আমাদের কেহই একটীবারও আমাদের অতীত তত্ত্ব আলোচনা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কে আমাদিগকে কুপথ ছাড়াইয়া সুপথে আনিল যে আমরা এখন সভ্যভব্য বলিয়া গৌরব করিবার অধিকারী হইয়াছি।

ভাষা ও সাহিত্য। আমরা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যসম্বন্ধে ইংরাজের নিকট

যথেষ্ট ঋণী। এদেশে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালাসাহিত্যে বৈষ্ণবকবির পদাবলী ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কতকগুলি কবিতাগ্রন্থ এবং কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কেতকা দাসের মনসার ভাসান ও কয়েকখানি ধর্ম্মপুরাণ ব্যতীত অন্য পুস্তক অতি অল্পই ছিল। এজন্য বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল, কিন্তু ভাষাকে সংযত করিবার ব্যাকরণ ছিল না, গদ্যসাহিত্যের একবারে অভাব ছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মের দুই একখানি গদ্য কড়চা গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু সাধারণে তাহাদের প্রচলন ছিল না। সকল বিষয়ই কবিতায় লিপিবদ্ধ হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খৃঃ ১৭৮৪ অব্দে হালহেড নামক সিবিলিয়ান সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, ছাপিবার অক্ষর ছিল না, কাপ্তেন উইলকিন্স সর্ব্বাগ্রে তাহা প্রস্তুত করিয়া শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক একব্যক্তিকে অক্ষর ঢালিবার কৌশল শিখাইয়া দেন, অতএব বাঙ্গালীর মধ্যে পঞ্চাননই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় ছাপিবার অক্ষর প্রস্তুত কারক। আর কেরি সাহেবই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা গদ্য রচনা করেন, তাঁহার অনুবাদিত বাইবেলের নূতন সন্দর্ভই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষার গদ্য গ্রন্থ। রেভঃ লং সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা হইলেও উহার প্রথম গঠন ইংরাজের হাতে। অতএব বঙ্গভাষার জন্য আমরা যে ইংরাজের নিকট ঋণী সে পক্ষে সন্দেহ নাই। আমরা যে দিকে যে কোন কল্যাণকর ব্যাপারেরপ্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহাতেই ইংরাজের উদারতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হই। আজি ভারতের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই ইংরাজ ভারতের একেশ্বর। তাহা না হইলে আরও কত কাল আমাদিগকে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া বনচারী অসভ্যের ন্যায় কাল কাটাইতে হইত। ইংরাজের কল্যাণেই আমাদের আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মান জন্মিয়াছে। আমাদের জাতীয় ভাষা শ্রীসম্পদসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরাজী ধরণে রচিত হইতেছে। কাব্য নাটকাদিতে ইংরাজীর অনুকরণ চলিতেছে। ভাষা অভিনব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। ইংরাজী গণিত, ইংরাজী জ্যোতিষানুসারে গ্রহ উপগ্রহাদির গতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গণনা করা হইতেছে। ইংরাজের উদ্ভিদবিদ্যা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজের রসায়ন শাস্ত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইংরাজের শিল্পশাস্ত্রানুসারে আমাদের শিল্পশাস্ত্র প্রণীত হইতেছে। ইংরাজী বিজ্ঞান বাঙ্গালা-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। আর কত বলিব,—আমাদের প্রাচীন

সংস্কৃত শাস্ত্রে যাহা ছিল, তাহা সাধারণের দৃষ্টিপথের অন্তরালগত ছিল; ইংরাজের কৃপাতেই তাহার সাধারণ্যে প্রচারিত হইতেছে। ইংরাজের বাইবেলের দেখা দেখি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বীগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য রচনার কোরক ফুটাইতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের ভাষায় ব্রাজাবসার আরম্ভ হইল। পরে রাজেন্দ্র লাল মিত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহানুভবগণের ভাষা পারিপাট্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়েরা যথেষ্ট পোষকতা করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে টেকচাঁদ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র ললিত লাবণ্যের সংযোগ করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দেখিতে দেখিতে বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে বাঙ্গালার সাহিত্যসম্পদ বাড়িয়া উঠিল। সাহিত্য-ভাণ্ডার পূরিয়া গেল। বৈভবে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যের অনেক উপরে উঠিয়া বসিল। ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষাই আজি ইহার সমকক্ষতা করিতে সমর্থ নহে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের কথা কি আছে। ইহাও যে ইংরাজের প্রসাদে তাহা কে না স্বীকার করিবে। ইতিপূর্ব্বে পারস্য উর্দ্দু ভাষা এ দেশের রাজভাষা ছিল বলিয়া অনেক হিন্দু জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহা শিক্ষা করিতেন, ঐ সকল ভাষায় গদ্য গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু আমাদের জাতীয় সাহিত্যে তাহা খুজিয়া পাই নাই। অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে আমরা ইংরাজের নিকট গদ্য লিখিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গালীর যেকোন বিষয়ের উন্নতি তাহা সমস্তই ইংরাজের অনুগ্রহে, ইংরাজের চেষ্টা ও যত্ন ব্যতিরেকে এ দেশের কোন সাধারণ হিতকর কাজ হয় না, হইবার নহে,। ভারতে ইংরাজের কৃপা না হইলে অমোদের উদ্ধারসাধন হইত না এবং ভারতীয় আর্য্য- ঋষিগণের কীর্ত্তিকলাপ বিস্মৃতির ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত। কস্মিনকালে কেহ তাহা লোকলোচনে আনিতে পারিত কি না সন্দেহ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনীর উদ্ধার জন্য ইংরাজ কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।* কত পাশ্চাত্য পৌরাণিকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে। এরূপ মঙ্গলময় ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণ কামনা যে না করে, তাহাকে পাষণ্ড ও ঈশ্বর-বিড়ম্বিত ব্যক্তি বই আর কি বলা যাইতে পারে। ইহসংসার হইতে সেরূপ লোকের অস্তিত্ব যত শীঘ্র লুপ্ত

* Asiatic Society of B...

হয় ততই মঙ্গল। আমাদের শাস্ত্রে আছে,—"কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিস্কৃতি নাই।"

সমাজ-সংস্কার ও নিষ্ঠুরতা নিবারণ। ইংরাজরাজ তাঁহার ভারতীয় প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না, করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাতে প্রজার মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। ধর্ম্ম মনুষ্যের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তিগত মর্ম্মে আঘাত করা হয়, ইহা বুঝিয়া তাহাতে রাজা চির উদাসীন। কিন্তু সমাজ মধ্যে যে সকল কুপ্রথা আছে, যাহা দ্বারা সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে, সমাজের অকল্যাণ ঘটিতে পারে বা সমাজের নিন্দা জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহা সমুৎপাটিত করিতে ইংরাজ নিশ্চেষ্ট নহেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রাজপুতদিগের কন্যার বিবাহে বহু অর্থব্যয় করিতে হইত, সেই দুর্ব্বহ কন্যাভার হইতে উদ্ধার লাভার্থ তাঁহারা বড়ই নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন। কন্যা জন্মিলে সূতিকাগৃহে বা দুই এক মাসের মধ্যেই বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ-সংহার করিতেন, তাহা ইংরাজ রাজের সুগোচর হইলে তন্নিবারণার্থ রাজবিধি প্রণীত হইল। তাহাতে কঠোর দণ্ডাজ্ঞার ব্যবস্থা হওয়ায় ক্রমে তাহা নিবারিত হইয়াছে। ইহাতে কত বালিকা অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

এ দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত গর্ভবতী না হইলে তখন তাঁহারা গঙ্গাদেবীর নিকট মানৎ করিতেন, পুত্রকন্যা জন্মিলে একটী তাহাকে দিবেন, দেবতাকে মানৎ করিয়া তাহা না পালন করিলে পাপাশঙ্কায় জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যা গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে হইত। কি নৃশংস ব্যাপার! কি নিষ্ঠুর আচরণ! ইংরাজ আইন করিয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখন আর সে কুপ্রথা প্রচলিত নাই। ইহা দ্বারা কত শিশুর জীবন রক্ষা হইতেছে! তজ্জন্য ইংরাজকে শত সহস্র বার ধন্যবাদ দিব, না দিলে আমরা ঈশ্বরের নিকট অবশ্যই অপরাধী।

আমাদের কুলাঙ্গনাগণ পতিবিয়োগে তাঁহার শব বা তাঁহার কোন প্রিয়বস্তু সঙ্গে লইয়া জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূতা হইতেন! ইহাতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক সুস্থদেহে প্রাণ হারাইতেন। তন্নিবারণার্থে ইংরাজ আমাদের সহায় হয়েন, ও রাজারামমোহন রায় এদেশের অনেক সম্ভ্রান্তলোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মানুসারে সতীদাহ নিবারণ জন্য এদেশে আইন জারি হয়। সেই অবধি সতীদাহ রহিত হইয়াছে। এই সকল কদাচার

সমুদ্র।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত।

এত দিনান্তরে আমরা চেন্নপট্টনকে অভিবাদন করিয়া, পুনরায় পোতাশ্রয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ক্ল্যান মেকিণ্টসে বক্রশিরে পতাকা যাত্রিক অভ্যাগতকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে। বিশ্রান্ততরী, বিপুল ধূম উদ্গীরণ করিয়া তাহার দুর্ব্বাসহ বীর্য্য জ্ঞাপন করিল। পোতোপরি ময়ূর-পুচ্ছ নির্ম্মিত ব্যজন, সূচিশিল্পান্বিত কৌষেয় বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ ও ক্রীড়নক বিক্রয়ার্থ উপস্থিত। ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে। অধিকন্তু মান্দ্রাসী নরনারী জাহাজ দেখিতে আসিতেছেন। ইয়ুরোপাগত আরোহী বিনা অবতরণে দেশের ভাব জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর প্রকোষ্ঠ সজ্জিত গৃহাবলিতে পরিপূর্ণ; তার পণ্য ৭৫৲ টাকা। উপরে সাধারণ জনাশ্রয়। ভিত্তিগাত্র খোদিত পুষ্পপাত্র শোভিত বিস্তীর্ণাকারপেটের উপরি অনেকগুলি কাষ্ঠাসন ও পুস্তকাধার। একপার্শ্বে পীয়ানবাদ্য রক্ষিত হইয়াছে। তদনন্তর পোত সম্পর্কীয় প্রধান কর্ম্মচারীগণের বাসস্থান এবং চার্টগৃহ। সর্ব্বোপরি পরিচালকের স্থান। জাহাজখানি লিবরপুল হইতে আসিতেছে। কর্ম্মচারীর সংখ্যা একশত, পরিচারক ও লসকরগণ, বাঙ্গালা ও বিহারের মুসলমান। পোতাধ্যক্ষ কহিলেন, "অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় যাত্রা করিব। চারিতল পূর্ণ দ্রব্য সম্ভার উত্তোলিত করিয়া, অবতরণ করাইতে সাতটা বাজিল। তরী লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ জলাবর্ত্ত থাকায়, দোলায়মান হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বন্দরে তামিল ভারবাহীগণের রক্ত উষ্ণীষারণ্য দৃষ্ট হইতেছে। ক্রমে চোলমণ্ডলী উপকূল অদৃশ্য হইল।

প্রধান পরিচারক যে গৃহে আমাকে অবস্থিতি করিতে দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দর্পণ, জলীয়নাল, মুখপ্রক্ষালন পাত্র, শয্যা প্রভৃতি তাড়িত আলোকে উদ্ভাষিত হইল। ছদিতলে 'কর্ক' নির্ম্মিত জীবনরক্ষক আবদ্ধ রহিয়াছে। জলে ভাসিতে হইলে, উক্ত শয্যা ফলপ্রদ হইবে। পাকে বিপাক বুঝিয়া, দিন চতুষ্টয় যাপনোপযোগী অপূপ, গাঢ় দুগ্ধ ও সাগরিক পীড়ায় ভেষজ মিষ্ট জম্বির সহযাত্রিক করিয়াছি।

প্রাতেঃ আরোহণীয় মসৃণ পিত্তল দণ্ডে করমর্দ্দন করিয়া, উপরে আরূঢ় হইলাম। প্রথম দেশাটনে, জলধি সন্দর্শন লালসায় পুরী যাত্রা করি। পর্য্যটন শেষ

করিয়া, আবার সমুদ্রবক্ষে অধিষ্ঠান করিয়াছি। পুরাতন ভাব জাগ্রত হইতেছে, তোয়নিধি বিশাল, কিন্তু দৃষ্টি অধিক দূরগামিনী নহে। দিগ্‌বলয়ে, আকাশ ও জলধির মিলনসীমা নয়নগোচর হইতেছে। মেঘমালা রবিকরজালে বিবিধ বর্ণ গ্রহণ করিয়া, নিমজ্জিত ও উত্থিত হইতেছে। যাদঃপতির গভীরতা কোন স্থানে সার্দ্ধ দ্বি ক্রোশের অধিক নহে।

পূর্ব্বতন ভূবেত্তার মতে, কোন কালে সুদূর উত্তরে হিমবানে শিবালিক শৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল; নাহিলে, তদুপরি সামুদ্রিক "ফসিল" যুক্ত স্তর মিলে কেন? উপত্যকা আধিক্যতা উচ্চ ও নিম্নভূমি সংকুল ভূপৃষ্ঠ, পূর্ব্বে সাগর গর্ভে ছিল। তাহার স্থান পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল জল অপসৃত হওয়া হেতুক বহির্গত হইয়াছে। পরন্তু ইদানীং অনুমিত হইতেছে, ভূপৃষ্ঠ পরিবর্ত্তনশীল। কদাচিত সমুদ্রে নিহিত, কখন বা উত্থিত হয়। ভূমি কোথায়ও অধোগামী, অন্যত্র উর্দ্ধগামী হইতে দেখা যায়। বঙ্গদেশ ক্রমে অধোগামী। মান্দ্রাসের তট, উপরে উঠিতেছে। সমুদ্র আপন সীমা অতিক্রম করে না; নদীজল যে পরিমাণে উহাতে পতিত হয়, তাহা বাষ্পে পরিণত হইয়া, সমতা রক্ষা করে, ইত্যাদি প্রসঙ্গ যথার্থ নহে।

আমাদের বাষ্পীয় পল্লীখানি জলভেদ করিয়া, ধক্ ধক্ শব্দে একাকী অবিরাম ধাবিত। নীল জলের শুভ্র ফেণ নানা প্রকারের বিভ্রম সহকারে ক্রীড়াপরায়ণ। একের পর আরটী তরঙ্গ আসিতেছে, তাহার আকার অন্য। যত দেখি, নূতন বোধ হয়। এই সফেণ, তখনি ফেণহীন। আবার তরঙ্গ ঈষৎ ফেণিল হইয়া পুঞ্জীকৃত বুদ্‌বুদ্ পদার্থ আনয়ন করিল। ঐ আর নাই; কোথায় মিলাইয়া গেল। কুল অপেক্ষা, এখানে জল অধিক, বর্ণ অবশ্য গাঢ় হইবে। আলোক ছায়ার তারতম্যে ক্ষণে নিলীমা অধিকতর বিকসিত। কীট বা কর্দ্দমের বর্ণ অনুসারে, স্থান ভেদে লবণাম্বুর বর্ণভেদ ঘটে।

এক বৃদ্ধ আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার নাম হরিচন্দ চিন্তামন্। তাঁহার পুত্র লণ্ডন হইতে আসিতেছেন। "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে" মরাঠী ও গুজরাতি অধ্যাপনা করিতেন। আমি মহারাষ্ট্রীয় মহিলার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলাম, "বাঙ্গালায়, এখনও কি নারীজাতির অবরোধ প্রথা বিদ্যমান?" মহিলা

তাঁহার দিনযাপন হইতেছে। পিতার তুরস্কশিরস্ত্রাণ, মায়ের শাড়ি, কন্যার... ত্রিমূর্ত্তির বেশে মিশ্রভাবের দিব্য সমন্বয়!

অপরাহ্নে নীলোৎপল সন্নিভ পয়ঃসৌষ্ঠব দর্শন করিতেছি এমনকালে উড্ডীয়মান মৎস্য তরণীবক্ষে আসিয়া নিপতিত হইল। বর্ণ তপস্বীর ন্যায়, আকার বাটা মৎস্যবৎ। শত্রুভয়ে লম্ফ প্রদানান্তর অধিকতর বৈরীর নিকট উত্তীর্ণ হইল। উড্ডন ও সন্তরণ কার্য্যে সক্ষম তদীয় পক্ষপুট এক্ষণে বৃথা। আমীষ ভোজীগণ বিবেচনা করেন, মীনজাতি আহারের জন্য সৃষ্ট। অখাদ্য মৎস্য অপেক্ষা, খাদ্যের বংশবৃদ্ধি অধিক।

এই জীব কেহ ত্রিলোচন, কেহ বা চতুর্লোচন। চক্ষের নিমেষ নাই স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভাব। মীনধৃতি কৌশলির তরণ্ড। নিঃক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম বড়িশের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া, উহা গলাধঃকরণ করে। তাবৎ সামগ্রী পরিপাক করিবার ক্ষমত আছে। তজ্জন্য সর্ব্বভূক এই বিড়ম্বনা গ্রস্ত হয়। ইহারা যেমন অধিক ভোজী তেমনই জলমাত্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতে সক্ষম। মৎস্যের পর্য্যটন শক্তি প্রখর। ভাসমান প্রকৃতি অধিক; নিজভার বহন করিতে হয় না।

গ্রাহ (হাঙ্গর) দেখিতে মীনবৎ। জাহাজের সহিত সমবেগে গমন করে। ভল্ল মৎস্য অতি ভয়ঙ্কর। অর্ণবপোত সছিদ্র করিয়া মগ্ন করিতে সক্ষম। দারুভেদক করপত্র ও শিরোভুজ মৎসের এই প্রকার ক্ষমতা আছে। টর্পিত মৎস্য স্পর্শ করিলে, শরীর অবসন্ন হয়। তন্মধ্যে বিদ্যুতের সত্তা বশতঃ এবম্বিধ লীলা ঘটে। ভেক ও নৃমৎস্যের অর্দ্ধভাগ মণ্ডূক এবং বানরের ন্যায়। "শিল" মৎস্য তিমির ন্যায় স্তন্যপায়ী, উভচর। প্রতিপালকের নিকট, সারমেয়ের মত অবস্থিতি করে। ব্রীক মৎস্যের শল্ক চূর্ণ করিয়া, কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মৎস্যের স্ত্রী পুংভেদ উপলব্ধি হইতে পারে। তারকা মৎস্য শঙ্খের মত নির্মোক। উহার রস সংস্পর্শে শঙ্খশুক্তি অচৈতন্য হইয়া যায়।

তথাকথিত মৎস্য ব্যতীত, কয়েক প্রকার জলজন্তু, স্থলচর জীবের সহিত কোন প্রকার সাদৃশ্য থাকায়, সেই নামে পরিচিত। ঘোটকবৎ স্বরের জন্য সিন্ধুঘোটক, গজদন্তের কারণ জলকুঞ্জর ও উদ্‌বিড়াল প্রভৃতি বারিশয়গণের নামকরণ হইয়াছে। মকর এদেশে আর নাই। কদাচিত ভারতসাগরে আইসে।

শম্বুকবৎ ভগাধার দেহ, শিরঃপদী বর্গীয়, বহুকোষ্ঠী প্রাণী বিশেষ। তাহার দেহে অনেক গুলি কোষ্ঠ (গৃহ) আছে। তদ্দর্শনে লক্ষ্মী, জনার্দ্দন, দামোদর প্রভৃতি লক্ষণ স্থিরীকৃত হইতে পারে।

নৃমৎস্যের দৈর্ঘ ৬ ছয় হস্ত। প্রথমার্দ্ধ বানরবৎ, অপরার্দ্ধ মৎস্যের ন্যায়। লোহিত সাগর ইহার প্রিয় নিকেতন। বাগুরায় পতিত হইবার নহে। হস্ত দ্বারা জালের বন্ধন মোচন করিবে। একদা গভীর রাত্রে গঙ্গাসাগর সঙ্গমের নিকটস্থ কোনও নদীতে এই যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল। তীরসমীপে করদ্বারা মৎস্য-ধারণ করিয়া ভোজন করিবার কালে, অস্ফুট ধ্বনি করিতেছিল। নৌকারোহী গণের নিকট উহা কথোপোকথনবৎ প্রতীত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, জল-দেবতার সন্দর্শন পাইয়াছেন।

নটীসাল নামক যাদম্, আপনার দুই হস্ত, একটী কর্ণ ও অন্য তরফে ক্ষেপনী-রূপে ব্যবহার করে। যৎকালে, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সন্তরণ করিতে থাকে, বোধ হয়, যেন উড়, পপাইল তুলিয়া যাইতেছে। স্থল বিশেষে, এই জীব কর্ত্তৃক মানব নৌকা পরিচালনের শিক্ষা পাইয়া থাকিবে। মৎস্যপুচ্ছের আকারের সহিত নৌকার কর্ণ তুলনীয়।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, ছাদে যাইবার সময়, পোতাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইল—তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইলাম। আরোহিবর্গের অবগতির জন্য, সোপান শিরে প্রকটিত হইয়াছে। গত কল্য মধ্যাহ্ন হইতে তরী তিন শত দশ মাইল আসিয়াছে। অদ্য তৎকাল পর্য্যন্ত, সাকল্যে ৫০০ পাঁচশত মাইল যাইবে। স্যাণ্ড-হেডস্ হইতে দূরতা ১৬১ মাইল।

প্রতিদিন অর্দ্ধচন্দ্রাকার Lextant নামক জ্যোতিষী যন্ত্রদ্বারা, নির্দ্দিষ্টকালে নিরক্ষান্তর ও দ্রাঘিমা স্থির করা হয়। তদনন্তর মানচিত্র দৃষ্টে, কত অংশ উত্তর বা পূর্ব্বে যাইতে হইবে স্থির করিয়া, দিগদর্শনের সাহায্যে, পোত তদভিমুখীন চালিত হইয়া থাকে। Leadiney নামধেয়, রজ্জুসমন্বিত, নাটাইয়ের মত জলপথ মুখ্যযন্ত্রের দড়ি নির্দ্দিষ্টকালে কি পরিমাণ বহির্গত হইতেছে দেখিয়া, প্রতি ঘটিকায় কতদূর যাওয়া হইল অনুমিত হইয়া থাকে।

সবিতা পয়োধি জলে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তৎসংস্পর্শে তদীয় বপুঃ যেন বিগলিত হইতেছে। এখন শীতল হইয়াছেন; দর্শনে কষ্ট নাই। তিনি এত ব্যস্ত কেন? ক্ষণকাল বিলম্ব করুন। দেখিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইব। জগতি

ছন্দে স্তুতি করিয়াছিলেন ;—জ্ঞানী সবিতা স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন ; তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের কল্যাণ করিতেছেন। পূজনীয় দেবসবিতা স্বর্গকে সুপ্রকাশ করিতেছেন, এবং উষার পশ্চাৎ উদিত হইয়াছেন।

"বিশ্বারূপাণি প্রতিমু ঞ্চতে কবিং প্রাসাবীভদ্রন্দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বিনাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যো হু প্রয়ানে মুষসো বিরাজতি॥"
(বৈশ্য-গায়ত্রী।)

রাত্রে হুগলী নদীর " পাইলট" আসিয়া, তরী পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জাহাজ চলিতেছে না। শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী নৌকাযোগে উপস্থিত হইলেন। কেহ আগ্নেয়াস্ত্র আনয়ন করিয়াছে কি না তাহার জিজ্ঞাস্ত, আমাদের কর্ণধার সমুদ্রে অনায়াসে নৌচালন করিয়াছেন। নদীমুখে অন্যের সহায়তা লইতে হইল।

জলতলে, সৈকতভূমি, অতর্কিতভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে। পথ ভয়ঙ্কর। যাহারা সদা পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহারা চালক হইবার যোগ্য। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে দেখিলাম, অম্বু রাশির সে বর্ণ আর নাই। নদ্যাগত মৃৎ দ্বারা পাণ্ডু হইয়াছে। পথ নির্দশক "বয়া"-শ্রেণী পংক্তি দ্বয়ে ভাসমান। মধ্যে, কলিকাতা বন্দরের লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র বাষ্পীয় নৌ, সংকেতার্থ দণ্ডায়মান আছে। পূর্ব্ববারে এ দিকে দুইখানি জলমগ্ন, বাষ্পীয় পোতের গুণবৃক্ষ দর্শন করিয়া গিয়াছিলাম।

এখন শৈত্যবোধ হইতে লাগিল। দক্ষিণে উর্ণাবস্ত্র পীটক হইতে নিষ্কাসিত করিতে হয় নাই। বামভাগে, স্থল দৃষ্ট হইতেছে। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমজাত এই মহাদেশ কপিলমুনি অধিষ্ঠিত নব্য ন্যায়শাস্ত্র-প্রসূতি, তন্ত্রজননী ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও নৈয়ায়িকবর্গের প্রীতি ও জ্ঞানের সঙ্গমস্থল পূর্ব্ব পিতৃগণের উদ্ধার এখানেই সম্ভব। ঋগ্বেদের ঋষি, যাহাকে চটক সদৃশ বলিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্গ এক পরাক্রান্ত আর্য্যদেশ বলিয়া গণ্য হইল। মানবের বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ। চেতনের ন্যায় অচেতন পদার্থ, সাড়া দিতে পারে, জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। মার্কণীর অগ্রে তিনি তারহীন তাড়িতবার্ত্তার কৌশল জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

কর্ত্তিত পথে আনীত। ভাগিরথী নহেন, গঙ্গাস্নান করিতে হইলে, কলিকাতা যাইতে হয়। বহুদিন পরে, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য বাঙ্গালা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলাম।

—:•:—

কত দূর ?

শঙ্করের গুরু শ্রীরাম, শ্রীরামের গুরু শিব—এই শ্রুতিটি অতি মধুর। শিব শ্মশানবাসী, শ্রীরাম রাজ্যেশ্বর ; অথচ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভক্তি নিরন্তর অক্ষুণ্ণ। ধনেশ্বর কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, সেই শিব সত্যসত্য নির্ধন নহেন। কেবল লোকশিক্ষার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শিবকে ভিখারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। লোক শিক্ষার নিমিত্ত ;—কিন্তু কালসহকারে সেই লোক শিক্ষার ফল বর্ত্তমান সমাজে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজ্যেশ্বর রামের প্রতি ভিখারী মহেশ্বরের যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি, ভিখারী মহেশ্বরের প্রতিও রাজ্যেশ্বর রামচন্দ্রের অবিকল সেইরূপ। অধুনা নির্ধনের প্রতি ধনবানেরা ভ্রমেও কটাক্ষপাত করেন না। পৃথিবীর সকল দেশেই এই রীতি।

সংসারের সকল বিষয়েই দরিদ্রের কষ্ট অধিক। দরিদ্রের সহিত ধনবানের সহানুভূতি থাকিলে অবশ্য সে কষ্টের কিছু লাঘব হইত ; সহানুভূতির অভাবে তাহা হইতেছে না। অদ্য আমরা অল্প কথায় তাহা বুঝাইব। বঙ্গের কায়স্থ ব্রাহ্মণ সমাজে বৈবাহিক বাজারে বরের মূল্যবৃদ্ধির হুতাশনে দগ্ধবিদগ্ধ কন্যাকর্ত্তা দরিদ্র গৃহস্থেরা অহরহঃ ছট্‌ফট্ করিতেছেন। নামলুব্ধ ভক্ত হিতৈষী অপেক্ষাকৃত [illegible] সমাজ সংস্কারক বাগ্মী, মধ্যে এক এক স্থানে সভা করিয়া বৈবাহিক ব্যয় লাঘবের অনুকূলে সুমধুরস্বরে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছেন ; লোকমুখে ও সংবাদপত্রে সেই সমাচার অবগত হইয়া, দরিদ্র কন্যাকর্ত্তারা সমধিক আগ্রহে ভবিষ্যৎ আনন্দের আশা করিতেছেন। যাঁহাদের ঐরূপ আশা তাঁহারা

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরাও ডাক ছাড়িয়া বলিতে পারি, বহুদূর। বক্তৃতায় ব্যয়লাঘবের মিষ্ট ধ্বনি শুনা যায়, কাজে কিন্তু দিন দিন ব্যয় বাহুল্যের মহাধুম। বাজারে আগুণ লাগিবার প্রারম্ভে যত ধূমশিখা উত্থিত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে গুমিয়া গুমিয়া প্রধূমিত হইয়া মহাতেজে সেই অনল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে। হার, বাজু, আংটি, তাহার পর সোণার ঘড়ি, সোণার চেন, সোণার চশমা, উচ্চাঙ্গের খাট বিছানা, স্কুল কলেজের বেতন ও পাঠ্যপুস্তক, এক এক স্থলে গাড়ীপাল্কী হারমোণিয়ম এবং চেয়ার, টেবিল, সোফা প্রভৃতি বৈঠকখানার সজ্জা। এতদূর উঠিয়াছে, তথাপি দারুণ গ্রীষ্মের তাপ মানের পারদ ক্রমশই উর্দ্ধগামী। ইতিমধ্যে এক দিন আমরা একজন ভদ্র গৃহস্থের নিকেতনে উপস্থিত ছিলাম, সেই গৃহস্থের কন্যাদায়—একজন লম্বোদর ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল, পাঁচ সাতটি বরের পরিচয় দিল, শেষকালে দম্ভ করিয়া বলিল, "একটি পরম সুন্দর কুলীন বর, বি, এ, পাশ; তেমন পাত্র সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট, সর্ব্বগুণে গুণবান, বয়সও অল্প। দাবি বড় অধিক নহে, আজকাল নগদ ও দানসজ্জার পদ্ধতি যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহা ত অবশ্যই দিতে হইবে, কেবল একটি অঙ্ক বেশী। বরের বিলাত যাইবার বাসনা। বিলাত যাইবার রেল ভাড়া, জাহাজ ভাড়া, বিলাতবাসের খরচা এবং ফিরিয়া আসিবার উপযুক্ত রাস্তা খরচ।"

একবার আকাশ পানে মুখ তুলিয়া কন্যাকর্ত্তা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বিবাহের অগ্রে বরের বিলাত যাত্রা কিম্বা বিবাহ করিয়া বিলাতযাত্রা, ঘটককে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি রহিল না, ক্ষণেকের জন্য বাক্যরোধ হইয়া আসিল। মনে মনে তিনি ভাবিয়া লইলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রীপুত্র ও নিজের দেহ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও সে দাবির পূরণ হইতে পারিবে না। ঘটককে কোন কথা না বলিয়াই বেচারা কম্পিত কলেবরে, অধোমুখে গাত্রোত্থান করিয়া নেপোথ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইহা ত প্রস্তাব মাত্র, দিন কাল যেরূপ পড়িয়া আসিতেছে, তাহাতে ঐরূপ প্রস্তাব অথবা ইহা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের প্রস্তাব বজ্রতুল্য ফল প্রসব করিবে, সে আতঙ্ক নিষ্কারণ বোধ হইতেছে না। সভায় যাঁহারা ব্যয় লাঘবের বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বড় দরের চাঁই, তাঁহারা আপনারাই স্ব স্ব পুত্রকে হাইয়েষ্ট বিডারে তুলিয়া দিতে অগ্রসর! কেহ কেহ ডুবিয়া ডুবিয়া জল খান, কেহ

বক্তৃতামালার যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন যে এই দারুণ উপসর্গের শীঘ্র প্রশমন হইবে, কখনই এমন আশা করা যায় না। বুধগণ বলিয়া গিয়াছেন, উপদেশের সহিত উদাহরণ অতি আবশ্যক। সভা সমিতির চাঁই মহাশয়েরা কিরূপ উদাহরণ দেখাইতেছেন; কেমন আদর্শস্থলে দাঁড়াইতেছেন, যাঁহাদের প্রচুর পয়সা আছে, তাঁহারা এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। গরীবের সর্ব্বনাশ হইতেছে! লক্ষণ দেখিয়া অবধি যে আশঙ্কা আমরা পোষণ করিতেছি, সেই আশঙ্কাই বলবতী হইতেছে। অভাগা বঙ্গের দরিদ্র ভদ্র পরিবারের অনেক কন্যা চিরনূঢ়া থাকিয়া যাইবে, হলাহলের আদর বাড়িবে; নাট্যাচার্য্য বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের বলিদান নাটক সার্থক হইবে।

বকুলকুমারী।

লেখক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী ও পদ্মা।

পাঠক মহাশয় এ সময় একবার কোন্নগরে চলুন। জীবন্ত পতি বর্ত্তমানে চিরবিরহিনী, অভাগিনী সুকুমারী কেমন আছেন, কি করিতেছেন, দেখা আবশ্যক।

তিন বৎসর গত হইয়া গেল, মাখনলাল মিত্রের সহিত সুকুমারীর বিবাহ হইয়াছে; বিবাহ রাত্রির পর স্বামীর সহিত সুকুমারীর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। সুকুমারী এখন পঞ্চদশ বর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ছয় মাস পূর্ব্বে ত্রিলোচন মল্লিক পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বনিতাও কিছুদিন পূর্ব্বে সংসারলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। বাটীতে সুকুমারী একাকিনী। দিন গুজ-

ও বাসনপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সুকুমারী অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছিল; আর চলে না। কি করিবে, কি উপায় হইবে,—তাহাই ভাবিয়া সুকুমারী যেন অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিল।

সেই পাড়ায় একজন নাপিতের একটি কন্যা ছিল তাহার নাম পদ্মাবতী; পদ্মাবতী বিধবা, বয়ঃক্রম ত্রিশ বত্রিশ বৎসর। তাহারও পিতামাতা ছিল না। লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া ও পাড়ার মেয়েদের আল্‌তা পরাইয়া পদ্মা আপনার উদরান্নের সংস্থান করিত। সুকুমারীর মাতা পদ্মাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে পদ্মার সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল; জ্ঞান হওয়া অবধি সুকুমারী পদ্মাবতীকে দিদি দিদি বলিয়া ডাকিত। সুকুমারীর প্রতি পদ্মারও ভগ্নিস্নেহ জন্মিয়াছিল। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর সুকুমারী একাকিনী থাকে, যুবতী কন্যা একাকিনী থাকা ভয়ের কারণ, অতএব পদ্মাবতী তাহার জিনিষপত্র বেচিয়া দিত, বাজার করিয়া দিত, রাত্রিকালে তাহার কাছে শুইয়া থাকিত।

ত্রিলোচন মল্লিকের বাটীতে প্রাচীর দেওয়া ছিল না. তিন দিকে বৃক্ষ বেষ্টিত একখণ্ড অনাবৃত ভুমিতে তৃণাচ্ছাদিত তিনখানি মাটীর ঘর, সকল ঘরের চালে খড় ছিল না, মালিকের দুরাবস্থা জানা না থাকিলে চোরেরা অনায়াসে বালিকার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারিত, নিতান্ত দুরাবস্থা বলিয়া চোরের ভয় ছিল না। চোরেরা জানিত সুকুমারীর কিছুই নাই, সুতরাং তত সুবিধা থাকিলেও তাহারা চুরির চেষ্টা করিত না, একএক রাত্রে সুকুমারীর শয়নগৃহের দ্বারে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইত। প্রথম প্রথম ভূতের ভয়ে সুকুমারী কম্পিত হইয়া পদ্মাবতীকে জড়াইয়া ধরিত; ভূত নাই, শিয়াল কুকুর আসিয়াছে, এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া পদ্মাবতী তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিত।

দিবাভাগে গৃহে যখন সুকুমারী একাকিনী থাকিত, তখন ম্রিয়মাণা হইয়া, গালে হাত দিয়া কি ভাবিত. কি তাহার ভাবনা, অভাগিনী নিজেই তাহা জানিত অন্য লোকে সে ভাব দেখিলে, অবশ্যই কিছু অনুমান করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু সুকুমারী সে ভাব কাহাকেও জানিতে দিত না, দেখিতেও দিত না, অনুমান করিতেও দিত না।

একদিন সন্ধ্যার পর, পদ্মাবতীর আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘ উঠিয়াছে, দ্বারে খিল দিয়া সুকুমারী একাকিনী উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহ মধ্যে

বসিয়া আছে, দুটী চক্ষে দর দর ধারে জল পড়িতেছে. একপার্শ্বে একটী মাটীর দীপাধারে ক্ষুদ্র একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। উত্তাপ লাগিলে বরফ দ্রব হয়, মনের অনলের উত্তাপে অভাগিনীর সন্তপ্ত হৃদয় স্তরে স্তরে দ্রব হইয়া যাইতেছে কেহই তাহা দেখিতেছে না, সাক্ষী কেবল সেই দীপশিখা।

পদ্মাবতী আসিল, ঠুক্ ঠুক্ করিয়া কপাটে আঘাত করিল, নাম ধরিয়া দুই তিনবার ডাকিল; কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া, সুকুমারী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পদ্মাবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানি মাদুরের উপর বসিল; উভয়েই মুখামুখী হইয়া দুটী একটী কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ এক বার সুকুমারীর মুখ পানে চাহিয়া চমকিত স্বরে পদ্মা বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদচো দিদি? বাহিরে গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পোড়্বে. ঘরের ভিতর তোমার চক্ষে বৃষ্টি! কেন দিদি, আচম্বিতে কিসের ভাবনা উথ্‌লে উঠ্‌লো? তোমার কান্না দেখে আমার চক্ষে জল আসচে।

চঞ্চল হস্তে নেত্র মার্জ্জন করিয়া, স্তম্ভিতস্বরে সুকুমারী বলিল, "সংসারে আমি কাঁদবো না তো কে কাঁদবে পদ্ম? আমার কেউ নাই! মেঘাড়ম্বরে ঐ আকাশ যেমন অন্ধকার, আমি অভাগিনী, আমার হৃদয়ও তেমনি অন্ধকার; সব দিক্ অন্ধকার! যাহা কিছু ভাবি, সমস্তই অন্ধকার! মনে করি কাঁদবো না, কিন্তু পোড়া চক্ষে আপনা হোতেই জল আসে।

পুনর্ব্বার অশ্রুপ্রবাহে পদ্মমুখীর, পদ্মমুখখানি প্লাবিত। অঞ্চলে নেত্রজল মুছাইয়া দিয়া কাতরকণ্ঠে পদ্মাবতী বলিল, "না দিদি, তা নয়, রোজ আমি তোমাকে দেখ্‌চি, এমন ধারা কান্নাতো একদিনও দেখিনি, একদিনও তো তুমি আমাকে নূতন দুঃখের কথা কিছুই বলোনি; বোধ হয় আজ কোন রকম নূতন হয়ে থাক্‌বে। আছে কি কোন নূতন কথা?

সুকুমারী (পূর্ব্ববৎ স্তম্ভিতকণ্ঠে) আছে বৈ কি। তোমাকে কিছু বলি না, মনের ব্যথা মনেই চেপে রাখি। মা চোলে গেলেন, বাবা চোলে গেলেন, মালা বদল কোরে ফুল ছড়ানো বিয়ে হয়েছিল, স্বামী যে কেমন, শুভ দৃষ্টির পর ভাল কোরে চক্ষেও দেখ্‌লেম না; সেই তো এক মহাদুঃখ, তার উপর কেমন কোরে দিন চোল্‌বে. কি খেয়ে বেঁচে থাক্‌বো, কেনই বা বেঁচে থাক্‌বো, সেই এক মর্ম্মান্তিক যাতনা, মর্ম্মান্তিক ভাবনা; তার উপর আবার—

শেষ কথা আর বাহির হইল না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে অভাগিনী একদৃষ্টে পদ্মাবতীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

পদ্মাবতী (সস্নেহ বিস্ময়ে) বল না কি বোলছিলে ? থামলে কেন ? তার উপর আবার কি ?

সুকুমারী। (অশ্রুমার্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে) মেয়েমানুষের জীবনটা বিষম কণ্টক।

পদ্মাবতী। তা তো সকলেই জানে, নূতন কথাটা তুমি কি বোল্‌ছিলে ? তার আবার—এইটুকু বোল্‌তে বোল্‌তে থেমে গেচো, কথাটা কি ?

সুকুমারী। তার উপর আবার পাড়ার ছোঁড়ারা আমার প্রতি বিরূপ অবজ্ঞা করে,— পুকুর ঘাটে জল আন্‌তে গেলে, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, আঙ্গুল দেখায়, আমি কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও চাই না, ছুটে ছুটে পালিয়ে পালিয়ে আসি।

পদ্মাবতী। আঙ্গুল দেখায় কেন ?

সুকুমারী। আমি যেন বুঝ্‌তে পারি, পয়সা দিবার ইসারা করে। আমি গরীব কি না, তাই তারা পয়সার লোভ দেখায়।

পদ্মাবতী। স্পষ্ট কোরে কেউ কিছু বোল্‌ছে না কি ?

সুকুমারী। ততটা বুকের পাটা হয় না।

এই সব কথা মনে কোরেই আমি একলা বোসে বোসে কাঁদ্‌ছিলেম।

পদ্মাবতী। (একটু চিন্তা করিয়া) তাদের মা বাপকে বোলে দিলে হয় না ?

সুকুমারী। না, না, না,—এমন কাজ করো না, তাতে আরও বেশী দোষ ?

পদ্মাবতী। তবে তুমি কি কোর্ত্তে চাও ?

সুকুমারী। তাই তো আমি ভাবি। ঘাটে যাওয়া বন্ধ কোরে ঘরের ভিতর দোর দিয়ে বোসে থাকা, সেটাও তো কেউ পারে না। আমি যেন বুঝ্‌তে পাচ্চি.—এ অঞ্চলের হাওয়াটা বিষাক্ত হোয়ে পোড়েছে। দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেই হাড় জুড়োয়। একে তো পেটের জ্বালা, তার উপর ঐ রকম বিষম উৎপাত যে রকম গতিক দেখ্‌তে পাচ্চি, তাতে বিষম সঙ্কট, ওদিকে আবার দুদিন পরে হয় তো উপোস কোরেই দিন কাটাতে হবে ; হয় হবে, উপোসে উপোসে প্রাণ যায় যাবে।

সুকুমারী। ঠাউরেচি এক ! যুক্তি। দেশ ছেড়ে পালাবো। পেটের জ্বালায় আর তাদের জ্বালায় দেশত্যাগিনী হোয়ে যাবো। প্রাণ তো শীঘ্র যাবে না ; ইচ্ছে কোরে আত্মঘাতিনী হওয়া মহাপাপ ; বিদেশে গিয়ে দাসিবৃত্তি কোরে পোড়া পেট পোষণ করাও মঙ্গল।

পদ্মাবতী। কোন্ দেশে যেতে চাও ?

সুকুমারী। সেই কথাই তো ভাবচি। কোন্ দেশে গেলে একটা আশ্রয় পাই। তুই তার একটা পরামর্শ দিতে পারিস্ ?

পদ্মাবতী। পরামর্শ ? আমি তো ভাই বিদেশের কোন খবর রাখি না ; তবে শুনেছি, কোল্‌কাতা সহর খুব ভাল, সেখানে অনেক দেশের অনেক লোকের অন্ন হয় ; সাবধানে থাকৃতে পাল্লে, সেখানে পেটের ভাব্‌না ভাব্‌তে হয় না। আর কোন বিপদের আশঙ্কাও থাকে না। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের বাস, একটা না একটা আশ্রয় মিলে যেতে পারেই পারে।

সুকুমারী। তবে সেই কথাই ভাল, আমি কোল্‌কেতায় যাবো। তুই আমার সঙ্গে যেতে পারিস্ ?

পদ্মাবতী। তা কেন পার্‌বো না, আমারও তো কেউ নাই সচ্ছন্দে যেতে পারি, তোমাকে আমি মায়ের পেটের বোনের মতন ভালবাসি, তুমি যদি যেতে চাও, তোমাকে আমি একলা ছেড়ে দিতে পার্‌বো না, কাজে-কাজেই আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। (চিন্তা করিয়া) রোসো রোসো একটা কথা আমার মনে পোড়েছে। তা হলেই বেশ হবে।

সুকুমারী। কি রকম।

পদ্মাবতী। আমাদের গাঁয়ের একটী বাবু মেদিনীপুর জেলায় উকিল ছিলেন, বিশ বৎসর সেখানে থেকে অনেক টাকা রোজকার কোরেছেন, খুব বড় মানুষ হয়েছেন, সম্প্রতি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে, দেশে এসেছেন, কল্‌কেতায় বাড়ী কোরে দু'বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি কোচ্চেন। কোল্‌কেতায় কোন জায়গায় তাঁর বাড়ী সন্ধান নিয়ে যদি আমরা সেই বাড়ীতে যেতে পারি, তা হোলে অবিশ্যি একটা না একটা কিনারা লাগ্‌তে পারে।

সুকুমারী। তিনি কি করেন ?

পদ্মাবতী। জাত ভাল, তোমাদেরি স্বজাত। তাঁর নাম বাবু রামজীবন ঘোষ।

সুকুমারী। তবে আর, কথা নেই, সেইখানেই আমায় নিয়ে চলো।

গরীব বোলে দয়া কোরে যদি আমায় আশ্রয় দেন, তবে আমরা সেই-খানেই থাক্‌বো, সেই বাড়ীতে থেকে কাজকর্ম্ম জুটিয়ে নেবো।

পরামর্শ স্থির হইল, উভয়ে ঘুমাইল। পরদিন প্রাতঃকালে পদ্মাবতীর একটী নূতন কাজ, রামজীবনবাবুর কলিকাতার বাটীর ঠিকানা কোথায়? কোন্নগরে বাড়ীর একজন রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া পদ্মা সেই ঠিকানাটী জানিয়া আসিল।

তিন দিন পরে ভোর বেলায় পদ্মাবতী নাপতিনীর সঙ্গে একখানি গহনার নৌকায় উঠিয়া সুকুমারী কলিকাতায় যাত্রা করিল।

—:—

অর্শ। (*Piles*)

লেখক কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত।

পিত্তার্শের বিপ্রকৃষ্ট নিদান এবং লক্ষণ :—

"কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপ প্রভা।
দেশকালাচ শিশিরৌ ক্রোধোমদ্যমসূয়নং॥
বিদাহিতীক্ষ্মুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্ন ভোজনং।
পিত্তোল্বনানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতু রর্শসাং।

ঝাল, টক এবং উষ্ণগুণ সম্পন্ন দ্রব্যের পানভোজন, উষ্ণদ্রব্যের স্পর্শ, অধিক ব্যায়াম অগ্নি সূর্য্যের তাপ, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে মরুদেশে বাস, মদ্যপান ক্রোধ ও হিংসা, ভাজা পোড়া বা অর্দ্ধপাক দ্রব্যের পান ভোজনে পিত্তার্শের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বনা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ।
তন্বস্রক স্রাবিণো বিস্রা তনবো মৃদবোশ্লথাঃ।

শুকজিহ্বা যকৃৎখণ্ড জলৌকা বক্ত্র সন্নিভাঃ।
দাহ পাকজ্বর স্বেদতৃষ্ণমূর্চ্ছারুচি মোহদাঃ॥
সোষ্মানো দ্রবনীলোষ্ণ পীতরক্তামবর্চ্চসঃ॥
যবমধ্যা হরিৎ পীত হারিদ্র ত্বঙ্‌নখাদয়ঃ॥

পিত্তপ্রধান অর্শের আকৃতি সূক্ষ্ম, লম্বা ও কোমলস্পর্শ পক্ষীর জিহ্বা যকৃৎখণ্ড অথবা জলৌকা (জোঁকের) মুখের মত, অগ্রভাগ নীলবর্ণ, অন্তভাগ রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, উহাদের মধ্যদেশ যবের মত মোটা হয়, অর্থাৎ মূল এবং অগ্রভাগ সূক্ষ্ম কিন্তু মধ্যস্থল অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূল। অর্শের স্থান উষ্ণাবিশিষ্ট (গরম) পিত্তার্শপীড়িত রোগীর দাহ (জ্বালা) মলদ্বারের পাক, জ্বর, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা অরুচি এবং মোহ প্রভৃতি উপদ্রব হয়। এই রোগাক্রান্ত রোগী রক্ত ও আম-মিশ্রিত শাকের মত বর্ণের বা পীত বর্ণের তরল মল ত্যাগ করে। অধিক দিন এই ব্যাধিতে ভুগিলে শরীরের ত্বক এবং নখাদি হল্‌দে হইয়া পড়ে।

রক্তার্শ (Bleeding Piles) পিত্তার্শেরই অনুরূপ লক্ষণাক্রান্ত এবং যে যে কারণে পিত্তার্শের উৎপত্তি সেই সেই কারণে ইহাও হইয়া থাকে। অধিকন্তু :—

"বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জা বিদ্রুম সন্নিভাঃ।
তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ় বিটকপ্রপীড়িতাঃ।
স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতি প্রবৃত্তিতঃ।"

এই রক্তার্শ বটের ঝুরির মত গুচ্ছ গুচ্ছ বা অতি সরু সরু এবং প্রবালের মত বা রক্ত কুচের মত ঘোর রক্ত বর্ণ হয়। রোগীর মলবদ্ধ থাকায় কঠিন গুটলে মলত্যাগের সময় ঐ সকল অর্শের গাত্রে চাপ লাগায় ঐ সকল ছিন্ন হইয়া সহসা অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। অধিক রক্ত স্রাব হওয়া বশতঃ রোগীর শরীরেরবর্ণ ফেকাসে ও রক্তহীন হইয়া যায়। ইহাতে অধোবায়ু রুদ্ধ থাকে॥

শ্লেষ্মা প্রধান অর্শ :—

মধুরস্নিগ্ধশীতাণি লবণাম্লগুরূনিচ।
অব্যায়াম দিবাস্বপ্ন শয্যাসন সুখেরতিঃ॥
প্রাগ্‌বর্ত্তে সেবা শীতৌচ দেশকালাচ চিন্তনং।
শ্লৈষ্মিকানাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণ অর্শসাঃ॥

মিষ্ট, স্নিগ্ধ, শীতল অম্ল, লবণ রস বিশিষ্ট অথবা গুরুদ্রব্যের ভোজনে কিছু-মাত্র পরিশ্রম না করিলে, সর্ব্বদা কোমল শয্যায় শয়ন বা উপবেশন, পূর্ব্ব দিকের হাওয়া, শীতকাল এবং শীতপ্রধান দেশে বাস অর্শরোগের বিপ্রকৃষ্ট কারণ।

শ্লৈষ্মিক অর্শের আকার ;—

শ্লেষ্মোল্বনা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ।
উৎসন্নোপচিতা স্নিগ্ধাঃ স্তব্ধ-বৃত্ত-গুরু-স্থিরাঃ॥
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়ঃ
করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তন সন্নিভাঃ॥

শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুরগুলি মহামূল, উন্নত স্থূল ও লম্বা হইয়া থাকে। ইহার আকার সাধারণতঃ বাঁশের কোঁড়, কাঁটালের বীজ অথবা গাভীর বাঁটের মত হইয়া থাকে, কখন কখন বর্ত্তুলাকারও হয়। ইহাতে অধিক বেদনা থাকে না। অঙ্কুরের গাত্রগুলি তৈলাক্তবৎ পিচ্ছিল হয় এবং কুট্‌কুট্‌ করে অঙ্গুলি দ্বারা অল্প অল্প পীড়ন করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

শ্লৈষ্মিক অর্শের উপদ্রব ;—

বশভ সকফপ্রাজ্য পুরীষা সপ্রবাহিকাঃ।
ন শ্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধ ত্বগাদয়ঃ।

ইহাতে চর্ব্বির ন্যায় কফবিশিষ্ট মল প্রচুর পরিমাণে কুন্থন দিতে দিতে নির্গত হয়, ইহা হইতে কোনরূপ ক্লেদাদিস্রাব হয় না বা উহা বিদীর্ণ হয় না, রোগীর গাত্র তেল চুকচুকে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে, মলাদিও ক্রমশঃ ঐরূপ হইয়া পড়ে, অপিচ,—

বঙ্ক্ষণানাহিঃ পায়ুবস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ।
স কাশঃ শ্বাস হৃল্লাস প্রসেকারুচিপীনসাঃ॥
মেহকৃচ্ছ্র শিরোজাড্য শিশির জ্বরকারিণঃ।
ক্লৈব্যাগ্নি মার্দ্দবশ্ছর্দ্দি রামপ্রায় বিকারদাঃ॥

এই রোগে দুটি কুঁচকি টানিয়া ধরার মত বেদনা হয়। মলদ্বার বস্তি (তল-পেট) এবং নাভিতেও টানিয়া ধরা মত টন্‌টনানি বেদনা হয়। রোগীর কাশি, হাঁপানি মুখদিয়া জল উঠা, গা বমি করা, অরুচি, নাকে ঘা, মেহকৃচ্ছ্র, শিরোরোগ শীতজ্বর, অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি আম বহুল ব্যাধি, অগ্নিমান্দ্য বমি এই সকল উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়।

খেয়াল।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

দূর হ'তে এ সংসার দেখ জ্বলে মণি।
কাছে দেখ সে মণিরে ধ'রে আছে ফণী॥

ধরায় আগমবার্ত্তা প্রচারিল শাঁখ।
ঘোষিল বিবাহবার্ত্তা বেজে ঢোল ঢাক॥
নিগমের কালে হায় নাহি কোন জাঁক।
"বল হরি হরি বোল" মাত্র—সব ফাঁক॥

যে হৃদয়ে বিরাজে না কোন বাসনাই।
সে হৃদয় শুষ্ক পুষ্প কোন বাস নাই॥

নক্তোপরে স্বর্গ গড়ে যেই যুযুধান।
জাগ্রতে দুঃস্বপ্ন তার অস্ত্রের প্রধান॥

কৌমুদিকুন্তলা শশি না চাহি তোমার।
অলোকাজ্যোৎস্নারাশি কিম্বা সুধাধার॥
একটু কলঙ্ককালি দেহ লো সুন্দরি।
যতনে একটি টিপ ললাটেতে পরি॥

হায় তুই কত কাল খেলাঘরে রবি।
অস্তাচলে চলে তোর সাথী আয়ু-রবি॥

পতি কাচ—পত্নী পৃষ্ঠে পারা-আবরণ।
দুয়ে মিলে হয় দেখ নির্ম্মল দর্পণ॥
সহজে তাহাতে পড়ে স্বপ্রকাশ ছায়া।

বন পোড়ে—মন পোড়ে এ কথা নিশ্চয়।
বন পোড়া নেবে কিন্তু মন পোড়া নয়॥

প্রেম যদি চাও তবে চেয়োনাক মান।
এক বৃন্তে দুটি ফুল কোথা বর্ত্তমান॥

ধেনো পোর্ট রম ব্রাণ্ডী সেরি শ্যামপেন।
যা বল প্রথমে মজা শেষে দেয় পেন॥ (Pain)

ভারী বটে ধনীর মুকুট তদুপর।
বোধ হয় ভারী হবে শোলার টোপর॥

দুলিতে শ্রীকণ্ঠে সদা হয় মম মতি।
কিন্তু হায় এ অভাগা ছিদ্রহীন মতি॥

"মাটির মানুষ" যেই সুখ্যাতি তাহার।
"মাটি হয়ে গেছে" কথা অতীব নিন্দার॥
আছে—ভাল, হলে যদি দোষ গুরুতর।
মাটি হায় হই তবে মাটির আতর॥

যে সংসারে হয় হায় দ্বন্দ্ব নিশিদিন।
শত সুখে সে সংসার শ্রীহীন মলিন॥

সেই গুরু—শিষ্য সনে যার ব্যবহার।
ঠিক কাচপোকা সম সহ আর্শলার॥

বিষকুম্ভ পয়োমুখ ঠিক জেনো খল।
ভুজঙ্গ নির্ম্মোক ছাড়ে—না ছাড়ে গরল॥

বিশ্বময় দেহ মোরে ললাট-লোচন।
হেরি তব রূপ—এই আঁখি আকিঞ্চন॥

সহস্র লোচনে কেশ ইন্দ্র হতে লুপ্ত।
সে হেতু টাকের নাম বুঝি ইন্দ্রলুপ্ত॥

নহে কবি-গাথা-পুষ্প কভু শুষ্ক বাসি।
বিতরে জগতে চির সৌরভের রাশি॥

দুখহীন সুখ কোথা—সুখহীন দুঃখ।
এ বিষয়ে বিধাতারো বিধাতা বিমুখ॥

ডার্ব্বিন বলেন যাহা তাহা নহে ভুল।
আদি যুগে মানবের আছিল লাঙ্গুল॥

সরস্বতি।

এসো মা বঙ্গের রঙ্গে বচন-ঈশ্বরি—
সরস্বতী, শুভ্রকান্তি, সরোজবাসিনী,
বিণাপাণি, বাগীশ্বরী, বিদ্যাবিধায়িনী,
নৃত্যগীতবিনোদিনী ত্রিভঙ্গরূপিণী;
তোমারে প্রণাম করি প্রাণের উল্লাসে!
পুণ্যদিন শ্রীপঞ্চমী, তোমার শ্রীপদে—
এই দিনে করি দেবি, পুষ্পাঞ্জলি দান।

কৃপা কর কৃপাময়ি প্রসাদে তোমার,
বর্ষে বর্ষে করি যেন বাসন্তি-উৎসব।
তব কৃপা বিনা ভবে ভববাসিগণ—
থাকিত হইয়ে বোবা, বাক্‌শক্তি কভু
স্ফুরিত না রসনায় কাহারো সংসারে ;
জন্মাবধি জীবনের অবসান কাল—
বাক্যহীন নর দেহ কাষ্ঠ সম হয়ে,
থাকিত অবনিতলে নড়িত চড়িত,
কিন্তু যেন দেখাইত নির্জীবের প্রায়!
পশুপক্ষী রব করে তোমারি প্রসাদে।
অনন্ত তোমার কৃপা বর্ণিবারে নারি,
বর্ণহার উপহার কি দিব তোমারে।
ভকতি-কুসুমাঞ্জলি লহ উপহার।
ভক্তিভাবে যোড়করে লুটাইয়ে ভূমি ;
বার বার শ্রীচরণে করি নমস্কার।

—০*০—

পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

লেখক, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

মধ্যএসিয়া আয়ুর্ব্বেদের জন্মভূমি। ইলাবৃতবর্ষ মধ্যস্থ কনকপর্ব্বত মেরুপৃষ্ঠে সমাসীন স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরা কল্পের প্রলয় পয়োধিজলে অন্তর্হিত সেতিহাস বেদাদি উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্বের সঙ্গে তাহার উপাঙ্গস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদেরও উদ্ধার সাধন করেন। স্বয়ম্ভুর দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া মহর্ষিগণ এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মহাভারত তাই বলিয়াছেন :—

কল্পান্তেঽন্তর্হিতান বেদান্
সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
তপসা লেভিরে পূর্ব্ব
মনুজ্ঞাতা সয়ম্ভুবা॥

বর্ত্তমান কালেরপ্রারম্ভে অন্যান্য ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের নব সংস্করণ পরিগঠন-বিষয়ে পিতামহকে সাহায্য করিলেও কাশীরাজ, দিবোদাস, ধন্বন্তরি বলেন, "প্রাচীনতম যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের লক্ষ শ্লোক ব্রহ্মা নিজেই স্মরণের দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত এই লক্ষ শ্লোক, প্রথমতঃ সহস্র অধ্যায়ে সুবিভক্ত হইয়াছিল। তখন ইহার আয়ুর্ব্বেদ এই নামকরণ হয় নাই; বেদের উপাঙ্গরূপে প্রথম প্রথম ইহা অভিহিত হইত। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বের উপাঙ্গরূপে তখন এই চিকিৎসা-সূত্র সকল বেদ মধ্যেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল।

সেই জন্য কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরিকে বলিতে হইয়াছে।—

"আমরা যাহাকে আয়ুর্ব্বেদ এই নামে অভিহিত করিতেছি, তাহা অথর্ব্ব-বেদের উপাঙ্গ। প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি। প্রথমতঃ ইহার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ ছিল, আর সেই সময়ে ইহা সহস্র অধ্যায়ে সংবিভক্ত হয়। সুশ্রুত-সংহিতায় বেদোৎপত্তি নাম প্রথম অধ্যায়ে আছে।

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য
অনুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ
শ্লোক শতসহস্রঞ্চ
অধ্যায় সহসঞ্চ
কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।"

ডল্লন তাঁহার নিবন্ধ-সংগ্রহ নামক টীকায় এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা অবগত হই, আয়ুর্ব্বেদ কাহারও কৃত নহে, আয়ুর্ব্বেদ নিত্য। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ উদ্ধার করিয়া পরে প্রজা সৃষ্টি করেন। "কৃতবান্" বলিতে এখানে "সংস্কৃতবান্" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। আর এখানে উপাঙ্গ শব্দ গ্রহণ করায় এই বুঝিতে হইবে, অথর্ব্ব বেদ বৃহৎ; আয়ুর্ব্বেদ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র।

যেমন দেহের বাহু, জঙ্ঘা, শির অঙ্গ, আর কর, চরণ নাসিকা উপাঙ্গ; সেইরূপ অথর্ব্ব বেদ অঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ উপাঙ্গ।

তাঁহার কথাগুলি এই ;—

উপাঙ্গম্—অঙ্গমেবাল্পত্বাৎ উপাঙ্গম্

তদ্ যথা—

দেহস্ত বাহুজঙ্ঘ্যে শিরঃ ইত্যাঙ্গানি,

কর চরণ নাসিকাদিন্যুপাঙ্গিনি।

এতেন উপাঙ্গীমিত্যুক্তম।

উপাঙ্গমঙ্গসমীপং ইত্যেকে।

অনুপাদ্যৈব প্রজাঃ—লোক সৃষ্টেঃ প্রাক্

আয়ুর্ব্বেদং প্রদর্শ্য প্রজাঃ পশ্চাৎ

সৃষ্টবানিত্যর্থং।

কৃতবান্—সংস্কৃতবান—নতুপূর্ব্ব,

মুৎপাদিতবান্।

কুতঃ

নিত্যত্বাৎ। সয়ম্ভুঃ ব্রহ্মা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—

প্রজাপতি ঋক্, যজুঃ সাম অথর্ব্ব বেদ গতিদর্শন করিয়া ও তাহার অর্থ বিচার পূর্ব্বক তাহা হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সূত্র সকল সংগ্রহ করিয়া পঞ্চম বেদরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, আয়ুর্ব্বেদ এই নাম প্রজাপতির নিজস্ব। তিনি বলিয়াছেন ;—

ঋকযজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্

দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।

বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈব

আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥

আয়ুর্ব্বেদ যে প্রাচীন যুগে পঞ্চম বেদ রূপে অভিহিত হইত কদাচ তাঁহার নাড়ী বিজ্ঞানের ভূমিকায় এই কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ;—

আস্তে বেদঃ পঞ্চমো বৈদ্যক্যাখ্যো।

বেত্তাকশ্চিৎ তস্ত নাস্তে মহেশাৎ॥

অর্থাৎ বৈদ্যকাখ্য পঞ্চবেদ বিদ্যমান আছে, সে পঞ্চম বেদ আর কেহ জানেন, না, কেবলমাত্র মহেশই তাহা পরিজ্ঞাত।" সুতরাং বলিতে হইবে, এমন সময়ে ছিল যখন, আয়ুর্ব্বেদ এই নামকরণ হয় নাই। প্রথমতঃ ইহা বেদাঙ্গরূপে বেদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহার পর ইহা পঞ্চমবেদরূপে বেদগর্ভ হইতে সংগৃহীত হইয়া সূত্রাকার ধারণ করে, এই পঞ্চমবেদের একমাত্র বেত্তা মহেশ। ইহার পর ইহার "আয়ুর্ব্বেদ" এই নামকরণ হয়। বেদের ভিতর আয়ুর্ব্বেদ এই শব্দ পরিদৃষ্ট না হওয়ার এই কারণই এই। পূর্ব্বে বলিয়াছি ;—

আয়ুর্ব্বেদের আয়ুর্ব্বেদ নামকরণ প্রজাপতির নিজস্ব। প্রজাপতি আয়ুর্ব্বেদের আয়ুর্ব্বেদ এই নামকরণ করিয়া নিজ দৌহিত্র ভাস্করকে ইহা সমগ্রাকারে প্রদান করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়াছেন, ভাস্কর নিজ মাতামহের নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়া ইহা হইতে ভাস্করসংহিতা নামক একখানি স্বতন্ত্র তন্ত্র প্রণয়ণ করিয়া আপন শিষ্যদিগকে প্রদান করেন এবং তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার কথাগুলি এই ;—

কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং
ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বনাম্না সংহিতাং তস্মাৎ
ভাস্করশ্চ চকার সং॥
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য
আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাম্
প্রদদৌ পাঠয়ামাস
তে চক্রুঃ সংহিতাংস্ততঃ।

পঞ্চম বেদের একমাত্র বেত্তা মহেশ নিজ পত্নীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ব্রহ্মার অবরোধ বা স্মরণ হইতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি এবং প্রজাপতির দ্বারা তাহার আয়ুর্ব্বেদ এই নামকরণ হইলেও, ভাস্করই প্রাচীন যুগের একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রচারক এবং লক্ষ শ্লোক সংযুক্ত সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত বেদাঙ্গরূপে অবস্থিত, পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ তাঁহারই সম্প্রদায় ও শিষ্যগণের ভিতর প্রভাবিত হয়। ক্রমশঃ

———:০:———

সমালোচনা।

সাংখ্যযোগ-কর্ম্মযোগ।—ইংরাজী সংস্করণ। শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দস্বামী সম্পাদিত। মূল্য একটাকা।

খ্যাতনামা প্রাচ্য দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আত্মানন্দ স্বামীজী গত ১৯০৪ খৃঃ অব্দে রাজকোটের সভায় এই যোগ সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্বামী সেই তিনটি বক্তৃতা মূল হিন্দী ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, পাঁচমাসের মধ্যে সহস্রখণ্ড পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়; স্বামিজী অতঃপর স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বন্ধুবর্গের অনুরোধে জগতের যাবতীয় প্রধান প্রধান ভাষায়,—বিশেষতঃ ইংরাজীভাষায় সেই পুস্তকখানির অনুবাদ করিতে কৃতসংকল্প হন; সম্প্রতি এই ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ধন্যবাদসহকারে স্বীকার করিতেছি, আমরা তাহার একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। অবতরণিকায় দৃষ্ট হইল, সৌরাষ্ট্র নগর নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতিসুখ শঙ্কর কমলাশঙ্কর ত্রিবেদী এম, এ, এল, এল, বি, ঐ হিন্দী পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, কলিকাতা নিবাসী সাহিত্য-বিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপদ বন্দোপাধ্যায় উক্ত ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া অনুবাদিত ইংরাজী ভাষা সুমার্জ্জিত ও সু-সজ্জিত করিয়াছেন।

যোগশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভাষা অতি কঠিন, সহজে ভাষান্তর করা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে; প্রাগুক্ত অনুবাদক মহাশয়েরা এই পুস্তকের ভাষাকে অতি পরিষ্কার সুখবোধ্য করিয়া লইয়াছেন।

কর্ম্মযোগের বিধি, পদ্ধতি প্রণালী, শিক্ষা ও সংক্ষিপ্ত ফলাফল এই পুস্তকে আছে; বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার স্থানাভাব। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে যোগশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমার্থ বিদ্যা ও সংসারে নিঃস্বার্থপরতার সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইবেন।

যোগাসনে বসিয়া নয়ন মুদিয়া ধ্যান করা এই পুস্তকোক্ত উপদেশের অর্থ নহে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহাই উপদেশ। যোগমার্গে কর্ম্মের প্রকৃতি কিরূপ, গীতা শাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন; ভগবানের উদ্দেশে নিষ্কাম কর্ম্মই সর্ব্বকর্ম্মের সার

সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্বামী এই ইংরাজী পুস্তকের উপক্রমণিকায় অনেকগুলি সার সার কথা লিখিয়াছেন; প্রথম কথা এই যে, ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অসংখ্য অসংখ্য উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; সর্ব্বসম্প্রদায়ের মূল উপদেশ একই প্রকার;—জগদীশ্বরকে জগতের পিতা এবং জগতের মানবগণকে পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য; আর এক উদ্দেশ্য সাম্য অথবা শান্তিস্থাপন। লেখার ভাব ঐরূপ, মুখের কথাও ঐরূপ, কিন্তু কার্য্যে আমরা দেখিতেছি কি? দেখিতেছি,—সাম্যের পরিবর্ত্তে পরস্পর কলহ ভ্রাতৃভাবের পরিবর্ত্তে হিংসা বিদ্বেষ, সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে বৃথা গর্ব্ব, সুনীতির পরিবর্ত্তে দুর্নীতি, নিস্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে লোভ ও স্বার্থপরতা, মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে কর্কশতা এবং ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম। যতগুলি সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, সকলগুলিতেই পরস্পর হিংসা বিদ্বেষের বহুলতা দেখা যায়। পার্শি, জুদীয়, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান এবং পৌরাণিক হিন্দু, ইহারা সকলেই আত্মমতের বিরোধী ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা করে, আপনাদের মতকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে। এতদ্দ্বারা সংসারের ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে, ধর্ম্মের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দু আর এখনকার হিন্দু একজাতি বলিয়া বিবেচিত হয় না; হিন্দুর সেই ঔদার্য্য এখনকার পৌরাণিক হিন্দুতে অতি অল্প। সকল সম্প্রদায়েই গোঁড়ামী প্রবেশ করিয়াছে; গোঁড়ামীধর্ম্মপন্থার মহাবিঘ্ন, সর্ব্ব অনর্থের হেতু।

এইরূপ অনেক অনিষ্টের হেতু প্রদর্শন করা হইয়াছে। সাংখ্যযোগের মহিমা বুঝিলে ক্রমে ক্রমে শান্তি হইতে পারিবে; মহাত্মাআত্মানন্দ স্বামিজী এবং পণ্ডিতবর ভাস্করানন্দ স্বামিজী এই যোগতত্ত্ব প্রচার করিয়া সমাজের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হইলে আরও অধিক উপকার হইবে।

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা।—আমরা আগামী ১৩১৮ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও আর এ প্রাচীন পঞ্জিকার নূতন পরিচয় দিতে হইবে না, এই পঞ্জিকা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত ইহাতে বিরোধভাব নাই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সকলের নিকটেই গুপ্তপ্রেশপঞ্জিকার মত সর্ব্বাগ্রেই আদরণীয়। চিরপ্রথামত এই পঞ্জিকায় যে সকল অত্যাবশ্যক বিষয় প্রকাশ হইয়া থাকে, এবারেও তাহার কোনটির ত্রুটি হয় নাই; তৎব্যতীত নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটী নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ } ১৩১৭ সাল, ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

লেখক ডাঃ শ্রী সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রীশ, প্রাচীন চালডিয়া, প্রাচীন এসিরিয়া, প্রাচীন বাবিলনিয়া, প্রাচীন পারসিয়া, প্রাচীন জগতের সভ্য অসভ্য সকল দেশেই, ভাস্কর চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রচারের মূলে দণ্ডায়মান। দেবতা এক, উপাধি ভিন্ন। একই sungod. কিন্তু কোনখানে ইহার নাম Horus (১) কোনখানে Apollo (২) কোনখানে অর্য্যমন্ (৩) কোনখানে ভাস্কর। (৪) প্রাচ্য

দেশে এই ভাস্কর সম্প্রদায়ের ষোলজন প্রধান প্রধান তন্ত্রকার ঋষির নাম ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণকার তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ২৫।

এই ষোলজন তন্ত্রকারের বিরচিত গ্রন্থ গুলির নামও আমরা এই প্রাচীন পুস্তকে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

দেখিতে পাই,

১। ধন্বন্তরি—চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান নামক পুস্তকের প্রণেতা,

২। দিবোদাস—চিকিৎসা দর্পণ

৩। কাশীরাজ—চিকিৎসা কৌমুদী

৪। অশ্বিনী— } চিকিৎসার ও ভ্রমঘ্ন

৫। যম—

৬। নকুল—বৈদ্যক সর্ব্বস্ব

৭। সহদেব—ব্যাধি সিন্ধু বিমর্দ্দন

৮। যমরাজ—জ্ঞানার্ণব

৯। চ্যবন—জীবদান

১০। জনক—বৈদ্য সন্দেহ ভঞ্জন

১১। চন্দ্র স্থত বুধ—সর্ব্বসার

১২। জাবাল—তন্ত্রসার

১৩। জাজলি—বেদাঙ্গসার

১৪। পৈল—নিদান

১৫। কবচ—সর্ব্বধর

১৬। কুম্ভ সম্ভব অগস্ত্য—দ্বৈধনির্ণয়

প্রণয়ন করেন।

ব্রহ্মে বৈবর্ত্ত পুরাণে ভাস্কর এবং ভাস্কর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু চরক স্থশ্রুত বাগভটাদি গ্রন্থে ভাস্করের নাম গন্ধও নাই।

চরকের মতে, বেদোৎপত্তি ক্রম এইরূপ

(মূলে) ব্রহ্মা—

ব্রহ্মা—প্রজাপতি—দক্ষ অশ্বিদ্বয়

ইন্দ্র—ভরদ্বাজ

আত্রেয়

অগ্নিবেশ

অগ্নিবেশ ভেল জাতুকর্ণ পরাশর হারীত ক্ষারপাণি।

কেহ বলেন আত্রেয় পুনর্ব্বসু ও ভরদ্বাজ একব্যক্তি, কেহ বলেন, আত্রেয় ও ভরদ্বাজ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বটেন, কিন্তু আত্রেয় ভরদ্বাজের শিষ্য নহেন। ইন্দ্রের শিষ্য কেহ বলেন ইন্দ্রের শিষ্য ভরদ্বাজ একা নহেন, ইন্দ্রের নিকট রসায়ন তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অনেক ঋষী তাহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য—অসিত ও গৌতম।

সুশ্রুতের মতে কেহ বলেন,—নিশিম কশ্যপ ও ইন্দ্রের শিষ্য।

মূলে ব্রহ্মা—

প্রজাপতি—

দক্ষ।	অত্রি
।	অঙ্গিরা
অশ্বিদ্বয়।	ভৃগু
।	বশিষ্ট
ইন্দ্র।	কশ্যপ
।	বামদেব
ধন্বন্তরি।	অগস্ত্য
।	পুলস্ত্য

সুশ্রুতঃ ঔপধেনব, ঔরভ্র পৌষ্কলাবত বৈতরণ করবীর্য্য

{ গোপুর
রক্ষিত

এই সপ্ত শিষ্য আর গোপুররক্ষিত যদি বিভিন্ন ব্যক্তি হয়েন, তাহা হইলে অষ্টশিষ্য

কেহ কেহ বলেন, ভোজ, প্রভৃতি ধন্বন্তরির শিষ্য কেহ কেহ বলেন,

নিমি

কাঙ্কায়ণ

গার্গ্য

গালব

প্রভৃতিও ধন্বন্তরির শিষ্য বলিয়া পরিগণিত

বাগ্‌ভটের মতে (মূলে) ব্রহ্মা

প্রজাপতি

|

অশ্বিদ্বয়—

|

ইন্দ্র—

|

অত্রি পুত্রাদি মু নি,

অগ্নিবেশাদি। ৩৭।

উদ্ধৃত তালিকাটিতে আমরা প্রায় ৩৭।৩৮ জন ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি মহর্ষি, রাজর্ষি, এবং ঋষি কুমারের নাম প্রাপ্ত হই, কিন্তু ভাস্করের নাম গন্ধও এ তালিকাতে পরিদৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কিন্তু ভাস্কর, ধন্বন্তরি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বিনীকুমার অগস্ত্য জনক, জাজলি অর্কি সকলেই গুরু। ইন্দ্রের নাম গন্ধও ইহাতে নাই।

চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে ভাস্করের নাম নাই; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইন্দ্রের নাম নাই। এখন প্রশ্ন এই অসামঞ্জস্যের কারণ কি?

কারণ আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মার অবরোধ হইতে বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভে প্রজা সৃষ্টির পূর্ব্বে, উৎপন্ন প্রথম সংস্করণ লক্ষ শ্লোকের আয়ুর্ব্বেদ, যাহা একদা বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত, পরে প্রজাপতি দক্ষের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া পঞ্চমবেদরূপে দণ্ডায়মান হয়, এবং আয়ুর্ব্বেদাখ্যা ধারণ করে, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মতি ক্রমে যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি প্রচারক, সেই ভাস্করই বলুন আর অর্য্যমনই বলুন, হোরসই বলুন আর আপোলোই বলুন, sun-god এর ভিতর দিয়া প্রাচীন জগতে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; আর প্রজা সৃষ্টির অনেক পরে যখন লোক সকল অল্পায়ু এবং অল্প মেধা এবং জরা ব্যাধিতে প্রপীড়িত (৩৮) তখন তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার বিরচিত (৩৯) আয়ুর্ব্বেদের নাম অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

অষ্টাঙ্গে বিচ্ছিন্ন (৪০) আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ সংক্ষিপ্ত নহে, সুশৃঙ্খলান্বিত। অষ্টাধ্যায় পানিনি এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদী যে সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সেইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ প্রথম সংস্করণ হইতে দ্বিতীয় সংস্করণ সমুৎপাদিত হইয়া, ইন্দ্রের ভিতর দিয়া ভরদ্বাজের সাহায্যে (৪১) ভৌম স্বর্গ মধ্য এসিয়া হইতে এই মর্ত্যলোক ভারতবর্ষে উপাগত হয়। প্রথম সংস্করণ আয়ুর্ব্বেদ পূর্ণাঙ্গ। দ্বিতীয় সংস্করণ অষ্টাঙ্গে বিচ্ছিন্ন।

বকুলকুমারী।

লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল,

নবম পরিচ্ছেদ।

অপরিচিতা কামিনী।

মাখনলাল চাকরী করেন, অভ্যাস মত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রামজীবন বাবুর বৈঠকখানায় বসেন। একরাত্রে রামজীবন বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "কাজকর্ম্ম দেখিয়া তোমার মনিব তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আলস্য করিও না, কামাই করিও না, ভুল করিও না, দুই তিন মাস পরে তোমার বেতন বৃদ্ধি হইবে। আর দেখ, রাত্রিকালে তুমি আমার বাটীতেই আহারাদি করিও, আহারের পর আমার চাকর সঙ্গে গিয়া তোমাকে রাখিয়া আসিবে। দিনমানে যে দিন যেদিন সে বাড়ীতে তোমার আহারের বিলম্ব দেখিবে, সেই সেই দিনও এইখানে তুমি আহার করিতে পারিবে।" মাখনলাল সম্মত হইলেন।

যে রাত্রে মাখনলালের সহিত রামজীবন বাবুর ঐরূপ কথা হয়, তাহার পরদিন বেলা দশটার সময় দুটী স্ত্রীলোক সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রামজীবন বাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না, আদালতে বাহির হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোক দুটী অন্দরমহলে প্রবেশ করিল।

রামজীবন বাবুর পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, দুটী অল্পবয়স্ক পুত্র, একটী বিবাহিতা কন্যা, দুইজন চাকর ও একজন দাসী। কন্যাটী তখন পিত্রালয়েই ছিল। কন্যার নাম নিতম্বিনী। দুটী অপরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখিয়া নিতম্বিনী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্‌রা কে গা? কোথা থেকে আস্‌চো? এখানে তোম্‌রা কি চাও?"

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যেটী বয়োধিকা, সেইটি উত্তর করিল, "অনেক দূর থেকে আস্‌চি, নিরাশ্রয় কল্‌কেতায় আমাদের কোন জানা শুনা লোক নাই।"

নিতম্বিনী সেই কথা তাহার জননীকে জানাইল, গৃহিণী যত্ন করিয়া তাহাদিগকে বসাইলেন, সেই খানেই তাহারা স্নান আহার করিল। যে স্ত্রীলোকটী প্রথমে কথা কহিয়াছিল, নাপ্‌তের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া সে স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া আহার করিল। গৃহিণী জানিতে পারিলেন, ছোটটী কায়েতের মেয়ে, বড়টী নাপ্‌তের মেয়ে। বাস্তবিক কে তাহারা, পাঠকমহাশয়েরা অনুভবেই তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন।

সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বে রামজীবন বাবু বাড়ী আসিলেন, অবসর ক্রমে গৃহিণী তাঁহাকে আগন্তুক স্ত্রীলোকদিগের কথা বলিলেন। বাবু তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। তাহারা তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। বাবু তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আসল পরিচয় গোপন রাখিয়া নাপ্‌তিনী বলিল, "আমার এই সঙ্গিনীটী কুলীন কায়স্থের কন্যা, মা বাপ, ভাই ভগিনী, কেহই নাই, দিন গুজরাণের সম্বলও নাই, বিবাহ হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে দেখাশুনাও নাই; বড়ই কষ্ট, মাথা থুয়ে থাক্‌বার স্থান টুকু পর্য্যন্তও নাই। কোন ভদ্রলোকের বাটীতে রাঁধুনী হয়ে প্রাণধারণ করেন, আমার কাছে সেই ইচ্ছা প্রকাশ কোরে ছিলেন। এক গ্রামেই আমাদের নিবাস। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে, একলা কোন্ দেশে চাকরি কোত্তে যাবে, তাই আমি একে সঙ্গে করে কোল্‌কেতায় এনেছি। আপনার বাড়ীতেই আশ্রয় পেয়েছি, মা ঠাকুরণ আমাদের যত্ন কোরে রেখেছেন; আমাদের উপর আপনার মেয়েটিরও খুব যত্ন।"

মাথা হেঁট করিয়া রামজীবন বাবু খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর মাথা তুলিয়া ছোটটীর দিকে চাহিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিতো ছেলেমানুষ, তুমি কি রন্ধন কার্য্য জানো?"

মেয়েটী উত্তর করিতে পারিল না, নাপতিনীর পশ্চাতে অর্দ্ধলুক্কায়িতা হইয়া লজ্জায় নতমুখী হইল। তাদৃশ মুগ্ধভাব দর্শনে পূর্ব্ববৎ সস্নেহ বাক্যে বাবু বলিলেন, "কেন মা, লজ্জা কর কেন? আমি তোমাকে কন্যার মত দেখিতেছি, আমার কাছে লজ্জা কি? যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দাও। তুমি কি রন্ধনকার্য্য জান?"

নাপতিনী বলিল, "না জান্‌লে আর উপায় কি? সব শিখেচে। নিজের ঘরসংসারের সবকাজ নিজেই কোত্তো। বেশ রাঁধতে পারে।"

বাবু আবার চিন্তামগ্ন হইলেন, অবশেষে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তোমরা এইখানেই থাক, মেয়েটী যদি রাঁধতে পারে. অভ্যাস করুক, সকল কাজ একলা কোত্তে হবে না, বাড়ীর মেয়েরাও দেখিয়া শুনিয়া দিবে, সাহায্য কোরবে, দু-এক মাস থাক্‌তে থাক্‌তে সব শিখে নেবে। আমার একটা উড়ে বামুন ছিল, এক মাসের ছুটি নিয়ে সে লোকটা দেশে গেছে, আস্‌বে কি না আস্‌বে, ঠিক নেই। উড়ের হাতের রান্নাও আমাদের ভাল লাগে না, এই মেয়েটী ঠিক হবে। ঘরের মেয়ের মত থাক্‌বে কোন কষ্ট হবে না। আর তোমার যদি ঘরসংসারের টান না থাকে, তা হলে তুমিও বরাবর এইখানে থাক্‌তে পার। সংসারের কাজকর্ম্ম কোর্‌বে, ছেলেমেয়েদের যত্ন কোর্‌বে, বেশ হবে।"

নাপ্‌তিনী করযোড়ে নমস্কার করিল। বাবু গাত্রোত্থান করিয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

সাতদিন অতিবাহিত হইল। নূতন পাচিকার রন্ধন পারিপাট্য দেখিয়া বাবু সন্তুষ্ট হইলেন, পরিবারেরাও সন্তুষ্ট। ক্রমে ক্রমে তাহার আদর বাড়িতে লাগিল। কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই তাহাকে ভাল বাসেন, সর্ব্বদা মিষ্ট কথা বলেন, উত্তম উত্তম সামগ্রী আহার করিতে দেন, সত্যই কন্যা তুল্য স্নেহ। মেয়েটীরও লজ্জা কমিল। বাবুকে সে বাবা বলিয়া ডাকে, গৃহিণীকে মা বলে, নিতম্বিনীকে দিদি বলে। বাহিরের কাজকর্ম্ম করিয়া নাপ্‌তিনীও সকলের সন্তোষ জন্মাইল।

পরিচয় গোপন রাখিবার আর প্রয়োজন করে না। নূতন পাচিকাটী সেই কোন্নগরের দুঃখিনী সুকুমারী, তাহার সঙ্গিনী নাপ্‌তিনীটী সেই পদ্মাবতী। এ বাড়ীতে সুকুমারীর নাম হইয়াছে সৌদামিনী, পদ্মাবতী নিজে নাম লইয়াছে মোক্ষদা।

সাতদিন পরে রামজীবন বাবু প্রকৃত পরিচয় অবগত হইলেন। কি প্রকারে পরিচয় পাইবার অবসর হইল, তাহারও উল্লেখ করিতে হয়। একদা নিশাকালে শয়ন কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া বাবু তামাক খাইতেছেন, গৃহে অপর আর কেহ নাই, প্রদীপে তৈল প্রদান করিবার নিমিত্ত মোক্ষদা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। জ্যৈষ্ঠ মাস, বাবুর অঙ্গে ও ললাটে ঘর্ম্মধারা প্রবাহিত, প্রদীপে তৈল প্রদান করিয়া, তৈলপাত্রটী একটা তাকের উপর রাখিয়া মোক্ষদা একখানা

পাখা হস্তে লইয়া পালঙ্কের নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে বাবুকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া, অনুচ্চস্বরে বাবু বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, রোজ রোজ মনে করি, ভুলে ভুলে যাই, অবসরও ঘটে না। কথাটা কি জান,—প্রথম দিন তুমি ঐ মেয়েটীর পরিচয় দিয়েছিলে, ভদ্রকুলের কায়স্থ কন্যা, কেবল সেইটুকু মাত্র আমি জেনে রেখেছি; যথার্থই ভদ্রকুলের কন্যা, ব্যবহারে তার পরিচয়ও প্রাপ্ত হচ্চি, কিন্তু প্রকৃত পরিচয়টী কি, কোন্ কুলের কন্যা, পিতার নাম কি, কোথায় নিবাস, সেইটী এখনও আমি জান্‌তে পারিনি; বল দেখি, সত্য পরিচয়টী কি?"

মুখ নীচু করিয়া মৃদু হাসিয়া, তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া, মোক্ষদা উত্তর করিল, "কুল, শীল, নাম, গ্রাম, সমস্তই আপনার জানা; একটু মোহানা খুলে দিলেই সব কথা আপনার মনে হবে। অনেক দিন আপনি বিদেশে ছিলেন, নিজ গ্রামের নূতন নূতন মুখ আপনি দেখেন নাই। মেয়েটীর নিবাসও কোন্নগরে, বাপের নাম ছিল তিলোচন—বসু মল্লিক; মেয়েটীর নাম বোলেছি সৌদামিনী, সত্য নাম তা নয়, সত্য নাম সুকুমারী; বিবাহ হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে দেখা নাই, সে কথাও আপনি শুনেছেন, বরের নাম মাখনলাল মিত্র। তিনি কোল্‌কেতায় কোথায় নূতন বিয়ে কোরে ঘর জামাই হোয়ে আছেন, লোকের মুখে এই কথা শুনেছি। আমারো বাড়ী কোন্নগর। আপনিও কোন্নগরের বাবু, তাও আমি জানি। আপনার বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী; আমাকেও আপনি দেখেছেন, কিন্তু এখন মনে পোড়বে না, আমি যখন খুব ছোট, তখন আপনি বিদেশে গিয়াছিলেন। আমার বাপের নাম ছিল হলধর পরামানিক। মোক্ষদা নামে আমি আপনাদেন কাছে পরিচয় দিয়াছি, আমার আসল নাম পদ্মাবতী।"

বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রফুল্ল বদনে বাবু বলিলেন, "বটে? ওঃ! তবে ত ভালই হয়েছে; ঘরের মেয়ে ঘরে এসেছে। ভগবান যে কত সময়ে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা একত্র কোরে দেন, মানুষ সর্ব্বদা সেটা বুঝে উঠতে পারে না। আচ্ছা, তবে তুমি এখন যাও, আর আমাকে বাতাস কোত্তে হবে না, এখন আর ততটা গরম নাই।"

পাখাখানি বিছানার উপর রাখিয়া, তাকের উপর হইতে তৈলপাত্রটী লইয়া, মোক্ষদা বাহির হইয়া গেল, বাবু আপন মনে নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভারতে ইংরাজ।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

রাজার জন্য আমাদের যাবতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিলেও তাঁহার কৃতোপকারের পরিশোধ হয় না। অতএব কায়মনোবাক্যে রাজার হিতসাধনার্থ প্রাণমন সমর্পণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নয় কি?

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি পর্ব্বোপলক্ষে এদেশের ইতর লোকেরা সন্ন্যাস করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংশে, পার্শ্বে, ললাটে, জিহ্বায় লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া নাচিয়া বেড়াইত, কেহ কেহ চড়ক গাছে উঠিয়া ঘুরিত, পৃষ্ঠের মাংসখণ্ড হয়ত ছিঁড়িয়া যাইলে, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইত। ইহাতেও অনেকের জীবনহানি হইত। প্রজাহিতেচ্ছু রাজা অনুকম্পা করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শিক্ষা বিস্তার।—ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশের সাধারণ-শিক্ষা বড়ই হীনবল ছিল। তৎকালে বাঙ্গালাভাষার শৈশবাবস্থা। উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃত ভাষাতেই হইত। বাঙ্গালাভাষায় কেবল বর্ণমালার পরিচয় জন্য তাহা লিখিবার ও পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। তজ্জন্য গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গঙ্গার বন্দনা, দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা ও অষ্টোত্তর-শত চাণক্য শ্লোক এবং গণিত শিখিবার জন্য শুভঙ্কর দাসের আর্য্যাই প্রধান অবলম্বন ছিল। এইগুলি শিক্ষা করিয়াই প্রায় সকলে পঠদ্দশার সমাপ্তি করিত। কেহ কেহ সাহিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন হইবার জন্য ঘরে বসিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিত। কেহ বা জমিদার ও মহাজনদিগের সেরেস্তায় কাজ করিবার জন্য ভূমি-পরিমাণ জরিপ এবং জমিদারী ও মহাজনী কাগজ পত্র লিখিতে শিক্ষা করিত। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও দৈবজ্ঞ সন্তানেরা চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান স্মৃতি, ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলাদি এবং বৈদ্য সন্তান আয়ুর্ব্বেদ ও দৈবজ্ঞ সন্তান জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতেন।

সকল গ্রামে চতুষ্পাঠী বা পাঠশালা ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয়ের সন্তানেরা ও নবশাক শ্রেণীস্থ সকলের নহে, কাহার কাহার সন্তান পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিত। শিক্ষার দ্বার সকলের পক্ষে সমভাবে উন্মুক্ত ছিল না। কাজেই অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই বিদ্যালাভ ঘটিত। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধ করিয়া কেহ কেহ আপনার পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইত। স্ত্রী-

শিক্ষা একবারে নিষিদ্ধ ছিল, অনেকে বিশ্বাস করিত যে, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।

এখন সে কাল গিয়াছে—গ্রামে গ্রামে, এমন কি পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, অনেক গ্রামেই চতুষ্পাঠী বসিয়াছে, অধ্যাপক মহাশয় সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি ন্যায় শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করিতেছেন, এই সকল পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীতে ইংরাজ-রাজ অর্থ সাহায্য করিতেছেন। দুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এক একটী গ্রামে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল বসিয়াছে, নগরে নগরে উচ্চ-শ্রেণীর স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,মহানগরী কলিকাতায় উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কালেজ চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখাইবার জন্য মেডিকেল কালেজ, মেডিকেল স্কুল, স্থপতি, শিল্প ও পূর্ত্ত কার্য্য শিক্ষার জন্য শিবপুরে ও অন্যান্য স্থানে এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ, টেক্‌নিকেল স্কুল ও আর্টস্কুল খুলিয়াছে, কোথাও কোথাও কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য কৃষিকালেজ, তাঁত বুনন শিখিবার জন্য বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষায় সকলের সমান অধিকার জন্মিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ও প্রতিযোগিতায় বিদ্যার্থীগণকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভদ্রাভদ্র সকলেই আশা মিটাইয়া লেখাপড়া শিখিতেছে, দরিদ্র কুটীরে, রাজ প্রাসাদে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইতেছে। অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়াছে, কোথাও তাহার ঝাপসা পর্য্যন্ত নাই। যে সে ব্যক্তি আজি বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছে; সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ন্যায়ভূষণ বিদ্যাভূষণ হইতেছে, মহাকবির আসন পাইতেছে, গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছে, ব্যবস্থাদাতা হইতেছে। বিদ্যার এক চেটেত্ব ঘুচিয়াছে। কাহার কল্যাণে এরূপ সুবিধা সুযোগ ঘটিয়াছে, কে এরূপ মুক্তহস্তে বিদ্যাদান করিতে পারিয়াছে? অমূল্য বিদ্যাধন দান করিতে কাহার এরূপ কৃপণতা নাই? ইংরাজ রাজের—অতএব আমরা ইংরাজের নিকট অনির্ম্মোচ্য ঋণে আবদ্ধ। হিন্দু চিরদিন কৃতজ্ঞ। হিন্দু সন্তানের কৃতজ্ঞতাখ্যাতি দিগন্ত-বিশ্রুত। এমন সুনাম সুখ্যাতি রক্ষার জন্য সকলেরই প্রাণপন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কে এমন নির্ব্বোধ আছে যে, পিতৃ পুরুষের নাম ডুবাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এদেশের সর্ব্বত্র পথঘাট সুগম ছিল না, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাইতে বড় বড় মাঠ পার হইতে হইত। সেই

সকল পথে দস্যুভয় ছিল। আইল রাস্তা বই কুত্রাপি বাঁধা রাস্তা ছিল না। কেবল হাওড়া হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, অহল্যা বাইয়ের নাগপুর রোড, ও মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত "জামাই জাঙ্গাল" এইমাত্র প্রশস্ত পথ। বর্দ্ধমান জেলায় পুরী রোড, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড আরও দুইএকটী তদ্রূপ রাস্তা ছিল। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় তদ্রূপ সুপ্রশস্ত পথ না থাকিলেও অনেক পড়া-পতিত বড় বড় মাঠ ময়দান ছিল, তাহাদের মৃত্তিকা কঙ্করময়ী বলিয়া যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট ছিল না। বর্ষাকালে গ্রামপল্লী ও মাঠ ময়দানগুলি সাধারণতঃ জলে কাদায় পরিপূর্ণ হইত। শীত গ্রীষ্মকালে ধুলায় ভরিয়া যাইত, পথিকদের পথপর্য্যটনে বড়ই কষ্ট হইত। তাহার উপর প্রায় সকল মাঠেই দস্যুতস্করের আড্ডা থাকা প্রযুক্ত সর্ব্বদাই আপদ-বিপদের শঙ্কা করিতে হইত। এখন গ্রামে গ্রামে রোডশেশের রাস্তা হইয়াছে, গ্রামান্তর যাইবারও রাস্তার অভাব নাই। নগর হইতে নগরান্তর যাইবার জন্য লৌহবর্ত্ম (রেলপথ) প্রস্তুত হইয়াছে, জলপথে ষ্টিমার যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে ধনবানেরা পাল্কী চৌপালা চাপিয়া বহু অর্থব্যয়ে পথকষ্টের পরিহার করিতেন, আজিকালি সাধারণে যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ে তদপেক্ষা অধিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত বহু দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতে পারিতেছে। তীর্থযাত্রায় কতই কষ্ট ছিল। পথ এতই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল যে, যাত্রাকালে কেহই ফিরিবার আশা না রাখিয়া আপন বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। বিদায় দিবার কালে আত্মীয় স্বজনেরা অশ্রুমোচন করিতেন। পথে বাহির হইয়া পথিককে পায়ে নেকড়া জড়াইতে হইত, না জড়াইলে পা দুইখানি কাটিয়া রক্ত বাহির হইত। এখন যে গয়াক্ষেত্রে যাইতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগে না সে গয়াক্ষেত্র পনর যোল দিনেও যাইতে পারা যাইত না। খোরাকী খরচ কত লাগিত। কতই পথশ্রম সহিতে হইত। তাহার উপর নিত্য নূতন স্থণ্ডিলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া উদরাময়ে কত কষ্ট ছিল—কেহ কেহ প্রাণও হারাইত। দস্যুহস্তে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে ও কত লোককে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে হইত। এখন মনে করিলে পনর দিন মধ্যে সেতুবন্ধ দিয়া দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে সুখ বই দুঃখ অনুভব হয় না। দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ লইতে হইলে তথায় বহুব্যয়ে লোক পাঠাইতে হইত, তাহাতে কতই কায়িক কষ্ট ছিল। এখন দুইটী মাত্র পয়সা ব্যয়ে দুইদিন ঊর্দ্ধসংখ্যা চারি পাঁচ দিন মধ্যে ডাকযোগে

করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে তারে খবর লওয়া যাইতে পারে। সরকারী ডাক ও টেলিগ্রাফে এতই সুবিধা সাধন করিয়াছে। ঘরে বসিয়া ভারতের সকল স্থান যেন নখদর্পণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন সুবিধা ভারতে আর কোন সময়ে হইয়াছে কি? ইংরাজ রাজত্ব আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ইংরাজ রাজত্বেই হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইংরাজ শিল্পী কাপ্তেন উইলকিন্স সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া দিয়া শ্রীরামপুরের বাঙ্গালী শিল্পী পঞ্চানন কর্ম্মকারকে তাহা শিখাইয়াছিলেন। কাপ্তেন উইলকিন্সের দ্বারাই বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রচ্ছন্ন ভাবে বহুকাল লোকলোচনের অন্তরালে ছিল, তাহা প্রকাশিত-হইয়াছে! বাঙ্গালা সাহিত্যের কেমন সুখের দিন আসিয়াছে। এতদ্দ্বারা বাঙ্গালা পুস্তক প্রচার, সংবাদ পত্র প্রকাশ প্রভৃতি মহোপকার সাধিত হইতেছে।

সভ্যতা।—ভারত প্রাচীন সভ্য দেশ। ভারতের ষড়দর্শন, ভারতের কাব্যালঙ্কার, ভারতের কলা ও স্থপতি-বিদ্যা, ভারতের শিল্প জগদ্বিখ্যাত। প্রাচীন সভ্যতায় ভারত সর্ব্বাগ্রগণ্য দেশ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে সে সমস্তই প্রায় লয় প্রাপ্ত হইয়া নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আজি ইংরাজ রাজত্বে তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। ষড় দর্শনের সমাদর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অশন বসন ও ভূষণের পারিপাট্য জন্মিয়াছে। আপামর সাধারণ সকলেই ভাল খাইতেছে, ভাল পরিতেছে। আলাপ আপ্যায়নে কেহই অনিপুণ নহে। তবে কাহার কাহার মতে, তাহাতে বৈদেশিক ছাপ পাওয়া যাইতেছে। দেশকাল পাত্রের প্রভাব পরিহার করা সহজ সাধ্য নহে। কালধর্ম্মে যাহা হইবার তাহা না হইয়া থাকিতে পারে না। অনুকরণপ্রিয়তা বড়ই সংক্রামক। কালের সংস্রবত্যাগের যখন উপায় নাই তখন অগত্যা কালধর্ম্ম মহিমা সহ্য করিতে হইলেও সভ্যতার দোষ দেওয়া চলে না। আজিকালি ইংরাজ রাজত্বে যে সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা না বলিয়া থাকা যায় না। তাহাতে প্রকার ভেদ থাকে থাকুক।

কৃষি। ইংরাজরাজত্বে কৃষির উন্নতি হইয়াছে। যেরূপে যেদিক দিয়াই হউক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই একটী বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেই হইবে—

ছিয়াত্তর মন্বন্তরের (১৭৭০অব্দের দুর্ভিক্ষের) পর এদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমি অনেক দিন পতিত ছিল, এবং দশশালা বন্দোবস্তের সময় যে সকল জমি খামার পতিত ছিল, আবাদ হইত না, সে সকল জমি উত্থিত হইয়াছে। তখন টাকায় সাত আট মন ধান বিকাইত, প্রত্যেক বিঘার উৎপন্ন ধান্য ১৪ মন ধরিলে তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষক ২॥০ টাকা পাইত, আজি পাইতেছে ২৪॥০ টাকা। অবশ্য একথা মানিতে হইবে যে রাজকর পূর্ব্বে ছিল বিঘাপ্রতি ২৲ টাকা এখন হইয়াছে, ৪।৬ টাকা। তাহা বাদ দিলেও কৃষকের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লাভ দাঁড়াইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে কৃষকের পরিশ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। বিপক্ষবাদী বলিতে পারেন, কৃষকের বিলাসব্যসনে ব্যয়েরও বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কিন্তু তাহার লাঘব করাতো কৃষকের হাত। কৃষক যদি বিলাসব্যসনের দিক দিয়া না যায়, আপনার পিতৃপুরুষদের ন্যায় চালা ঘরে বাস করে, মৃত্তিকার পান ও ভোজন পাত্র ব্যবহার করিয়া কৌপিনধারী হয়, তাহা হইলে তাহারতো সঞ্চয় হয়, অল্প দিনেই ধনেশ্বর হইতে পারে। বিলাসব্যসনের দিকে অগ্রসর হওয়া না হওয়াত তাহার ইচ্ছাধীন। ভাল খাইবার পরিবার জন্যতো কোন রাজ নিয়ম নাই। তবে কেন সে বিলাসী হয়। তাহার জন্য কাহাকেও দোষী করা যাইতে পারে না। সুখদুঃখ মানুষের মনে—একজন কুটীরবাসী দরিদ্র দিনান্তে মুষ্টিমেয় অন্ন গ্রহণে আপনার সুস্থ স্বচ্ছন্দ পুত্রকলত্রাদি লইয়া সুখী—আবার প্রাসাদবাসী নরপতিও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদিতে সুখী নহে। ধনসঞ্চয়ে যাহারা সুখী হইতে চাহে তাহাদের বিলাসব্যসন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যে সকল কৃষক পিতৃপুরুষের চালচলন রক্ষা করিতে পারিতেছে তাহাদের গৃহ লক্ষ্মীর বিশ্রামাবাস না হইবে কেন।

ধর্ম্মচর্চ্চা। হিন্দুর ধর্ম্মালোচনাতেও আমরা প্রকারান্তরে ইংরাজকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ইংরাজ ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয়। সত্যের তথ্যানুসন্ধানে ইংরাজ সর্ব্বাগ্রগণ্য। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞানোপদেশের মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা বুঝিবার জন্য ইংরাজ যতটা ব্যাকুল আমাদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলে সেরূপ নহে। বেদোপনিষৎ ষড় দর্শন পুরাণ তন্ত্রাদির তত্ত্বালোচনায় এক একজন ইংরাজ প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, একথা আমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। বেদ পুরাণাদি আমাদের মহামূল্য সম্পত্তি, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে দুই

একজন মাত্র বেদোপনিষদে কৃতশ্রম দেখিতে পাই। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারও অভাব ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ভুল ভ্রান্তি মনুষ্য মাত্রেরই সম্ভব—তাহা স্বত্বেও তাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসার ও উত্তম উৎসাহের জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহারা আপন ভাষায় বেদের অনুবাদ করিলেন, বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রের উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহা দেখিয়া আমরা উদাসীন থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি আমাদের আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে কাহার কাহার আস্থা জন্মিল, অনেকেই তাহার আদর করিতে অভ্যাস করিলেন। ইংরাজ বিশেষ না দেখিয়া কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করেন না, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব ইংরাজ বলিলেন—গঙ্গাজলে কোন প্রকার রোগের জীবাণু নাই, অমনি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে গঙ্গাস্নানের আগ্রহ জন্মিল, এত দিনতো আমরা দেখিয়া আসিতেছিলাম গঙ্গার জল দীর্ঘকাল কোন আধার মধ্যে থাকিলে তাহার বিকৃতি জন্মে না, ইহা দেখিয়াও তো আমাদের আধুনিক শিক্ষিতেরা গঙ্গাজলে স্নান ও গঙ্গাজল পানের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তক্রপান সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে, আবার গোময়ের পূতিকারিতার কথা উঠিয়াছে। কালে তাহারও আদর হইবে, অমাবস্যা পূর্ণিমার রাত্রিতে যে গুরু ভোজন নিষিদ্ধ তাহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকেই তাহা পরিহার করিতেছেন। হিন্দুর সকল কাজেই ধার্ম্মাধর্ম্ম ও পাপ পুণ্যের দোহাই দেওয়া আছে। কালে হয় ত নবমীতে অলাবু ভক্ষণ অস্বাস্থ্যকর ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। এই জন্যই বলিতে হইতেছে—হিন্দু ধর্ম্মের সত্যানুসন্ধানে ইংরাজ আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। যোগ হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দু ঋষিগণ ইহার উদ্ভাবনকর্ত্তা—কিন্তু আজি আমরা থিওসোফিষ্ট (যোগ ধর্ম্মাবলম্বী) হইয়া ইংরাজের নিকট যোগাভ্যাস শিক্ষা করিতেছি। যেরূপে হউক, যাহাকে দিয়া হউক আমরা যোগাভ্যাসী হইতেছি। ইংরাজ যোগাভ্যাসের (থিওসোফির) পথ না দেখাইলে আমরা এখন যতগুলি থিওসোফিষ্ট হইয়াছি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কি ততগুলি যোগধর্ম্মাবলম্বী হইতাম ?

শিল্প। ভারতের সূক্ষ্ম শিল্প বহুকাল হইতে দেশ বিদেশে সমাদৃত। রোমের বণিকেরা কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কৌষেয় বাস এদেশ হইতে লইয়া গিয়া বহুমূল্যে আপনাদের দেশে বিক্রয় করিতেন। কাশীর স্বর্ণ সূত্র

খচিত বস্ত্র, কাশ্মীরি শালের কত আদর ছিল। সেই সকল শিল্প প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ইতোপূর্ব্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তাহা ব্যবহার করিবার সঙ্গতি ছিল না। ধনবানেরাই তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন! এখন তাহাদের ব্যবহার বাহুল্য প্রযুক্ত কাট্‌তি বেশী হইয়াছে। আজি কালি আমাদের এণ্ডি মট্‌কা, মানভূমের তসর, বহরমপুরের গরদ, ভাগল পুরের খেশ, তদ্ভিন্ন রাধাকান্ত পুর বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের কৌষেয় বাসের কতই রপ্তানি বাড়িয়াছে। কাঞ্চন নগর, বনপাশ, শাশপুর প্রভৃতি স্থানের ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য লৌহদ্রব্যের আদর হইয়াছে। খাগড়া, সোণামুখী, দেওয়ানগঞ্জ পাটুলি পাত্রসায়ের প্রভৃতি গ্রামে পিত্তল কাঁসার বাসন প্রভৃত প্রস্তুত হইতেছে। কৃষ্ণনগরের পুত্তল, বীরভূম ইলামবাজারের গালার ফুল ফল প্রস্তুত হইয়া বহু শিল্পজীবীর অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেছে। ধন ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের আদর বাড়িতেছে। এই সমস্তই ইংরাজ রাজত্বের ঐশ্বর্য্য।

বাণিজ্য।—"বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী" আর্য্য ঋষির উক্তি। এদেশেই বাণিজ্যোপজীবী বৈশ্যের বাস। অতএব হিন্দু যে বাণিজ্য করিতে জানিত ইহাই তাহার প্রমাণ। পুরাণেতিহাসে এদেশের লোকের বাণিজ্য-যাত্রার উল্লেখ আছে। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোন লক্ষণই ছিল না। তৎকালে বাঙ্গালীকে সকলেই বাণিজ্য-বৈমুখ বলিয়া জানিত। বঙ্গবাসী আলস্যে অবসন্ন ছিল। মুদিগিরিতেই আমাদের বাণিজ্যবৃত্তি চরিতার্থ হইত। অর্ণবপোতারোহণে বাণিজ্যযাত্রা দূরের কথা, বঙ্গোপসাগরের দিকে দৃষ্টিপাতে হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইত। বাঙ্গালীর বণিকবৃত্তির পরিচয় নামে যতটা পাওয়া যায়, কাজে ততটা নহে—গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিকেরা ঘরে বসিয়াই পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেন, সুতরাং ব্যবসায়ের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিত না। এদেশে যত জাতি বিদেশ হইতে বাণিজ্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া এদেশে ঐশ্বর্য্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। ইংরাজের সংস্রবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া এবং ইংরাজের অনুকরণ প্রয়াসী হইয়া এদেশের কয়েক জন লোক সার্থক হইয়াছেন। সেরূপ অনুকারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠিল কই। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতিগতি কিন্তু ভিন্ন পথে ধাবিত হইল, বাঙ্গালী অলসতায় হৃদয়াবদ্ধ

করিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের দিক দিয়া গেল না। যেমন রামগোপাল ঘোষ, শিব-কৃষ্ণ দাঁ, তারক নাথ সরকার প্রভৃতি মনিস্বীগণ ইংরাজের অনুকরণ দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ধনৈশালিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—তৎকালে আর কেহ তেমন করিতে পারিল কই। চাকরীর উত্তেজনাটা বাঙ্গালীকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল, এখন তাহার যৎসামান্য অবসাদে বাঙ্গালীর বাণিজ্যপ্রবৃত্তি নানা উপায়ে ইংরাজ জাগ্রত করিয়া দিতেছেন।

বাণিজ্যে দেশের ধন বৃদ্ধি হইয়াছে। টাকা সুলভ হইয়াছে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে। তাহাতেই কৃষিশিল্পের অবস্থা ফিরিয়াছে, মজুরি করিয়া মজুরেরাও মাসিক ছয় আট আনা বেতনের স্থলে সাত, আট, দশটাকা বেতন পাইতেছে। নিরক্ষর ভদ্র সন্তানেও ডকে ও কল কারখানায় কাজ করিয়া আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বাণিজ্য ব্যবসায় অনেকের মন ঝুঁকিয়াছে। ইংরাজ রাজ অনেক দিন হইতে আমাদিগকে কৃষি শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের প্রবৃত্তি দিয়া আসিতেছেন। কৃষিকালেজ ও শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন তাহার দৃষ্টান্ত। গবর্ণমেণ্টের আফিশে আদালতে অনেকদিন হইতে দেশীয় শিল্প দ্রব্যের ব্যবহার চলিতেছে ইংরাজ যে আমাদের শুভানুধ্যায়ী সে পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের উপযোগিতা।—খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পৃথিবীর ইতিহাসে উন্নতির যুগ বলিয়া কথিত। এই শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ভূমণ্ডলের সমস্ত জাতি অল্পাধিক উন্নতির দিকে অগ্রসর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির উন্নতি, ধনের উন্নতি, ধর্ম্মকর্ম্মের উন্নতি, সভ্যতাভব্যতার উন্নতি, সংক্ষেপতঃ সকল বিষয়েরই উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই উন্নতির জন্য লালায়িত দেখিতে পাইবে। এসময় ইংরাজ রাজের কৃপা না হইলে, ইংরাজ আমাদের উন্নতির জন্য অগ্রসর না হইলে আজিও আমরা কোল ভীলাদি অসভ্য জাতির কিছু উপরে থাকিতাম মাত্র

জীবনে মরণে।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আমি তোমার,"

"আমি তোমার!"

অধরে অধরে স্পৃষ্ট হইল।

একদিন সন্ধ্যাপগমে—তরুণ চন্দ্রালোকে—সংকীর্ণকায়ালসা তটিনীতীরে—অনিলহিল্লোল-স্পর্শসুখ-বিহ্বল-লতাকুঞ্জতলে প্রণয়ী যুগল প্রাণোৎসর্গের অভিজ্ঞান স্বরূপ এইমন্ত্র উচ্চারণ করিল।

দুর্ব্বল মানবের এই কঠিন সংকল্প শুনিয়া খরস্রোতা তটিনী কুল কুল করিয়া যেন হাসিয়া বহিতে লাগিল। কুঞ্জের অদূরে একটি তরুশাখায় পাপিয়া বসিয়াছিল,—সে যেন টিট্‌কারি দিয়া ডাকিয়া উঠিল। বিটপী পত্রান্তরাল হইতে মুখ বাড়াইয়া চন্দ্রমা যেন রহস্যের হাসি হাসিল।

যুবক বলিল,—"জীবনে মরণে!"

যুবতী বলিল,—"জীবনে মরণে!"

এইবার প্রাণ-বলিদান মন্ত্র উচ্চারিত হইল। ইহা শুনিয়া তটিনী যেন অস্ফুট স্বরে বলিল, "হায় হায়!" পাপিয়া বলিল,—"ছি ছি!"—সে কোথা উড়িয়া চলিয়া গেল। একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ আসিয়া চন্দ্রমার বদন হইতে হাসি মুছিয়া লইল।

যুবক এবার আবেগভরে বলিল, "সমীরা আমার কি আছে, যাহা তোমার অলোকা রূপরাশির পদে অঞ্জলি দানে আমাকে ধন্য বলিয়া মানি। আমি দরিদ্র, এ জগতে আমার মত দরিদ্র বোধ হয় আর কেহ নাই! আমি কুটীর-বাসি—আমাকে ভগবান যদি এই বসুন্ধরার সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিতেন, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্য্য তোমায় ডালি দিয়া আমি তোমার পদে বিকাইয়া রহিতাম!—হায় অদৃষ্ট!"

যুবক তাহার বিশালবক্ষ স্পন্দিত করিয়া একটি জরাগ্রস্ত সুদীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

যুবতী যুবকের ক্ষীণ চন্দ্রকরোজ্জ্বল ম্লান মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"কিসের ঐশ্বর্য্য—কিসের ধনসম্পদ! যে হৃদয়ে প্রেমের আসন—সে হৃদয়ের এক কণার সহিত তুলনায় পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন তুচ্ছ। রূপেশ! আমি কিছুই চাহি না—

চাহি মাত্র তোমার হৃদয়। ঐ দেখ নীল নভোসরোবরের ফুল্লকুবলয়দল তারকা রাজীর পবিত্র হাসি। ঐ দেখ মলয়হিল্লোলের সুখবিলাসস্পর্শ। ঐ দেখ, স্রোতস্বিনীর কুল কুল স্বরে মধুর মঙ্গলগীতি! প্রকৃতিসতী হাসিমুখে যেন আমাদের উভয়ের গলায় মালা পরাইয়া দিতে তাহার কমনীয় কর উত্তোলন করিয়াছে। এজগতে আমাদের মত সুখী কে?"

সমীরার মুখে এই কথা শুনিয়া রূপেশ যেন একটু চঞ্চল হইল, বলিল, "সমীরা তোমার যেরূপ উন্নত হৃদয় তুমি সেইরূপ বলিবে। কিন্তু হায়! তোমার এই অতুল রূপরাশি রাজরাজেশ্বরের স্পৃহনীয়। তোমাকে পাইবার আশা এ ভাগ্যহীনের দুরাশা মাত্র!"

সমীরা রূপেশের মুখের প্রতি আকুলদৃষ্টিতে কহিল, "কেন রূপেশ, তুমি বার বার ঐ কথা বলিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা দাও। আমি জগতের ধনরত্ন পদে দলিত করিয়া তোমাকে লইয়া সুখী—সে সুখে এ কাল্পনিক অন্তরায় কেন?"

রূপেশ কহিল, "জান না সমীরা, জগতে থাকিতে গেলে অর্থ চাই—অর্থ না হইলে মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। আমার যদি ধন থাকিত, আমি তোমাকে রত্নের আভরণে মুড়িয়া দিতাম। শত শত দাসদাসী তোমার ইঙ্গিতে চলিত ফিরিত। তোমার ঐ সুকোমল চরণকমল ভূমিস্পর্শ করিতে দিতাম না। কিন্তু হায়! আমি হতভাগ্য! আমার হৃদয়ের আশা মধ্যাহ্নের ক্ষীণ ক্ষণপ্রভাসম পলকে দেখা দিয়া পলকে মিটাইয়া যায়।"

সমীরার কবরীতে একটি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ শোভা পাইতেছিল। সেই গোলাপের প্রতি রূপেশের দৃষ্টি পড়িল। রূপেশ দেখিল, সমীরার কপোলের অরুণ আভার কাছেসে গোলাপ হীনপ্রভ! ভাবিল সে গোলাপের কমনীয় স্পর্শ সমীরার সুধাময় অধরের স্পর্শের তুলনায় সামান্য, রূপেশ কি আবেগ ভরে অনুরাগোদ্দিপ্ত বদনে উন্মত্তের প্রায় সমীরাকে বাহুবেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া কহিল, "না না সমীরা কিসের ধন? কিসের রত্ন? তোমাকে পাইতে আমি এ ধরার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের পদকেও উপেক্ষা করি। এ জগতে আমার মত ভাগ্যবান কে?"

হায়! চঞ্চল মানব বুদ্ধি!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কন্দর্পের ঘটকালী ও প্রজাপতির মধ্যস্থতায় রূপেশের সহিত সমীরার বিবাহ হইয়া গেল। বাহ্যজগত ও অন্তর্জগতে মিলন সংঘটিত হইল। বিবাহের পর বিধাতা দম্পতিযুগলকে নন্দনকাননসুশোভিত স্বর্গ হইতে নামাইয়া, এই কঠিন মৃণ্ময় ধরিত্রীতে আনয়ন করিয়া সহরের নিকটস্থ কোন নির্জ্জন পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহে স্থান দান করিলেন। উভয়ে সংসারের শত অভাবরাশিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে চারি পাঁচ মাস কাটিতেই অদৃষ্টচক্রের অব্যর্থ গতিপ্রভাবে সহসা তাহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল।

সমীরা তাহার অপুত্রক জ্যেষ্ঠ তাতের মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠতাতের উইল অনুসারে তাঁহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইল। এখন আর তাহারা দীন দরিদ্র নহে—তাহারা সহরের ধনবাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইতে চলিল। সমীরা ভাবিল, স্বামীর সুখস্বপ্ন সফল হইয়াছে, আর তাহাকে দারিদ্রদুঃখক্লিষ্ট-মলিনবেশধারী সামান্য লোকের মত পথে পথে বিচরণ করিতে হইবে না।

কথা সত্য। সহরের নগণ্যপল্লীর একপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্ত্তে আজ হাস্তলাস্ত বিলাসোন্মত্ততা অট্টালিকা ; জীর্ণ ছিন্ন মলিন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে অতি বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত পোষাক পরিচ্ছদ, দুই গাছি কাচের বলয়ের পরিবর্ত্তে চুনী-পান্না-নীলা-মণি-মুক্তা-হীরকখচিত নানা বহুমূল্য আভরণ পুতিগন্ধময় প্রাচীন পল্লীর বায়ু বিষাক্ত, তাহার পরিবর্ত্তে চম্পক-টগর-গোলাপ-বেল-জাতি যুথী-মল্লিকা-কুঙ্কুমের পরিমলবাহী গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোল, এবং সর্ব্বোপরি ধূলিকর্দ্দম-গ্রস্ত পদব্রজের পরিবর্ত্তে তকমাপাগড়ী পোষাকসজ্জিত সহিসকোচম্যানশোভিত স্তাবাব্যান ল্যাণ্ডো-ফিটন বগী এবং আরও সুখ সচ্ছন্দের নিদান ভূত কত কি উপকরণ কৃপাপরবশ ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদিগকে উপহার দিয়াছেন। সমীরা উল্লাসবিকশিত নয়নে ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে ধন্যা মনে করিল। সে একাকিনী চিন্তা করিতেছিল, তাহার হৃদয়ে অজ্ঞানিত আনন্দের তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়কে স্পন্দিত করিতেছিল. সেই অজ্ঞাত সুখ তরঙ্গাঘাত একটু একটু চঞ্চল হইতে ছিল, দুই একবিন্দু স্বেদ জল মুক্তফলের ন্যায় ললাটেও শোভা পাইতে ছিল। সমীরার এ অবস্থা সুখদুঃখহীন মানবের অবস্থার অনতি উচ্চে। এ অবস্থা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষার বিকাশের।

এরূপ সময়ে রূপেশ গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার বদনমণ্ডল চিন্তার মলিন রেখাঙ্কিত যেন ছায়াবৃত। রূপেশ প্রবেশ করিতেই তাহার পদশব্দে সমীরা অল্প চমকিয়া উঠিল। রূপেশের প্রতি চাহিয়া তাহার বিষাদ কালিমাময় মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রূপেশ। তুমি এত বিষণ্ণ কেন ?"

রূপেশ নিরুত্তর। সে সমীরার মুখের পানে অর্থহীন এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সমীরা পুনরপি জিজ্ঞাসিল। "রূপেশ! তোমার কি হয়েছে ?—নিরুত্তর কেন! আনন্দের দিনে এত মলিন কেন ?" রূপেশ বহুক্ষণ সঞ্চিত একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ আনন্দের দিন নয় সমীরা, এদিন এই নিরন্ন জীর্ণ শীর্ণ মলিনবসন পরা পথশ্রমে ক্লান্ত নিশ্চিন্ত পরম সুখী রূপেশের মৃত্যুর দিন !"

সমীরা রূপেশের মুখে এই দারুণ হতাশ ধূমময় হৃদয়ের করুণ উক্তি শ্রবণে স্তম্ভিতা হইয়া গেল।

রূপেশ বলিতে লাগিল, "না, না, তাহা হবে না সমীরা। আমি সেই মৃত্যুর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিব।" এই বলিয়াই সমীরার দুটি হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "সমীরা—আমার হৃদয়েরএকমাত্র অধিষ্ঠাত্রী জাগ্রত দেবতা সমীরা তুমিই সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্র তুমি আমায় রক্ষা কর। এ ঐশ্বর্য্যে কাজ নাই। তুমি ইহা প্রত্যাখান কর।"

সমীরা রূপেশের মুখে এই অচিন্ত্য অনহুমেয় প্রস্তাব শ্রবণে একেবারে প্রস্তরী-ভূত মুখ স্বপ্নবৎ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "কেন রূপেশ আমরা যখন কপর্দ্দকহীন নিস্ব ছিলাম, তখন তুমি ত বলিতে অর্থ নহিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা মানুষের আশা কামনা বাসনা কিছুই পূর্ণ হয় না। আজ তোমার এ ভাব কেন ?"

রূপেশ কহিল, "জগতে সুখ সচ্ছন্দ লাভ করিতে অর্থের প্রয়োজন নিশ্চিত। কিন্তু এরূপ অর্থ নয়। তোমাকে অপরের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবতী হইতে দেখিবার কামনা আমার নাই। আমার অর্জ্জিত অর্থে তোমাকে সুখী দেখিতে পাইলে আমার সুখ হইত। যেন এ অর্থ আমার পক্ষে বিষতুল্য। আমি নির্ব্বন্ধ সহ-কারে বলিতেছি, তুমি এ প্রলোভন ত্যাগ কর। তুমি যদি আমাকে চাও ত এ অর্থকে লোষ্ট্রবৎ তোমাকে পদদলিত করিতে হইবে। তুমি যদি এই অর্থ চাও ত আমার আশা ত্যাগ কর।"

সমীরা একটু বিরক্তি সহকারে কহিল, "যে অর্থের জন্য তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াছ, আজ তুমি ঈশ্বরের কৃপায় অনায়াসে সেই অর্থ পাইয়া তাহা

উপেক্ষা করিতেছ। তুমি বিচিত্র মানুষ।”

রূপেশ উপেক্ষার হাস্যে, বলিল “এই মূল্যহীন, বিনাপণেক্রীত অর্থ রূপেশ গ্রহণ করিবে? দরিদ্র রূপেশের হৃদয় এত হীন নয়। রূপেশ ক্ষণিক আবেগে সমীরাকে বাহুবেষ্টনে তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, “সমীরা, আমার আশা ভরসা জীবন মরণ সমীরা। একদিকে অর্থ আর অপর দিকে আমি। তুমি ইহার কাহাকে চাও!”

সমীরা কি জানি কেন রূপেশের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে চক্ষু মুদিত করিয়া তাহার বাহুদ্বয়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

রূপেশ কহিল, “সমীরা উত্তর দাও—উত্তর দাও, বল বল – তুমি অর্থের কি আমার। রূপেশ বার বার এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেও সমীরা সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। বোধ হয়, তখন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া থাকিবে। সমীরার মুদিত নয়নের প্রান্ত দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

চাঁদের হাসি দেখিয়া ক্রোড়স্থ শিশু তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়ায়; ফোটা ফুল দেখিলে যুবকযুবতী বৃদ্ধের মন আকৃষ্ট হয়; কিন্তু হায় অর্থ! তোমার মহীয়সী মোহিনী শক্তির তীব্রতা বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল! নহিলে হিংস্র জলজীব সমাকীর্ণ অন্ধকারময় গুহ্য সাগরকুক্ষিতে কমলাকর্ত্তৃক অতি যত্নে লুক্কায়িত মুক্তা-রাশির অনুসন্ধান করিয়া মনুষ্য তাহা লাভ করিতে মৃত্যুর পদে অনায়াসে প্রাণ উৎসর্গ করিবে কেন? নহিলে বর্ব্বর মানবের বাসস্থান—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক হায়েনা প্রভৃতি শ্বাপদসঙ্কুল মরুময় আফ্রিকার বালুকাতলে লুক্কাইত কমলার শ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডারের অনুসন্ধান পাইয়া বলদৃপ্ত মনুষ্য তাহা লাভ করিতে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেই শুভ্র মরুবক্ষে শোণিতনদী প্রবাহিত করিবে কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমীরা প্রকৃতিস্থা হইয়া যখন নয়ন উন্মিলীত করিল,—দেখিল, রূপেশ সেখানে আর নাই,—চলিয়া গিয়াছে। ভাবিল, এখন থাক্—আর এক সময়ে ভাল করিয়া তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিব।

নিকটস্থ দাসদাসীকে রূপেশের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "তিনি এইমাত্র উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতপদে কোথায় চলিয়া গেলেন।"

অনুসন্ধানের জন্য তৎক্ষণাৎ চারিদিকে লোক পাঠান হইল। কিন্তু কেহই তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ক্ষণেকের জন্য এই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী ধরণী যেন সমীরার নয়নে ঘোর তমসাচ্ছন্না বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

অল্পক্ষণ পরে সেই ঘোর কাটিল। তখন তাহার মনের দ্বারে সান্ত্বনা রূপসী বিতর্ক মহাশয়কে অগ্রে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

সমীরা ভাবিল, যে অর্থ পাইবার জন্য সংসারের লোক লালায়িত হইয়া অহরহ ছুটাছুটি করিতেছে, সেই অর্থ ত্যাগ করিব! কেন ত্যাগ করিব?' এই অপ্রার্থিত অর্থ আমার পূর্ব্বজন্মের কোন পুণ্যফলে আমার অঙ্কে পতিত হইয়াছে! আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না—তাহাকে যত্নে পালন করিব,—আদরে পোষণ করিব। তাহার সুখে আমার সুখ, আমার সুখে তাহার সুখ। আমি রূপেশকে বুঝাইব, সে বুঝিবে, যে এ সংসারে থাকিতে হইলে অর্থ না হইলে চলে না। মানে অর্থ, সম্ভ্রমে অর্থ, সম্পদে অর্থ, বিপদে অর্থ, জীবনে মরণে অর্থের সমান প্রয়োজন। অর্থের বাগুড়াবেষ্টনে মানুষ না থাকিলে সংসারে অনেক সুখ দুঃখে পরিণত হয়! তবে সে অর্থ আমি পাইয়া প্রত্যাখ্যান করিব—কখনই নহে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সমীরার প্রাণে,—তাহার কমল কলেবরে যেন একটা অবসাদের ভাব উপস্থিত হইল। সেই অবসাদের পশ্চাতে তন্দ্রা। তন্দ্রাভিভূতা সমীরা স্বপ্নে দেখিল, সে যেন কোন অমানুষ শক্তিবলে পক্ষলাভ করিয়া কোন দেশের কোন কাঞ্চনময় পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহন করিয়াছে,—সেখানে তরুলতায় ফলফুল সব হীরা মুক্তা মাণিক; সেখানে যেন চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় তরল হীরকের ধারা-রবির দীপ্তিতে কেবল সোণার ফোয়ারা। সমীরা দেখিল, সেই পর্ব্বতের গাত্র স্পর্শ করিয়া সোণার মেঘে চড়িয়া সোণার গড়া অপ্সরী কিন্নরী সব উড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের গানে হাসিতে মণিমাণিক্য মুক্তা ঝরিতেছে, দেখিতে দেখিতে কে যেন তাহার পশ্চাৎদেশে দাঁড়াইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া সেই পর্ব্বত হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সমীরা যেন পর্ব্বত হইতে গড়াইতে গড়াইতে কোন অন্ধকারময় সমুদ্রে পতিত হইল। সে ভয়ে চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "রূপেশ! রূপেশ!"

সমীরা নয়ন উন্মীলিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিল সেখানে কেহই নাই। হায় কোথায় রূপেশ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বহু অর্থব্যয়ে দেশ দেশান্তরে লোকজন পাঠাইয়াও রূপেশের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সংবাদপত্রে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। সমীরার মনে সর্ব্বদাই রূপেশের চিন্তা প্রবলা থাকিলেও অর্থের মোহে সময়ে সময়ে সে চিন্তার মূর্ত্তি যেন চিত্র পট হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িত। বিপুল অর্থ, রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা। প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যেন ঐশ্বর্য্যের জোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। সুখসম্পদ-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিয়া যাইয়া যেন সমীরার শ্বাসরোধ হইতে লাগিল। বুঝি এ সুখ সহে কি না?

সমীরার গৃহে মধুলোলুপ মক্ষিকার ন্যায় বহু লোকজনের সমাগম হইতে লাগিল। যে আসে সমীরা তাহাকেই অতি যত্ন ও আদর করিয়া থাকে; মূল্যবান উপহার উপঢৌকনাদি দ্বারা তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে। এই সদ্ব্যবহারে সকলের মুখেই সমীরার দানশীলতা ও সদ্ব্যবহারের প্রশংসা, দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর হিমময় হস্ত যে স্থানে পতিত হয়, সমীরার ঔদার্য্য ও দানশীলতার উত্তাপ সেই স্থানে পতিত হইয়া তাহাকে সজীব করে।

এইরূপে দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায় রূপেশের সন্ধান মিলে না। দুই-বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এই দুই বৎসরে সমীরার মনে ভাবান্তরের রেখা পাত হইয়াছে। সুবর্ণ মণিমাণিক্যের চাকচিক্যে তাহার নয়ন আর ঝল্‌সিয়া যায় না। যৌবনে শিশুর খেলনার বস্তুর ন্যায় পরিত্যক্তা হইয়াছে। সদা হাস্যমাখা অধর যেন বিষাদের কালিমাঙ্কিত। বিলাস-লালসা সূর্য্যোদয়ে তমসার ন্যায় কোথায় লুকাইয়াছে! সমীরা এখন সর্ব্বদাই একাকী থাকিতে ভালবাসে। সে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে চায় না। কেহ দেখা করিতে আসিলে দেখা দেয় না। এত বৈভবের সংসার তাহার নিকট যেন মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আর দাসদাসী নাই,—গৃহ নির্জ্জন। এক কথায়, সমীরা এখন যেন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী।

তিন বৎসরের পর একদিন সমীরা দীনার বেশে একজনমাত্র দাসী সমভিব্যাহারে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইল। তীর্থ-পর্য্যটনে যাইবার আগে তাহার সমস্ত সম্পত্তি দীন দরিদ্রের সাহায্যার্থ দান করিয়া গেল। তাহার অট্টালিকা

আতুরাশ্রমে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইল।

কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, হরিদ্বার প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর শেষে সে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃন্দাবনে যমুনার ধারে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ বটিকা তাহার আশ্রয় হইল।

সমীরা একদিন সন্ধ্যার পর পূর্ণচন্দ্রালোকে যমুনার ধারে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, আর দুনয়ন দিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বক্ষ ভাসাইয়া বাহিয়া যাইতেছিল। তখন যেন বোধ হইতে ছিল, কোন অজানিত দেশের সূক্ষ্ম-কায় জীবের কোন জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রশুচি স্বপ্ন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "রূপেশ! রূপেশ!" এই স্বরে সেই নির্জ্জন স্থানের ধীর সমীরণ যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। শত চন্দ্র শোভিত যমুনার নীল জল রাশি যেন তর তর বাহিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল। অদূরে কোন পাখী বৃক্ষ-শাখা হইতে যেন "হায় হায়" করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

সমীরা যমুনার দিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিল কি? দেখিল ঐ যমুনার জলে বক্ষ নিমজ্জিত করিয়া—ঐ রূপেশ, ঐ—ঐ—ঐ দাঁড়াইয়া। দেখিল, চন্দ্রালোকে পূর্ণোদ্ভাসিত প্রফুল্ল বদন অপরূপ তেজপুঞ্জ বেষ্টিত বপু ঐ রূপেশ, ঐ—ঐ—ঐ দাঁড়াইয়া। সমীরা উন্মত্তার ন্যায় হাত তুলিয়া যমুনার জলে নামিতে লাগিল এবং বলিল, "ওই যে—ওই যে তুমি এসো—এসো—এসো—আমার হৃদয়েশ্বর, আমাকে হৃদয়ে লইয়া আমার এই সন্তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া দাও। আর আমাকে পদে ঠেলিও না। দেখো আমি যে দীনা ছিলাম, আবার সেই দীনাই হইয়াছি। আর তোমার অভিমান কিসের? এ দীনাকে তোমার ঐ পদপ্রান্তে স্থান দান করিয়া চরিতার্থ কর।"

ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে সমীরা সেই মূর্ত্তিকে দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাহার আলিঙ্গন আশে যমুনার জলে নামিতে লাগিল। ধীরে, ধীরে, ধীরে রূপে-শের তেজোময় মূর্ত্তি সমীরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে পরে যেন সমীরা রূপেশের অঙ্গে মিশিয়া মিলাইয়া গেল।

কই কোথায় সমীরা—কোথায় রূপেশ! তাহাদের সেই মিলন,—সেই সমীরণশ্বিত পূর্ণ চন্দ্রালোকে দীপ্ত যমুনার জলে সেই মধুর মিলন আর কেহ দেখিল না!

দেখিল প্রকৃতি—তাই যেন প্রকৃতি হাসিয়া পিককুলকে কলধ্বনি দিতে ইঙ্গিত করিল। পিককুল ডাকিয়া উঠিল, "জীবনে মরণে" যমুনা কলঁ কলকলে গাহিল, "জীবনে মরণে"।

চন্দ্রাকরের রজতাক্ষরে নীলিমা আকাশপটে অপরূপ সৌন্দর্য্য লেখা ফুটিয়া উঠিল, "জীবনে মরণে।"

কান্তা।

স্ত্রীশিক্ষা।

অনুবাদক- -শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

নিবেদন। সহৃদয় পাঠকপাঠিকা ও সমালোচকবৃন্দের নিকট নিবেদন এই যে, এই অনুবাদের ভাষা অনেক স্থানে ভাল হয় নাই, তাহার কারণ অনুবাদকের এইটি প্রথম উদ্যম, আলোচ্য বিষয়টিও কঠিন। তথাপি এ বিষয়ের উপকারিতা বুঝিয়া নিজের অক্ষমতাসত্তেও এই কর্ম্মে সাহসী হইয়াছি। আশা করি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মদীয় উদ্দেশ্য বুঝিয়া অনুবাদগত সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

(পূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করানন্দ কর্ত্তৃক হিন্দিভাষায় লিখিত 'কান্তা' নামক স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ।)

জগত জপে জগদীশ, আমি ভজি ভগবান। (১)
ভেদ্ব, উপাধি ভেদ মাত্র বস্তু একই সমান॥ (২)

দিল্লি নগরীর নিকটবর্ত্তী রেওয়াড়ী নাম্নী অনতি প্রশস্ত নদী উপকণ্ঠে মহেন্দ্র-

(১) ভগবান—প্রবন্ধোক্ত শব্দের অর্থ "পতি"।
(২) অর্থ অভিন্ন—Identical, same.

গড় নামে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। জনপদটি এখনও বর্ত্তমান আছে ; তবে সে পূর্ব্বশ্রী নাই। জনপদস্থিত কোন এক পল্লিতে "চতুরা" নাম্নী এক রমণী বাস করিতেন। চতুরা শিক্ষিতা, পরন্তু নম্র এবং সুশীলা ও গৃহকার্য্যে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। তাঁহার বাটীতে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে, তাঁহারা চতুরার আন্তরিক সেবা-সৎকারে পরম প্রীতি ও পরিতোষ লাভ করিতেন। এক কথায় বলিতে গেলে, চতুরার গুণ ও কর্ম্ম তাঁহার নামের অনুরূপ হইয়াছিল। তাঁহার বিচারশীলা ও সারগ্রাহিণী বুদ্ধি স্ত্রীমণ্ডলীতে বিশেষ প্রশংসিত হইত। তিনি নিজ পিতামাতা, শ্বশুরশাশুড়ী ও স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও কথায় বড় বিশ্বাস রাখিতেন না। প্রতিবেশিনীরা সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যাদি ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিত। এবম্বিধ গুণবতী ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার প্রকৃত নাম এক-রকম চাপা পড়িয়া "চতুরা" নামেই তাঁহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া-ছিল। কি তাঁহার পিত্রালয়ে কি শ্বশুরালয়ে, কি প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কেহই ইহাঁকে কাহারও সহিত রুক্ষব্যবহার করিতে বা কাহারও মনোকষ্টের হেতুভূত হইতে দেখেন নাই। অধিক কি তাঁহার দ্বারা যে উহা সম্ভব তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। চতুরা নিরন্তর "পতিসেবা কার্য্যে" ও নিজ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকি-তেন। সদাই প্রসন্নবদনা ও হাস্যমুখী, তাঁহার পাতিব্রত্য ও সেবাতিশয্যে তিনি পতিরও অতিশয় অনুরাগ ও প্রীতিপাত্রী হইয়াছিলেন।

যে পল্লিতে চতুরা বাস করিতেন, তাহার সন্নিকটস্থ আর এক পল্লিতে সরলা নাম্নী অপর এক রমণীর পিত্রালয় ছিল। সরলা যুবতী। ২।৩ বৎসর হইল সাজাহানপুরে বিবাহ হইয়াছে। কয়েকদিন হইল, প্রথম শ্বশুরঘর করিয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে। শ্বশুরঘর করিতে গেলে, কাহার প্রতি কি প্রকার আদর, সম্ভাষণ ও ব্যবহার করিতে হয়, সরলা নবযুবতী হইলেও তাহার এ সব বিষয়ে বড় অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য তাহার শাশুড়ী তাহাকে সদাসর্ব্বদা ব্যবহারিক বিষয় ও গৃহকার্য্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। শাশুড়ীর ইচ্ছা বধূ সুশিক্ষা লাভ করে। বধূও শাশুড়ীর উপদেশ মান্য করিত ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে আগ্রহ রাখিত।

পিত্রালয়ে আসার পর কোন প্রসঙ্গে সরলাকে চতুরার পল্লিতে আসিতে হয়, এবং সেইসময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সুবিধা পাইয়া সরলা ধর্ম্ম ও গৃহস্থা-শ্রম সম্বন্ধীয় কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। চতুরা বলিল, "দেখ ভগ্নি, আমা-

দের ভার্গববংশে আমার এক গুপ্ত শিক্ষক আছেন। তিনি আমার বন্ধু এবং আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। ইঁহার নাম "শ্রীকান্তা"। কিছু শিখিতে হইলে তাঁহার নিকটেই উপদেশ লওয়া উচিত।"

সরলা। তিনি কে?

চতুরা শ্রীকান্তা ও সরলার সম্পর্ক অবগত ছিলেন। পরিচয় দিলে সরলা বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকান্তা তাঁহার আত্মীয়া ও গুরুস্থানীয়া।

সরলা। তবে চলুন, তাঁহার কাছেই যাই চলুন।

চতুরা। একটু অপেক্ষা কর, খবরটা আনাই।

চতুরা লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন, এবং নির্দ্ধারিত সময়ে উভয়ে কান্তা-দেবীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অভিবাদন ও আদর অভ্যর্থনার পরে সরলা অবসর পাইয়া কান্তাকে বলিলেন;—

সরলা। আপনি আমাদের মধ্যে শিক্ষিতা ও গুণবতী। দুই কুলেরই শোভাস্বরূপ, ঈশ্বরানুগ্রহে আপনি অনুভবী ও বিদ্বান পতিলাভ করিয়াছেন।—আপনার দাম্পত্যধর্ম্ম ও সুশীল স্বভাব সুপ্রসিদ্ধ। আপনি গৃহস্থাশ্রমের কার্য্যে কুশলা এবং চতুরাদিদির মত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতীর শিক্ষাগুরু। আপনার সৎগুণের কথা আমি চতুরাদিদির কাছে সমস্ত শুনিয়াছি এবং আপনার উচ্চ বংশ গৌরবের কথাও অবগত হইয়াছি। আর ইহাও জানিয়াছি যে, আপনি আমার সম্পর্কে শ্রেষ্ঠা। সেই জন্যই আপনার উপর আমার কতকটা দাবী আছে। আমি অল্পস্বল্প লিখিতে পড়িতে পারি, এবং তজ্জন্য নিজেকে স্ত্রীশিক্ষার অধিকারিণী মনে করি। আমার মিনতি এই যে আপনি আমায় কিছু হিতশিক্ষা দিন।

কান্তা। দেখ, ব্রহ্ম-মায়া বল, পুরুষ প্রকৃতি বল, জীব-অজীব বল, চেতন জড় বল, ঈশ্বর শক্তি বল, কিম্বা পুরুষ ছায়াই বল, এই দুই হইতেই সমস্ত সংসার। এই দুই হইতেই যাবতীয় ব্যবহারিক দৃশ্য অদৃশ্য পদার্থ। আমি তুমি এবং এই সমগ্র জগৎ এই দুই হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়, এবং অন্তে সকলকেই ঐ দুয়েতেই লয় হইতে হইবে।

আমি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যোগ্য শিক্ষা-প্রণালীর অভাব বশতঃ যে প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত, তাহা পাই নাই। তথাপি আমি মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃজায়া, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি ও সঙ্গিনীদের নিকট যাহা

শিখিয়াছি, বা পুস্তকে পড়িয়াছি, শিক্ষকের কাছে পাইয়াছি ও পরীক্ষাদ্বারা জানিতে পারিয়াছি এবং আমার সাক্ষাৎ, ভগবান্ স্বামীর নিকট যাহা উপদেশলাভ করিয়াছি, তদনুযায়ী এবং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি, তদ্রূপ উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দেখ, ভগ্নি, সত্য কথা বলিতে কি স্ত্রী-স্বভাব বড় বিচিত্র, এবং সেই জন্যই আমার মনে হয়, যে, যদি আমি আপনা হইতে বলিতে থাকি, তাহা হইলে উহার মধ্যে হয় ত কতকগুলি বিষয় তোমার অপ্রিয় হইতে পারে। তাহা হইতে, তোমার যে যে বিষয়ে শঙ্কা আছে বা যাহা তোমার জিজ্ঞাস্য আছে মনে কর, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আমি নিজ শক্তি, বুদ্ধি ও অনুভব অনুযায়ী তাহার সমাধান ও উত্তর দিতে যত্ন করিব।

সরলা। আমাদের স্ত্রীজাতির এ অধম পরতন্ত্রতা কেন? আর এই পরাধীনতা-

(১) রূপ কুপ্রথা কি উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে? এবং যদি ইহার নিবৃত্তি না হয়, তাহ'লে তো স্ত্রীজীবন একটা কারাগার স্বরূপ হইল, তা এ কারাগারে আসিবার কারণ কি?

কান্তা। দেখ, ভগ্নি, এই অধীনতা যে কেবল তিরস্কারযোগ্য, তাহা নহে। স্ত্রী-জাতি যদি নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, স্ত্রীজীবন রাজা এবং মহাত্মা হইতেও অপেক্ষাকৃত ভাল। বিবেচনা করিয়া দেখ, সমস্ত পুরুষ তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নানাবিধ দুঃখ ক্লেশ পাইতেছে। অন্যের দাসত্ব করিতেছে। শুধু তাই নয় জীবিকার জন্য বিবিধ ছল কপট, দাগাবাজী, ফেরাবী, চুরি ডাকাতি এবং মিথ্যাকথা প্রভৃতি দুষ্ট কর্ম্ম করিয়া পাপের বোঝা বাঁধিতেছে, তাহার ফলে, ইহজন্মে দুঃখ পাইতেছে ও পরজন্মে নরকগামী হইবে। হায়! কি কষ্ট! একজন অপরের মনে কষ্ট দিয়া ঠকাইয়া পাপ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ অর্জ্জন করিয়া ক্লেশ পাইতেছে, তথাপি নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া কেমন বুক ফুলাইয়া হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। হায়! পুরুষদিগের কি নিলর্জ্জতা! সাধারণ পুরুষ মাত্রেরই এই দশা জানিবে।

এ দিকে রাজাদের স্থিতি বিচার করিয়া দেখ, কর্ত্তা যদি সংসারপালক না হন, তাহা হইলে তাঁহার অপকীর্ত্তি বা নিন্দার ভয় (দুঃখ) থাকে, এবং নানারূপ দুঃখ থাকে। অন্যায়কারী হইলে পাপের ভাগী হইতে হয় ও মানসিক দুঃখভোগ

করিয়া কালাতিপাত করিতে হয়। কর্ত্তা যদি ন্যায়বান ও মিতব্যয়ী হন তাহা হইলে অপর কোন দুঃখ না থাকে তো, দিবারাত্র সংসারপালনের চিন্তায় কাল যাপন করিতে হয়। ইহাঁদের যদিও অন্নকষ্ট থাকে না, তথাপি নানাবিধ দুঃখ-ভোগ করিতে হয়।

সাধুজনের কথা বলি শোন ;—ইহাঁরা অপর সমস্ত প্রবৃত্তি শূন্য হইয়া ভগবানের ভজন ধ্যান, জ্ঞান এবং ভগবৎ আনন্দে মগ্ন থাকেন, ইহাঁদেরও অন্নচিন্তা থাকে। কারণ যদি উদরপূর্ণ না থাকে তাহা হইলে, জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান তো দূরের কথা প্রভুর নাম পর্য্যন্ত স্মরণ হওয়া কঠিন। বাসনা রহিত, পূর্ণকাম শরীরেও কোনপ্রকার মমতা রাখেন না এবং কেবল কন্দমূল খাইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, এরূপ সাধু পুরুষ তো দৃষ্টিগোচর হয় না। অথবা যদি কেহ এরূপ আছেন, মনে কর তো তাঁহাদের শরীর অল্পকাল মধ্যেই ধ্বংশ হইয়া যায়। কিন্তু ইহারাও সংসার সেবার ঋণী হইয়া দেহ রক্ষা করিলে, পুনশ্চ জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হন। এই ত গেল উত্তম সাধুপুরুষদের অবস্থা। আর যাহারা অজ্ঞান, আলস্য বা স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সাধুবেশ ধারণ পূর্ব্বক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারা তো সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষাও পতিত। তাহাদের চর্চ্চা এ স্থানে নিষ্প্রয়োজন।

এইবার যদি নারীজন্মের বিচার কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে উহা কি প্রকারে উপরোক্ত পুরুষদিগের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখ, স্ত্রীলোকদিগের উদর পূরণ করিবার চিন্তা নাই। এই জন্য তাহাদের ছলকপট প্রভৃতি অন্যায় ও দুষ্টকর্ম্ম করিবার অবসর হয় না এবং তাহার আবশ্যকতাও থাকে না। সন্তানাদির ভরণ-পোষণের চিন্তা থাকে না। স্ত্রী-কর্ত্তব্য কেবল পতিসেবা, সে কেবল তাহা করিয়াই ঋণমুক্ত হইয়া যায়। এইরূপ (১) তাহাকে পাপকার্য্যও করিতে হয় না ও তাহার ফলে দুঃখও ভুগিতে হয় না। পরন্তু শুদ্ধ জীবনযাপন করিতে পারে। (২) তাহার ইহজন্মে কিছু নূতন "সঞ্চিত" কর্ম্ম হয় না বরং (৩) তাহার পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মের ভোগ পতিসেবারূপ কর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় করিতে থাকে। এই তিনটি কারণ বশতঃ স্ত্রীজাতি সহজে মোক্ষলাভ করিবার অধি-কারিণী হইয়া থাকে।

মনে বুঝিয়া দেখ, সমস্ত পাপের মূল হইল শরীরপোষণ ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্ম-গুলি। স্ত্রীলোককে সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করিতে হয় না। পতি সে চিন্তা

নিজ শিরে গ্রহণ করেন। আহা! পতি কি উপকারী, তাঁহার কি অপার দয়া ও বীরত্ব যে সভামধ্যে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পত্নীর পোষণের ভার নিজস্কন্ধে লইয়া স্ত্রীকে (অর্দ্ধাঙ্গনীকে) পাপ হইতে মুক্ত করেন

আমরা দেখিতে পাই উগ্যমহীন নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকে ঈশ্বরও পোষণ করেন না। অর্থাৎ উগ্যম না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু উগ্যম করিতে গেলে বেশী না হউক কিছু না কিছু পাপ করিতেই হয়। এবং ঈশ্বরও তদনুরূপ দণ্ডবিধান করেন। স্ত্রীর পতি কিন্তু নিজ ভার্য্যার পোষণের ভার নিজের উপর লইয়া তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন। সত্য বলিতে কি আমার মনে হয়, এ বিষয়ে স্ত্রীর কাছে স্বামী ঈশ্বর অপেক্ষাও পূজ্য,—স্বামী সাক্ষাৎ ইষ্ট-দেবতা।

তুমি এইবার বিচার করিয়া দেখ যে পুরুষ অপেক্ষা নারীজন্ম শ্রেষ্ঠ কি না? আর স্ত্রী যদি পুরুষের উপর নির্ভর না রাখিয়া স্বতন্ত্ররূপে জীবনব্যবহার (আত্ম-পোষণাদি) চালাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে তাহার পাপের ভার বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং তাহার ফলে তাহাকে জন্মমৃত্যুরূপ চক্রে অবশ্য পুনঃ পুনঃ আসিয়া পড়িতে হয়। ইহা বোধ হয় স্পষ্টই বুঝিয়াছ যে স্বতন্ত্রভাবে চলিতে গেলে অনেক প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে লিপ্ত হইতে হয়। অনেক প্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে এবং বিবিধ প্রকার ন্যায় ও অন্যায় করিতে বাধ্য হইতে হয়। সেই জন্য বুদ্ধিমতী চতুরা রমণী পুরুষের দেখা দেখি তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন না। পরন্তু পতিসেবাই নিজেদের একমাত্র কার্য্য নিশ্চয় করিয়া পতির অধীন থাকিয়া "নবীন কর্ম্ম" (১) করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। এবং শীঘ্রই সেইজন্য মোক্ষলাভের অধিকারিণী হইয়া থাকেন।

সরলা। পতিসেবারূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে দুঃখী হইতে হয়, তাহার (২) কারণ কি?

কান্তা। ইহার কারণ পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি, কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই; সেই জন্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি. শোন;—জীব (মনুষ্য) মাত্রেরই কর্ম্ম তিন প্রকার। যথা :—

(১) "প্রারব্ধ কর্ম্ম"—পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্মফলে এই শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে এবং সেইসঙ্গে যে সকল সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাকে

(১) অর্থ—পতিসেবা ভিন্ন অন্য নূতন কর্ম্ম।

প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। এই প্রারব্ধের ভোগবিনা ক্ষয় হয় না।

(২) "সঞ্চিত কর্ম্ম"—পূর্ব্বজন্মের যে সকল কর্ম্মের ফলোদয় হয় নাই বা যাহার ফল ইহজীবনে হঠাৎ ভুগিতে হয় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিলে ও তাহার ফল পরজন্মে ভুগিতে হইবে, তাহাকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে।

(৩) "ক্রিয়মান কর্ম্ম" (পুরুষার্থ)—ইহ জন্মে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম ক্রিয়মান কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের ফল ইহজীবনে পাওয়া যায়। আর যাহার ফলোদয় হইতে বাকী থাকে, সে গুলি পরজন্মের "প্রারব্ধ" ও "সঞ্চিত" রূপে পরিণত হয় এবং সেই সেই জন্মে বা তৎপরবর্ত্তী জন্মে তাহার ফল দান করিয়া থাকে।

যে জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম এত অল্প যে এক জীবনেই তাহার সম্পূর্ণ ভোগ হইতে পারে এবং যাহার ক্রিয়মান কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না,—তাহাদেরই ভাগ্যবলে এই নারীজন্ম লাভ হইয়া থাকে। এই নারীজন্মে নূতন বন্ধনের হেতুভূত যে ক্রিয়মান কর্ম্ম তাহা আর করিতে হয় না। প্রারব্ধ ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মাদি ভোগ হইয়া গেলে ইহজন্মেই অবসান হইয়া যায়। যাঁহারা পূর্ণমাত্রায় স্ত্রীপদবাচ্য তাহাদের সঞ্চিত কর্ম্ম একটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে; যাহার ফলে তাঁহাদের পতি-সেবারূপ কর্ম্ম করিতে পরিশ্রমাদি করিতে হয়। বুঝিয়া দেখ, যদি ইহজন্মে কাহারও অনেক সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাকী থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির এমন যোনীতে জন্ম হওয়া উচিত যে, সে আপনার সঞ্চিতভোগ করিবার জন্য ইচ্ছানুযায়ী পাপ পুণ্যকর্ম্ম করিবার অবসর পায়। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে নারীজন্ম সেরূপ নয়। দেখ বোন, যদি সঞ্চিত কর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত পুনর্ব্বার জন্ম হইত না, না হয় ত জন্মিবার পরই মৃত্যু হইত। কারণ কর্ম্ম করা ব্যতিরেকে জীবন চলা অসম্ভব। সেই জন্য ঐ সঞ্চিত কর্ম্ম যাহা পতি সেবার মূল এবং যাহার ফলে কোন পাপ-কার্য্য করিতে হয় না তাহা উত্তম বলিয়াই মনে করা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত কারণ প্রযুক্ত বিবেকী ও বিদূষী স্ত্রী মাত্রেই এই পতিসেবারূপ কার্য্য পরাধীনতা মনে করেন না, পরন্তু প্রতিজ্ঞাকারী পতির সেবা উত্তম "সঞ্চিত-কর্ম্মের" ফল, এই দৃঢ় বিশ্বাসে অপর কোন প্রপঞ্চে লিপ্ত না হইয়া পতিসেবা

অপর কর্ত্তব্য আছে, মনে করেন তিনি পূর্ণ স্ত্রীযোনীতে নাই বুঝিতে হইবে। সেই-জন্যই "নূতন" পাপপুণ্য কর্ম্ম করিবার যোগ্য যোনী লাভ হওয়াতে তাঁহাকে জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রে পুনঃপুনঃ আসিতে হইবে জানিবে।

ভগ্নি, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিলে কি ইচ্ছা হয় না যে, "হে পরমেশ্বর, আমি রাজা বা মহাত্মা হইতে চায় না, পরন্তু যেন জন্ম জন্ম পতির অধীন পতিব্রতা স্ত্রীজন্মলাভ করিতে পারি, এই ভিক্ষা দাও।" এইরূপ ইচ্ছা হইবার কারণ এই যে পতিসেবারূপ কার্য্যের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিতকর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গেলে, আমরা ইহজন্মেই মোক্ষলাভের অধিকারিণী হইতে পারি। কদাচিৎ কোন বিশেষ সঞ্চিতকর্ম্ম যদি ভুগিতে বাকী থাকে, তবে (স্মরণ রাখিও যে, ইহজন্মের পতিসেবা, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সঞ্চিত কর্ম্ম অন্তর্গত নয়) পরজন্মে অবশিষ্ট টুকু জ্ঞানলাভের দ্বারা নষ্ট হইলে মোক্ষপদলাভ হইবে, ইহাই নিশ্চয় হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুহ্য, সূক্ষ্ম ও গম্ভীর। যদি সমস্ত ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইয়া থাকে তাহা হইলে এইটুকু যদি মনে রাখ, তবেই যথেষ্ট, "যে মহান, দয়ালু পতি উপস্থিত দুঃখ এবং কর্ম্মজন্য পাপের ফল নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সেবা না করিয়া কি অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন ও পাপিণীর ন্যায় আচরণ করিব, কখনই নয়।" সত্য বলিতে কি পতিসেবা করা বা তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, আপনার কর্ত্তব্য বা তাঁহার উপকার করা হইতেছে এমন মনে করা ভুল। পরন্তু উহা মহৎ উপকারের কতকটা প্রত্যুপকার মাত্র মনে করা উচিত; এবং কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য পতিসেবা না করিতে পারিলে আমার স্ত্রীজন্ম সার্থক নয় এরূপ ধারণা রাখিয়া পতিসেবাকার্য্যে রত থাকা কর্ত্তব্য।



যোগ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

বালসূর্য্যের মৃদুকরস্পর্শে যখন সমস্ত গ্রাম অনুরাগের রক্তিম আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল ; পর্ব্বতের উন্নত শৃঙ্গে, মন্দিরের সমুচ্চ চূড়ায়, পক্ষিকুল মুখরিত বৃক্ষশাখায় যখন কিরণরশ্মি দেখা গিয়াছিল ; তটিনীর বীচিস্ফীতবক্ষে বালকবালিকার পদক্ষেপে শব্দিত প্রাসাদের অলিন্দদেশে, গ্রামস্থ কিশোরীগণের বিলাসচঞ্চল সগর্ব্বচলনে, আনন্দতুষারশিক্ত ক্ষুদ্রপথে, যখন একটা নূতন সজীবতা বিরাজ করিতে ছিল ; রজনীর নিদ্রালস-জড়তা নিষ্পন্দ জীবহৃদয় অকস্মাৎ এই আলোকরশ্মির মোহকর ইন্দ্রজালস্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। তখন আমি আমার শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম,—একজন সন্ন্যাসী, তাঁহার পরিধানে বল্কল, অঙ্গে বিভূতি, মস্তকে বিপুল জটাভার, একহস্তে চিমটা অপর হস্তে জলপাত্র, স্কন্ধে ভিক্ষাধার, নয়নে জ্যোতি, অঙ্গে অঙ্গে পবিত্রতার স্নিগ্ধ প্রবাহ বহিয়া যাইতে ছিল। সহসা আমার চক্ষু সন্ন্যাসীর উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ; আমি তাঁহার পবিত্র চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মস্তকে করপ্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ধর্ম্মে মতিরস্তু"। সে স্পর্শে বুঝিলাম, তিনি যোগী। তাঁহার সে আনন্দস্পর্শে আমার শরীরে আনন্দের তাড়িৎ বহিয়া গেল ; ধমনীতে একটি অপূর্ব্ব স্পন্দনসুখ অনুভূত হইল। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ বাক্যালাপ করিলাম ; আশা মিটাইয়া সন্দেহ দূর করিয়া লইলাম ; অনেক যুক্তিতর্ক উঠাইলাম, তিনি বালকের মত আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বুঝিলাম, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ জ্ঞানী।

এমন সময়ে আমাদের মন্দিরে শঙ্খ, কাংস, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সে বাজনা তরঙ্গে তরঙ্গে প্রকৃতির অবয়ব ভেদ করিয়া আকাশের গায় মিলাইয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসী উর্দ্ধদৃষ্টে একমনে সে ধ্বনি লক্ষ করিতেছিলেন, দেখিলাম, তাঁহার নয়নে অশ্রু, অঙ্গে পুলক, বদনে মৃদুহাসি, কঠোর সংযমী, সর্ব্বত্যাগী, সংসারজয়ী মহাপুরুষের অন্তর এত কোমল। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম ; এ অলৌকিক ভাব সংমিশ্রণ দেখিয়া আমি আপনাকে ভুলিলাম, পরে যখন চেতন আসিল, দেখিলাম সন্ন্যাসী আর নাই। কেবল সেই স্থানটী এক অপূর্ব্ব সৌরভে সুরভিত আছে, পবিত্র সঙ্গীতে স্পন্দিত আছে।

জন মানবশূন্য গভীর অরণ্যে গিরি-নির্ঝরিণী প্রপাত শব্দিত পার্ব্বত্যগুহায় বাস করিলেই যোগ করা হয় না; অঙ্গে বিভূতিলেপন, মস্তকে রুক্ষ জটাভার ধারণ বা বল্কল পরিধান যোগীর লক্ষণ নহে। যিনি যোগী, তাঁহার দেহের দীপ্তি, অন্তরের অকপট পবিত্রতা, মুখের অসামান্য মধুরিমা দেখিলেই, বুঝা যায়,—ইনি যোগী।

আমরা বাল্যকালে অঙ্ক কষিয়াছি "যোগ"। অনেকগুলি সংখ্যাকে সম্মিলিত করিয়া একটি সংখ্যায় পরিণত করিতে পারিলেই যোগ হইল। সমস্ত মাঠ যখন বিস্তীর্ণ সলিলরাশির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন নিস্তরঙ্গ সাগর। অনেক স্থানে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া, সে জলরাশি অগভীর এবং এই জন্য তরঙ্গবিক্ষেপ দেখা যায় না; কিন্তু যদি সেই বিশাল জলরাশি একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মুখে বহাইতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রখর স্রোতা একটি ক্ষুদ্র নদীরূপে পরিণত হইতে পারে; সে স্রোতে তখন ঐরাবত ভাসিয়া যাইবে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন বিরাট বিস্তীর্ণতাকে, অবচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করিয়া শক্তির বৃদ্ধি করাই যোগ। প্রত্যেক জীবের দেহস্থ তাড়িতশক্তি অল্প পরিমিত, তাহার দ্বারা অভীষ্ট গুরুতর কার্য্য সাধিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি কোন উপায়ে বহুজীবের অল্প তাড়িতশক্তি সমূহ একত্র সম্মিলিত করিয়া বিরাট তাড়িতশক্তি রূপে পরিণত করিতে পারা যায়; তখন তাহার দ্বারা অনেক মহাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্যের মনোগতি সীমাবদ্ধ, স্বল্পপ্রসর ও সঙ্কীর্ণ; কিন্তু যদি অনেকের বিভিন্ন মনোগতি একাধারে আকৃষ্ট করিয়া এক মহা মনোগতিরূপে পর্য্যবসিত করিবার শক্তি জন্মে, তবে সে শক্তিদ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই পূরণ করা যাইতে পারে এই উপায় এই প্রক্রিয়ার নামই যোগ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সছিদ্র ও পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও যদি এই বিরাট-ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতে পারে, ক্ষুদ্র বারিকণা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া মহাসমুদ্র আকার ধারণ করিতে পারে, তবে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন মানবী শক্তি ও পরস্পর সহযোগে একটি মহা বিরাট শক্তির আকার ধারণ করিয়া মুক্তি হইবে অসম্ভব কি?

তুমি একটী শাখা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু একত্রীভূত শাখা-সমষ্টি ভাঙ্গিয়া ফেলা তোমার সাধ্যাতীত। একটী তৃণ অনায়াসে ছিন্ন করা যায়, কিন্তু রজ্জুরূপে পরিণত সেই তৃণসমষ্টি ছিন্ন করা সহজ নহে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, যোগের দ্বারা শাখা ও তৃণের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা বিচ্ছিন্ন,

ও ক্ষুদ্র, তাহার বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষুদ্রতা দূর করিয়া অবিচ্ছিন্ন মহত্বে পরিণত করাই যোগের উদ্দেশ্য। বিশৃঙ্খল অসম্পূর্ণতাকে যে উপায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হয়, সেই উপায়ের নাম যোগ।

আমরা দেখিতে পাই, বিদ্যুৎ বাতাস করে, গৃহ আলোকিক করে, যান সকল দ্রুতগতিতে চালাইয়া থাকে; আরও দেখিতে পাই, আতসী কাচ সূর্য্যরশ্মিমুখে ধরিলে সে আতসী কাচ দ্বারা বস্ত্র দগ্ধ হইয়া যায়; এই সমস্ত একই যোগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র।

যোগ দুই প্রকার,—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। উভয়প্রকার যোগই যথাযথ ও নির্ব্বিঘ্নে প্রযুক্ত হইলে অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। তাহার প্রমাণ ব্যাসদেব, কপিল, গৌতম জৈমিনী ও পতঞ্জলি; বশিষ্ঠ, শুকদেব, বিশ্বামিত্র ও সনকাদি মহর্ষিগণ। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, গৌরাঙ্গ ইঁহারা অন্তর্বিষরক যোগে যোগী ছিলেন। নিউটন, গ্যালিলিও, ইউক্লীড ও বৈজ্ঞানিকগণ বাহ্যবিষয়ক যোগের উদাহরণ; কণাদ, রঘুনাথ, জগদীশ, ভাস্করাচার্য্য, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও লীলাবতী, ইহাঁরা প্রাচ্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাহ্যবিষয়ক যোগের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। বুদ্ধি যতদূর হইতে পারে, কল্পনা যত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, ধারণাশক্তি যতদূর ধারণা করিতে পারে, ততদূর লইয়া যাইবার শক্তি বাহ্য বিষয়ক যোগের আছে।

যে স্থানে ধারণা ও কল্পনাশক্তি পৌছিতে পারে না, মনুষ্যের শান্ত চিন্তাশক্তি যে স্থানের ইয়ত্তা করিতে পারে না, বাক্য ও মনের সহিত, চেষ্টা বৈকল্যের সহিত, যে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়; যে পরমতীর্থ, তপনচন্দ্র, তারকা বিদ্যুৎ নিজ নিজ দীপ্তি দ্বারা আলোকিত করিতে পারে না; সেই অব্যক্ত অচিন্ত্য অবাঙমনোগোচর মুক্তির পথে যাইতে হইলে অন্তর্বিষয়ক যোগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই যোগই প্রকৃত যোগ। অন্তর্বিষয়ক যোগী মন বুদ্ধি বাক্য কল্পনার অতীত পরমবস্তু জানিতে চাহেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও প্রাণের অলীক তৃপ্তিকর, ক্ষুদ্র সুখ, দুঃখবিমিশ্র ক্ষণিক অথচ পরিমাণ জানিয়া তাহাতে আকাঙ্ক্ষা রাখেন না; যাহা ভূমা, যাহা পরিপূর্ণতা তাহাই প্রার্থনা করেন। "যত্র নানাৎপশ্যতি নান্যস্থনোতি নান্যদ্বিজানতি সভূমা।" ইহাদের দৃষ্টি সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, আকাশ বিদ্যুতে নাই; একমাত্র স্বয়ম্প্রকাশমান জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্মে। কার্য্য অসীম, অনন্ত ও নিরবশেষ. তাহা এক একটি করিয়া জানিতেই

জীবন কাটিয়া যায়, তাহার পর আবার জন্মগ্রহণ করিলে যাইতে হইবে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে কারণ জানিতে পারা যায়, তবে পৃথক্ করিয়া আর কার্য্য জানিবার আবশ্যক করে না। বর্ণ জ্ঞান হইলে পৃথক করিয়া রক্ত, নীল, শ্বেত কৃষ্ণ বুঝিতে হয় না; মনকে জানিতে পারিলে আর মনোবৃত্তিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে জানিতে হয় না, অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে পারিলেই তাহার কার্য্য রাগদ্বেষাদি আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়; ব্রহ্মানন্দের অসীম অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে ক্ষুদ্রানন্দের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছন্নতা ত আছেই। গীতাকার তাই বলিয়াছেন ঃ—

যাবানর্থ ঔদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

অনেকের ধারণা যে অন্তর্বিষয়ক যোগের দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করা যায়; ইহা সমীচীন মত নহে। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিলেও উভয়ের একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, পরমাত্মা চৈতন্য চেতন, পরমাত্মা শক্তি দ্বারা শক্তিমান্ বা পরমাত্মার সহিত একটি দুশ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট ইহা বলিতে হয়; নতুবা পরমাত্মার অস্তিত্বের বিশেষ কারণ থাকে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অধীন ও পরাধীনভাব বা সেব্যসেবক ভাব না মানিলে পরমেশ্বর যে জীবের প্রভু বা স্রষ্টা, ইহা কোনপ্রকারে বলা যায় না; ইহা না মানিয়া দ্বৈত্যবাদী একটি পদও অগ্রসর হইতে পারে না। এবং এইরূপ সম্বন্ধ নিত্য, তাহার কখনও অপলাপ হইবার কারণ থাকে না, বলিয়াই যোগ রহিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। বিচ্ছিন্নের মিলনই যদি যোগ, তবে বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর পরস্পর বিবাহের মত এ যোগ্য নিরর্থক। তবে পরস্পর নিত্যযুক্ত থাকিয়া ও কোন একটি অজ্ঞেয় অচিন্ত্যনীয় আবরণে আবরিত থাকে, বলিয়া বিযুক্ত বোধ হয় মাত্র; কিন্তু সেই আবরণটি দূর করিতে পারিলে যাহা যুক্ত তাহাই থাকিবে; মেঘজাল সরাইয়া ফেলিলে যে সূর্য্য তাহাই থাকিবে। এই প্রতিবন্ধকতা নাশ করাই দ্বৈতবাদীর যোগ, ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধির বিরোধিতাও থাকে না।

অদ্বৈতবাদী বলেন, "বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতস আত্মানি সামাধানং যোগঃ।" বিষয়াভিমুখ হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মায় স্থির করাই যোগ্য। জীবের মন বিষয়প্রবল, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্রতা শক্তিহীন। সেই মনের স্বাভাবিক বিষয়ের উপরেই থাকে। চক্ষুর স্বভাব যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা, মনের স্বভাব

তদ্রূপ সংকল্প করা, সংকল্প ব্যতীত মন ক্ষণিকের জন্যও প্রায় স্থির থাকিতে পারে না, সেই মনকে নিরন্তর আত্মাভিমুখে সমাহিত করা সহজ সাধ্য নহে। জলের স্বাভাবিক নিম্নগতি যেমন যন্ত্র সাহায্যে ঊর্দ্ধগতিরূপে পর্য্যবসিত করা যায়, মনকেও তদ্রূপ আত্মাভিমুখে স্থির রাখা প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সম্ভব। পতঞ্জলি লক্ষণ করিয়াছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ।" চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে, দ্রষ্টা নিজস্বরূপে অবস্থান করেন। তাহা অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাপেক্ষ প্রণব বীজমন্ত্র গায়ত্রী জপাদি দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। বেদাদিপাঠ, ঈশ্বরগুণগান ও পূজাদি করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ কলুষ ত্যাগ করিতে থাকে; কলুষ্য ত্যাগ করিতে করিতে চিত্ত এমত নির্ম্মল হইয়া উঠে যে, স্বচ্ছ দর্পণে যেমন মুখের ছবি প্রতিফলিত হয়, নির্ম্মলচিত্তে ও তদ্রূপ আত্মজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। চিত্ত নির্ম্মল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মচর্য্য অত্যাবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য্যলাভ, বীর্য্যলাভে বলসঞ্চয় হইলে পরে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়, তাহা গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে।

শ্রীধর বলেন, "ভগবৎ পাদপদ্মে কর্ম্মফল সমর্পণপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাই যোগ। মোটের উপর যোগকে আমরা যে ভাবেই দেখিতে যাই না কেন সর্ব্বস্থানেই ফল একই প্রকার। অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎ পাদনের সহায়তা করে। তবে সাধারণতঃ যোগ শব্দে পতঞ্জলি নির্দ্দিষ্ট প্রণায়ামাদিই বুঝাই। সার্ব্বভৌমিক অর্থ ধরিলে বা মূল উদ্দেশ্যটি লইয়া বিচার করিলেই সকলগুলিকেই যোগ বলিতে হয়। বৈদান্তিক আচার্য্যগন চিত্তশুদ্ধির দুইটি উপায় বলেন, একটি প্রথমোক্ত যোগ। দ্বিতীয়টি বেদান্তবাক্য বিচার।

দ্বৌ হেতু চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
অসাধ্যঃ কস্যচিদ্যোগঃ কস্যচিত্তত্ত্বনিশ্চয়ঃ॥

(জ্ঞান বেদান্তবাক্যবিচারার্থক)



শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত

সাধারণ উপদেশ।

মধ্যলীলা।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

৪৮। বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই॥ ঐ ১৭০ পৃঃ

৪৯। ঈশ্বরেতে অপরাধ্য ফলে ততক্ষণ। ঐ ১৭২ পৃঃ

৫০। যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ১৬পং।১৮০ পৃঃ

৫১। মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারপ্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥ ১৭পং।১৮৪ পৃঃ

৫২। উচ্ছৃঙ্খল লোকসঙ্গে দুইলোকনাশ। ঐ

৫৩। কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি? ॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাহাঁ—যাহাঁ তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥ ঐ ১৮৬পৃঃ

৫৪। রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন॥ ১৯পং ১৯৫পৃঃ

৫৫। মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ-সনাতন সভার কৃপাগৌরবপাত্র।
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
"কহ, তাহাঁ কৈছে রহে রূপ সনাতন?।
কৈছে রহে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন?
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন?
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥

অনিকেতন দোঁহে রহে,—যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্করুটি চাকান চাবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাথে, কাঁথা-ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন—চারিদণ্ড শয়নে।
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেহো নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তি রসশাস্ত্র কয়য়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্যচিন্তন॥ ঐ ১৯৮ পৃঃ

৫৬। তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা।
হাথে করোয়া, ছিঁড়া কন্থা, নির্ভয় হইলা। ২০ পং ২০৩ পৃঃ

৫৭। প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল। ঐ ২০৫পৃঃ

৫৮। নারদ কহে—অৰ্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা॥
ব্যাধ! তুমি জীব মার এ অল্প পাপ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার এ পাপ অপার॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিয়াছ জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম জন্মান্তরে। ২৪পং ২৪২পৃঃ

৫৯। তুলসী পরিক্রমা যার তুলসীসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তণ।

৬০। দণ্ডবংস্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি, পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নারদ কহে—ব্যাধ! এ নহে আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য॥ ঐ

৬১; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥ ২৫ পং ২৪৬পৃঃ

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

রামকৃষ্ণ শান্তিশতক। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য আটআনা।

এই পুস্তকে ভক্তিমূলক একশত সঙ্গীত আছে; অতএব পুস্তকের নাম রামকৃষ্ণ শান্তিশতক। গীতগুলি ভক্তিরসপূর্ণ এবং শান্তিরসে পরিপ্লুত। যাঁহারা ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, দুর্গামঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মহেশমঙ্গল, চৈতন্য-মঙ্গল এবং রামকৃষ্ণমঙ্গল, একাধারে সর্ব্বমঙ্গল সমষ্টি।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া কবিবর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত এই সঙ্গীতশতকের পরিশিষ্টাংশের একটি গীতের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন :—

"তুমি তিনি নহে ভিন্ন, শিবগুরু রামকৃষ্ণ
নমি তব পদাম্বুজে, যুগ অবতার।
লও দেব কৃপা কোরে, পতিতের ভার ॥"

আমরা আশা করি বঙ্গের ভক্তসমাজে এই শান্তিশতকের যথেষ্ট আদর হইবে।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত, মূল্য দুই আনা।

সত্যনারায়ণ, এই দেবতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তিভাজন। হিন্দু বলেন, সত্যনারায়ণ, মুসলমান বলেন সত্যপীর। সত্যনারায়ণের ব্রতফলে ভক্তগণের ইষ্টসিদ্ধ হয়। শ্রীযুক্ত রাধানাথ বাবু স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডোক্ত স্তোত্র অবলম্বনে এই ব্রতকথা রচনা করিয়াছেন। সচরাচর পর্ব্ব উপলক্ষে গৃহস্থের গৃহে গৃহে যে পুঁথি পঠিত হয়, তাহার পাঠ অপেক্ষা ইহা পরিষ্কার পরিস্ফুট ও ভক্তিবর্দ্ধক, আমরা ইহা পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণমতি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, শ্রীযুক্ত বাসুদেব ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত; মূল্য চারি আনা।

ইহা একখানি গীতিকাব্য। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে নিজ বাসস্থান ও আত্মীয়স্বজনের কথা আছে। শ্রীমতী কৃষ্ণমতি বাল্যাবধি ভগবৎ-প্রেমাধীনা, ছেলেবেলায় কৃষ্ণনাম শুনিলেই আনন্দে নৃত্য করিতেন। সেই কৃষ্ণমতি একদিন যোগানন্দ নামে একজন বৈষ্ণবকে বাড়ীতে পাইয়া তাহার নিকট কৃষ্ণ-বিষয়ক গীত শ্রবণ করেন। সেই গীতগুলিই "শ্রীকৃষ্ণমতি" পুস্তকে সন্নিবিষ্ট। সে গুলি বড়ই মধুর, শুনিতে শুনিতে ভগবানে প্রেমভক্তি, উথলিয়া উঠে। সাধক যোগেশবাবু অল্প বয়স হইতেই যোগভ্যাসে অনুরক্ত। কবিতায় তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত। আমাদের বিশ্বাস সাধারণে ইহার সমধিক আদর না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি পরিপাটী।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৮শ বর্ষ। } ১৩১৭ সাল, চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ও তাহার উদয়কাল।

লেখক ডাঃ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,

ভাস্কর ব্রহ্মার প্রথম সংস্করণ পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক ; আর ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ ও আত্রেয় সম্প্রদায় কিম্বা ধন্বন্তরি, কাশীরাজ, দিবোদাস ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ধন্বন্তরি সম্প্রদায় অথবা ইন্দ্রের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু, বশিষ্ঠ, বামদেব, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, অসিত, গৌতম, কাশ্যপ প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ

ব্রহ্মার দ্বিতীয় সংস্করণ অষ্টাঙ্গ বিচ্ছিন্ন আয়ুর্ব্বেদ খণ্ডশঃ খণ্ডশঃ ভৌমস্বর্গলোক মধ্যএসিয়া হইতে ভৌমদেবযানপথে (৪৩) মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে আনয়ন ও প্রচার করেন।

ভারতবর্ষ হইতে পরবর্ত্তী চরক এবং সুশ্রুত যুগে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ পুনচর্চ্চায় একত্র সংগৃহীত হয়। ইহাই প্রথম মিশরে, (৪৪) মিশর হইতে আরবে, আরব হইতে গ্রীশে (৪৬), গ্রীশ হইতে রোমে, (৪৭) এবং প্রতীচ্য অন্যান্য ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়।৪৮।

স্বর্গরাজ্যের সর্ব্বোত্তর সীমায় অবস্থিত, মধ্যএসিয়া ইলাবৃত বর্ষের কনক পর্ব্বত মেরু বর্ত্তমান Southern Altai এর প্রস্থদেশ হইতে কিম্বা তাহার দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিম্ন ভূখণ্ডে অবস্থিত মানস-সরোবরের উত্তরে, শৈলরাজের পরপারে, অলকনন্দার উপকূলে বিদ্যমান নন্দনকানন বেষ্টিত ইন্দ্রভবন হইতে অষ্টাঙ্গে বিচ্ছিন্ন ত্রিসূত্রীয় ত্রিস্কন্দ যুক্তিব্যপাশ্রয় আয়ুর্ব্বেদ বা Rational therapeutics, দেবযানের অন্যতমপথ বদরিকা আশ্রম কিম্বা যেখানে গঙ্গাপ্রভবন ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের পুর্ব্বনিবাস অবস্থিত। সেই পথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করে।৪৯।

ভরদ্বাজযুগের এই ঘটনা (৫০) আর ইহার বহুপূর্ব্বে দেবযানের অবশিষ্ট তিনটির কোনটির ভিতর দিয়া (সম্ভবতঃ বামিয়ান গিরিবর্ত্মের সাহায্যে) ব্রহ্মার অবরোধ সমুৎপন্ন প্রথম সংস্করণের লক্ষশ্লোকের আয়ুর্ব্বেদ দৈবব্যাপাশ্রয় ভেষজ অর্থাৎ;—মন্ত্র, ঔষধ, মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, নিয়ম, হোম, দান, স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, প্রণিপাত গমনাদি the falsely so called Therapeuties of fancy,(৫২) এবং যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজস্বরূপ অন্তঃ ও বহিঃপরিমার্জ্জন ও শাস্ত্রপ্রণিধান অর্থাৎ (৫৩) the so called rational therapeutics (৫৪) একখাতে প্রবাহিত এবং পরস্পর সংমিশ্রিত গঙ্গাযমুনার মত, পাশাপাশি (৫৫) মাখামাখি (৫৬) ভাবে কতক বা বেদবর্ণিত আস্তব্রিত ও অবস্তাবর্ণিত আর্থ্যাত্রিত প্রভৃতির মত ব্রহ্মবংশীয় (৫৯) মন্ত্রবিশারদ priest magicians (৬০) বা পুরোহিতদিগের হস্তে (৬১) কতক বা রস বিশারদ বিষশল্যাময় হন্তা অশ্বিনীকুমার দিগের মত (৬৩) রসবিশারদ রাজবৈদ্য চিকিৎসক (৬৪) (৬৫) দিগের হস্তে উর্দ্ধস্থান বা পর্ত্তোস্পান বা প্রতিষ্ঠান (বর্ত্তমান কাবুল নগরে) (৬৫) আগমন করে (৬১)।

কিন্তু এখান হইতে হপ্তহিন্দু (৬২) বা সপ্তসিন্ধুর তটস্থিত পঞ্জাবপ্রদেশে যখন ইহা বিস্তৃত হয়, তখন ভয়ানক দুঃখের কথা! এখানে এমন সকল লোক আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, যাঁহারা যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিতেন, এবং দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসাকেই অন্তঃপরিমার্জ্জন বহিঃপরিমার্জ্জন শাস্ত্রপ্রণিধান অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া নিঃশঙ্কোচিত্তে তাহারই শরণাপন্ন হইতে লোক সকলকে শিক্ষা দিতেন। (৬২)

অশ্বিনীকুমার কিম্বা ইন্দ্রের প্রতি ইহাদের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। (৬৩) এমন বিজাতীয় ঘৃণা যে প্রতিপল্লী, প্রতি গ্রাম হইতে, প্রতি নগর হইতে, এমন কি সমগ্র পৃথিবী হইতে ইন্দ্র ও নাসত্য (নাসত্য—অশ্বিনীকুমার) এবং সৌত্রকে দূর করিয়া দিতে এই ঔপনিবেশিকগণ যেন উর্দ্ধ হস্ত। (৫৪)

ইহার বিষময় ফল এই হইয়াছিল যে, ভরদ্বাজযুগের উদয়ের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটি লোক ছিলেন না, যিনি যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসা করিতে পারেন, অথবা তদ্বিষয়ে কাহাকেও কোনরূপ কিছু শিক্ষা দেন। (৬৫) চরক সংহিতার প্রথম পৃষ্ঠায় এই ভীষণ অধঃপতনের একটি ভয়ানক চিত্র এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে ব্যাকরণের ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা না করিয়া একটি প্রাচীন জাতির মহত্তাকীর্ত্তির ইতিহাস স্বরূপ অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট চিন্তাকুলিত ৫২।৫৩ জন প্রখ্যাত ঋষির (৬৬) কেহ যাযাবর, কেহ শালিন, কেহ দেবর্ষি, কেহ মহর্ষি, কেহ রাজর্ষি, কেহ ঋষিপুত্র (৬৭) ধ্যানমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষের মহান্ অন্তরায় স্বরূপ এই যে রোগসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া মানবসমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছে, তাহার শমোপায় কি? ইহা আশার কথা নহে,—ইহা পরম নিরাশাব্যঞ্জক চিত্র। ফলতঃ এই হিমবৎ সমিতি ভারতবর্ষের তদানীন্তন কালের একটি নিশ্চয়ই শোচনীয় অবস্থার বিবরণ। (৬৮) সমগ্র ভারতবর্ষে তখন এমন কোন লোকও নাই, যিনি যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ পরিজ্ঞাত আছেন (৬৯) ঋষিগণ ধ্যাননেত্রে দেখিলেন, আছেন একজন, যিনি ব্রহ্মার অবরোধ হইতে সমুৎপন্ন (৭০) ত্রিসূত্রীয় ত্রিস্কন্ধ পুণ্য শাশ্বত আয়ুর্ব্বেদ (৭১) শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তিনি দূরে, অতি দূরে,—অসুকৃতি জনগণের অগম্য গঙ্গাপ্রভবন ঋষিদিগের পূর্ব্বনিবাস তাঁহার অধিকারভুক্ত হইলেও (৭২) সেখান হইতেও তাহার বাসভবন ত্রিপিষ্টপ নামক তিনটি পর্ব্বত ভূমি অতিক্রম

সেখানে যাইবে, এই প্রশ্ন লইয়া তাঁহাদিগকে আন্দোলন করিতে হইত কি? হিমবানের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে যাত্রা করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পার হইয়া মানস সরোবরের ধার দিয়া অলকনন্দার কুলে কুলে প্রথমতঃ হেমকূট, তার পর আরও দুইটি উচ্চ গিরিশ্রেণী পার হইয়া গন্ধমাদনের দক্ষিণে নন্দনকাননে সেই মহাত্মার বাসস্থান।৭৪। আমরা পশ্বস্তি সূত্রে অবগত হইয়াছি, বিশ্বৌসরা তাহার রাজধানী ৭৫। কিন্তু এই বিশ্বৌসরায় যায় কে? ভরদ্বাজ ঋষিসমিতির একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"আপনারা চিন্তিত হইবেন না, আমি যাইব। ৭৩। এই দুরূহকার্য্য করিবার জন্য আপনারা আমাকে নিয়োজিত করুন।" ৭৭। ভরদ্বাজ তাই তোমাকে প্রাণ ভরিয়া শত ধন্যবাদ দিই; তুমি নিজে দীর্ঘজীবনের প্রার্থী হইলেও তোমার এই স্বার্থ, পরার্থের মধুময় অমৃতে চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়াছে। যেখানে যত চিকিৎসক মণ্ডলী আছেন, আসুন সকলে একত্র হইয়া সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলি জয় এই শুভ মুহূর্ত্তের। জয় ভরদ্বাজের। জয় ব্রাহ্মণজাতির জয়!

ভরদ্বাজ ইন্দ্রভবনে যথাকালে উপস্থিত হইয়া ঋষিদিগের অনুরোধ তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন।৭৬। প্রজার দুঃখে চিরদুঃখিত। প্রজাহিতে চিরব্রত (৭৮) এ ইন্দ্র যিনিই হউন, (৭৯) ত্রিসূত্রীয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের একমাত্র অধিকারী এই মহাপুরুষ; ইহাকে সহস্রবার প্রণাম করি! ভরদ্বাজকে বিপুলমতি বুঝিয়া পদৈরল্পৈঃ কায় চিকিৎসা প্রধান করিয়া ত্রিসূত্রীয় আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করিলেন।৮০ ইহার পর যিনিই ইন্দ্রভবনে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে যান না কেন, সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, ভরদ্বাজ ইহাদের সকলেরই পদপ্রদর্শক।৮ ভরদ্বাজ এদেশে যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ভরদ্বাজের সহিত ভারতের Rational therapeuties বিজড়িত। সেইজন্য আমরা এই পুণ্যযুগের নাম দিতেছি ভরদ্বাজ যুগ।

ভারতে আত্রেয় ও আত্রেয় সম্প্রদায়ের উদয় এবং ধন্বন্তরি ও ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব,—ভরদ্বাজযুগের আয়ুর্ব্বেদোদয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হইয়া যদি মনে করা যায় স্বতন্ত্রোদিত বা সমসাময়িক, তাহাহইলেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভরদ্বাজযুগের প্রারম্ভ হইতে আত্রেয় ও ধন্বন্তরিযুগ কিম্বা অগ্নিবেশ ও সৌশ্রুতযুগ পর্য্যন্ত যে কাল রয়, তাহার অন্তরাল অনতিদীর্ঘই হউক আর দীর্ঘই হউক, এই সময় এ দেশের লোকের এমনি দুর্গতি ঘটিয়াছিল যে সে দুর্গতির আর তুলনা নাই!

খেয়াল।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

স্বভাবে সময়ে দেখ হইয়া নিস্তেজ।
খসে যায় দন্ত—খসে ব্যাঙাচীর লেজ॥
মানুষের লেজ যাবে—ইথে কি বিস্ময়।
রামদাস-বংশধর আমরা নিশ্চয়॥

বিরাট সাম্রাজ্যরূপী মনের ভিতরে।
স্বপ্রকাশ শয়তান একত্রে বিহরে॥

যার মোটে ঘর নাই হেথা তার ঘর।
সাঁচ্চা হ'তে জেনো হেথা ঝুঁটার কদর॥

বহু শাস্ত্র পাঠে যেই না বুঝিল তত্ত্ব।
তার সম কাঁঠালের কেবা আমস্বত্ব॥

পদ্মশূন্য সরোবর—পদ্মে মধুকর।
মধুকরে নাহি হায় গুন্ গুন্ স্বর॥
গুন্ গুন্ স্বরে নাহি মধুরিমা মাখা।
বিচারি চারির দেখ থেকেও না থাকা।

তুমি ত বিক্রয় কর টুথ পাউডার।
আছে কি মাজন কিছু মন-ময়লার॥

অকৃতজ্ঞ আক্কেলহারা বেইমান।
নিজ দোষে লোকমাঝে হারাবেই মান॥

চিত্তশুদ্ধি ঘটে যাঁর তিনি এ ধরায়।
থাকেন নির্লিপ্ত লুপ্ত 'অ' কারের প্রায়॥

'উপ' পড়ে 'কারে' আর 'অপ' জেনে 'বর্গ'।
মন্দ হয়ে ভাল হয়—বুঝহ সংসর্গ ॥

ব্রাহ্মণগোঁসাই পুত্র গোলাম হাসান।
পি এম বাক্চীর পাঁজী মুস্কিল আসান ॥

—০:০:০—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত

সাধারণ উপদেশ।

মধ্যলীলা।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

৬২। "ভক্তি বিনা মুক্তি নহে"—ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি পায়॥ ২৫পং ২৪৬পৃঃ

৬৩। ছিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ 'মায়িক' করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥ ঐ

৬৪। চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত—সেই সব ছারখার॥ ঐ ২৪৭ পৃঃ

৬৫। (শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥)
আচার্য্যের আগ্রহ 'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রার্থব্যাখ্যা করে অন্যরধতে॥
'ভগবত্তা' মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সবশাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥

মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাঙ্খ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণপ্রসঙ্গ ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু" কয় ॥
(পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান।
বেদমত কহে—ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ ॥)
পরম কারণ ঈশ্বর—কেহো নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে, পরমতের খণ্ডনে ॥
তাতে ছয়দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সে-ই সত্য মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু, সেই তত্ত্বসার ॥ ঐ

৬৬। রাজা কহে—আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ ২৫পং ২৫২পৃঃ

৬৭। সুবিদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥ ঐ ২৫২পৃঃ

৬৮। চৈতন্যলীলামৃত পূর, কৃষ্ণলীলা সুকরপূ,
দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সে-ই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥
যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্ন-পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যাঁর একবিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনুমানে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান, যাহাসম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্কনার্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ঐ ২৫৪পৃঃ

নিদান জ্ঞান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত তারকনাথ মৈত্র।

বেলা যায় যায়; মাঠ হ'তে ফিরে ধেনু,
রাখাল তাহারি পিছে বাজাইছে বেণু।
রাঙা ছবি পেয়ে হাসে তৃণভরা মাঠ,
হয়নি তখনো স্তব্ধ পথিকের বাট।
চাষীরা ফিরিছে মেঠো পথ দিয়ে ঘরে,
গ্রামপথে ধায় মাতা তনয়ের তরে।
পাখী সব করে রব মাঝি গায় গান,
মাঠে ছিল হেন কালে কোনও কৃষাণ।
পাড়াতে ছেলেটি তার খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
পিতারে পাইল দেখা প্রান্তরে আসিয়া।
কহিল জনকে ডাকি,—"বাবা বেলা যায়,
তবুও আনন্দে তুমি দাঁড়িয়ে হেথায়!"
কৃষাণের মনে হ'ল জ্ঞানের উদয়,
অশ্রুজলে ভাসে বুক—বালকেরে কয়—
যৌবনে যখন ছিনু মগ্ন মত্ততায়,
কেন বাছা না বলিলি—"বাবা বেলা যায়!"
যখন আছিনু ডুবি সুখ-মদিরায়,
কেন বাছা না বলিলি,—"বাবা বেলা যায়!"
এখন হয়েছে সন্ধ্যা রবি গেল পাটে,
মরণ ডাকিছে পিছে—যেতে হবে ঘাটে।
সময় আছিল যবে তখন আমায়,
কেন বাবা বল নাই—''বাবা বেলা যায়!"

———০:*:০———

ভারতে ইংরাজ

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সভ্যতার সুন্দর আলোক দেখিবার অধিকারী হইতাম না। ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে অধঃপতনের দিকে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম ও হইতেছিলাম তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার যাহা কিছু ছিল তাহাও হারাইয়া বসিতাম। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব আসিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছিল। এ সময় ইংরাজের ন্যায় সুসভ্য, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সৎ জাতির হাতে ভারতের শাসনদণ্ড ন্যস্ত না হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। অতএব উপযুক্ত সময়েই ভারত ইংরাজের অধীন হইয়াছে। সময়ের প্রাধান্য সকলকেই মানিতে হয়, সেই সময় বশেই ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব। ইহাকে ভারতবাসীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এখন সকলেরই ইংরাজ-শাসনের কৃপাদৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। আমরা অদ্যাপি আত্ম-রক্ষায় সমর্থ নহি, আপনাদের হিতাহিত ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় মহাশক্তিশালী ইংরাজরাজের অনুগত ও আশ্রিত থাকা আমাদের সর্ব্বোতোভাবে শ্রেয়ঃ।

কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কাহার নিকট কোন উপকার পাইলে আপনা হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে মন আকৃষ্ট হয়, তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না। আপনা হইতেই মুখ হইতে সাধুবাদ নির্গত হয়, সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলে জ্ঞানবানে তাহার প্রতিশোধ দিবার ত্রুটী করেন না। কেহ কোন ইতর জন্তু পুষিলে সেও পোষণকর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলে। কৃতজ্ঞতাহীন হৃদয় মরুভূমির ন্যায়। উপকারীর উপকার স্বীকার না করা মহাপাপ। তাহাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিস্কৃতি নাই, ইহা আমাদের শাস্ত্রবাক্য। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে দেখান গিয়াছে—আমরা কত রকমে ইংরাজ-রাজের নিকট উপকৃত। যতদিন আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই ইংরাজের উপকার স্বীকার করিতে হইবে; না করিলে আমরা লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ, পতিত জাতি বলিয়া জগদ্বাসীর অবজ্ঞাভাজন হইব। জ্ঞানী হইয়া কে সেই কুনাম কুখ্যাতি গ্রহণ করিয়া কলঙ্কের পসরা মাথায় লইতে প্রস্তুত হইবে; অতএব ইংরাজের কৃতোপকারের জন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। চিরদিন আমরা ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণ কামনা করিব।

রাজভক্তি। আমরা হিন্দুসন্তান—হিন্দু। হিন্দুর জীবন ধর্ম্মানুগত। ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশানুসারে আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, আত্মীয়-স্বজনের সহিত আত্মীয়তা করি, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করি, ভৃত্যাদি ও অনুগত জনের প্রতি সদ্ব্যবহার করি। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের ক্রিয়াকলাপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলই হিন্দুশাস্ত্রানুসারী। হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে আমরা রাজভক্তি-পরায়ণ। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজশক্তির সম্মান করিয়া আসিতেছি বলিয়া, আমাদের রাজভক্তির সুখ্যাতি আছে। আমরা রাজাকে দেবাংশ-সম্ভূত দেবতা বলিয়া জানি। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "জগৎ বিশৃঙ্খল হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হয়, এজন্য চরাচর রক্ষার্থ পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি, সূর্য্য, কুবের এই অষ্ট দিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশ হইতে রাজা নির্ম্মিত হইয়াছেন বলিয়া, তেজের আতিশয্য হেতু, তিনি সকল প্রাণীকেই অতিক্রম করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে কোন লোকই রাজাকে অভিমুখে অবলোকন করিতে সক্ষম নহে। প্রভাবে রাজা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের বরুণ এবং মহেন্দ্রের তুল্য। রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্য বোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। অসাবধান হইয়া যে ব্যক্তি অগ্নির নিকটস্থ হয়, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন; পরন্তু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে, সপরিবার, পশু ও দ্রব্যসমষ্টির সহিত নষ্ট হইতে হয়। প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ স্বকীয় শক্তি এবং দেশকালের পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা রাজধর্ম্মানুরোধে সকল প্রকার রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি প্রসন্ন হইয়া থাকিলে মহতী শ্রীলাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয় লাভ হয়, যাঁহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থল, নিশ্চিত তিনিই সর্ব্বতেজোময়। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ তাঁহাকে দ্বেষ করিয়া থাকে, সে নিশ্চিতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য রাজা সত্বর মনোযোগী হয়েন। অতএব রাজা দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন জন্য যে ধর্ম্মনিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে।*

অমিততেজা রাজগণ অগ্নি, ঈশ, চন্দ্র, যম ও বরুণদেবের মূর্ত্তি স্বরূপ। এজন্য রাজগণের প্রতি হিংসা আক্রোশ বা অবজ্ঞাবাক্য ব্যবহার করা কাহারও কর্ত্তব্য

* মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ৩—১২ শ্লোক।

নহে। দেবগণই ভূপতিরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিধাতা ইন্দ্র হইতে প্রভুত্ব, বহ্নি হইতে প্রতাপ, যম হইতে ক্রোধ, চন্দ্র হইতে সৌন্দর্য্য, কুবের হইতে ধন এবং ভগবান বিষ্ণু হইতে মধুর সত্ত্বগুণ লইয়া নৃপতিগণের শরীর সৃজন করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে রাজগণকে ইন্দ্র বলিয়া জানিবে; বস্তুতঃ ভূপতিগণ ইন্দ্র হইতে বিভিন্ন নহেন।"*

আমাদের ভারতসম্রাজ্যের অধীশ্বর ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন। যাঁহারা এ দেশে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করেন, তাঁহারা সম্রাটের ন্যায় আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইবার অধিকারী। তাঁহাদিগকে সম্রাটের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হিন্দু হইয়া, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ বাক্য অবনত মস্তকে মানিতে এবং তদনুবর্ত্তী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। যিনি তাহা না করেন, তিনি হিন্দুসমাজের আবর্জ্জনা বই আর কিছুই নহেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে আপনার বলিতে বাধ্য নহেন। শাস্ত্রোপদেশ পালন হিন্দুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "রাজা প্রসন্ন হইলে শ্রীসৌভাগ্য, সুখসম্পদ সমস্তই আয়ত্তাধীন হয়, সংসারী মাত্রেরই তাহা বাঞ্ছনীয়, রাজসেবায় ধর্ম্ম আছে, শ্রীসৌভাগ্য আছে। নরজন্মধারণে মনুষ্য আর কি কামনা করিতে পারে। অতএব রাজানুবর্ত্তী হইয়া শিষ্টশান্তভাবে কালযাপন করিতে পারিলেই, যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সহজেই রাজানুগৃহীত হইয়া, ঐহিক সুখ এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা পরকালে সুখী হইবার সুযোগসত্ত্বে, তাহা অবহেলা করে সে নির্ব্বোধ। রাজা আমাদিগকে রক্ষা করেন, অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করেন, এবং আমাদের সুখশান্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দতায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের সুশিক্ষার আয়োজন অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমাদের অশান্তি দূর করণার্থ তিনি পুলীশ রাখিয়াছেন, আদালত সংস্থাপিত করিয়া আমাদের হাতেই বিচারের ভার দিয়াছেন। যদি আমরা রাজবিধির অপলাপ করি, তাহার জন্য রাজা দোষী হইতে পারেন না। অনেকস্থলে আমাদের আপনাদের দোষ আমরা আপনারা দেখিতে না পাইয়া বিড়ম্বিত হই, মহামহিমান্বিত ভারতেশ্বর প্রত্যাশা করেন, আমরা তাঁহার এই সুবিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্য শাসনে তাঁহাকে সহায়তা করিব। এরূপ

* বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ৩য় অধ্যায় ৬—৯ শ্লোক।

সম্রাটের সাম্রাজ্যে বাস করিয়া আমাদের কিসের দুঃখ? আমরা আপনারা শিষ্ট শান্ত, রাজভক্ত হইতে পারিলেই সুখী। আজি অশীতিপর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে, "ইংরাজরাজত্বে অনেক সুখ, অনেক স্বচ্ছন্দতা।"

ইংরাজ-চরিত্র। ঋষিকল্প রাজা রামমোহন রায় আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনীমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, "ইংরাজ রাজত্বের উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না, আমি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের ভিতরে ও বাহিরে অনেক স্থান বেড়াইয়াছি। যখন আমার বয়স কুড়ি বৎসর, আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং পূর্ব্ববৎ স্নেহযত্ন করিতে থাকেন। বাড়ী আসিয়া আমি ইউরোপীয় সমাজে গতিবিধি করি, তাঁহাদের বিধি ব্যবস্থা ও রাজ্যশাসনপ্রণালী কতকটা অবগত হই, তাহাতে আমার পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হয় এবং তাঁহাদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান, বিবেচক, স্থির ও সংযতচরিত্র দেখিয়া তাঁহাদের পক্ষপাতী হই। বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, বিদেশীয়ের অধীন হইলেও ইংরাজশাসনে শীঘ্রই ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের নিশ্চিত সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। কাজেকর্ম্মে আমি তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছিলাম।*

আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজের সদ্‌গুণ স্বীকার করেন। ইংরাজ-চরিত্রে প্রশংসাযোগ্য অনেক সদ্‌গুণ আছে। ইংরাজের উন্নত জাতীয় ভাব ও জাতীয় চরিত্র আছে। যে জাতির শিক্ষাদীক্ষা বা সংস্রবগুণে তজ্জাতীয়

* When I reached the age of twenty, my father recalled me and restored me to his favour; after which I first saw and began to associate wlth the Europeans, and soon after make myself tolerably acquainted with their laws and form of Government. Fainding them, more intelligent, more steady and moderate in their conduct I gave up my prejudice against them and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amieloration of the native inhabitants; and I enjoyed the confidence of several of them even in their public capacity.

Auto-Biography of Raja Ram Mohan Roy,

সকলেরই পরস্পর ব্যবহারগত সামঞ্জস্য থাকে তাহাকেই জাতীয় চরিত্র বলে। দশ জন দশ রকমের হইলে তাহাদের চরিত্রে জাতীয়তা থাকে না। ইংরাজ-চরিত্রে আমরা সুস্পষ্ট জাতীয়তা দেখিতে পাই; এস্থলে দুই একটি উদাহরণ দিব।

আমাদের একজন সুযোগ্য বন্ধু একবার বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার কোন একটি যাদুঘর দেখিবার ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য তিনি পথে বাহির হইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, গন্তব্যপথ তাঁহার জানা ছিল না, কাজেই একজন বিলাতী শ্রামিককে সম্মুখে পাইয়া, তাহাকে যাদুঘরের পথ জিজ্ঞাসা করেন, শ্রামিক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এক মাইলেরও বেশী পথ গেল, এবং বিদেশীয় পথিককে যাদুঘর দেখাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলে, বন্ধুবর বিস্মিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে পথ দেখাইবার জন্যই এতটা পথ আসিলে?"

শ্রামিক উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ—যেখানে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেখান হইতে আমার কর্ম্মস্থান এতটাই হইবে। আপনি একজন বিদেশবাসী হইয়া আমাদের দেশের যাদুঘর দেখিবেন সেত আমার গৌরবের কথা আপনাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

বন্ধুবর পুনরায় বলিলেন, "তোমার এই বিলম্বের জন্যত খুব ক্ষতি হইল। তোমার প্রভু হয়ত রাগ করিবেন।"

শ্রামিক বলিল, "আমার প্রভু আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

ধন্য দেশ—ধন্য প্রভু—ধন্য ভৃত্য! ইহাকেই বলে প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি। আমাদের দেশে আমরা এরূপস্থলে কি করিয়া থাকি? তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই আপনাপন মনে বুঝিয়া দেখিলে তাহা জানিতে পারিবেন। ঐ ইংরাজ শ্রমিক হয় ত লেখাপড়া জানিত না, কিন্তু সংস্রবগুণে তাহার চরিত্রে এই মহত্ত্বটুকু জন্মিয়াছিল। ইহাকেই বলে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ।

বিলাতে গরীবদের পড়িবার জন্য "পেণি লাইব্রেরী" আছে। একটী পেণি-সেই পুস্তকালয়ে দিয়া যে কেহ যে কোন বহি ইচ্ছা পড়িতে লইয়া যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময় শেষে তাহা ফিরাইয়া দিতে হয়। সেই যাত্রাতেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধু ঐরূপ একটী পুস্তকাগারে গিয়া সেখানকার কার্য্যপ্রণালী দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে এক জন গরীব লোক আসিয়া একটী পেণি দিয়া পুস্তকা-

লয়ের অধ্যক্ষের নিকট একখানি এক পাউণ্ড মূল্যের পুস্তক লইয়া গেল। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ তখন তাহার নামধাম লিখিয়া লইলেন, দেখিয়া আমাদের ভারতবাসীবন্ধু পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ব্যক্তি কি আপনাদের পরিচিত?"

পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ বলিলেন, "না, আমাদের কাহারও পরিচিত নহে।" বন্ধু বলিলেন, "তবেত সে অনায়াসেই পুস্তকখানি আত্মসাৎ করিতে পারে?"

উত্তর। তা কেন করিবে, উপকৃত হইয়া কি কেহ প্রতারণা করিতে পারে?

এইবার আমাদের ভারতবাসী বন্ধু বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলেন, তাঁহার মুখে আর কথাটি নাই। উপকৃত হইয়া যে প্রবঞ্চনা করিতে নাই, তাহা বিলাতের সামান্য শ্রামিকেও জানে। বিলাতের নৈতিক উন্নতি কত অধিক। অতএব বিলাতবাসীর নিকট আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে শিখিবার আছে। এক কালে এদেশের লোকেরও যথেষ্ট নীতিজ্ঞান ছিল, এখনও পল্লীগ্রামের অনেক চাষা-ভুষার নিকট এরূপ শিক্ষা অনেক পাওয়া যায়। এখন তাহারা গো-বেচারা বা ভাল মানুষ বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ তাহারা সাদাসিধা লোক। আমরা ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ, চস্‌মা, চুরুট ইত্যাদি ব্যবহারে পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণ শিক্ষা করি, সৌখীন হইতে চেষ্টা করি, তাঁহাদের সদাচার, সচ্চরিত্রার দিক্ দিয়া যাই না; সে দোষ কাহার? ইংরাজ চরিত্রে উচ্চতা অনেক, যে জাতি যত উন্নত সে জাতির চরিত্র তত উন্নত হয়, যাঁহারা ইংরাজ জাতির সহিত মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

কৃষক বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী হইলে, সে কিরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতায় কালযাপন করিয়া সময়ে দশটাকা সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা একজন কৃষকের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এক কৃষকের পরিবারে সে আপনি, পত্নী, দুইটী শিশু সন্তান, বৃদ্ধা মাতা ও একটী বিধবা ভগ্নি আছে। তাহার দশ বিঘা শালি ও ৪/ বিঘা শুনা জমির একটী জোত, তাহার বার্ষিক খাজনা ৫৬৲ টাকা।

জমা

সন ১৩১৬ সাল তাং ২রা বৈশাখ।
মহাজন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের
নিকট ২টী বলদ খরিদ জন্য কর্জ্জ ৮০৲
সন মজকুরার ১০ই জ্যৈষ্ঠ।
উক্ত রায় মহাশয়ের নিকট
আবাদ খরচ ও সংসারখরচ
বাবদ কর্জ্জ ৯০৲
ঐ সন ১৬ই আষাঢ়
উক্ত রায় মহাশয়ের নিকট
আষাঢ় কিস্তির খাজন বাবতকর্জ্জ ১৫৲
৫ই অগ্রহায়ণ
৪/ বিঘা শুনা জমির উৎপন্ন
পাট বিক্রয় বিঘা প্রতি ৬/ মন
হিঃ ২৪/মন পাটের মূল্য
৬৲ টাকা মন হিসাবে ১৪৪৲
৪/ বিঘা শুনা জমির উৎপন্ন আলু
প্রতি বিঘা ৭০/ মন হিঃ
২৮০/মনের মূল্য ২৲ টাকা হিঃ ৫৬০৲*
১০ই ফাল্গুন।
১০/ বিঘা শালি জমির উৎপন্ন
ধান্য প্রতিবিঘা ১২/ হিসাবে
১২০/ মনের মূল্য ১৸০ হিঃ ২১০৲

মোট ১০৯৯৲

খরচ

সন ১৩১৬ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ
লাঙ্গল খরিদ বাবত ১৷৷০
২/মন বীজ ধান খরিদ ৩৷৷০
২১শে আষাঢ়—আষাঢ় কিস্তির খাজনা
বাবত ১৪৲, শেশ ৸৶০ ১৪৸৶০
১৫ই আশ্বিন—আশ্বিন কিস্তির খাজনা
বাবত ১৪৲, শেশ ৸৶ ১৪৸৶০
ঐ রোজ
ভৃত্যের বেতন ৬মাসের কাথ ২০৲
ঐ রোজ—
আলুবীজ বিঘাপ্রতি ৪/ মন হিঃ
১৬/ মনের মূল্য ৭৲ হিঃ ১১২৲
সার খরিদ বিঘা প্রতি ১৲ হিঃ ১০৲
২৫শে আশ্বিন
৪/ বিঘা শুনা জমিতে আলু আবাদ
জন্য বিঘাপ্রতি ৪/মন হিঃ ১৬/ মন
খইলের মূল্য ২৷৷০ হিঃ ৪০৲
২৫শে অগ্রহায়ণ
১০/বিঘা শালি জমিতে ধান্য আবাদ
ধানকাটা ও ধান ঝাড়াই মড়াই খরচ
বিঘা প্রতি ২৲ হিসাবে ২ ৲

* কৃষি সমাচার নামক মাসিক পত্রের ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যায় আলু-চাষের যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে জমির খাজানা বিঘা প্রতি ২৲ টাকা ধরা হইয়াছে। সর্ব্বত্র ২৲ টাকা খাজনায় আলুর জমি মিলে না, ৩৷৷৮ টাকা দিতে হয়। জমিতে খইলও সর্ব্বত্র একরূপ দিতে হয় না। নিতান্ত মন্দ জমিতেই ১০/ মন খইল লাগে, উৎপন্ন ফসল বিঘা প্রতি ১১০/ মনও ফলিতে দেখা যায়। কৃষি বিবরণে তাহাই দেখান হইয়াছে।

খরচ

জের	২৩৬৸৹
২৫শে পৌষ।	
পৌষ কিস্তির	
খাজনা ১৪৲ শেশ ৸৵	১৪৸৵৹
ভৃত্যের অবশিষ্ট ৬ মাসের বেতন	২০৲
সম্বৎসরের খোরাকী ধান্য দরুণ কৃষক পরিবার ৪ জন ও ভৃত্য ৫ জনের প্রত্যেকের ১৶ কাহন হিসাবে (১৬৶ মন) ৮০৶ মনের মূল্য ১৸৹ হিসাবে	১৪০৲
সম্বৎসরের মৎস্য	৬৲
নারিকেল তৈল ⁄৬সের	২।৹
জ্বালানী কেরোসিন তৈল মাসিক ৭ বোতল হিসাবে ৮৪ বোতল ⁄১০ আনা হিসাবে	৭৸৵
দেশেলাই মাসিক ৪টা হিঃ ৪৮ টার মূল্য	।৵৹
হাঁড়ী কলসী ইত্যাদি	৩৲
কৃষক পত্নীর চুড়ি ৪ জোড়া	৸৹
৲সিন্দূর	৶৹
পান বৎসরে	১॥৹
চুণ	৵৹
মোট	৩৩৩॥৶

খরচ

জের	৩৩৩॥৶৹
শীতকালে সর্ব্বদা গায়ে দিবার জন্য আপনার ও ভৃত্যের ১খানি হিঃ ২খানি বোম্বাই চাদর	১॥৹
কৃষকের শিশু ২টির বস্ত্র গড়ে	৬৲
কুটুম্বালয় ও মেলা মহোৎসবে যাইবার জন্য কৃষকের ভাল ধূতি ১ খানি	১।৵৹
উড়ানি এক খানি	॥৵৹
কামিজ ১টা	১৵৹
গেঞ্জি ২টা	১৲
জুতা ১ জোড়া	২॥৹
ছাতা ১ টা	১৵৹
শীতবস্ত্র হিসাবে গড়ে প্রতি বৎসর	৩৲
গরম কোট ১টা গড়ে বৎসরে	১॥৹
মহাজনের ঋণ ২০০ টাকা	
* সুদ মাসে গড়ে শতকরা ৩৵৹ হিঃ বৈশাখ হইতে নাগাইদ আশ্বিন	৩৭॥৹
কার্ত্তিক হইতে নাগাইদ পৌষ ২৩৭॥৹ টাকার সুদ	২২।৫
মোট	২৫৯৸৫
মোট	৬৫০।৶৹

কৈঃ—

জমা——১০৯৯৲

খরচ—— ৬৫০।৶

বাকী—৪৪৮॥⁄৹

আগামী বর্ষে কৃষকের গোরু, লাঙ্গল, বীজধান কিনিতে হইবে না, তাহার জন্য ৮৫৲ টাকা বাঁচিবে, সম্বৎসরের খোরাকী ধান থাকিবে; খাজনার জন্য মহাজনের নিকট হাত পাতিতে হইবে না।

* কর্জ্জের টাকা ভিন্ন সময়ে লওয়া হইলেও হিসাবের সুবিধার জন্য বৈশাখ হইতেই সুদের হিসাব দেওয়া গেল।

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ দিন দিন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চলিল। সমাদৃত কোকিল গুলি একে একে অজ্ঞাতদেশে প্রস্থান করিতেছে, আমাদের সাহিত্যসমাজের সর্ব্বজন সুপরিচিত সুনামলব্ধ বহুগুণশালী সাহিত্যবন্ধু বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহ-সংসারে আর নাই! বর্ত্তমান মাসের নবম দিবসে বেলা দুই প্রহরের সময় সর্ব্বগ্রাসী-করাল-কৃতান্ত-অকালে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়াছে। বাবু ইন্দ্রনাথ ক্রমাগত কয়েক বৎসর সুপ্রতিষ্ঠার সহিত জেলা বর্দ্ধমানের জজ আদালতে একজন শ্রেষ্ঠ উকীলের পদে ব্রত ছিলেন, কেবল এইমাত্র তাঁহার পরিচয় নহে; তাঁহার প্রসাদে বঙ্গীয়সাহিত্যের বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের গুণাবলী বর্ণনে ইহাও পর্য্যাপ্ত নহে, সামাজিক সকল সংগুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। তিনি যেমন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা, মিষ্টভাষী সদালাপী, বন্ধুবৎসল পর-দুঃখকাতর, নিঃস্বার্থ পরায়ণ ছিলেন, তেমন একটি অকপট বন্ধু আমরা আর শীঘ্র প্রাপ্ত হইব না। উক্ত অশুভসংবাদ ৯ই চৈত্রের টেলিগ্রামপাঠে আমরা সত্যই যেন বজ্রাহত হইয়াছিলাম। ইন্দ্রনাথের গুণের কথা আমরা আর বেশী কি বলিব? যাঁহারা একবার মাত্র তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়াছেন, তাঁহারাই অসাধারণ গুণাবলীর সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বঙ্গদেশে তাঁহার প্রিয় বন্ধু অসংখ্য, অকস্মাৎ এই নিদারুণ ঘটনায় তাঁহারা সকলেই গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছেন।

চরমে তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এইস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। ভীষ্মদেবের ইচ্ছামৃত্যু এ দেশের সকলেই মহাভারতে পাঠ করিয়াছেন, এখন শ্রবণ করুন ইন্দ্রনাথের ইচ্ছামৃত্যু। তাঁহার গ্রহণী পীড়া ছিল, উপযুক্ত সময়ে গঙ্গা-বাসী হইবার অভিপ্রায়ে কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নৈহাটী নামক স্থানে গঙ্গাতীরে তিনি একখানি নূতন বাটী প্রস্তুত করিবার আদেশ দেন, শীঘ্র শীঘ্র বাটী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, মাঘ মাসে পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিনি অভয়া চতুষ্পাঠির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণির সহিত নিত্য নিত্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলাপ করিতে থাকেন, তিনি সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, পীড়ার যন্ত্রণাতেও তাঁহাকে কেহ নিরানন্দ দর্শন করেন নাই! আনন্দ উৎসাহে তিনি বলিয়াছিলেন, "মহাপ্রস্থানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ১৪ই চৈত্র পার হইবে না।" তাহাই ঠিক হইল, দোলযাত্রার পর ৬ই চৈত্র বেলা ১০ টার সময় তিনি আপন জননীকে অগ্রে নৈহাটীতে প্রেরণ করিয়া তৎপরে স্বয়ং শিবিকারোহণে নৈহাটী গঙ্গাতীরস্থ

নূতন বাটীতে উপস্থিত হন, গঙ্গাতীরে তিনরাত্রি বাস হয়, ইতিমধ্যে তিনি স্বীয় সৎকার্য্যের জন্য কলিকাতা হইতে চন্দনকাষ্ঠ প্রেরণের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, চন্দনকাষ্ঠ প্রেরিত হইয়াছিল। গঙ্গাতীরের বাড়ীতে তাঁহার জননী, পত্নী, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, ভাগীনেয় প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রায় দুইশত স্ত্রীপুরুষ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ তথায় প্রায় আহার করিতেন। সে তিন দিন ইন্দ্রনাথের শরীরে কোন প্রকার পীড়ার লক্ষণ ছিল না; তিনি যেন দিব্য নিরাময় হইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই সহাস্যবদন। ৮ই চৈত্র ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "মা! সকলকে নিষেধ করিয়া দাও, এই শুভ প্রস্থান সময়ে কেহ যেন চক্ষের জল ফেলিয়া আমার শান্তির ব্যাঘাত না করে।" গঙ্গাবাসী হইয়াও তাঁহার পরমানন্দ। ৯ই চৈত্র বেলা দুই প্রহরের সময় স্বজ্ঞানে গঙ্গাদেবীর স্তব করিতে করিতে ধর্ম্মপ্রাণ ইন্দ্রনাথ জন্মের মত ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখনকার লোকের এরূপ ইচ্ছামৃত্যু প্রায় কুত্রাপি দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। বাবু ইন্দ্রনাথ ইহসংসারে নিত্য শান্তিপ্রিয় ছিলেন; পরলোকেও শান্তিধামে শান্তিময়ের ক্রোড়ে অনন্ত শান্তি উপভোগ করিতে থাকুন। তিনি স্বচ্ছন্দে সংসার হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার বৃদ্ধা জননী বাঁচিয়া রহিলেন; ইহাই অপরিসীম দুঃখের বিষয়।

১৭৭১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রামে বাবু ইন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন; পাণ্ডু গ্রাম তাঁহার মাতামহাশ্রম, পৈত্রিক নিবাস ঐ জেলার গঙ্গাটিকুরী গ্রাম। তাঁহার পিতা ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ণিয়া জজকোর্টের উকীল ছিলেন। শিশুকালে ইন্দ্রনাথ পূর্ণিয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত জীবনীতে দৃষ্ট হয়; পূর্ণিয়াতেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ। নবম বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ; সুতরাং পূর্ণিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা ও হুগলী প্রভৃতি স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্ব পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হন। ওকালতি করিবার পূর্ব্বে কয়েক মাস তিনি বীরভূমের হেতমপুর স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন, তাহার পর দিনাজপুরে ওকালতি, তৎপরে ৬ বৎসর হাইকোর্টে ওকালতী, পরিশেষে বর্দ্ধমানের জজ আদালতের উকীল হইয়া, বর্দ্ধমানেই ওকালতী করিতেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তপ্রেসে একখানি নাটক ছাপা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া

ইন্দ্রনাথের গ্রন্থকার হইবার ইচ্ছা হয়। নিজের জীবনীতে তিনি নিজে লিখিয়া-গিয়াছেন, সেইসময় একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করিয়া সেই পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন, "উৎকৃষ্ট কাব্যং"। মূল্য হইয়াছিল আড়াই পয়সা। কলেজ ষ্ট্রীটের বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ক্যানিং লাইব্রেরীতে" সেই "উৎকৃষ্ট কাব্যং" একদিনে ষোলখানি বিক্রীত হইয়া দশআনা পয়সা আদায় হয়, পাঁচজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া গ্রন্থকার সেই দশ আনার রসগোল্লা খাইয়াছিলেন। দিনাজপুরে অবস্থানকালে তিনি স্বর্ণলতা প্রণেতা ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে রাজসাহীর 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে প্রকাশার্থ ১২৮০ সালে 'কল্পতরু' লিখিতে আরম্ভ করেন; ১৮।১৯ দিনে কল্পতরু সমাপ্ত হইয়াছিল। জ্ঞানাঙ্কুরে ছাপা হয় নাই, বাবু ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় তাহা ছাপাইয়া নাম প্রচার করিয়াছিলেন। তদন্তর দিনকতক তিনি আর কোন পুস্তক রচনা করেন নাই। চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে তিনি অকপট মিত্রভাবে দাদা বলিতেন, সেই বন্ধুত্বের খাতিরে অক্ষয়বাবুর প্রচারিত "সাধারণী" পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। তৎপর ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি কতকগুলি কবিতা লিখিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন "ভারত উদ্ধার" তৎকালে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন, বৈকালে আদালত হইতে বাসায় আসিয়া খানিকক্ষণ লিখিতে বসিতেন, তিনটি বৈকালের পরিশ্রমেই "ভারত উদ্ধার" সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কলিকাতা ঠন্‌ঠনিয়া সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ইন্দ্রবাবুর বাসা ছিল। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মাঝে মাঝে সেই বাসায় আসিতেন, কয়েক দিন উভয়ে এক সঙ্গে বসিয়া একখানি প্রহসন লিখিয়া ফেলেন, নাম হইয়াছি, "হাতে হাতে ফল"। চুচুঁড়ার "সাধারণী যন্ত্রে" সেই প্রহসন ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু বাজারে বাহির হয় নাই। তাহার পর ঐ বাসাতেই পঞ্চানন্দের সূত্রপাত হয়, অক্ষয়চন্দ্রই পঞ্চানন্দ লিখিতে উপদেশ দেন, কয়েক পৃষ্ঠামাত্র লিখিয়া ইন্দ্রনাথ তাহা অক্ষয়বাবুর নিকট চুচুঁড়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অপেক্ষা না করিয়া অক্ষয়চন্দ্র সেইগুলি তাহার সাধারণী পত্রিকার উদরসাৎ করিয়াছিলেন। দুই তিনবার ঐরূপ হইবার পর ইন্দ্রবাবু একবার চুচুঁড়ায় যান, সরকার মহাশয়ের সঙ্গে একযোগে একখণ্ড 'পঞ্চানন্দ' লেখেন, 'পঞ্চানন্দ' নামে স্বতন্ত্র পত্রিকা বাহির হয়, কিন্তু একখণ্ডের অধিক প্রকাশ হয় নাই। সেইসময় ইন্দ্রবাবু ভবানীপুরে বাস করেন, তথায় ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্য-

বিশারদ প্রভৃতির আগ্রহে তিনি পঞ্চানন্দ লিখিতে থাকেন। তাঁহারা নিয়মিতরূপে কয়েকখণ্ড প্রকাশ করেন; কিছুদিন পরে ইন্দ্রবাবু হাইকোর্টের ওকালতি ত্যাগ করিয়া বৰ্দ্ধমানে চলিয়া যান। বৰ্দ্ধমান হইতেও কয়েকখণ্ড পঞ্চানন্দ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রবাবু নিয়মিতরূপে পত্রিকা বাহির করিবার অবসর পান নাই; বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু পঞ্চানন্দের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসেন। ক্রমান্বয়ে 'বঙ্গবাসী' পত্রে পঞ্চানন্দ বাহির হইতে থাকে। পঞ্চানন্দের কল্যাণে বঙ্গবাসীর নাম জাঁকিয়া উঠে, পাঠকও বাড়িয়া যায়; বাস্তবিক ইন্দ্রনাথের রসময়ি লেখনীপ্রসূত পঞ্চানন্দের তুল্য রসময় প্রবন্ধ আর কাহারও লেখনী হইতে নিঃসৃত হইবার আশা ছিল না। বঙ্গবাসীর সহিত ইন্দ্রবাবু সংশ্রব বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৰ্দ্ধন করিয়াছিল। বঙ্গবাসীর উপহারের জন্য "ক্ষুদিরাম" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিতে ইন্দ্রবাবু অনুরুদ্ধ হন; কিন্তু বৰ্দ্ধমানে বসিয়া পুস্তক লিখিবার অবসর হইল না, সুতরাং ৭।৮ দিন ওকালতি বন্ধ রাখিয়া তিনি শিবনিবাসে ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে গিয়া ক্ষুদিরাম লেখা শেষ করিলেন, 'বঙ্গবাসী প্রেসে' ছাপা হইয়া বিতরিত হইল। যে কয়েকখানি পুস্তকের নাম করা গেল, তাহা ছাড়া ইন্দ্রবাবুর আর কোন পুস্তক আছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "জন্মভূমি"র প্রতি সদয় হইয়া ধারাবাহিকরূপে অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ 'জন্মভূমি পত্রিকা'র প্রকাশার্থ প্রেরণ করিতেন, জন্মভূমির পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন।

ইন্দ্রনাথ বাবুর সমাজানুরক্তি ধর্ম্মানুরক্তি যেরূপ ছিল, ভগবৎ ভক্তি ও মাতৃভক্তি তদনুরূপ প্রশংসনীয় ছিল। ওকালতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াও পার্জ্জমানে তিনি এক দিনও ধর্ম্মের অনাদর করেন নাই। "মা! মা!" বলিয়া প্রতিদিন মাতৃপদ স্মরণ করিয়া তিনি আদালতে প্রবেশ করিতেন; যথাসাধ্য সত্য অবধারণ করিয়া তিনি ফরিয়াদি পক্ষের ওকালতনামা গ্রহণ করিতেন। আসামী পক্ষের সংশয়মুলক মোকৰ্দ্দমায় তিনি কদাচ পক্ষ সমর্থনে দণ্ডায়মান হইতেন না। উকীলের পক্ষে ইহা সাধারণ গৌরবের কথা নহে।

রসিকতায় সুরসিক ইন্দ্রনাথ সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করিতেন। বিষয়ী লোকের তদ্রূপ নির্দ্দোষ রসিকতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্পষ্টবাদিতায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন; বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের মুখের উপর তিনি উচিত কথা বলিতে তিনি ভীত অথবা শঙ্কুচিত হইতেন না। ইন্দ্রনাথের সমস্ত গুণাবলী

প্রকাশ করিতে এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় স্থানাভাব। তাদৃশ সর্ব্বজনরঞ্জন সর্ব্বগুণধাম ধর্ম্মশীল পণ্ডিতপুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বঙ্গদেশের বিস্তর উপকার হইত, আমাদের ভাগ্যবৈগুণ্যে তিনি অল্প বয়সে সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর মাত্র। এক্ষণে তাঁহার সেই আত্মা আত্মারামের পদতলে নিত্য সুখে বিরামলাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বকুলকুমারী।

লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল,

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রচ্ছন্ন অনুরাগ।

আরো তিনদিন অতীত হইল। মাখনলাল যেমন নিত্য রাত্রে রামজীবন বাবুর বাটীতে আহার করেন, যথানিয়মে সেইরূপ চলিতেছে। পরিচয়ে একটী সম্পর্ক হইয়াছে, অতএব মাখনলাল অন্দর মহলেই আহার করিতে যান। কর্ত্তা হইয়াছেন, কাকা, গৃহিণী হইয়াছেন, কাকী মা; সেই সম্পর্কে নিতম্বিনীও তাঁহাকে দাদা বলে, সম্মুখে বাহির হওয়া দোষ মনে করে না।

চতুর্থ রজনীতে মাখনলাল আহারান্তে বিদায় গ্রহণ করিলে বাবু শয়ন করিতে যান, গৃহিণীও কিয়ৎক্ষণ পরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। শয়নকক্ষের দুইদিকে দুইটী দরজা; গ্রীষ্মকাল, দরজা জানালা খোলা রহিল। সেই গৃহের পূর্ব্বদিকে যে ঘরটী সেই ঘরে নিতম্বিনী শয়ন করে, সেই ঘরের পার্শ্বে অন্য এক ঘরে সুকুমারী ও পদ্মাবতীর শয়নের স্থান। গৃহিণীর ঘর ও নিতম্বিনীর ঘরের মধ্যস্থলের দরজাটী অর্দ্ধাবৃত ছিল। আপন ঘরের একধারে বসিয়া নিতম্বিনী একমনে কারপেট বুনিতেছিল।

শয়নের অগ্রে তাম্রকূটধুম সেবন করিতে করিতে পার্শ্বোপবিষ্টা গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া অল্প উচ্চকণ্ঠে কর্ত্তাবাবু বলিলেন, "শুন শুন ভারী একটা মজার কথা।"

মৃদু হাস্য করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "মাঝে মাঝে প্রায়ইতো তুমি মজার কথা আনো, সমস্ত দিন পরের মামলায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকো, এতো মজার কথা পাও কোথা ?"

গম্ভীরবদনে কর্ত্তা বলিলেন, "সে রকম নয়, ঘরাও মজা। সে দিন মোক্ষদার-মুখে শুনেছি, যে মেয়েটী সৌদামিনী নামে পরিচয় দিয়ে, আমাদের বাড়ীতে আছে, তাহার সত্য নাম সুকুমারী, কোন্নগরে তার পিত্রালয়, পিতার নাম ত্রিলোচন মল্লিক; গ্রামসম্পর্কে ত্রিলোচনকে আমি দাদা বলিতাম, সে সম্পর্কে সুকুমারী আমার ভাইঝি হয়। মোক্ষদা বোলেছে যার সঙ্গে সুকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল, তার নাম মাখনলাল মিত্র। বিবাহের পর অবধি উভয়ে দেখাসাক্ষাৎ নাই।"

কথাগুলি অল্প অল্প নিতম্বিনীর কর্ণে গেল। মোক্ষদা, সৌদামিনী ও মাখনলালের নাম শ্রবণে, তাহার মনে কি একটা কৌতুহল জন্মিল। অর্দ্ধসমাপ্ত কারপেট হস্তে ধীরে ধীরে উঠিয়া নিঃশব্দে অর্দ্ধাবৃত দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা আমাকে আরো বলেছে, সে কার মুখে শুনেছে সেই মাখনলাল কলিকাতায় পুনর্ব্বার বিবাহ কোরে ঘরজামাই হ'য়ে আছে। বুঝ্‌তে পাল্লে কিছু ? যে মাখনলাল সর্ব্বদা আমার কাছে আসে, আমাদের বাড়ীতে আহার করে, সেই মাখনলাল এই পাড়ার গৌড়ীপ্রসাদ দত্তের ঘরজামাই। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এই মাখনলালই সেই মাখনলাল; এই মাখনলালই সুকুমারীর স্বামী; সুকুমারীর সঙ্গে তাহার প্রথম বিবাহ হয়েছিল।"

চমকিতা হইয়া গৃহিণী বলিলেন, "বল কি ? তবে তো একরকম ভালই হোলো। সৌদামিনীকে বাড়ীতে রেখে আমি তো তবে ভাল কাজই করেছি। আহা! বিয়ে হয়ে অবধি মেয়েটী স্বামীর মুখ দেখেনি, বিধাতার যদি মনে থাকে তবে তো এইখানেই মিলন হ'তে পারে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "আমিও তাই ভেবেছি। কথাটা কিন্তু কাহাকেও বোলিনি কেবল শুনে রেখেছি মাত্র; তুমিও এখন কারো কাছে কিছু প্রকাশ কোরো না। দেখা যাক্ কিসে কি দাঁড়ায়। পরস্পর যাতে দেখা হয় তুমি তার চেষ্টা কর।"

গৃহিণী। আমি কি রকমে চেষ্টা পাবো?

কর্ত্তা। কেন বেশ উপায় আছে। রাত্রে আমি যখন আহারে বসি, মাখনলাল তখন আমার কাছেই বসে; নিত্য নিত্য তুমি পরিবেশন কর, এখন অবধি তুমি আর এসো না, সৌদামিনীকেই পরিবেশন কোত্তে দিও।

গৃহিণী। তা হ'লে কি হবে? চেনাশুনা নাই, কেমন কোরে কে কারে চিন্‌বে?

কর্ত্তা। সেটা পরের কথা। যা বোল্লেম, তাই তুমি কর; তার পর বিবেচনা করা যাবে।

সে রাত্রে এই পর্য্যন্ত কথা। অন্তরালে থাকিয়া সব কথাগুলি নিতম্বিনী শ্রবণ করিল; তাহার মনে পরমকৌতুক। কর্ত্তার শেষ কথাগুলি শুনিয়া গৃহিণী একটু হাস্য করিলেন। নিতম্বিনী সেখান হইতে সরিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ আপন কার্য্যে বসিল।

পরদিন রাত্রিকালে যথাসময়ে মাখনলালের সঙ্গে রামজীবন বাবু আহারে বসিলেন, সুকুমারী ওরফে সৌদামিনী অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া পরিবেশন করিতে বাহির হইল, দুই তিনবার আসিল, যাহাকে যাহা দিতে হইবে, পশ্চাতে থাকিয়া গৃহিণী তাহা বলিয়া বলিয়া দিলেন। নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া মাখনলাল আড়ে আড়ে দুই তিনবার সৌদামিনীর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সে রাত্রের অভিনয় ঐ পর্য্যন্ত।

তাহার পর আরো তিনরাত্রি ঐরূপ নূতন অভিনয়। প্রায় সমস্ত লোকের ধারণা আছে, সচরাচর উপন্যাস-পুস্তকে অবিচ্ছেদে দৃষ্ট হয়, রাজপুত্র হইলে পরম সুন্দর, রাজকন্যা হইলে পরম সুন্দরী হইতেই হইবে; চক্ষে না দেখিলেও অনুমানে বুঝিতেই হইবে। বকুলকুমারী রাজকন্যা না হইলেও বড় মানুষের কন্যা সুন্দরী না হইলেও ভোগবিলাসে দিব্য লাবণ্যবতী; সুকুমারী ওরফে সৌদামিনী গরীবের কন্যা, অযত্নে তাহার সৌন্দর্য্যের জ্যোতি তত বিকাশ হইতে পায় নাই। কিন্তু স্বভাবতঃ সুকুমারী পরম রূপবতী। বিধাতার বিচিত্র সংঘটন মাখনলাল মিত্র উপর্য্যুপরি চারিদিন সেই রূপ দর্শন করিয়া মনে মনে তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া উঠিলেন, কি প্রকারে তাহার সহিত একবার নির্জ্জনে দেখা হয়, মনে মনে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবসর ঘটিয়া উঠিল না। নিত্য নিত্য সৌদামিনী পরিবেশন করে, আহারের দিকে মাখনলালের মন থাকে না, চক্ষু কেবল অলক্ষিতে পরিবেশিকার রূপের দিকে সমাকৃষ্ট। প্রাণ হু হু করে.

বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ হয় না, চিত্ত যেন সর্ব্বদাই বিচলিত। সকলেই জানেন, নূতন অনুরাগের এই প্রকার লক্ষণ। সৌদামিনীর প্রতি মাখনলালের প্রচ্ছন্ন অনুরাগ। পরিবেশনের সময় অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে সৌদামিনীও এক একবার সেই দিকে কটাক্ষ ঘুরায়; মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, কিছুই বুঝা যায় না।

নিতম্বিনী অবশ্য সৌদামিনীকে ভাল বাসিয়াছে; আদর করিয়া সদু সদু বলিয়া ডাকে; সৌদামিনী পতি-বিরহিণী, সেই দুঃখে মনে মনে কষ্ট অনুভব করে। একদিন বেলা দুইপ্রহরের পর আহারান্তে বিশ্রাম করিবার সময় সৌদামিনীকে নিকটে বসাইয়া এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর নিতম্বিনী কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল সদু! নিত্য রাত্রে যে নূতন বাবুটিকে তুই পরিবেশন করিস, তোর চক্ষু তাকে কেমন দেখে? আড়ে আড়ে তার পানে তুই চক্ষু ফিরাস, তাও আমি দেখেছি। তাকে কি তুই চিন্‌তে পারিস?

মুখ ভারী করিয়া, চক্ষু পাকাইয়া সৌদামিনী বলিল "ঐ তোমার কেমন এক রকমকথা! আমি তাকে কেমন কোরে চিন্‌বো? নূতন মানুষ তোমাদের বাড়ীর লোক নয়, আমি তারে চিন্‌বো কিরূপে?"

নিতম্বিনী। না না, সে কথা নয়, সে কথা বোল্‌ছি না।—পূর্ব্বে কি কখনো তারে দেখেছিস্ মনে হয়?

সৌদামিনী। কোন জন্মেও না।

নিতম। সে তবে তোর পানে তেমন কোরে চেয়ে থাকে কেন?

সৌদা। তাই বা কেমন কোরে জান্‌বো? তার মনের কথা, তার মনের ভাব, সে জানে। পুরুষ মানুষের স্বভাব-দোষ।

নিতম। সকল পুরুষের স্বভাবদোষ থাকে না। আচ্ছা ভাই, একটা কথা বলি, রাগ করিস্ নি, মন্দ ভাবিস্ নি,—আচ্ছা যার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল, তার চেহারা কি তোর মনে আছে?

সৌদা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরোষে) যাও তুমি! বার বার যদি তুমি ঐ রকম কথা বল, তবে আর আমি পরিবেশন কোত্তে যাব না।

সৌদামিনী বাহির হইয়া গেল, নিতম্বিনী আপন মনে হাসিল। এরূপ অজ্ঞাত সম্বন্ধ হঠাৎ না ভাঙ্গিয়া, অল্পে অল্পে প্রকাশ করাই ভাল, ইহাই নিতম্বিনীর মানসিক সিদ্ধান্ত।

দনমানের ঘটনা এইরূপ, রাত্রিকালে কর্ত্তা ও মাখনলাল আহার করিতে

আসিলেন গৃহিণী সৌদামিনীকে পরিবেশন করিতে বলিলেন, একটু জড়সড় হইয়া সৌদামিনী মৃদুস্বরে বলিল, "আমি যাব না।"

গৃহিণী। কেন মা?

সৌদামিনী। ঐ বাবুটী ঘন ঘন আমার দিকে চায়, আমার বড় লজ্জা হয়; দিদিও ঠাট্টা করে।

গৃহিণী। (হাস্য করিয়া) নিতি তোমাকে ক্ষেপিয়েছে। সেটা তার তামাসা! মাখন আমাদের ঘরের ছেলের মতন, তার কাছে লজ্জা কোত্তে হবে না। তার চাউনিটা ঐ রকম ফ্যাল্‌ফেলে, কখন কোন্ দিকে চায়, ঠিক্ বোঝা যায় না। সে সব তুমি কিছু মনে কোরো না, যাও মা, পরিবেশন করগে।

কথা কাটাকাটি না করিয়া, বেশী করিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া সৌদামিনী পরিবেশন করিতে গেল, শীঘ্র শীঘ্র পরিবেশন করিয়া ফিরিয়া আসিল। মাখন-লালের চঞ্চলদৃষ্টি সে রাত্রেও সমভাব।

এক মাস এই রকম। ইতিমধ্যে একদিন আহারের পর মোক্ষদা মাখন-লালকে পান দিতে গেল, নিকটে কেহ ছিল না, অবসর পাইয়া মাখনলাল তাহাকে পাঁচ রকমের পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাটা কাটা কথায় মোক্ষদা সে সব প্রশ্নের এক একটা ছোট ছোট জবাব দিল। তাহার পর মাখনলাল তাহাকে চুপি চুপি বলিলেন, "ঐ যে মেয়েটী, যার নাম সৌদামিনী, যে আমাদের পরি-বেশন করে, নির্জ্জনে তার সঙ্গে একবার আমার দেখা করিয়ে দিতে পার?"

মোক্ষদা একটু শিহরিয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে সৌদামিনীর সহিত নিতম্বিনীর যে দিন গোপনে কিছু কিছু আভাবের কথা হয়, গবাক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মোক্ষদা তাহা শুনিয়াছিল; সেই কথা তখন তাহার মনে পড়িল। মস্তক অবনত করিয়া মাখনলালের প্রশ্নে প্রতিপ্রশ্ন করিল,—"কেনগা? কি জন্যে?"

মাখন। একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো।

মোক্ষদা। কি কথা?

মাখন। সে কথা তোমার জান্‌বার দরকার নাই।

মোক্ষদা। ও মা! সে কি কথা? ভদ্রকুলের মেয়ে, জানাশুনা নেই, গোপনে তাকে তুমি কি কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বে?

মাখন। মন্দকথা কিছুই না, অন্য বিষয়ের একটী সামান্য কথা মাত্র।

মোক্ষদা। (নতমুখে হাস্য করিয়া মৃদুস্বরে) তুমি আমাকে হীরে মালিনী বানাতে চাও নাকি? আচ্ছা, যদি দেখা করিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে আমি কি বক্সিস্ পাবো?

মাখন। যা চাও তাই।

মোক্ষদা। ঠিক্ আমি স্বীকার কোত্তে পাচ্ছি না, তাকে জিজ্ঞাসা কোরে যা হয়, খবর দেবো।

মাখন। খবরটা কবে পাবো?

মোক্ষদা। যদি রাজী হয়, তবে দু'তিন দিনের মধ্যেই শুনতে পাবে।

মাখন। দেখো, ভুলো না।

মোক্ষদা। (মৃদু হাসিয়া) না, ভুল্‌বো কেন, ঠিক্ আমার মনে থাক্‌বে।

সে দিনের এই পর্য্যন্ত কথা। "বড় মজাই হবে!" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষদা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

পাঁচদিন পরে রবিবার আসিল। সন্ধ্যার পর বাবু আর মাখনলাল বৈঠকখানায় পাঁচরকম গল্প করিতেছেন, ঘর সংসারের কথা উঠিয়াছে, সেই অবসরে একটু ফাঁক পাইয়া মৃদু রচনে মাখনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে মেয়েটী নিত্য আমাদের পরিবেশন করে, ওটী আপনার কে হয়?"

বাবু বলিলেন, "এমন কেহ হয় না, কুটুম্বের মেয়ে, বেশ সচ্চরিত্রা, দুঃখের দশায় পড়েছে, রক্ষণাবেক্ষণের কেহই নাই, সেইজন্য বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছি। অতি সুশীলা দিব্য নম্র স্বভাব।

আরো কিছু জিজ্ঞাসা করা মাখনলালের ইচ্ছা ছিল, পাছে কর্ত্তা কিছু দুষ্যভাব মনে করেন, সেই সন্দেহে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না, চাপিয়া গেলেন; অন্য কথা উঠিল।

তাহার পর আর এক সপ্তাহ। আবার পূর্ব্ববৎ বিশ্রামকালে নিতম্বিনী আর সৌদামিনী এক ঘরে গল্প করিতে করিতে পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া নিতম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুদের পরিবেশন কোত্তে এখন তো আর তোর লজ্জা হয় না? মাখনদাদা এখনও সেই রকম তোর পানে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখে, তা কি তুই দেখ্‌তে পাশ? সে দিন একটা কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম, রাগ কোরে ফর্‌ফরিয়ে উঠে পালালি, আজ আর রাগ করিস্‌নি ভাই, সত্য কোরে বল দেখি, যার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল, তার চেহারা কি তোর মনে পড়ে?

"আবার সেই কথা তুল্‌চো ? তবে আর আমি এখানে বোস্‌বো না।" এই বলিয়া সৌদামিনী উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, নিতম্বিনী তাহার এক-খানি হাত ধরিয়া বসাইল। একবার গৃহিণীর মুখে, দ্বিতীয়বার নিতম্বিনীর মুখে "মাখন নামটি শ্রবণ করিয়া, সৌদামিনীর মন কেমন তর্কিয়া ছিল ; নিতম্বিনী দেখিল, সৌদামিনীর মুখখানি ঈষৎ আরক্ত হইয়াছে, আরও সুযোগ পাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোর বরের চেহারা আর মাখনদাদার চেহারা কি ঠিক্ এক রকম ? কথা বোল্লেই রাগ করিস্, তোলিয়ে কিছুই বুঝিস্ না, তাতেই আমার হাসি পায়। এতদিন পরে আমি ঠিক শুনেছি, ঐ মাখনদাদাই তোর বর। বুঝ্‌লি পাগলী ? তোকে বিয়ে কোরে এসে, আমাদের পাড়ায় আর একটী বাবুর মেয়েকে বিয়ে কোরে ঘর জামাই হ'য়ে আছে, তাতেই তোকে ভুলে রয়েছে।

অধোবদনে সৌদামিনী নীরব। নিতম্বিনী দেখিল, সৌদামিনীর দুটী চক্ষে জলধারা। অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, বুঝাইয়া বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিয়া, নিতম্বিনী আবার বলিল, "কাঁদিস্ কেন, আর ভাবনা কি ? এতদিনের্ পর স্বামী-সোহাগে সুখী হবি। মা কালীর দিব্বি কোরে আমি বোল্‌চি, ঠাট্টা নয়, আমার একটী কথাও মিথ্যা নয়। সত্তি সত্তি মাখনদাদা তোর বর।"

"ঐ তোর পতি লো পাঞ্চালি ;
বরমালা দিয়ে গলে বর নরবরে।"

সৌদামিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই প্রসঙ্গে নিতম্বিনী আরও অনেকগুলি কথা বলিল, তাহার পর দুজনে উঠিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে গেল।

এদিনও পদ্মাবতী গুপ্তশ্রোতা।



পুরাতন জ্বরে ঘৃত প্রয়োগ ও ক্ষয়প্রতিশেধ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিনোদলাল দাসগুপ্ত কবিভূষণ।

আজকাল জ্বরাবস্থায় ঘৃতসংযুত ঔষধ ব্যবহার করিতে অধিকাংশ চিকিৎসক-একান্ত নারাজ, আবার কোন কোন চিকিৎসক উহা ব্যবহার করাইয়াও অনেক-স্থলে বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন। এইজন্য ক্রমে ঘৃত প্রয়োগ উঠিয়া যাইতেছে পক্ষান্তরে দীর্ঘকাল কোন ব্যক্তি জ্বররোগে পীড়িত থাকিলে ক্রমে সেই জ্বর বদ্ধ-মূল হইয়া রোগান্তর অর্থাৎ ক্ষয়রোগে পরিণত হয়, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। কারণ জ্বর দীর্ঘকাল শরীরে প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্যরূপে থাকিলেই পরপর ধাতু-সকলকে ক্রমে দুর্ব্বল করিতে থাকে। সুতরাং সেই দুর্ব্বলতা নিবৃত্ত না হইলে যে ক্ষয়রোগ জন্মিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে জ্বর কি এবং উহা জীর্ণ বা পুরাতন অবস্থায় শরীর যন্ত্রাদির প্রতি কিরূপ ক্রিয়া করে তাহা জানা আব-শ্যক।

আমাশয়স্থোগ্নিং হত্বাপি সামো মার্গানদিধায় যদ্বিধাতি জ্বরং দোষঃ—

সামদোষ অর্থাৎ অপক্ক রস, আমাশয়ে অবস্থিত হইয়া অগ্নিমান্দ্য করতঃ শরীরস্থ রসবহ ও ঘর্ম্মবহ স্রোতপথ সকলকে অবরোধ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে।

অন্যত্রত

দুষ্টাঃ স্বহেতুভির্দোষাঃ প্রাপ্যামাশয় মুষ্মণা।
সহিতা রসমাগত্য রসস্বেদ প্রবাহিনাম্॥
স্রোতসাং মার্গমাগত্য মন্দীকৃত্য হুতাশনম্।
নিরস্য বহিরূষ্মানং পক্তিস্থানাচ্চকেবলম্॥
শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জ্বরাগমম্।
জনজয়ন্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ স্ববর্ণঞ্চ ত্বগাদিষু॥
তৈবৈর্গাত্রৈর্বহুধা সমুদভ্রান্তৈর্বিমার্গগৈঃ।
বিক্ষিপ্যমানোঽন্তরগ্নির্ভবত্যান্ত বহিশ্চরঃ॥
রুণাদ্ধিবাপ্যপাং ধাতুং যস্মাৎতস্মাৎ জ্বরাতুরঃ ... ...

স্ব স্ব হেতুতে দোষ সকল দুষ্ট হইয়া ও উষ্মার সহিত আমাশয়ে গত হইয়া রস ও স্বেদবাহী স্রোত সকলের সহিত রসকে আক্রমণ করতঃ স্রোতপথ সকলকে অবরুদ্ধ করে এবং অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পাকস্থান হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেয় এবং স্ব স্ব সময়ে জ্বর উৎপাদন করে। তদনন্তর স্ব স্ব ক্রিয়ারি শক্তি

বৃদ্ধি করে এবং ত্বক নয়ন মূত্রাদিতে স্ব স্ব বর্ণ উৎপাদন করে।

দোষ সকল বেগবান হইয়া বহুপ্রকারে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিমার্গগামী হয় এবং অন্তরগ্নিকে বহির্দ্দেশে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে; এবং তাহাতে জলধাতুর মার্গ-রোধ হয় (বহিরুষ্মা শরীরকে উত্তপ্ত করে)।

অন্যত্রত—

সংসৃষ্টাঃ সন্নিপতিতাঃ পৃথগ্বাঃ কুপিতামলাঃ।
রসাখ্যং ধাতুমন্বেত্য স্থানান্নিস্তর চ॥
স্বেনবেনোষ্মনাটেব কৃত্বা দোহাগ্নণোবলম্।
স্রোতাং কি রুদ্ধা সম্প্রাপ্তাঃ কেবলং দেহমুল্বণাঃ।
সন্তাপমধিকং দেহে জনয়ন্তি নরাস্তদা।
ভবত্যত্যুষ্ণ সর্ব্বাঙ্গো জ্বরিতস্তেন চোব্যতে॥

কুপিত বায়ু পিত্তাদি দোষ সকল একক বা মিশ্রিতভাবে রস নামক ধাতুকে (আমাশয়স্থারসকে) প্রাপ্ত হইয়া পাচকাগ্নিকে স্থানচ্যুত করে এবং সেই পাচকাগ্নির উষ্মদ্বারা দেহের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া স্রোতসমূহ রুদ্ধ করতঃ দেহকে অধিকার করে এবং অধিক সন্তাপ জন্মাইয়া থাকে। তখন মানুষের সর্ব্বাঙ্গ অতীব উষ্ণ হইয়া থাকে, এই অবস্থার নাম জ্বর।

সুতরাং দেখা গেল যে অপক্ক রসই বায়ু আদির প্রভাব হেতু তাহাতে অনুগত হইয়া তরুণ জ্বর উৎপাদন করে। কিন্তু ঐ দোষ যদি সামান্যরূপেও আমাশয়ে থাকিয়া যায়, অথবা অহিত আহারবিহারাদির দ্বারা দোষের প্রকোপ বিষয়ে সহায়তা লাভ করে তখন রস ব্যতীত অন্য রক্তাদি ধাতু সকলকে স্ববশে আনিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে। অপিচ চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং দৃষ্টতেও দেখা যায় রস বা জলীয় অংশ নাশ করিতে হইলে দ্রব্যকে শুষ্ক করা আবশ্যক। সেইজন্য তরুণ জ্বরে উপবাসাদির দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করান হয় এবং রস শোধক, উষ্ণবীর্য্য ঔষধাদি প্রযুক্ত হয়। এইরূপে সংক্ষেপে বলা যায় যে রস বৃদ্ধিই সাধারণতঃ তরুণ জ্বরের হেতু এবং রসাদি ক্ষয়বশতঃই পুরাতন জ্বর বা বিষম জ্বর ঘটিয়া থাকে তাহা নিম্নোক্ত শাস্ত্রবচনী দ্বারাই প্রমাণীকৃত হয়।

দেহ ধাত্ববলত্বাচ্চ জ্বরোজীর্ণোনুবর্ত্ততে।

ইহার অর্থ এই যে দেহ ও দেহস্থিত ধাতুর অবলত্ব হেতু অর্থাৎ দৌর্ব্বল্য হেতু জীর্ণ জ্বর অনুবর্ত্তিত হয়, নব জ্বরকে অনুবর্ত্তন করে, এই কারণে শরীরাগ্নিও

কতকপরিমাণে মন্দীভূত হয়, কাজেই অধিকাংশস্থলে অগ্নিমান্দ্যপ্রযুক্ত অজীর্ণ এবং ধাত্বাদির দৌর্ব্বল্যহেতু যকৃত প্লীহাদির শরীরের উপর ক্রিয়া মন্দীভূত হইতে থাকে, ইহার প্রতীকার করিতে হইলে যাহাতে উপচায় ক্রিয়া মন্দীভূত না হয়, তদ্রূপ কারণ অবলম্বন করা আবশ্যক। আবার যখন ঐ উপচয় ক্রিয়া নাশ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তখন দুর্ব্বলতানাশ হইলেই অপচয় ক্রিয়া রহিত হইবে। এখন দেখা আবশ্যক কোন উপায়দ্বারা ঐ অপচয় ক্রিয়া ও দুর্ব্বলতা নাশ করা যায়, তদুত্তরে বলা যায় যে, মাংসরস, দুগ্ধ ও ঘৃতাদিই শরীরকে ও ধাত্বাদিকে সবল করে। ইহার মধ্যে কোনটির কিরূপ গুণ তাহার আলোচনা করিয়া যেটী প্রকৃষ্টতম তাহাই ব্যবহার আবশ্যক। প্রথমতঃ ঘৃতের গুণ কি তাহাই দেখা যাউক :—

শাস্ত্র বলিতেছেন :—

ঘৃতন্তু সৌম্যং শীতবীর্য্যং মৃদুমধুরমমৃত সল্পাভিষ্যন্দি
স্নেহন মুদাবর্ত্তোন্মাদপস্মার শূল জ্বরানাহ বাতপিত্ত প্রশমন
মগ্নিদীপন স্মৃতিমতিমেধা কান্তিস্বরলাবণ্য সৌকুমার্য্যোজ
স্তেজ বলকরমায়ুষ্যং বৃষ্যং মেধ্যং বয়ঃ স্থাপনং গুরু চক্ষুষ্যং
শ্লেষ্মাভি বর্দ্ধনং পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং বিষহরং রক্ষোঘ্নঞ্চ। সুশ্রুতঃ

সোম গুণশালী, শীতবীর্য্য, মৃদুমধুর ও অল্প অভিষ্যন্দি স্নেহন এই কয়টী ঘৃতের সাধারণ গুণ; আর উদাবর্ত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, শূল, জ্বর, আনাহ প্রভৃতি পীড়ানাশক বাতপিত্ত প্রশমনকারক অপিচ অগ্নিদীপক, স্মৃতি বুদ্ধি মেধা, কান্তি স্বর, লাবণ্য সৌকুমার্য্য, তেজ ও বলবর্দ্ধক, আয়ুস্থাপক বৃষ্য, মেধা, বয়স্থাপক, গুরু, বায়ুর হিতকারক, পাপ ও অলক্ষ্মী নাশক, বিষহর ও রক্ষোদোষ নাশক। সুতরাং দেখা যায় যে, যে কোন প্রকার ক্ষয়ই হউক না কেন কেবল মাত্র ঘৃত-ব্যবহারে তাহা পূর্ণ হয়। আবার ঘৃতমধ্যে গব্যঘৃত কতদূর শ্রেষ্ঠ তাহাও বলিতেছেন।

বিপাকে মধুরং শীতং বাতাপিত্ত বিষাপহম্।
চক্ষুষ্যমগ্র্যং বল্যঞ্চ গব্যং সর্পিগুণোত্তরম্॥

গব্যঘৃত বিপাকে মধুর, শীতবীর্য্য বাত পিত্ত ও বিষদোষনাশক। চক্ষুর দীপ্তিকারক ও সর্ব্বপ্রকার নেত্রপীড়ায় উপকারী, বল্য ও গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তার পর ঘৃত সম্বন্ধে ইহাও বলিয়াছেন যে, দ্রব্যান্তর যোগে ঘৃত নিজগুণ বজায় রাখিয়া অন্য দ্রব্যের গুণও বিশেষরূপ গ্রহণ করে।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা বাগ্‌ভট বলেন :—

শস্তং ধীস্মৃতিমেধাগ্নিবলায়ুঃ শুক্রচক্ষুষাম্
বালবৃদ্ধ প্রজাকান্তি সৌকুমার্য্য স্বরার্থিনাম
ক্ষত ক্ষীণ পরীসর্পশস্ত্রাগ্নিগ্লপিতাত্মনাম্
বাতপিত্ত বিষোন্মাদ শোষালক্ষ্মী জ্বরাপহম্
স্নেহানামুত্তমং শীতং বয়সঃ স্থাপনং পরম্
সহস্র বীর্য্যং বিধিভির্ঘৃতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ।

বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা অগ্নি, বল, আয়ু, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুষ্য। ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ হিতকারক; শরীরের কান্তি ও কোমলতা জনক, স্বর প্রসাদক ক্ষতক্ষীণ ও বিসর্প রোগে এবং শস্ত্রপ্রয়োগ ও অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা ক্লান্ত জনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। ইহা বাত; পিত্ত, বিষ, উন্মাদ, শোষ, শ্রীহীনতা ও জ্বর নাশক। আর ইহা সর্ব্বপ্রকার স্নেহপদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, শীতবীর্য্য বয়স্থাপক। ইহার আর একটি বিশেষ শক্তি যে, যথানিয়মে দ্রব্যসংযোগ বা পাক হইলে ইহা যোগবাহিত্ব গুণে অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট হয়; সুতরাং বহুরোগে প্রযুক্ত হইয়া অভিমত ফল দান করে। ঘৃতের উপযোগীতা সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ আছে, প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে কেবল ২।৩টি উল্লেখ করা যাইতেছে।

বুদ্ধ্যগ্নি শুক্রোজো মেদঃ স্মৃতি কফকারি
বাতপিত্ত বিষোন্মাদ রোগ শোথালক্ষ্মী জ্বরনাশি
মাংসাদষ্ট গুণ গুরুত্বঞ্চ। রাজবল্লভঃ

বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, ওজ, মেদ, স্মৃতি, এবং কফকারক, বায়ু, পিত্ত, বিষদোষ, উন্মাদ, শোথ, অলক্ষ্মী ও জ্বরনাশক, মাংস হইতে অষ্টগুণ গুরু।

তারপর পুনঃ বলিতেছেন :—

চক্ষুর্হিত, দীপন, রুচি বলকারি, বৃংহন বৃষ্য বিষমজ্বর নাশিত্যঞ্চ।

চক্ষুস্য, অগ্নিদ্দীপক, রুচি ও বলকারক, বৃংহন, বৃষ্য ও বিষমজ্বরনাশক।

অন্যত্র প্রতি শ্যায়াম্ কাস জীর্ণজ্বর সর্ব্বরোগ নাশী, শ্রেষ্ঠধাতু সৌম্যকারিত্বঞ্চ।

সুতরাং এবম্বিধ গুণসত্বেও উহার অপ্রয়োগ যে কোনপ্রকার সঙ্গত নয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আরও দেখুন ভাবপ্রকাশ বলিতেছেন :—

যোজয়েন্নর মেবাজ্যং ভোজনে তর্পনে শ্রমে।
বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলা নেত্ররোগয়োঃ।।

রাজযক্ষ্মানি বালচে বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে।
রোগে সাম বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধেচ মদাত্যয়ে॥
জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পি বহু মন্যতে।

ভোজন তর্পন, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা ও নেত্ররোগে ঘৃত প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাদের মন্দাগ্নি ও শ্লেষ্মলধাতু, তাহাদের পক্ষে কেবল-মাত্র নূতনঘৃত উপযোগী নহে। তারপর ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে চক্রপানি সংগ্রহে বলিতেছেন।

যথাঃ কষায়ৈ র্বমনৈ লঙ্ঘনৈ র্লঘুভোজনৈঃ
রুক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্‌

কষায়, বমন, লঙ্ঘন ও লঘুভোজন প্রভৃতি দ্বারা রোগী রুক্ষ হইয়াও যদি জ্বরের সমতা না হয়, তৎস্থলে ঘৃত প্রয়োগ দ্বারাই একমাত্র চিকিৎসা করিতে হইবে।

সাধারণতঃ বিষমজ্বরে (ক্ষয়াদি জনিত জ্বরে) পিপ্পলাদ্য ঘৃত, ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত, দশমূলষট পলক ঘৃত, বাসাদ্য ঘৃত, গুড়ূচ্যাদি ঘৃতাদি ব্যবহার করাইবার বিধান আছে।

আমরা এই কয়টী মধ্যে পিপ্পলাদ্য ঘৃত ও দশমূলষট পলক স্বতই বিশেষ আবশ্যকীয় মনে করি।

——০:০:০——

কান্তা।

স্ত্রীশিক্ষা।

অনুবাদক, — শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

সরলা। বালিকা বা বিধবা অবস্থায় স্ত্রীজাতির পরাধীনতারূপ দুঃখ কেন সহিতে হয় এবং তাহার কারণ কি?

কান্তা। বোন, তুমি যথার্থই সরলা। ভেবে দেখ, যদি বালকবালিকা পিতা-মাতার অধীন না থাকে, তাহা হইলে উহাদের পালন, পোষণ ও সংরক্ষণ হওয়া

সম্ভবপর নয়, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া যাইবে। কেহ কেহ উহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া কুপথে লইয়া যাইতে পারে এবং তাহার ভয়ে উহাদিগকে আজীবন দুঃখভোগ করিতে হইবে। এই জন্য বালক-বালিকার পক্ষে তাহাদের পিতা-মাতার অধীন থাকা তাহাদেরই হিতকর বোঝা উচিত। কারণ বাল্যাবস্থায় তাহারা নিজের সাধন শূন্য। সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের পতির অধীন থাকা তাহার পক্ষেই লাভজনক। কেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেবাযোগ্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের তাঁহাদের সন্তানসন্ততির নিকট থাকাই লাভজনক এবং বিধবার পরাধীন থাকিবার কারণ এই যে, স্বামীর জীবদ্দশায় পতিসেবার জন্য যে ফললাভ করিয়াছেন, স্বাধীনভাবে থাকিতে গিয়া তাহার প্রতিকূল ফল ভোগ না করিতে হয়—অর্থাৎ অধীন থাকিলে নূতন পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক (অপবাদ) না থাকে, তবে স্ত্রীজাতির পক্ষে অমুক (সীমা পর্য্যন্ত) পুরুষের অধীন থাকার কারণ বক্ষ্যমান বিষয়গুলি জানিবে।

(১) স্ত্রীজাতির হৃদয় ভগবান স্বভাবতঃ কোমল করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যদি তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে যায়, তবে তাহারা নিজের বা পতির গৃহের হানিজনক কার্য্য করিয়া ফেলিবে ইহা সম্ভবপর।

(২) স্ত্রীজাতিতে স্বাভাবিক অজ্ঞানের ভাগ অধিক থাকাতে অজ্ঞানের 'হঠ' ভাগও হঠকারিতা উহাতে বিদ্যমান আছে। আর সেই জন্যই এই যে স্বতন্ত্রতার কথা বলিলাম তাহাই আসিয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য তাহাদের দ্বারা হানিজনক কার্য্য সম্ভবপর হইয়া উঠে।

(৩) স্ত্রীলোকমাত্রেই অবলা; করুণাপাত্রী। তজ্জন্য স্বতন্ত্র থাকিয়া যেরূপ কার্য্য করা উচিত, সেরূপ করা সম্ভব নয় (কোন কোন বীর রমণীর কর্ম্ম সাধারণের ভিতর গণ্য নয়)।

(৪) স্ত্রীজাতিকে সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময় ও শক্তি অধিক পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়, সেইজন্য আরব্ধ কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার এমন কি তাহার সাধন জন্য উদ্যোগ করিবারও শক্তি থাকে না। সংক্ষেপতঃ তাহাদের পরাধীনই থাকিতে হয়।

(৫) স্ত্রী ক্ষেত্র ও পুরুষ বীজ। যদ্যপি ক্ষেত্র ভাল না হয়, তবে তাহার

কণও ভাল না হওয়াই সম্ভব। সেইজন্য স্ত্রীজাতিকে কতক মর্য্যাদার (সীমার) ভিতর রক্ষাসত্ত্বেও রক্ষা করিবার আবশ্যক হয়। জানিয়া রাখিও স্ত্রীপ্রকৃতি দুর্ব্বল, এবং এইরূপ শক্তিতে নিজেদের রক্ষা করিতে অসমর্থ। আরও ইহা বুঝা উচিত যে, প্রকৃতিই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতিকে সঙ্গী নির্ব্বাচন করিতে বিশেষ সতর্ক হইবার সূচনা করিতেছে। নতুবা স্বেচ্ছাচারিণী হইলে ক্ষেত্রের বিকার হইবার অধিক সম্ভাবনা। যদি ভগবৎ কৃপায় স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক লজ্জা, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও কোমলতা না থাকিত, তাহা হইলে কি যে, পরিণাম হইত কে বলিতে পারে, যদি বীজ দুষ্ট হয়, তাহা হইলে বৃক্ষ দূষিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য বীজ শুদ্ধও নিরোগী ও সবল হওয়া উচিত। বীজ ও ক্ষেত্র উভয়ই যদি শুদ্ধ ও নিরোগী হয়, তবেই উত্তম সন্তান উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এই নিয়মসত্ত্বেও শরীরের লাবণ্যের অংশের বিকাশ বা পূর্ণতা ক্ষেত্রের উপর অধিক নির্ভর করে। এইজন্য ক্ষেত্রের রক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়াতে স্ত্রীজাতিকে অধিকমাত্রায় স্বেচ্ছাধীন থাকিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু উহাদের পোষণ ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বিধেয়। সত্য কথা বলিতে কি, স্ত্রীজাতির পরাধীনতারূপ সামাজিক নিয়ম তাহাদের উপর দয়ার দৃষ্টি করিতেছে। কারণ ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষ কুকর্ম্মী ও দুরাচারী হয় তাহাকে নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া দুঃখে জীবনযাপন করিতে হয়। কিন্তু পুরুষদিগের মত স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকাতে উহাদের ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় না। অধীনতারূপ অবস্থায় দয়া বুঝিতে হইবে।

এই সকল কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ সতন্ত্রতার নিষেধ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথার উপর দোহাই দিয়া মূর্খ লোকেরা স্ত্রীজাতিকে দাসী অপেক্ষা তুচ্ছ মনে করিয়া উহাদিগকে যেন কয়েদখানার ভিতর আবদ্ধ রাখিয়াছে। এরূপ আচরণ পুরুষদিগের অত্যন্ত ভুল ও তাহাদের ঘোর অজ্ঞানতা। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, এবম্বিধ আচরণে তাহাদের নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছে ও যে বৃক্ষে বসিয়া আছে, সেই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন স্বহস্তে করিতেছে। যদি স্ত্রীজাতিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায়, অর্থাৎ পড়ান যায়, বিবিধ প্রকারের জ্ঞানদান করা যায় এবং সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক ও স্বীয় কল্যাণসূচক সংস্কার তাহাদের হৃদয়ে গ্রথিত করা যায়, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহাদের শারীরিক উন্নতির জন্য নির্ম্মল জলে স্নান ও বায়ুসেবন করান যায় তাহা হইলে

অন্তঃপুরে থাকিয়াও তাহারা নানাবিধ সৎকার্য্য করিতে পারে। এই সকল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছু বিদ্যানীতি, শিল্পাদি, স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা বা সম্পাদন করিবে, তৎসমূহের বীজ গর্ভোস্থিত সন্তানে আরোপিত হইবে। এই বীজ হইতেই ভবিষ্যতে শুভদায়ক বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইবে।

যদি স্ত্রীজাতি তাহাদিগের স্বাভাবিক যোগ্যতানুরূপ শিক্ষা না পায়, তাহাদিগকে সৎকার ও সম্মান না করা যায়, সুখী করিতে চেষ্টা না করা যায়, মন উৎসাহশীল ও প্রফুল্ল না রাখা যায়, এবং বিশুদ্ধ বায়ু, দিব্যালোক, নির্ম্মল জল না ভোগ করিতে দেওয়া যায়, পরন্তু উহাদিগকে কেবল আবদ্ধ রাখিয়া মনঃপীড়া দেওয়া যায়, উঁহাদের গলায় রীতিরূপ ফাঁসী পরাইয়া চলিত প্রথার দোহাই দিয়া অন্ধকারে নির্জীব করিয়া ফেলিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহাদের সন্তানসন্ততিও অনুৎসাহী রোগা, দুর্ব্বল জড়মতি, মূর্খ ও স্বল্পায়ু হইবে এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন হইতে পারিবে না, ইহাই স্বাভাবিক। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীজাতি যে পরাধীন থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা কেবল এই সুশিক্ষা-বিরহের বিষময় ফল। আর এই যে আজকাল এত অপদার্থ দুর্ব্বল সন্তান জন্মিতেছে, তাহার মূল কারণই পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞ-পুরুষমণ্ডলীর ঔদাস্য! ইহার প্রতিকারের জন্য স্ত্রীজাতি কি পরিমাণে এবং কি নিয়মানুযায়ী সতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, এই বিষয় বৃদ্ধা ও বিদুষী রমণী মণ্ডলী এবং পণ্ডিতদিগের সভা দ্বারা নির্ণীত হওয়া উচিত। স্ত্রীমাত্রেই যদি সেই নিয়মাধীন হইয়া চলে, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে এবং তাহা হইলে তোমাদের মত কাহাকেও আর এই সব বিষয়ে প্রশ্নাদি করিবার প্রয়োজন হইত না।

ভগ্নি, যে সকল পুরুষ স্ত্রীজাতিকে উদাস ও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন এবং তদ্দৃষ্টি-অনুযায়ী বা কুরীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে পরাধীন করিয়া রাখেন ও বাঁদীর মত দেখেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিলে স্বতঃই তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা ও তিরস্কারের উদ্রেক হয়। সেইজন্য এই পুরুষমণ্ডলীকে মূর্খ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

স্ত্রীজাতির এবম্বিধ পরাধীন স্থিতি ও তাহাদিগকে করুণাপাত্রী মনে করিয়াই তুমি এই প্রশ্ন করিয়াছ, বুঝিতে পারিয়াছি, এবং আমিও এরূপ পরাধীন ও হীন-স্থিতিকে শতবার ধিক্কার দিই। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তদনুযায়ী যদি স্বতন্ত্রতা ও অস্বতন্ত্রতার মর্য্যাদা, রীতি, নিয়মবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বর্ত্ত-

মান সময়ের যে হীন পরাধীনতার যে বিষময় ফল তাহা আর স্ত্রীজাতিকে ভুগিতে হয় না। বরং তাহারা এই সসীম পরাধীনতার ভিতর থাকা নিজেদের সুখকর এবং হিতকর জানিয়া সদা উৎসাহপূর্ণ থাকিবে ও প্রফুল্লচিত্তে নিজ কর্ত্তব্যপালনে যত্নবতী হইবে। কেবল ইহাই নহে, সাংসারের ও জগতের নানা প্রকার কল্যাণ সাধন করিতে পারে এরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইবে।

সমালোচনা।

পাগল-সঙ্গীত।—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৲একটাকা।

নামেই প্রকাশ—উহা একখানি গীতিকাব্য। ইহাতে শিব, কৃষ্ণ, শক্তি, প্রভৃতি দেবদেবী বিষয়ক গীত সন্নিবিষ্ট। গীতগুলির শব্দবিন্যাস চিত্তপ্রসাদক, শব্দেই প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস হয়, সুরে গাইলে যে কি মধুর শুনিতে লাগিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যোগেশ বাবু ভক্তি-বিষয়ক গীত রচনায় সিদ্ধ; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বর সন্নিধানে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার কামনা করি, তিনি একজন সুকবি ও সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার মত সাধু ব্যক্তির ইহলোকে অবস্থান সংসারের কল্যাণজনক।

তারা। বীরভূম জেলার কুণ্ডলাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এই নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তারাপুরে তারা দেবীর একটি মন্দির আছে, স্থানটি 'তারাপীঠ' নামে বিখ্যাত। সেই পীঠটি সিদ্ধ পীঠ। কথিত আছে, মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় যোগসাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, নাটোরেশ্বরী রাণী ভবানী তারাদেবীর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আজিও নাটোরের রাজ-সংসার হইতে তারাদেবীর পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনা করিয়াছিলেন। অটলা গ্রাম নিবাসী সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাল্যাবধি তারাদেবীর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তারাপীঠের প্রধান কৌলিক। গ্রাম্য লোকেরা বামাচরণকে বামাক্ষেপা বলিত। এক্ষণে সেই পাগল একজন মহাযোগী। বাবু মহিমারঞ্জন এই পুস্তিকার শেষভাগে বামাক্ষেপার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেবীভক্তির ন্যায় বামাক্ষেপার মাতৃভক্তিও অতুল্য। বামাচরণ আজিও জীবিত আছেন, যাঁহারা সাধুজীবনের পরমতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মূল্য চারি আনা।